ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

শিল্পীর অবকাশ, স্রষ্টার নিরীক্ষা

হরপ্রসাদ মিত্র

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মঋতুতে নাট্যকার জে. এম্. সিন্‌জ্ তাঁর ব্যক্তিগত কোনো কোনো বিশ্বাস বা মতামতের কথা লিখে রেখেছিলেন। প্রধানতঃ সে-সব ছিল তাঁর সাহিত্য-বিশ্বাসেরই নানা দিক। তাঁর সেই উক্তিমালার একটিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, যথার্থ শিল্পী যাঁরা, তাঁরা কেবলমাত্র মতবাদের রাজ্যে বাঁধা থাকতে পারেন না। তিনি 'থিওরি' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। কোনো 'থিওরি'তে আবন্ধ থাকার মানে তো আর-কিছু নয়, —সেই বিশেষ বুদ্ধিতেই বন্দী থাকা! সে অবস্থা শিল্পীর কাম্য নয়। সেটা শিল্পীর স্বক্ষেত্রই নয়। লেখক, চিত্রকর, মূর্তিকার ইত্যাদি শিল্পলোকের সাধক যাঁরা,—তাঁদের বাস অন্যত্র। সিন্‌জের নিজস্ব মত এই ছিল যে, সৃষ্টিক্ষমতা শিল্পিমনের অর্ধ-অবচেতনাতেই নিহিত থাকে। তাঁর কথায়, 'All theorizing is bad for the artist, because it makes him live in the intelligence instead of in the half-subconscious faculties by which all real creation is performed.'

এ কথা এতো বেশি সত্য যে, এ প্রসঙ্গের উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। সাহিত্যের সংসারে, 'থিওরি'-র বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে চলার অন্ত নেই তবু। একথাও ঠিক যে, সাহিত্যের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু সামাজিক জগতে নিত্যই হৈ হৈ লেগে আছে। আজ এক সমস্যা, কাল আর-এক। এইভাবে মানুষের কর্মজীবনে নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত চলছেই। বিচারবুদ্ধির বলে সেইসব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পথ রচনা করাই হচ্ছে প্রতিদিনের ব্যবহারিকতায় অভ্যস্ত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাজ। যাঁরা শিল্পস্রষ্টা, তাঁরাও সেই একই জগতের অধিবাসী। সমাজের মধ্যে বাস করে সামাজিক শিষ্টাচার তাঁরাও মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু তাঁদের ভেতরকার নিগূঢ় শিল্পিসত্তার পুষ্টি নির্ভর করে বেশ কিছু পরিমাণে নির্জনতা উপলব্ধির সামর্থ্যে। সিন্‌জের 'অর্ধ-অবচেতনা' কথাটার ইঙ্গিত সেই দিকেই। বিচারবুদ্ধিলব্ধ 'থিওরি'-সর্বস্বতা নয়,—চাই গহন মনন।

কোনো কোনো পর্বে কোনো কোনো লেখক বা লেখকদল যে সজ্ঞান মনের নিচুতলার অন্যান্য স্তরের ওপর একটু বেশি মাত্রায় জোর দিয়ে মানুষের নানান্ চেতনাস্তর'-ও স্রষ্টা-

মানসের নিগূঢ় অভিমুখিতা সম্বন্ধে 'থিওরি'র বাড়াবাড়ি না ঘটিয়ে থাকেন, তা নয়। সে-রকম বাড়াবাড়ি নিন্দার যোগ্য। সে বিষয়ে সাহিত্যের বড়ো স্রষ্টার কটাক্ষও সুপরিচিত। ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণের "শনিবারের চিঠিতে" প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'অবচেতনার অবদান' লেখাটি এই রকম এক কটাক্ষের নমুনা। তিনি লিখেছিলেন—

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি
লম্বা দাঁড়ার করতাল
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর
লেজখানা যায় ছিঁড়ে
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।

তাঁর এই কবিতার সঙ্গে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে আঁকা 'অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি' নামে একখানি কৌতুকচিত্র ছাপা হয়েছিল। আর, সেই কবিতার মুখবন্ধ হিসেবে তিনি লিখেছিলেন—'অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।'

লেখক-মনের সৃষ্টি-সম্ভাবনার আবশ্যিক শর্ত হিসেবে যাঁরা অবচেতন স্তরের মনন-চিন্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'থিওরি'র বাড়াবাড়ি ঘটাচ্ছিলেন সে-সময়ে,—রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা, এই চিত্র এবং তাঁর এই মন্তব্য তাঁদেরই সমালোচনা।

শশাঙ্কমোহন সেন আরো অনেক দিন আগে লিখে গেছেন—'যেমন সমাজের মধ্যে, তেমনি সাহিত্যের মধ্যেও অনেক শিষ্টাচার আছে, যাহা কদাপি লঙ্ঘন করিতে নাই; এবং লঙ্ঘন অপরিহার্য হইলেও শাস্তিটুকুন মানিয়া লওয়াই কর্তব্য। অস্পষ্টতা, অনির্বচনীয়তা অথবা সংকেতশক্তি যে সংগীত এবং চিত্রশিল্পের একটা পরম গরীয়সী শক্তি, তাহা কোন সূক্ষ্ম-দর্শী ব্যক্তি কোন কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু, কাব্যের মধ্যে, সারস্বত আচারের মধ্যে নানাদিকে উহার সীমা আছে।'

গহন চেতনার উৎস থেকেই যে শিল্পলোকের বড় বড় সৃষ্টির উদ্ভব ঘটে থাকে, সিন্‌জের সেই কথা থেকে এখানে কবিতায় অবচেতন স্তরের বাড়াবাড়ি-ঘটিত দুর্বোধ্যতার কথা উঠলো। এ কেবল আনুষঙ্গিক কথা। এই ধরনেই অন্যদিক থেকে অন্য কথাও হয়তো এইভাবে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে বিষয়বস্তু যাই হোক্ না কেন, বলবার ভঙ্গি বা রীতিটাই যখন প্রধান মনোযোগের বিষয়, তখন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ বা থিওরিতেই বা আপত্তি কিসের? পোপ যেমন 'উইট্' বা বচনচাতুর্যের গুণগান করে লিখেছিলেন—

True wit is nature to advantage dressed;
What oft was thought, but ne'er so well express'd.

কথার চাতুর্যটাই আসল কথা,—এ বিশ্বাসও অনেকের বিশ্বাস। গদ্যে-পদ্যে এরকম কথা বলা হয়েছে। "স্পেক্‌টেটর"-এ একদা অ্যাডিসন লিখেছিলেন—

'Wit and fine writing doth not consist so much in advancing things that

are new, as in giving things that are known, an agreeable turn. It is impossible for us, who live in the latter Ages of the world, to make observations in criticism, morality, or in any art or science, which have not been touched upon by others. We have little else left us, but to represent the common sense of mankind in more strong, more beautiful or more uncommon lights.'

কিন্তু উইট অথবা 'ফাইন রাইটিং' সম্বন্ধে এ-কথার সারবত্তা মেনে নিলেও এ যুগে গভীরতর সাহিত্যসৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই নেই—এরকম চূড়ান্ত রায় অভ্রান্ত বলা চলে না। পোপ বা অ্যাডিসনের পরেও ইংরেজি সাহিত্যের ধারায় সৃষ্টির সম্ভাবনা অব্যাহত ছিল।

বাংলায় রবীন্দ্রনাথের যুগে যখন সাহিত্যসৃষ্টির সমস্ত অলিগলি-রাজপথ সবই তাঁর নিজের নানামুখী সামর্থ্যে ভরে উঠেছিল, তখনো তরুণতর নবীন স্রষ্টার পথ বন্ধ হয়নি। ইতিহাসের ধারায় এক কালের সৃষ্টি যখন পরবর্তী কালের বোধে-বিচারে প্রথার অভ্যাস বলে মনে হয়, তখন সেই নবীন আগন্তুককে তাঁর নিজস্ব পথ তৈরি করে নিতে হয়। সে প্রক্রিয়ার মূলে সেই সনাতন সত্যেরই স্বীকৃতি দেখা যায়—চাতুর্যমাত্র নয়, 'থিওরি'সর্বস্বতা নয়, কেবল লিপিকৌশল নয়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি "তৃণাঙ্কুর"-এর ভূমিকায় এ-সত্যের ইশারা ছিল। তিনিও সিন্জের মতন নিজের উপলব্ধির 'নোট' রেখেছিলেন। এবং অন্যান্য দেশে, অন্যান্য কালে অন্যান্য লেখকদের যা বক্তব্য, বিভূতিভূষণও সেই ধরনের কথা বলে গেছেন—

'লিপিকৌশলের ইচ্ছা ইহাদের মূলে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়িতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোনো বৃক্ষতলে বা শিলাসনে যেসব রচনার উদ্ভব—লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়?...আমার জীবনের ও জগতের বহির্দেশে যাঁহারা অবস্থিত—তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবেন আমি জানি না, তবে একথা অনস্বীকার্য যে কৌতুক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি সকল দর্শকের পক্ষেই স্বাভাবিক— কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানবমনের মূলগত ঐক্য।'

তাঁর সেই "তৃণাঙ্কুর"-এর শেষদিকে কোনো এক বেলেডাঙ্গার পুলের কাছে কোন্ এক ফুলের গন্ধে তাঁর চেতনায় কী আবেশ ঘনিয়ে ছিল, তার উল্লেখ আছে। কুঠীর মঠ থেকে ফেরবার পথে শীতের নিভৃত সন্ধ্যা নেমে আসে। রিগেল বা অন্য কোনো নক্ষত্রের আলো দেখতে দেখতে মন মগ্ন হয়ে যায়। আর সেই অবস্থায় তাঁর মনে হয়—

'যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ রিগেল বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহন, গভীর উদাত্ত বাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত ঊর্ধ্বলোকের আয়তনে মনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্তে। ঐ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী—যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এ সত্যটা তাঁদের অজ্ঞাত নয়। এজন্যেই এমার্সন বলেছেন, 'Every literary man should embrace solitude as a bride.' এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউওয়ালপোল গত জুলাই মাসের *Adelphi* কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক।' জার্মান মিস্টিক এক্হার্ট কখনো লোকের

ভিড় বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন না—তাঁর 'Our hearts' brotherhood' গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার।'

বিভূতিভূষণ মিস্টিক গাথার নজির তুলেছিলেন বলেই যে সাহিত্যের এই গভীর সত্য এড়িয়ে চলা যাবে, তা কখনোই মানা যায় না। অন্য রকমের মন থেকেও অনুরূপ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। অতঃপর তারও একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে সমারসেট মমের *On A Chinese Screen* বইখানি প্রথম ছাপা হয়। ভূমিকায় তিনি তাঁর ভ্রমণস্বভাবের উল্লেখ করেন। ভ্রমণে মানুষ মাত্রেরই মনে মনে যে স্বাধীনতার অনুভূতি জাগে, সেই অনুভূতির প্রশংসা করে তিনি তাঁর ১৯২০-র চীন-ভ্রমণের কথা-প্রসঙ্গে জানান যে, আহার বা শয্যা এ দুয়ের কোনো দিকেই তাঁর কোনোরকম খুঁৎখুতে ভাব ছিল না। মালয় দ্বীপপুঞ্জের এক দ্বীপে তিন বেলা শুধু রম্ভা-ভোজনেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না, সাভাইয়ের এক দিশিলোকের বাড়িতে মাদুরে শুয়ে রাত কাটাতেও তাঁর কষ্ট হয়নি, আবার চীনের এক নদীতে সারা রাত নৌকোতেও কেটে গেছে! সেই বইখানির চতুর্থ রচনার নাম 'গড়ানে পাথর' (The Rolling Stone)। তাতে যে লোকটির ছবি ফুটেছে, সে এক পশুচিকিৎসকের ছেলে। লণ্ডনের পুলিশ কোর্টের রিপোর্টার হিসেবে সে কিছুদিন কাজ করেছিল। তারপর স্টুয়ার্ডের কাজ নিয়ে যায় বুয়োনাস এয়ার্সে। সেখান থেকে সরে পড়ে সে আরো গিয়েছিল সুদূর গোবি মরুভূমি অঞ্চলে। মম্ তাকে দেখেছিলেন। তার মুখ যেন কোনো এক মাঞ্চু-প্রাসাদের দেয়াল! অতি আবর্জনাময় এক রাস্তার ধারে সেইসব দেয়ালের অন্য পারে চিত্রবিচিত্র আঙিনা আছে,—আছে ড্রাগনের মূর্তি,—আছে আরো কতো কী! বাইরে থেকে তার যেটুকু দেখা যায়, তাতে বিস্ময়কর কিছুই নেই। কিন্তু সেই মাঞ্চু-প্রাসাদের দেয়ালের ভেতরে যেমন নানা রূপ, নানা আঁকিবুকি, সেই লোকটার জীবনেও তেমনি কতো ভ্রমণের স্মৃতি! কতো চিলি, তাহিতি, আময় ঘুরে এসেছে সে! মমের সঙ্গে তার যখন দেখা হয়, এসব ঘটনা তখন থেকে ন'বছর আগেকার কথা। অতঃপর আর একদিন চাকরি শুরু করেছিল সে। কিন্তু কোনো চাকরিতেই টিঁকে থাকা তার ধাত ছিল না। অবশেষে নিজের বিছানা বেঁধে নিয়ে, পাইপ হাতে নিয়ে আবার ভবঘুরেবৃত্তি শুরু করেছিল সে। পায়ে হেঁটে,—কখনো বা গরুর গাড়িতে,—কখনো নৌকোয় অনেক রাস্তা পেরিয়েছে সে। মোঙ্গোলিয়ার মালভূমিতে, বর্বর তুর্কিস্তানে,—গোবি অঞ্চলে অনেক ঘোরাফেরা শেষ করে সে যখন ক্লান্ত হয়ে পিকিঙে ফেরে, তখন চীনের এক ইংরেজি পত্রিকার তরফ থেকে তাকে ক'টি প্রবন্ধ লেখবার ফরমাস দেওয়া হয়। লিখে টাকা উপায় করাই তখন তার পক্ষে সবচেয়ে কাম্য, সবচেয়ে সহজ কাজ। মোট চব্বিশটি প্রবন্ধ লিখেছিল সে। কিন্তু—মম্ বলেছেন,—তার সে লেখাগুলি যেন দোকানের সওদার ফিরিস্তি। লোকটি যতোই ঘুরে থাক না কেন, সে সব-কিছুই এলোমেলো ভাবে দেখেছিল। তার দেখবার ক্ষমতাই ছিল না বোধ হয়! মম্ তার স্বভাবের একটু বিশ্লেষণও করে গেছেন সেইসূত্রে। তিনি বলেছেন যে, সভ্য জগতের আচার-আচরণ তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না,—সকলের স্বীকার্য যে পথ, সে-পথ সে পরিহার করে চলে,—জীবন আর জগৎ সম্বন্ধে তার কৌতূহল যদিও কম বলা চলে না, কিন্তু চোখ-কান দিয়ে পাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সে তার আত্মার অভিজ্ঞতা করে তুলতে পারেনি। তার সমস্ত প্রাপ্তিই যেন দেহের অর্জন,—যেন কেবল শরীরেরই অভিজ্ঞতা, 'I think his experiences were merely of the body and were never tran-

slated into experiences of the soul. Perhaps that is why at bottom you felt he was common place।' এই ইশারার পরেই তিনি প্রসঙ্গটি আরো একটু বিশদ করে যা বলেছিলেন, সে-মন্তব্য এ-রাজ্যে লাখ কথার মধ্যে এক কথা বলতে আপত্তি হবে না। মমের দেখা সেই ভবঘুরেটির আসলে অন্তর্দৃষ্টিরই অভাব ছিল। এবং—

'That was certainly why with so much to write about he wrote tediously, for in writing the important thing is less richness of material than richness of personality.'

মমের এই উক্তির মধ্যেই সাহিত্যসৃষ্টির আসল শর্তের ইঙ্গিত আছে। আধুনিক জগৎ যে কর্মভারগ্রস্ত, ঘটনাবাহুল্যময় এবং দ্রুতগতি, সে-কথা মানতেই হয়। কিন্তু এই ব্যস্ততার বিবরণ মাত্রকেই সাহিত্যের মর্যাদা দিতে হবে—এরকম কথা কোনো চিন্তাশীল সজ্জনের দাবি হতে পারে না। একথা বিতর্কের বহির্ভূত। তবু যে এ সম্বন্ধে কিছু লিখে জানানো দরকার, তার কারণ, মাঝে-মাঝে সাহিত্যের কোনো কোনো আসর থেকে চেতনাধারার যথাযথ অভিব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজও কথা উঠতে শোনা যায়। বিজ্ঞানমনস্কতা, ইতিহাস-সচেতনতা, সমাজচেতনা, জনকল্যাণ—এমনকি ইন্দ্রিয়কামনার বিশ্লেষণে অতি-মনোযোগও একালের সাহিত্য-সাধনার আবশ্যিক শর্তাবলীর মধ্যে জায়গা দাবি করছে। জীবনের সত্যস্বরূপ উপলব্ধির চেয়ে ধরতাই বুলি ধরবার দিকেই ঝোঁক যেন বেশি দেখা দিচ্ছে। শেষ লক্ষণটি অনেকদিন পরে হলেও পুনরায় প্রাধান্যের প্রয়াসী। ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়ে বাংলায় এ-বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। সে-সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। 'আধুনিকতা'র নামে মানুষের অন্তর্নিহিত 'পশু-ভাব' উদ্‌ঘাটন করা—অর্থাৎ সেই দিকেই বেশি মন দেওয়া তখনকার 'আধুনিকপন্থী-দে'র খেয়াল হয়ে উঠেছিল। এই আধুনিক খেয়ালের সঙ্গে প্রাচীন কালের তুলনা-প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত ঋগ্বেদ, কালিদাসের নামে প্রচলিত 'শৃঙ্গারতিলক', বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্দ্রের কাব্য ইত্যাদি নানা রচনার কথা তুলেছিলেন। তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে —'প্রাচীনেরা শৃঙ্গারবৃত্তিকে দেখিতেন একটা সুস্থ, সুন্দর, প্রফুল্ল, প্রেয়, এমনকি শ্রেয়বৃত্তি রূপে। কিন্তু আধুনিক যুগে জিনিসটাকে যেভাবে দেখান হইয়া থাকে, তাহাতে মনে হয় ইহা যেন একটা দারুণ ব্যাধি।' এ তাঁর নিজের ভাষা। এই আলোচনার মধ্যেই তিনি আরো বলেন যে—'অসল খাঁটি দিগম্বর সত্যের আবরণ আচ্ছাদন অবগুণ্ঠনেরই অন্য নাম সভ্যতা।' এবং একালের বিজ্ঞানমনস্কতার সূত্র ধরে তিনি আরো বলেন—'বিজ্ঞান তাহার রূঢ় আলোক-শলাকা দিয়া আমাদের জ্ঞানের চক্ষু এইভাবে খুলিয়া দিয়াছে; তাই সত্যকে যথাযথ দেখিতে ও দেখাইতে আমাদের ভয় নাই, কুণ্ঠা নাই—সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'।

সত্য-ই কাম্য, অসত্য পরিহার্য। সিন্‌জ্ সেই উদ্দেশ্যেই 'থিয়োরি'র বশ্যতা মানতে চাননি। এও স্বীকার্য যে মানবসংসারে সব যুগে এমন লগ্নও দেখা দেয় না, যখন সহজে বলা যেতে পারে—

'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।'

কিংবা

'যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।'

গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রহসন ইত্যাদি অন্যান্য সাহিত্যপ্রকারের পক্ষে বিবরণের দাম যতোই থাক্, কবিতার ক্ষেত্রে,—আধুনিক দ্রুত, ব্যস্ত, বিক্ষুব্ধ জগৎ-পরিবেশের প্রকৃতি মেনে নিয়েও বলা চলে যে, মম্ যে ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন, সিন্জ্ যে অর্ধ-অবচেতন উপলব্ধির ইঙ্গিত করেছিলেন, ইমার্সনের কথা তুলে বিভূতিভূষণ যে নির্জনতাপ্রীতি স্বীকার করেছেন, সেই মনোভঙ্গিই শিল্পীর আবশ্যিক প্রতিষ্ঠাভূমি। পোপের প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জোসেফ ওয়ার্টন দেখিয়েছিলেন যে ডান্ এবং সুইফ্ট্ ছিলেন 'মেন্ অব্ উইট্'; 'যথার্থ কবি' বলতে তিনি ভিন্ন এক শ্রেণীর কথা বুঝিয়ে গেছেন। ম্যাথু আর্নল্ডও প্রায় একই রকম শ্রেণীবিন্যাস মেনে নিয়েছিলেন—'উইট' আর 'সোল' (soul)—এই দুই উৎসের কথা তিনি উল্লেখ করে গেছেন। যথার্থ কবি যিনি, তিনি যে তাঁর আপন কালের সর্বাধিক সজাগ, সর্বাপেক্ষা সচেতন ব্যক্তি, সে-কথা আধুনিক কাব্যতত্ত্বজ্ঞানী রিচার্ডস্ও বলতে দ্বিধা করেননি। এইসব আলোচনার মধ্যে 'সচেতনতা' শব্দটির গূঢ়ার্থ অনুভব করে দেখাই একালের বিশেষ কৃত্য। মম্ যে ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছিলেন, কবিতা-সমালোচক এফ. আর. লিভিস আধুনিক কবিতার বিচার-বিধি অনুসন্ধানসূত্রে সেই দিকটিই অন্য শব্দপ্রয়োগের সাহায্যে বুঝিয়েছেন। তিনি 'অভিজ্ঞতার সামর্থ্য' আর 'প্রকাশের ক্ষমতা'—এই দুটি দিকের উল্লেখ করে এ-দুয়ের অবিচ্ছেদ্যতার কথা বলেছেন। বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'রবি-প্রদক্ষিণ' বইখানিতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনার ধারায় তাঁর কবিমানসের আলোচনাই যে প্রাধান্য পেয়েছে,—কাব্যরসের আলোচনা যে সে-পরিমাণে জায়গা পায়নি,—এই অনুযোগ জানাতে গিয়ে একটু ঘুরিয়ে সেই বিশেষ সত্যবোধের অভাবের কথাই যেন বলেছিলেন। তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা সম্পর্কিত মতামতের কথা আলাদা। এখানে কেবল পূর্ব-প্রদর্শিত ঐ অনুসন্ধানের কথাই উল্লেখযোগ্য। কবির কল্পনাশক্তির বিশেষ লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর কথা ছিল এই—

'এই বহির্জগৎ—এই সৃষ্টির মধ্যেই যে কল্পনা আপনাকে মুক্তি দিয়া যেন একপ্রকার বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে আত্ম-চেতনা মিলাইয়া সর্ব-বিরোধ ও সর্ব-বৈচিত্র্যের তীব্র তীক্ষ্ম অনুভূতিকেই দ্বন্দ্বাতীত করিয়া তোলে, তাহাই উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা।'

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কবিকর্মে যুগবিভেদগত যে-পার্থক্য তাঁর চোখে পড়েছিল, সেই ব্যবধানের বা যুগবৈষম্যের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেন—"এখনকার কালে কাব্য-রসের আস্বাদনে এইরূপ আত্ম-বিলোপ অতিশয় দুঃসাধ্য, কারণ, তীব্রতর জগৎ-চেতনার ফলে এখন আত্মচেতনাও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে।" কিন্তু, "তথাপি কবিকে কাব্যসৃষ্টি করিতে হইলে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বকেই অন্য উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে; ভাবকে রূপের অধীন করিতে না পারিয়া কেবল রূপকে ভাবের অধীন করিলে চলিবে না...।"

মোহিতলাল নিজে মনে করতেন যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণযৌবনের কাব্যে 'ভাব ও রূপের সাযুজ্য-সাধনে এক অপূর্ব রসের অভিব্যক্তি' ঘটলেও তাঁর সে-পর্বের সাধনা তাঁরই উত্তর জীবনের সাধনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিল। একালের পাঠক-মনোধর্ম সম্বন্ধে তাঁর এ মত উপেক্ষণীয় নয়। তিনি আরো বলেছেন—'আধুনিক কাব্যের কাব্য-সমালোচনায় গীতিকাব্যের আদর্শই অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করায়, কাব্যরস অপেক্ষা কবি-মানসই আলোচনার মুখ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়।' আবার যাঁরা 'সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র অনুসারে' রবীন্দ্র-কাব্যের রস-প্রমাণে যত্নবান হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—'শুধুই রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়,

সকল আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদে তাঁহারা এখনও পরাঙ্মুখ।”[1] এ একালের মনস্তত্ত্ব-প্রধান সমালোচনাভঙ্গিকেও তিনি যেমন অসম্পূর্ণ বলেছেন, অতীতের অলঙ্কার-নির্ণয়-প্রধান ভঙ্গিরও তেমনি নিন্দা করেছেন। এসব পন্থাকে তিনি বলেছেন ‘অতিচার’।

তাহলে তাঁর মতে প্রকৃষ্ট পথ কোন্‌টি?—কোন্ রীতি বা দৃষ্টিকোণ,—আদর্শ বা বিশ্বাস,—বিশ্লেষণ বা বীক্ষার সাহায্যে রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবাহের সম্যক্ মূল্যায়ন সম্ভব? তিনি তো বলেছেন—‘যাঁহারা আদি হইতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ কাব্য-সাধনায় তাঁহার কল্পনার নিত্যনব ভঙ্গিকে একই কাব্যব্যক্তির মানস-পরিণতির বিভিন্ন স্তর-বিকাশ মনে করিয়া আশ্বস্ত হন, তাঁহাদের সঙ্গে এই হিসাবে আমার মতবিরোধ নাই যে, সে ক্ষেত্রে কাব্যই মুখ্য নয়, কবিমানসই মুখ্য—সে বিচারের ক্ষেত্রই স্বতন্ত্র। কিন্তু যেখানে কাব্যবিচারই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কাব্যের উপরে কবিকে স্থান দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।’[2]

অর্থাৎ কাব্যবিচারে কবির মনস্তত্ত্বের বিচার গৌণ;—বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ নয়, মতবাদের পর্যালোচনা নয়,—বাইরে থেকে কোনো ‘থিওরি’র আরোপও নয়, সন্ধানও নয়,—চাই কবির গহন মননের আস্বাদন! এই ছিল মোহিতলালের অভিপ্রেত আদর্শ।

অতঃপর তাঁর আলোচনা অন্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে। এখানে সে-সব কথা অপ্রাসঙ্গিক। শিল্প-সৃষ্টিতে স্রষ্টার মগ্নতা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্য বলতে কী বোঝায়, তার নিদর্শন রসিক পাঠকের অজানা নয়। গল্প, উপন্যাস, মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে সে-সব উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। এখানে সংক্ষেপে দুটি মাত্র দৃশ্যের সাহায্যে ভাষাশিল্পীর সেই মগ্নতার নিদর্শন তুলে দেখানো যেতে পারে। দুটিই অবনীন্দ্রনাথের লেখা। ১৩৩৪ সালে তিনি তাঁর ‘আপন কথা’র মধ্যে এইসব ছবি রেখে গেছেন। প্রথম ছবিটি এই—

‘এটা জানি তখন—দিন আছে রাত আছে, আর তারা দুজনে এক সঙ্গে আসে না আমাদের তিনতলার ঘরে! এও জেনেছি বাতাস একজন ঠাণ্ডা, একজন গরম কিন্তু তাদের দুজনের কারো একটা করে ছাতা নেই গোলপাতার—রোদে পোড়ে, বর্ষায় ভেজে ওদের গা।

এও জেনে নিয়েছি যে একটা একটা সময় রোদ অনেকগুলো বাইরে থেকে ঘরে এসেই জালনাগুলোর কাছে একটা একটা মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাতে বসে যায়; কোনোদিন বা রোদ একজন হঠাৎ আসে খোলা জানলা দিয়ে সকালেই—তক্তপোষের কোণে বসে থাকে সে, মানুষ বিছানা ছেড়ে গেলেই তাড়াতাড়ি গড়িয়ে নেয় রোদটা একবার বালিশে তোষকে চাদরে আমার খাটেই—তার পর চট্ করে রোদ বিছানা ছেড়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়ে কড়ি-কাঠে—ধরা পড়ার ভয়ে! হাতের কাছেই আল্‌সের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে জানি আলো হলেই তারা দুজনে পড়া মুখস্ত করে—পাক্ পাখম্, সেজ্‌দী মেজ্‌দী।’

অতঃপর দ্বিতীয় ছবিটি। ‘ভাব’ নামে ছোটো একটি প্রবন্ধে সেই সময়েই তিনি লিখেছিলেন—

‘রূপকথায় শুনেছি—পাতার ঠোঙ্গায় কোন্ এক রাজকন্যার একগাছি চিকণ কেশ—তাই দেখে বিভোর হল ভাবে রাজপুত্র! এটা রূপকথা সুতরাং কথার কথা বলতেও পারো,

---

[1] মোহিতলালের এই উক্তিগুলি তাঁর “রবি-প্রদক্ষিণ” (পৌষ, ১৩৫৬) গ্রন্থের ১৫—১৭ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া।

[2] “রবি-প্রদক্ষিণ” (১৩৫৬) পৃ ১৬।

কিন্তু আকাশের প্রান্তে কাজল মেঘের সরু একটি টান—সেটা দেখে যে কবির ভাব জাগে তার কি! শুনেছি চীন দেশে তারা একটা তুলির টান দেখে রস পায়—সাদা কাগজে একটি টান, অন্ধকারে একটি আলোর রেখা—এসব জাগায় কিনা পরীক্ষা করে দেখলেই পারো!'

একেই বলতে হয় শিল্পীর ব্যক্তিঐশ্বর্যের উদাহরণ। এ কোনো থিওরি-তাড়িত আর্ট নয়। এর মূলে আছে শিল্পীর অবকাশ, আর তাঁর সত্যিকার নিরীক্ষা। সে অবকাশ সক্রিয়তায় পূর্ণ। এর আবেদন সনাতন, তবু এর ভঙ্গি যে সমুচিতভাবে আধুনিক, সে-কথা বলতে আপত্তি হবে কি?

কেবল এই ধরনের ক্ষণচিত্রেই যে শিল্পীর স্বাধীন নিরীক্ষার আনন্দ ব্যক্ত হতে পারে,—শুধু উপমাসৃষ্টি বা রূপকসৃষ্টির মধ্যেই যে এ আনন্দ সীমিত, তাও নয়। সত্যিকার বড়ো সৃষ্টির শর্তই এই। উনিশ শতকের শেষ দশকে—১৮৯১এর ৩রা কার্তিক কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে নদীর ধারে বেড়াতে-বেড়াতে শিলাইদহবাসী রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল—'একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হ'চ্চে—জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চ'লেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেইসব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করচে।'

তাঁর সে অবকাশ তো শূন্যতা নয়। সমস্ত চৈতন্য দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, পেয়েওছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—'আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে—সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেন্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এইরকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব ক'রেচে এবং কত কবি প্রকাশ ক'রতে চেষ্টা ক'রেচে—কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে!'

এই নিরাকুলতা বোধ হয় সমুচিত নিরালাতেই দেখা দিয়ে থাকে। ভাবুকতা ব্যতিরেকে এ লক্ষণ ব্যক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এবং এসব কথা এতোই স্বীকার্য যে, এ-বিষয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।
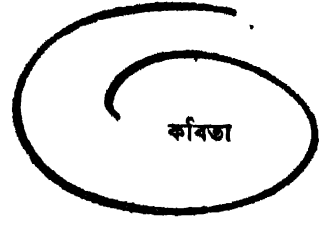
সেই হাত

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

চোখে লেগেছিল আলোর ঝলক পথের প্রান্তে,—
চড়াই পেরিয়ে, উৎরাই ভেঙে, হুড্রু-ধারার
জল ছুঁতে এসে, ক্ষুরধার খাদে বুঝি অজান্তে
সে আমার হাতে রেখেছিল নাকি হাতখানি তার।

পাখির ডানার পালকের মত চিকণ সে হাত
রেশম-কোমল, মনে এই কথা বুনতে বুনতে
যেই পা বাড়াই, উচ্ছল হলো রুপালী প্রপাত;
জলের তরল কণ্ঠের হাসি পেলাম শুনতে।

কে হাসে ওখানে? বিস্মিত মন প্রশ্ন শুধায়—
গেরুয়া-টিলায় রাঙালো গোধূলি-আলোর বাহার;
কেউ হাসেনিতো! শুধু পুলকিত ঘিরে দুজনায়
নিসর্গরাজি তালে তালে যেন দিয়েছে দোঁহার।

পাথরের বুকে পুঞ্জিত যত দুরাশা গভীর,
বিদীর্ণ হয়ে ফেটে পড়ে যেন শতধা-ধারায়;
হৃদয়ে কি সেই জল-কল্লোল আবেগে অধীর
স্নায়ুর তিমিরে মাথা কুটে মরে আঁধার-গুহায়।

ধরা দিয়েছিল সে যেন গহন স্বপ্ন-শিয়রে,
সেই হাত খুলে দিয়েছে দরোজা নীল আকাশের;
কর্মব্যস্ত সংসার মাঝে দিনের প্রহরে
ভোরে উঠে কবে চলে গেছে আমি পাইনিকো টের।

পদাবলীর সূচনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

কেশপাশে বেঁধে রাখো জটিল সময় কুমারিকা!
করতলে করকার কারুকার্য, কম্প্র কর্ণিকায়
কালিন্দীর রাধাচূড়া; প্রতিবিম্বে দোলো কুন্তলিকা।

সজল বাতাসে সিক্ত বসে আছো কলঙ্কছায়ায়।

এই মৃত্তিকার পরে অন্য কিছু কৃষ্য নয় আর
বলরাম বসুদাম দূরে গেছে নবকৃষিকাজে।
এইখানে তুমি আছো, কল্পবৃক্ষ শরীরে তোমার
কাঞ্চন কদম্ব কুম্ভ অকাল আষাঢ়ে ফলিয়াছে।

আর কিছু কৃষ্য নয় নবীন নদীর নীপবনে।
তোমার কোমল কল্ক স্ফুট ক'রে কহ্লারের স্মৃতি
গোপন পুলিনে পুষ্প পদ্মনাল পদাবলী ভণে,
বৈষ্ণব বিনয়পত্রে রৌদ্র লেখে প্রপঞ্চের প্রীতি।

কেশে, মুখচিত্রে যত্নে চর্যা যাও চঞ্চল চন্দনে
অনঙ্গে দংশন করে অনুখন চক্রধর চিতি।

স্বগতোক্তি

শান্তিকুমার ঘোষ

এখন সময় আসে যদি। যখন বিনিদ্র রাতে যন্ত্রণার শেষ প্রান্তে
মনে হয় সব ব্যর্থ, দেবতারা বুঝি মৃত, শার্সির কিনারে দেখি
নিষ্কম্প উদাস মূর্তি, নিষ্পলক দুই চোখে কঠিন আহ্বান
জ্বলে : দ্বিধাহীন যাবো নাকি তখনি সমস্ত ফেলে
জ্যোৎস্নার ধু ধু মরু বিশাল চত্বরে। আমার রিক্ততা যত
সঞ্চিত ক্রন্দনরাশি মুহূর্তে উচ্ছ্রিত হবে আর্তোজিয় উৎস মেঘ-চন্দ্রাতপ তলে।
নিরাবেগ তার মুখ, উত্তরবিহীন ঠোঁটে
প্রতিহত হ'য়ে ফেরে একে একে প্রশ্নগুলি। নিজেরই অজান্তে যেন
কখন নিঃশেষ-শক্তি আপনাকে স'পে দিই হিম আলিঙ্গনে।
জ্যোৎস্নায় দীপ্ত বালি :
অনুগামী দেখি আমি ছায়া পড়ে নাকো তবু আমার নায়ক চলে
অমোঘ মসৃণ গতি শূন্যের গভীরে।

নৈসর্গিক উপহার

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

কয়েকটি স্তবক আমি দিতে পারি তোমার দুহাতে।
ফুল নয়, স্বেদ রক্ত সংহারের বৈষয়িক স্তব;
তুমি যদি ফিরে চাও যদি তব নম্র নেত্রপাতে
ব্যবধান ঘুচে যায় কখনো মানবো না পরাভব।
কারণ তোমার বুকে যাহা কিছু তুলে দিতে পারি
সে তোমারই শরীরের পল্লবিত বকুলের ভার,
আমি তারই পাদদেশে লাবণ্যের হন্তারক, নারী;
কে কার শয়নকক্ষে দিতে চায় প্রবেশাধিকার।

নয়ন ফেরাও তব, তাৎক্ষণিক নয়নাভিরাম
দৃষ্টিপাতে ফিরে পাবো আশ্বিনের জলভরা নদী,
বাতাস তোমার কণ্ঠে করতালি দেয় অবিরাম
আলোর প্লাবনে ভাসে কক্ষ, আলো উদ্যান অবধি।
কয়েকটি স্তবক আমি দিতে পারি রৌদ্ররিক্ত দিনে,
প্রতিধ্বনি ফিরে যায়, প্রতিধ্বনিবিহীন আশ্বিনে।

বিকল্প বসন্ত

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

পদে পদে বিপর্যয়, পর্যুদস্ত জীবনের ডালে
পাতা নেই, বৈণবিক পাখীরা বসে না। তবু কাক
কোকিলের ভূমিকায় যতক্ষণ পারুক চেঁচাক;
নৈরাশ্যের অলঙ্কারে যৌবনের প্রতিমা সাজালে
ক্ষতি নেই। উঞ্ছতৃপ্ত হৃদয়ের সেইটুকু ঢের—
ট্রামে বাসে অকস্মাৎ আড়চোখে পাই যদি টের।

এখন বিকল্প প্রেম—বিপন্ন প্রৌঢ়ের ভালবাসা,
আর্থিক দক্ষিণা দিলে মাসে মধ্যে দু'এক সপ্তাহ
ও পাড়ায় রাত্রিবাস, ফুলশয্যা, গন্ধর্ববিবাহ,—
দম নিতে শুশুকের কিছুক্ষণ পরপর ভাসা।
বন্ধুলের কণ্ঠে তবু শরিকের চেনা আর্তনাদ,
কৃষ্ণপক্ষে জন্ম যার চোখ খুলে সে পায়নি চাঁদ।

এখানে বসন্ত নেই—বাদামী আলোর ফিকে ঋতু,
সৌরভের পুঁজিপতি বহুদিন হয়েছে ফেরার
হৃদয় গুটিয়ে নিয়ে হিমহিম জমাট অসাড়
নিরুত্তাপ শামুকের খোলসের অন্তরালে ভীতু।
শিখীপুচ্ছে দাঁড়কাক মেঘ দেখে পাঁচিলে পাঁচিলে
নৃত্যপরা বৃহন্নলা; সূর্য নেই তারার মিছিলে।

স্বপ্ন

বিমল কর

আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখি।

কাল রাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আরও দেখতে ইচ্ছে করছিল; ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যাবার পর অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকলাম, ছিন্নস্বপ্ন আর জোড়া লাগল না।

ঘরে তখন খাবলা খাবলা রোদ এসেছে। ভাড়াটে বাড়িটা নানা কলরবে পূর্ণ। ছেঁড়া স্বপ্নটা জুড়তে না পারার বিমর্ষতা নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম।

বাসি ঘর, বাসি বিছানা; কদাকার লাগছিল। বাইরে আসতে দেখলাম, সত্যবাবু থলি হাতে বাজারে যাচ্ছেন; কলতলায় বালতি টানাটানি হচ্ছে। কয়েক দণ্ড পরেই যমুনাঝি দুধের বোতল নিয়ে বাড়ি ঢুকল। সদরে পা দিয়েই সে গলা ছেড়ে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল, এই মাত্র যেন কাদের বাড়ির ছেলে বাজারের কাছে লরি চাপা পড়েছে। আহা...!

অমন স্বপ্নটা এখন আর কেউ আমায় মনে করতে দিতে চায় না। ব্লটিংপেপার দিয়ে মানুষ যেমন করে কাঁচা কালি শুষে নেয়, এই খটখটে সকাল এবং রুক্ষ সংসার তেমনি করে আমার স্বপ্নের ভেজা ভেজা দাগগুলো মন থেকে শুষে নিতে চাইছিল; আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছিল, আমি স্বপ্ন থেকে যোজন-দূরে রয়েছি। মিনতি বলল, তাড়াতাড়ি বাজারে যাও, ফিরতি পথে লন্ড্রি থেকে কাপড় জামা নিয়ে এস। কাগজ পড়তে পড়তে দাদা বলল, খবর দেখেছিস একটা মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে বাথরুমে ফেলে রেখেছিল। মা বলল, তোর মামার কাছে আজ একবার যাস—বাঁচে কি না বাঁচে ভগবান জানেন। এর পরই আমি সদরে আসতে পাড়ার ছেলেরা চাঁদা চাইতে এল।

স্বপ্নটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল। মরে যাচ্ছিল এক রকম। আমি বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম। সারা সকাল আমায় মরণ-বাঁচনের লড়াই লড়তে হল যেন।

দুপুরে অফিস। ফিতে বাঁধা দুটো ফাইল এগিয়ে দিয়ে দত্তবাবু বললেন, ক্লিয়ার করে দাও হে, আর্জেন্ট; একটা সামারি দিয়ে দিও, সাহেব ফাইল নিয়ে টুরে যাবে।

স্বপ্নটা দুপুরে হারিয়ে গেল।

বিকেলে অফিস-ছুটির পর আমার খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, একটা সুন্দর পাখি যেন হঠাৎ এসে পড়েছিল, আমি খাঁচায় ধরে রেখেছিলাম, সেই পাখি শেষ পর্যন্ত উড়ে পালিয়ে গেছে, খাঁচাটা পড়ে আছে। বিষণ্ণচিত্তে এই শূন্যতা আমি দেখছিলাম, অনুভব করছিলাম।

সন্ধ্যেবেলায় পথের একটা দোকানে চা খেতে গিয়ে হঠাৎ পুরো স্বপ্নটাই আমার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে যাবার পর আমি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চায়ের দোকানের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওই দেওয়ালে একটুকরো রঙ করা টিন আঁটা ছিল; হলুদ রঙের টিন, তার গায়ে গাঢ় লাল হরফে খাবারের নাম লেখা ছিল : টোস্ট ওমলেট ভেজিটেবল চপ চিঙড়ির কাটলেট ইত্যাদি। পাশে পাশে দাম লেখা।

কাল রাত্রে দেখা স্বপ্নটার কথা আমার মনে পড়ল।

স্বপ্নটা শুরু হয়েছিল রেলগাড়ির কামরায়। কোথায় যেন যাব বলে বেরিয়ে ট্রেনে উঠেছি। গাড়ি চলছিল। এক ভদ্রলোক ও-পাশের বেঞ্চে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়ে-ছিলেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, পাশ ফিরে থাকায় আমি ও'র মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম। জনৈকা মহিলা ও'র পাশে কোল পেতে বসে। মহিলার মুখ দেখা যাচ্ছিল। বয়স্কা। মাথার তলায় অগুছোলো ঘোমটা জড় হয়ে আছে। বসে বসে তিনি ঢুলছিলেন। সময়টা রাত। বাইরে অন্ধকার। এঞ্জিনের মুখ থেকে উড়ন্ত অঙ্গারকণা বাতাসে স্ফুলিঙ্গ হয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল। কখনও কখনও মনে হচ্ছিল আমরা জোনাকির বন পাশে রেখে দ্রুত চলে যাচ্ছি।

কামরায় তেমন আলো নেই। বেতের মস্ত একটা টুকরি, জলের পাত্র আর বেহালার একটা বাক্স ছাড়া আমার কিছু চোখে পড়ছিল না। বেহালার বাক্সটা দেখে অনুমান হচ্ছিল, ভদ্রলোক সঙ্গীতের চর্চা করেন।

আমার পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ মহিলা ও-পাশ থেকে উঠে এ-পাশে এসে বসলেন। এ-পাশের বাতি জ্বলছিল না। অন্ধকার। আমি সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসলাম। অন্ধকারে উনি যেন বিরক্তির শব্দ করলেন।

সহসা আমার দু পাশে রেল ইয়ার্ডের বাতিগুলো মুখ বাড়িয়ে দিল। জানলা দিয়ে দেখলাম, একটা মাঝারি স্টেশন। বিয়ে বাড়ির শেষ রাতের মণ্ডপের মতন প্লাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। নাম দেখার আগেই স্টেশন ছাড়িয়ে গাড়ি চলে গেল, বাতিগুলো থেমে থাকল, আমরা অন্ধকারে এগিয়ে গেলাম।

মহিলা ডাকলেন।

আমি চমকে উঠেছিলাম। কেমন করে যেন মলিন আলোর ঈষৎ রেখা তাঁর মুখে পড়েছে। আগে ও'কে বেশ বয়স্কা রমণী মনে হয়েছিল, এখন মনে হল, অতটা নয়। মুখের গড়ন ভরন্ত। সামান্য কয়েকটা দাগ ধরেছে কপালে। উনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

—এটা কোন স্টেশন পেরোলো? উনি জিজ্ঞেস করলেন।

—দেখতে পাই নি।

—গাড়িটা বড় জোরে যাচ্ছে, না—?

—হ্যাঁ; মেল ট্রেনের মতন।

—এবার কোন স্টেশন আসবে?

আমি ভাবলাম। কোন স্টেশন আসবে আমি জানতাম না, তবু ভাববার চেষ্টা করলাম।

—আপনি কোথায় যাবেন? মহিলা শুধোলেন।

'আমি কোথায় যাব' এই প্রশ্নে আমি সচকিত হলাম। কোথায় যাচ্ছি ভাবতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমি অন্ধকারে পড়ে আছি; কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

তবে এ-গাড়িতে কেন? কখন এলাম, কেন এলাম? আমার কিছু মনে পড়ল না। পকেট হাতড়ে টিকিটটা খুঁজতে যাব—মহিলা অ্যালার্ম-চেন ধরে টেনে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে ভয় সঞ্চারিত হল, বিদ্যুতের মতন।

'কি করছেন, কি করছেন আপনি—' এই কথা দুটো বলবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি কিছু বলতে পারলাম না, এবং ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসতে লাগল।

ঘুমন্ত ভদ্রলোক জেগে উঠলেন। মহিলা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলছিলেন। হয়ত চোর ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। ততক্ষণে গাড়ি থেমে এসেছিল, আর আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন

হয়ে দরজা খুলে অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম।

তারপর সকাল। সকাল।

সকালে আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত। পাহাড়তলির জমি দিয়ে হাঁটছি। অথচ এটা ঠিক পাহাড়তলি নয়। বড় বড় মাঠ, ঢালু প্রান্তর এবং বিক্ষিপ্ত গাছ ও ঝোপ দেখতে পাচ্ছিলাম। কাছাকাছি কোথাও যেন কাঠ চেরা চলছিল, করাতের শব্দ আসছে, যান্ত্রিক শব্দ। ক্বচিৎ পাখি ডাকছিল।

আমার ক্লান্তি লাগছিল। পা ধরে গেছে। চোখ জ্বালা করছিল। বুকে সামান্য হাঁপ ধরেছে।

জায়গাটা নির্জন। সামনে ফসলের ছোট ক্ষেত; সবজি বুনেছে কেউ। লাটাখাম্বায় জল তুলছে কে যেন। চিকণ স্বরের একটি করুণ শব্দ ভাসছিল।

হাঁটতে হাঁটতে ঢালু দিয়ে অনেকটা নেমে এসেছি। সামনে ছোট সাঁকো, শুকনো বালির একফালি রাস্তা চকচক করছিল। গাছতলায় একটা গরুরগাড়ি দাঁড় করানো, মাটির হাঁড়ি কলসিতে বোঝাই, গরু দুটো মাঠে চরছে।

সাঁকো পেরিয়ে, বালির রাস্তা ধরে অল্প একটু এগিয়ে আসতেই সেই বাড়িটা আমার চোখে পড়ল। বাড়িটা যেন কোথায় দেখেছি, অবিকল একই ছাঁদ। টালির চাল, পোড়ামাটির মতন রঙ। বাড়ির গায়ে এক টুকরো বাগান; কাঁটালতার বেড়া। কাঠের ফটক। কিছু তরুলতা কিছু ফুলপাতা। লম্বা বারান্দা আমার দিকে মুখ করে যেন চেয়ে আছে। অনেক সময়, আমি দেখেছি, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে আমার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বাড়িটার দরজা জানলা দেওয়াল সব যেন ঠিক ওই রকম করে তাকায়।

এরপর, কী আশ্চর্য, আমি দেখলাম, সেই সুন্দর ছবির মতন বাড়িটার ফটক খুলে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। বারান্দায় চৌকো টেবিল পাতা। চেয়ার সাজানো। হাত কয়েক তফাতে আরও একটা টেবিল, ওই রকম চৌকো, পাশে পাশে চেয়ার। কাঠের জাফরি দিয়ে ছায়া এবং আলোর ফিতে এসে ও-দিকটা কেমন নিবিড় করে রেখেছে।

পথশ্রমে আমার ক্লান্তি এসেছিল; পায়ের পাতা জ্বালা করছে, গোড়ালি দুটো যেন ব্যথায় ডুবোনো। তৃষ্ণা অনুভব করছিলাম, এবং ক্ষুধাও।

বাড়িটার পরিচ্ছন্নতা, শান্তি অথবা নির্জনতা অনুভব করার পর এখানে দু দণ্ড বসবার বাসনা আমায় কাতর করল।

আমি বসলাম। বসার পর চোখে পড়ল কাঠের জাফরির একপাশে একটি ময়ূর। ঘুমিয়ে রয়েছে।

অল্পক্ষণ আমি নীরবে নিশ্চিন্তে বসে থাকলাম। প্রচুর ক্লান্তির পর এই বিশ্রাম আমার ভাল লাগছিল। এত শান্ত আবহাওয়ায় ঘুম আসে। ঈষৎ আচ্ছন্নতা চোখের পাতা ভারী করে তুলছিল।

হঠাৎ ও-পাশের কোনো কোণের ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে স্লেট। মনে হল, মেয়েটি যেন ঘরে বসে পড়ছিল লিখছিল, আচমকা উঠে এসেছে।

আমায় দেখতে পেয়েছিল। ভ্রুক্ষেপ করল না। ময়ূরের পাশে গিয়ে বসল। তার গায়ে ঘন রঙের ফ্রক; মাথার চুল টান করে বাঁধা, কাঁধ পর্যন্ত চুল। ময়ূরটাকে সে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল, ময়ূর জাগল না।

মেয়েটি চঞ্চল। ময়ূর জাগছে না দেখে সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

ওর মুখটি আমি দেখলাম। পানপাতার মতন গড়ন। চোখ দুটিতে প্রতিমার সৌন্দর্য। চিবুক সুডোল। ছোট ছোট দাঁত মুক্তোর দানার মতন দেখাচ্ছিল।

—তোমার নাম কি? আমি তার সঙ্গে আলাপ করবার মতন করে বললাম।

ও আমায় বড় বড় চোখ করে দু পলক দেখল। যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমি তার নাম জানি না।

—কি নাম? ও বলল।—আমার দুটো তিনটে নাম আছে।

—নাকি, দু তিনটে!...একটাই বল, ডাক নামটা।

—পরী।

—বা, চমৎকার নাম। খুব সুন্দর।

—তোমার নাম কি? পরী টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল।

—আমার নামটা তোমার মতন ভাল না। মস্ত বড়, বিশ্রী নাম...

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে।

পরী যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দূরবর্তী সেই স্থান অনুমান করার চেষ্টা করল।

—আমায় একটু জল খাওয়াবে?

পরী সঙ্গে সঙ্গে একপাশে মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ করল। তার পরই চঞ্চল পায়ে চলে গেল জল আনতে। হাতের স্লেটটা তার হাতেই।

এখানকার সব কিছুই বেশ অদ্ভুত লাগছিল। এতক্ষণ বসে আছি কোনো বয়স্ক লোকের সাড়া পেলাম না। আমি যে অনধিকার প্রবেশ করেছি কেউ দেখতে এল না। স্বভাবতই আমার মনে হচ্ছিল, এ-বাড়িতে প্রাণীর সংখ্যা অল্প, এবং তারাও অন্দরমহলের এমন দূরবর্তী অংশে থাকে যেখান থেকে সহজে আসা যায় না।

যে কোনো মানুষ এ-বাড়িতে অতি সহজে প্রবেশ করতে পারে। কোনো বাধা নেই। কোথাও বিঘ্ন দেখছি না। আশ্চর্য! আরও অবাক লাগছিল, অনধিকার প্রবেশ করেও আমার খুব একটা অস্বস্তি অথবা সঙ্কোচ হচ্ছে না।

পরী জল নিয়ে এল। তার বাঁ হাতে স্লেটটা আগের মত ঝুলছে। গ্লাসের সবটুকু জল খেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম। পরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার জল খাওয়া দেখল।

—তুমি বুঝি পড়ছিলে? পরীকে শুধোলাম।

—না। পরী অবাক।

—তবে হাতে স্লেট যে...!

পরী তার টানা টানা টলটলে চোখে আমার দিকে এমন করে তাকাল যে মনে হল, আমার কথা শুনে সে আকাশ থেকে পড়েছে। চোখের ফুরফুরে পাতা ফেলল পরী, ঠোঁট ছড়িয়ে এমন করে মুখটা হাঁ করল, যেন বলতে গেল ঃ এ মা, তুমি কিচ্ছু জানো না!

আমি জানতাম না। পরীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পরী হাতের স্লেটটা আমার টেবিলে রেখে দিল।

—তুমি কিচ্ছু খাবে না? পরী জিজ্ঞেস করল।

—খাব না আবার। খুব খিদে পেয়েছে। এখানে দোকান কই?

—আমাদের বাড়িতে খাবার আছে। পরী তার স্লেট উলটে আমায় আঙুল দিয়ে

দেখাল।—এই দেখ না, কত খাবার। বলতে বলতে পরী দেখল ঘুমন্ত ময়ূরটা জেগে উঠে জাফরির পাশ দিয়ে ওদিকের বারান্দা হয়ে মাঠে নেমে গেল। পরী চঞ্চল হয়ে উঠল, খুব ব্যস্ত; যেন তার আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই। বলল,—তুমি কি খাবে ঠিক করো, আমি আসছি।

কথাটা কোনো রকমে বলেই পরী তার ময়ূরের পিছু পিছু ছুটে চলে গেল।

পরীকে আর দেখা গেল না। আমার মজা লাগছিল, হাসি পাচ্ছিল। তার ছেলে-মানুষি সারল্য এবং চঞ্চলতা যেন স্নিগ্ধ গন্ধের মতন আমার স্নায়ু পরিতৃপ্ত করছিল।

স্লেটটা দেখলাম। আঁকাবাঁকা অক্ষর, সাদা দাগ কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট। যেন হাতে হাতে মুছে গেছে।

খাদ্যবস্তুর নাম দেখতে গিয়ে প্রথমটায় বুঝি একটি দুটি নামে তেমন মনোযোগ দিই নি, অন্যমনস্ক থাকার দরুণ বোধ হয়, তারপর আচমকা মনোযোগ পড়ল, আমি সকৌতুক কৌতূহলে খাদ্য তালিকা দেখতে লাগলাম, প্রথম থেকেই!

প্রথমটা 'সুখ'। একটু অস্পষ্ট হয়ে আসা সত্ত্বেও স্লেট পেন্‌সিলের লেখাটা পড়া গেল। 'সুখ' নামক খাদ্যবস্তুটির দাম মাত্র ছ' পয়সা।

পরীকে আমি প্রশংসা করলাম। এ-রকম নাম আমি দেখি নি। কল্পনা করাও অসম্ভব, একটি খাবারের নাম 'সুখ' হতে পারে। আমার হাসি পাচ্ছিল, অশেষ কৌতুক অনুভব করছিলাম।

স্লেটের মসৃণ কালো গায় সাঁদাটে অক্ষরে একের তলায় অন্য খাবারের নামটিও লেখা। 'সুখ'-এর পর 'তৃপ্তি'; দাম একটু বেশি, সুখের তুলনায়। তবু মাত্র দু আনা। দু আনার 'তৃপ্তি' পছন্দ না হলে আরও দামী খাবার রয়েছে, 'আনন্দ'; চার আনা। আনন্দের পর আরও চার পাঁচটা খাবার। পরীর জামায় লেগে সেই মূল্যবান খাদ্যবস্তুগুলো কেমন মুছে এসেছে, অনেকটা অস্পষ্ট। তবু নজর করে দেখে আমার মনে হল, ওই শেষের দামী খাবারগুলোর একটার নাম 'ভালবাসা', অন্যটা বুঝি 'শান্তি'; এবং শেষেরটা 'ভগবান'।

অনেকক্ষণ এই খাদ্যবস্তুগুলোর নাম দেখলাম। সমস্তটাই ছেলেমানুষি। তবু ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল, কারণ আমি এমন আশ্চর্য দোকানে আর কখনও যাই নি, খাবারের এমন অদ্ভুত নাম আর দেখি নি।

পরী আর ফিরে আসছে না। আমি হালকা এবং স্নিগ্ধ মনে বসে থাকলাম। পরীর অপেক্ষা করছিলাম। জাফরির ছায়া ক্রমশই বারান্দা থেকে দেওয়ালে সরে যাচ্ছিল, দেওয়াল ধরে উঠছিল। একটু বেলায় শীতের রোদ পাওয়া বাতাস মৃদু মৃদু বয়ে গেলে যেমন লাগে এখানে তেমন করে বাতাস বয়ে আসছিল, আমার সর্বাঙ্গ উষ্ণ ও পরিতৃপ্ত হচ্ছিল।

পরী আসছে না। বসে থেকে থেকে আমি উঠলাম; বারান্দা ধরে নীচে মাঠে নেমে গেলাম।

সামনেটা একেবারে ধু ধু। তৃণাচ্ছাদিত ঢালু মাঠ। সমস্ত মাঠ উজ্জ্বল ও অফুরন্ত রোদে ডুবে আছে। মাঠের শেষসীমা মেঘের রেখার মতন। তারপর নদী।

পরী ওই মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছিল। তার আনন্দ কোথায়, কি বস্তু নিয়ে সে খেলছিল আমি এত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। পরীকে দেখবার জন্যে, তাকে ডাকতে আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

শুকনো শক্ত মাটির এক ধরনের গন্ধ ও স্পর্শ আছে, রোদে ঘাস এবং অন্যান্য তৃণ

তপ্ত হয়ে এলে তারও এক রকম ঘ্রাণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। হয়ত আমি এই সব প্রাকৃতিক স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করে খুশী হচ্ছিলাম। হালকা লাগছিল। 'পরী'কে ডাকতে গিয়ে দেখলাম আমার স্বর বাতাসে চতুর্দিকে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। পরীর কানে পেঁৗছচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত পরীর কাছে পেঁৗছতে পারলাম। নদীটা সামনে। ছোট নদী। বালির চরায় অর্ধেকেরও বেশী ঢাকা, ক্ষীণ একটি জলধারা গায়ে গায়ে বয়ে গেছে।

পরীর হাতে স্কিপিং রোপ। সে দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুটছিল।

—পরী।

—উঁ। পরী হাঁফাতে হাঁফাতে সামনে এসে দাঁড়াল। রোদে ছুটে ছুটে তার মুখ ঘামে ভিজে গেছে। নাকের ডগা ফোলা।

—আমায় বসিয়ে রেখে তুমি পালিয়ে এলে যে!

—বা রে, আমি কি তোমার কাছে বসে থাকব! পরী ফ্রকের হাতায় মুখ মুছল।

—তোমার স্লেট...

—তুমি খাও নি?

—না। কে খাবার এনে দেবে!

পরী যেন আমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝল না। সেই ভাবে তাকিয়ে থাকল। তারপর তার চোখে কেমন করুণা ফুটল। যেন বলল, তুমি কি বোকা, তুমি ভীষণ বোকা।

স্কিপিংরোপটা মাঠে ফেলে দিয়ে পরী বলল,—চল তোমার খাবার দিয়ে আসি।

পরীর সঙ্গে আমি হেঁটে চললাম। আকাশে বুঝি হালকা এক খণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছিল, তার ছায়া মাঠের বুক দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

—তুমি খাবার চাইলে ও দিয়ে যেত। পরী বলল।

—কে?

—দিদি।

—তোমার দিদিকে কই দেখতে পেলাম না ত।

—পাও নি!...তবে হয়ত কিছু করছে টরছে।

পরী দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছিল। তার পায়ে জুতো নেই। ঘাস আর খড়কুটোয় গোড়ালি ডুবে যাচ্ছে। মাথার চুল এলোমেলো। পিঠের কাছটা আধখানা চাঁদের মতন।

—তোমাদের বাড়িটা খুব সুন্দর। আমি বললাম।—এত সুন্দর বাড়ি আমি দেখি নি।

—এর চেয়েও সুন্দর বাড়ি আছে। পরী বলল।

—কোথায়?

পরী আকাশের দিকে হাত তুলে দেখাল। দেখিয়ে হাঁটতে লাগল।

আমি আকাশটা দেখলাম। হালকা নীচু মেঘটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। রোদের আভায় ফিকে নীল আকাশ গভীর ও অনন্ত দেখাচ্ছিল।

—ওখানে আরও সুন্দর বাড়ি আছে? আমি হাসির গলায় বলবার চেষ্টা করলাম।

—হ্যাঁ।

—কে বলল?

আমি নীরব। মনে হল, কথাটা পরী বিশ্বাস করে। মনে হল, আমিও বিশ্বাস করি।

বাড়িতে পা দিয়ে দেখলাম, বারান্দা তেমনি নির্জন; টেবিল চেয়ার অবিকল সেই

ভাবে পাতা; মনে হয় না আমি যাবার পর অন্য কেউ বারান্দায় এসেছে, একটু চেয়ার নাড়িয়ে বসেছে, বা টেবিলের কাপড়ে হাত রেখেছে।

স্লেটটা পড়ে আছে। আমি বসলাম। লেখাগুলো দেখছিলাম। এখন আর হাসি পাচ্ছিল না, কৌতুক অনুভব করছিলাম না। আশ্চর্য, আমি নিতান্ত বালকের মতন বিশ্বাস করছিলাম, এই সব খাদ্য এই বাড়ির অন্দরমহলে কোথাও রাখা রয়েছে। আমার লোভ হচ্ছিল, এবং ক্ষুধার বাসনা তীব্র হয়ে উঠছিল।

পরী বলল,—কই বলো, কি খাবে?

স্লেটের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দাগগুলো আমি কেমন অন্যমনস্ক ভাবে দেখছিলাম। কে জানে, আমি আমার প্রয়োজন ও স্বাদ অনুযায়ী খাদ্যগুলি পছন্দ করছিলাম কি না! বস্তুত আমার পছন্দ করার কিছু ছিল না। এই খাদ্যের কোনোটিই আমার আস্বাদিত নয়। আমি শুনেছি, লোকমুখে বারংবার শুনেছি। আমার লোভ হয়েছে; কাঙালের মতন লোভ করেছি।

—তাড়াতাড়ি বলো। পরী বলল।

কী আশ্চর্য, পরীর কথা কানে গেল কি গেল না, আমার মনে হল আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার সেই তীব্রতায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ফাঁকা মনে হল, যেন ঝিমঝিম করছে, হা হা করছে।

সমস্ত, যা আছে সমস্ত আমি আনতে বললাম। ওই স্লেটে লেখা প্রতিটি খাদ্যই এখন আমার পক্ষে প্রয়োজন। আমি অতীব ক্ষুধার্ত।

পরী চলে গেল। তার স্লেট উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি বসে থাকলাম। জাফরির ছায়াগুলো দেওয়ালে নকশা তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বসে থাকলাম, বসে থাকলাম...বসে বসে ক্লান্ত হলাম। পরী এল না।

কখন বুঝি এ-বাড়ির বারান্দা মেঘলার মতন অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ এল না। কোনো সাড়া নেই। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলে মনে হল বাইরে মাঠ বয়ে হু হু করে বাতাস আসছে।

অনুমান করলাম, বেলা মরে গেছে, বিকেল ফুরিয়েছে, সন্ধ্যা সমাগত। অপেক্ষা করার আর উপায় ছিল না। বিমর্ষ ব্যথিত চিত্তে আমি উঠে আসার কথা ভাবছিলাম। সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলে আমি এই অপরিচিত জায়গায় কোথায় যাব এই ভয় এবং উদ্বেগ আমায় বিচলিত করছিল।

আচমকা মনে হল কে যেন আসছে, বারান্দার অন্ধকার দিয়ে এগিয়ে আসছে। সেই ঘনছায়া জড়ানো, ভীষণ মেঘলার মতন অন্ধকারে আমি তাকিয়ে থাকলাম। আঁধারের প্রতিটি যবনিকা তার আগমনে কাঁপছিল যেন, মনে হচ্ছিল ভীরু মৃগের মতন তার পায়ে শব্দ হচ্ছে। আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

আমি তাকে শেষ অন্ধকারে দেখেছি কি দেখলাম-না, দিনের আলো এসে আমার স্বপ্ন ভেঙে দিল। নিষ্ঠুরের মতন।

তবু, স্বপ্ন ভেঙে যাবার পরও অপেক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ। কেউ এল না।

রেস্টুরেণ্টে চা খেতে খেতে কালকের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। লক্ষ করলাম, এখানে যারা এসেছে, সকলেই আমার মতন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।

বাংলা ছোটগল্পের নবদিগন্ত

অচ্যুত গোস্বামী

কল্লোল-কালীন লেখকরা যখন এলেন, বাংলাদেশের সাহিত্যের আসর তখন ছোটগল্পের জন্য তৈরী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভাত মুখুজ্জে প্রভৃতির চেষ্টায় ছোটগল্প একটি জনপ্রিয় রচনা-মাধ্যম বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে গল্পের জন্য কিছু স্থান সংরক্ষিত থাকে; এবং উৎসুক পাঠকের দৃষ্টি সকলের আগে সেই পৃষ্ঠাগুলি খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

বাংলাদেশের বদ্ধ আবহাওয়ায় কল্লোল-কালীনরা নিয়ে এলেন আর এক ভিন্ন দেশের আবহাওয়া, বাঙালী ফুলের সলাজ সকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশের বদলে বিদেশী ফুলের উজ্জ্বল, প্রখর উগ্র বর্ণবৈচিত্র্য। যে বাঙালী মেয়েরা ঘোমটার আড়াল থেকে মুখখানাকে একটুখানি প্রকাশ করে অসমাপ্ত কথাটাকে হাসি দিয়ে কোন রকমে শেষ করে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিত, সাহিত্যের আসর থেকে তারা বিদায় নিল। তাদের জায়গায় দেখা দিল আর এক জাতের মেয়েরা, যারা প্রসাধন আর পোষাকের পারিপাট্যে আপন যৌবনকে সরবে বিজ্ঞাপিত করে বিদেশী বইয়ের ভাষায় কথা বলে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াল জীবনের জয় করে নেবে বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে অতখানি বিজয় প্রত্যাশী হয়েও ড্রয়িং রুমের বাইরে তারা পা বাড়াল না। কল্লোল-কালীন সাহিত্যের তাই প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে রইল মেয়ে আর ড্রয়িং রুম।

লেখকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ভাল ছাত্র। তাঁরা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সর্বাধুনিক বই গোগ্রাসে গিলতেন, আর অনায়াসে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে প্রথম হতেন। তাঁরা জানতেন তাঁদের বাঁধা চাকরি আর ভদ্রগোছের মাইনের ভবিষ্যৎ জীবনটা মোটামুটি সুরক্ষিত। কাজেই তাঁদের ব্যর্থতা-বোধ ছিল একটু ভিন্ন জাতের।

অপ্রাপ্যের জন্য কামনা বোধ করি সমস্ত শিল্প-সাহিত্যের পিছনেই উৎস হিসাবে কাজ করে। কিন্তু কোন কোন সময়ে কোন কোন লেখকের মধ্যে এই কামনা অত্যন্ত সরবে উচ্চারিত হয়ে ওঠে। কল্লোল-কালীনরা ছিলেন সেই জাগ্রত সচেতন উচ্চকিত কামনার লেখক। উপমাটা ভাল শোনাবে কিনা জানি না, কিন্তু অগ্নিমুগ্ধ পতঙ্গের মতই তাঁরা য়ুরোপীয় সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এদেশের শান্ত স্তিমিত বৈচিত্র্যহীন অনুশাসনপ্রধান পারিবারিক আর সামাজিক জীবনকে তাঁরা মন থেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন (প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো অনেকখানি ভিন্নতর ছিল)। মনে মনে আবাহন জানিয়েছিলেন য়ুরোপীয় সমাজের স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে, তাদের বৈচিত্র্যময়তা আর প্রাণচাঞ্চল্যকে। মেয়ে-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ, যৌন-স্বাধীনতা, বিলাসব্যসন, গতিময়তা, উদ্দাম উৎকট নৈশজীবন, আর সর্বোপরি, বিত্ত যশ আর প্রতিপত্তি লাভের অফুরন্ত সুযোগ,—এই সবই ছিল তাদের অন্তরের একান্ত কামনা। তাঁরা ভাল করেই জানতেন হতভাগ্য বাংলাদেশে জন্মলাভের দুর্ঘটনার দরুণ জীবন-কালের মধ্যে এ-সব কামনা পরিপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবং সেই জন্যই দেখা দিয়েছিল ব্যর্থতা-বোধ। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্ন্যাল

প্রভৃতি লেখকদের প্রথম জীবনে লেখা গল্পে প্রধানতঃ দু' জাতের বিষয়বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হয় কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ, আর নয়তো ব্যর্থতাবোধজনিত রক্ষণশীল সমাজের উপর বেপরোয়া আক্রমণ।

এ-সব হল বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের ইতিহাস। আর আজ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে দেখতে পাচ্ছি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিপুল পট-পরিবর্তন ঘটে গেছে। দ্বিতীয় দশকে যে কামনাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, আজ সেই কামনা নানা তীর্যক পথে চরিতার্থতা খুঁজতে গিয়ে হলাহলে পরিণত হয়েছে। কামনা-বিকৃতির সেই বীভৎস রূপ আজকের লেখকদের দৃষ্টি-পথকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সাম্প্রতিক গল্প-সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তুই তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে কামনা-বিকৃতি বা সামাজিক ব্যাভিচার। প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ, খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল, জনতার জন্য নির্দিষ্ট টাকা আত্মসাৎ করা,—এই সব সমাজ-বিরোধী ঘটনা এখন অনেক গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ এ-সব তো বেপরোয়া কামনারই স্বাভাবিক পরিণাম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি যৌন-কামনার ক্ষেত্রেও আজ নানা বিসর্পিল পথে যৌন-স্বাধীনতা অর্জনের পথ তৈরী হয়েছে। কিন্তু যৌন-স্বাধীনতার সেই ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ দেখে এ-কালের কোন লেখক সতীত্ব আর ব্রহ্মচর্য সামাজিক কুসংস্কারমাত্র এ-কথা সদম্ভে ঘোষণা করছেন না কল্লোল-কালীনদের মত।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বা যুদ্ধের সময় থেকে সামাজিক ব্যাভিচার যে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে এমন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর যেটুকু ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নানাবিধ অসৎ উপায়ে সেকালের ধনীরা অর্থ-সংগ্রহ করতেন; এবং সে জন্য চিত্রগুপ্তের পাপ-পুণ্যের খাতায় কী লেখা হয়েছিল জানা নেই, তবে সমাজের খাতায় তাঁরা গণ্যমান্য বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। আমাদের আপিসের কেরাণীবাবুরা বা থানার দারোগাবাবুরা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ঘুষ কী করে নিতে হয় তার শিক্ষালাভ করেছিল। আর যৌন-স্বাধীনতার কথা বিশেষ করে বলে কী হবে? ঊনিশ শতকের উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষমাত্রেই ও-জিনিসকে স্বাভাবিক দৈনন্দিন অভ্যেসে পরিণত করেছিলেন। আর পুরুষরা যখন ব্যাভিচার করতেন, তখন ব্যাভিচারিণীরাও নিশ্চয়ই ছিলেন; তবে তাদের পক্ষে অনেক সময় সংসারে বাস করা হয়তো সম্ভবপর হয়ে উঠত না। কাজেই বড়জোর বলা চলে যে বৃহত্তর স্বাধীনতার আন্দোলনের চাপে মাঝখানের কয়েকটা বছর আমাদের ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটিকে একটু দাবিয়ে রাখতে হয়েছিল। বৃহত্তর স্বাধীনতাকে পাওয়া গিয়েছে। স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রতরটিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

এ-কথা ঠিক যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে সামাজিক দুর্নীতি বর্ষার হঠাৎ প্লাবনের মতই স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। তার কারণ যুদ্ধের সময় বাজারে কিছু ফাঁপানো টাকা ছিল। আর বর্তমানেও সেই একই অবস্থা উপস্থিত রয়েছে; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির হিড়িকে দেশে কিছু ফাঁপানো টাকা আছে। যে বাড়তি টাকা সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে সুসমঞ্জসভাবে ছড়িয়ে পড়ে না সেই টাকাটাই কিছু বিপত্তি ঘটাবে এমন আশঙ্কা থাকে। কাজেই inflated economyটা চলে গেলেই দুর্নীতির হঠাৎ প্লাবনটা হ্রাস পাবে এমন আশা করা অন্যায় নয়। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করি শাসন-রজ্জু যদি আরও দৃঢ় হত, তবে বোধহয় এই দুর্নীতির স্রোত এত তীব্র আর অবারিত হয়ে উঠত না। কিন্তু সরকারকে কর্তব্য-সচেতন করার জন্য সাহিত্য ছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি আছে। দুর্নীতিদমন অভিযানে ছোটগল্প একটি দুর্বল হাতিয়ার। তথাপি দুর্নীতি—বিশেষ করে

যৌন-দুর্নীতির—চিত্রায়ন ছোটগল্পে কেন এত প্রাধান্য লাভ করছে? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব না জানলে সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে আমরা তার নাগাল পাব না।

বঙ্কিমের কালে আমাদের নৈতিক চিন্তার মধ্যে কোন সন্দেহের বিন্দুবিসর্গ ছিল না। দুর্নীতি এবং ব্যাভিচারের প্রাচুর্য থাকলেও তার জন্য যাঁরা নীতিবাদী তাঁদের মন বিচলিত হত না। তাঁরা জানতেন যে মানুষের সমাজের নৈতিক বন্ধন একটা অমোঘ নিয়ম। এবং ভগবান-সৃষ্ট-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার সূত্রে মানব-জীবনের একটি সুনির্ধারিত স্থান রয়েছে। কাজেই যারা অন্যায়কারী, ইহলোকে হোক, পরলোকে হোক, জন্মান্তরে হোক, তারা শাস্তি পাবেই। 'পরিত্রাণয় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' ঈশ্বর নিশ্চয়ই যা হোক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কাজেই নীতির পথ যারা অনুসরণ করে চলত তাদের মনে শান্তি ছিল। যাঁরা একটু শক্ত ধাতুর লোক ছিলেন তাঁদের অনেকে stoic-পন্থীদের মত ভাবতেন, ভাল হোক বা না হোক নীতির পথ আমি ছাড়ব না। এক কথায়, সেদিনকার কারও মন এমন কোন চিন্তায় পীড়িত হত না যে নীতির পথ অবলম্বন করে তিনি জীবনে ভুল করেছেন।

তারপর ধীরে ধীরে আমাদের দেশে সহর, যন্ত্র আর বাণিজ্য-কেন্দ্রিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পশ্চিম দেশ থেকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা গ্রহণ করেছি জড়বাদ আর ভোগবাদের দীক্ষা। ঈশ্বর পরলোক প্রভৃতি জিনিসগুলোকে আজকের সামান্য কৃষকও আর তেমনভাবে বিশ্বাস করে না। যারা নিয়মিত মন্দিরে মসজিদে বা গীর্জায় যায় আর পাণ্ডা বা মৌলবী বা পুরোহিতকে নিয়মিত পয়সা দেয় তাদের মনেও আগের দিনের সেই সক্রিয় ধর্মবিশ্বাস নেই। আমরা জেনেছি যে নীতি মানুষের তৈরী, তা ভগবানের নিয়মও নয়, প্রকৃতির নিয়মও নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নীতি। পশ্চিমীদের সমাজ-নীতি অনেক বেশী কামনা-চরিতার্থতার সুযোগ দেয়, তথাপি ঈশ্বরের রোষ তাদের উপর পতিত হয়নি। অবশেষে কল্লোল-কালীনরা এসে ঘোষণা করলেন যে কামনা-চরিতার্থতাই জীবনের সার-কথা, এই ব্যাপারে যে-সমাজ-নীতি সর্বাধিক স্বাধীনতা দেবে সেই নীতিই গ্রহণীয়।

আজকে নিতান্ত অশিক্ষিত মানুষও জানে যে law of life আর law of morality এ দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আমরা যদি জীবনের নিয়মকে আয়ত্ত ও অনুসরণ করতে পারি তবে বিত্ত প্রতিপত্তি সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু নৈতিকতা এ-সবের কিছুই আমাদের দিতে পারবে না। এক কালে মেকিয়েভ্যালী বলেছিলেন যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ন্যায় বা সততার দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের উন্নতি-বিধানই যখন একমাত্র লক্ষ্য, তখন সেইদিকে নজর রেখে যে কোন কূট-কৌশলকে সমর্থন করা যায়। দেশভক্তির দোহাই দিয়ে গত তিন চারশো বছর ধরে আমরা রাষ্ট্রের অন্যায় নীতিকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়ে এসেছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রেও মেকিয়ে-ভ্যালীর নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য। জীবন-যুদ্ধে উপযোগিতার প্রশ্নে নৈতিকতা সংশয়াতীতভাবে পরাজিত—অসম্মানিত হয়েছে। এই পরাজিত সৈনিকটির জন্য আমরা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না।

কেন আমরা নৈতিকতাকে অবলম্বন করব? ধর্মের জন্য? কিন্তু আমরা জানি, আমাদের এই একটাই জীবন; জীবনের পরে মৃত্যু এবং পরিসমাপ্তি। সমাজের জন্য?

কিন্তু আমরা জানি জীবনে জয়ী ও সার্থক না হতে পারলে সমাজ আমাদের নৈতিকতাকে এতটুকু মূল্য বা মর্যাদা দেবে না; এবং জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য দরকার ন্যায়-নীতি-নিরপেক্ষ মেকিয়েভ্যালীর নীতি। ইতিহাসকে সাহায্য করাব জন্য? মূর্খতারও একটা সীমা থাকা দরকার! যে ভবিষ্যৎ-কালে আমরা থাকব না, আমাদের কোন চিহ্ন থাকবে না, সেই ভবিষ্যতের অজ্ঞাত মানুষদের সুখের জন্য আমাদের এই অত্যন্ত বাস্তব, একান্ত সত্য, কামনা-জর্জরিত জীবনকে বঞ্চিত করব?

না। নৈতিকতা পরাজিত—অসম্মানিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমরা এ-ও জানি নৈতিক বন্ধন ছাড়া মানুষের সমাজ টি'কতে পারে না। নীতি মানুষের রচিত, কিন্তু মনুষ্য সমাজও মানুষের সৃষ্টি। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় আমরা মানুষের সমাজকে প্রকৃতির নিয়ম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। প্রকৃতি-সম্মত সমাজ-নীতির প্রবক্তরা যত কথাই বলুন, আজ আর মানুষের সমাজকে প্রকৃতির কাছে সত্যি সত্যি ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমাদের জীবন-যাত্রা কৃত্রিম; এই কৃত্রিমতাকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

কাজেই নৈতিকতা আজকে এক সমাধানাতীত সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দুর্নীতির সঙ্গে আজকের দুর্নীতির তফাৎ এইখানে। বাইরের চেহারায় খুব বেশী তফাৎ নেই, তফাৎ আছে তাৎপর্যে। নৈতিকতার উপযোগিতা সেদিন সন্দেহভাজন ছিল না; আজকে নৈতিকতাকে আমরা অনায়াসে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অনুপযোগী বলে চিনতে পেরেছি। নৈতিকতাকে অবলম্বন করলে জীবনে সার্থকতা আসবে না। নৈতিকতাকে পরিহার করলে সমাজ বাঁচবে না। এই হল সংক্ষেপে আজকের দিনের সংকটের পরিচয়।

জিনিসটা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন সরোজকুমার রায় চৌধুরী একটি ছোট গল্পে। এক ব্যক্তি ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা চুরি করে বার বছরের জন্য কারাবরণ করে। ফিরে এসে টাকার জোরে সে সহজেই সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠল। মাত্র একজনের কাছে সে নিজেকে ছোট ও হীন বলে মনে করে—তার এক নীতিবাগীশ বাল্যবন্ধুর কাছে, যে তার সমস্ত ইতিহাস জানে। এই হীনতাবোধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে নিজের পুত্রকে বাল্যবন্ধুর কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করে। বাল্যবন্ধু অস্বীকার করে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী যখন বিবাহ-প্রস্তাবটি পুনর্জীবিত করতে চেষ্টা করে, তখন আমাদের হঠাৎ-ধনী ব্যক্তিটি তা অস্বীকার করে। বাল্যবন্ধুর মৃত্যুর পরে এখন আর কারও কাছেই তার কোন নৈতিক দুর্বলতা নেই।

হাল্কা কলমে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে লেখা এই গল্পটি সংকটের গভীরতা ও ভয়াবহতার অনুভূতি জাগতে পারেনি। কিন্তু সংকটের স্বরূপ সঠিকভাবে উপস্থিত করেছে।

গল্প-লেখককে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। পড়া কথা, শোনা কথা, বা খবরের কাগজের রিপোর্ট তাঁর কাছে যথেষ্ট নয়। শুধু অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, যদি লেখক তার মর্মার্থ পাঠ করতে না পারেন। যদি অভিজ্ঞতা জাড়িত হয়ে সংকটের গভীর উপলব্ধিতে পরিণত না হয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতির খণ্ড খণ্ড চিত্র বিভিন্ন ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অসাধুতা, প্রতারণা, নিপীড়ন প্রভৃতির অজস্র কাহিনী চোখে পড়ে তেমনি যৌন-ঘটিত দুর্নীতিরও অনেক কাহিনী

লিপিবদ্ধ হয়েছে। বরং বলা চলে যৌন-ঘটিত দুর্নীতিই লেখকদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভদ্রঘরের দারিদ্র্য-পীড়িত মেয়েরা ধীরে ধীরে বহুভোগ্যায় পরিণত হতে বাধ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক অধীনতা মেয়েদের যে-সব বিপদের সম্মুখীন করে, কলকাতায় এমন বাড়ি আছে যেখানে কুমারী মেয়ে আর অবিবাহিত পুরুষ সন্ধ্যেবেলা যথেচ্ছ বিহারের জন্য দু' এক ঘণ্টার জন্য ঘরভাড়া নিতে পারে, যারা প্রয়োজন বোধ করে তাদের জন্য কলকাতার হোটেলেও নারী সরবরাহ হয়, নারী সরবরাহ একটা নিয়মিত ব্যবসা,—ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ বিভিন্ন বাংলা গল্পে স্থানলাভ করেছে। এ যুগের ছোটবড় প্রায় সব লেখকই এই ধরনের কোন না কোন প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প লিখেছেন।

অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই যুগ-সঙ্কটের উপলব্ধির গভীরতর প্রকাশ নেই। গল্পগুলোর মধ্যে সাধারণতা প্রাধান্য লাভ করেছে, বাস্তবতা নয়। সাধারণতার ভিত্তি একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস,—মানুষের ধ্যানধারণা, নীতি-বোধ, কর্ম-পন্থা, সব-কিছু তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষ এক নিষ্ক্রিয় যন্ত্র; পরিবেশ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে রূপদান করে। কাজেই যে-নীতির উপর ভিত্তি করে এমিল জোলা তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন, এ গল্পগুলো তার চেয়ে অগ্রসর নয়। এ গল্পগুলির আবেদন তাঁদের কাছে যাঁরা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন। বিশেষত্ব এই যে বাংলা দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী মাঝে মাঝে একজন আদর্শবাদী যুবক এসে সামনে উপস্থিত হয় কোন কোন গল্পে। দুর্নীতির সংজ্ঞা নিয়েও জটিলতার অবকাশ আছে। কল্লোল-যুগের পর বঙ্কিমী রক্ষণশীল নৈতিকতায় আজকের অনেক লেখকেরই আস্থা নেই। কোন নারী যদি চাকরি যাওয়ার ভয়ে উপরস্থ অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে সেটা যে দুর্নীতি তা সহজে বোঝা যায়। কিন্তু কোন নারী যদি স্বামীর দেওয়া জীবন যাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ পরপুরুষকে গ্রহণ করে তবে তাকে কি একবাক্যে দুর্নীতি বলা যায়? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর এবং আরও দু'এক জন এ-ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আবার নরেন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গের নৈতিক সমস্যাটা এড়িয়ে গিয়ে তার মানবিক তাৎপর্যগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে লেখকদের উপলব্ধি কল্লোল-কালের সীমানাকে ছাড়িয়ে আসতে পারছে না।

আমি আগেই বলেছি এ-যুগের সংকট ঠিক তাদের নিয়ে নয় যারা দুর্নীতির কবলস্থ। এ যুগের সংকট প্রকৃতপক্ষে তাদের নিয়ে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, অথচ নৈতিকতার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা-বোধ হারিয়ে ফেলেছে। যারা মনে মনে স্বীকার করে যে তারা নির্বোধ অথবা অক্ষম, অথবা দুই-ই, আর সেইজন্যই সমাজের উপরতলায় ওঠার সিঁড়িটা তারা খুঁজে বের করতে পারেনি। যারা মনে মনে জানে যে তারা সুযোগের অভাবে চরিত্রবান।

এক কথায় অপরাধ না করেও অপরাধ-বোধ এ যুগের সংকটের চরিত্রগত লক্ষণ। কাফ্‌কার The Autocratic Father গল্পের নায়ক যখন জ্ঞাতসারে কোন অপরাধ না করেও নিজেকে নিরপরাধ বা শাস্তির অযোগ্য বলে ভাবতে পারছে না, তখন যুগযন্ত্রণার প্রকৃতি গভীর তাৎপর্য ধরা পড়ে। আঁদ্রে জিদের *Immoralist* প্রথমে খুবই moralist ছিল; কিন্তু moralist হওয়ার মধ্যে কোন তাৎপর্য খুঁজে না পেয়ে সে ভিন্ন পথ গ্রহণ করল। এখানে আমরা যুগ সঙ্কটের গভীরতার আভাস পাই।

ননী ভৌমিকের রচিত একটি গল্পে এই অপরাধ না করেও অপরাধ-বোধের ইঙ্গিত

ছিল। কাম্যু-রচিত *The Fall* এর আঙ্গিক কৌশলের অনুকরণে তিনি গল্পটি বিবৃত করেননি। ঘটনার পরে নায়কের মনের কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিন্তার মধ্যে ঘটনাটার একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। গল্পটি সঙ্গতভাবেই কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং তারপর থেকে একদল তরুণ লেখক Stream of consciousness নাম দিয়ে একটি নতুন রীতিতে গল্প লিখতে সুরু করেছেন। এই পরীক্ষামূলকতার মধ্যে কয়েকজন সাম্যবাদে বিশ্বাসী তরুণ লেখকও যুক্ত আছেন দেখে বিস্মিত হয়েছি। তাঁদের জানা উচিত যে গল্পের বিচার গল্পের শেষে লেখক কী বক্তব্য হাজির করলেন তা নিয়ে হয় না; গল্পের বিচার হয় পাঠকের মনে সেটা কী effect বা অনুভূতি সৃষ্টি করছে তা দিয়ে।

চেতনা-স্রোত রূপায়ণের রীতি একটি ভাঙা-চোরা শতধা বিচ্ছিন্ন মনের অনুভূতি জাগ্রত করে; এরকম একটি মন যদি হঠাৎ কোন গভীর বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তো তা সহজেই লেখকের আরোপিত বলে বোঝা যায়। এ-সব লেখকদের বুঝতে পারা উচিত যে এরকম একটা রীতির প্রতি তাঁদের যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ তাঁদের শিল্পী-মানসের উপলব্ধি আর সাম্যবাদের প্রতি অগভীর বিশ্বাস এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ননী ভৌমিকের গল্পটি আদৌ stream of consciousness—অলস চৈতন্যে যে একের পর এক ছবির মত বিশৃঙ্খল, পারম্পর্যহীন চিন্তার স্রোত ভেসে যায়, এবং তার ভিতর দিয়ে যে ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের মত নির্জ্ঞান মনের গুপ্ত সত্য উদ্ঘাটিত হয়, তার শৈল্পিক রূপায়ণ নয়। ননী ভৌমিকের গল্পটিতে রয়েছে কতকগুলি অভিজ্ঞতার পরে নায়কের স্বীকারোক্তি। অন্তরঙ্গ জনের কাছে বিবৃত করেছে বলে তার কথাগুলো একটু বিশৃঙ্খল।

"চতুরঙ্গে"র একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত সুধাংশু ঘোষের লেখা একটি বড় গল্পে অপরাধ না করেও অপরাধ-বোধের স্বীকৃতিকে উপজীব্য করা হয়েছে। গল্পটির মধ্যে কাম্যুর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে; না হলে এটিকে এ-যুগের একটি তাৎপর্য-পূর্ণ গল্প বলে উল্লেখ করতে পারতাম।

যুগ-সঙ্কটের গভীরতার উপলব্ধি যে শুধু আত্ম-অপরাধের স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করতে হবে আমি তা বলছি না। লেখক তাঁর উপলব্ধি ও কল্পনা অনুযায়ী নানাভাবে তাকে রূপ দিতে পারেন। একটি বিদেশী গল্পে পড়ছিলাম, একটি ছবি-পাগলা লোক সারা জীবনের রোজগার দিয়ে অনেকগুলো দুর্মূল্য ছবি সংগ্রহ করার পর হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে, জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে; এবং স্ত্রী ও কন্যা অন্য কোন উপায় না দেখতে পেয়ে একে একে দুর্মূল্য ছবিগুলো বিক্রি করে দিতে বাধ্য হল। বৃদ্ধ প্রতিদিন ছবিগুলো নাড়াচাড়া করে এবং তাইতেই তার অপার আনন্দ। কাজেই স্ত্রী ও কন্যা বৃদ্ধকে ঠকানোর জন্য বিক্রিত ছবিগুলোর বদলে অবিকল সেই মাপের শূন্য ফ্রেম রেখে দিল। যখন কোন অতিথি আসে, তখন মা আর মেয়ে তাকে আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে রাখে। বৃদ্ধ যখন এক এক করে শূন্য ফ্রেমগুলো তুলে স্মৃতি থেকে তার অপূর্ব শিল্প-কৌশলের বর্ণনা দেয়, তখন অতিথিও উৎসাহের সঙ্গে তাতে সায় দেয়। এখানে প্রতারণার পেছনে রয়েছে অন্ধ বৃদ্ধের প্রতি সুগভীর মমতা বোধ। তবু কী জঘন্য প্রতারণা!

একটি ইতালীয় গল্পে বিবৃত হয়েছে যে মুসোলিনীর আমলে যে-সব ফ্যাসিস্ত-তন্ত্রের প্রতি উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তাঁরা বহাল তবিয়তে রয়ে

গেলেন; কিন্তু এক ব্যক্তি যে আগাগোড়া মুসোলিনী সম্পর্কে মোহমুক্ত, সে নিতান্ত চাকরির দায়ে ফ্যাসিস্ত্ দলে নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছিল বলে শাস্তি লাভ করল। যে মেয়র তাকে আগে ফ্যাসিস্ত্ পার্টির সভ্য হতে বাধ্য করেছিল, সেই মেয়রই তাকে সেই অপরাধের দরুণ চাকরি থেকে বিচ্যুত করল। মেয়রের অবশ্য কোনই ক্ষতি হল না। গল্পটি গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। মানুষের প্রকৃতমূল্য নির্ধারণে নির্বিকার অক্ষমতাই এই যুগকে অন্তঃসারশূন্য করে দিচ্ছে।

এ-সব গল্পের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখা এমন একটি বাংলা গল্প পড়েছিলাম। এক আত্মসুখপরায়ণ ব্যক্তি পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কথা না ভেবে প্রায় সমস্ত রোজগারের টাকা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করেন। সুখ-ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় টাকায় টান পড়ায় তিনি একবার তহবিল তছরূপ করেন এবং ধরা পড়ে জেলে যান। লজ্জায় ঘৃণায় অপমান-বোধে লোকটির স্ত্রী দিশেহারা হয়ে ওঠে; তদুপরি তার সংসারের এখন অচল অবস্থা। জেল থেকে লোকটি স্ত্রীকে ডেকে পাঠান এবং সঙ্গে সিগারেট নিয়ে যেতে বলেন। স্ত্রী দেখা করতে গেলে তিনি প্রথমেই সিগারেটের কথা জিজ্ঞেস করেন এবং সিগারেট আনা হয়নি শুনে রাগে আগুন হয়ে উঠলেন। দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্রের এমন মনস্তত্ত্ব-সম্মত প্রকৃত চিত্র খুব কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্রূপাত্মক এই গল্পটি পড়ে আমরা সত্যিই অনুভব করি যারা দুর্নীতির সাগরে তলিয়ে রয়েছে তাদের মনে একটুও লজ্জা বা বিকার নেই; যারা সেই সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে তারা লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না।

সাম্প্রতিক তরুণ লেখকদের কলম থেকে এরকমের তাৎপর্যপূর্ণ গল্প বেরোচ্ছে না। অন্তত আমার চোখে পড়ছে না। অধিকাংশ লেখকই পাঠকের মনোরঞ্জন করতে ব্যস্ত, মনকে অধিকার করতে তাঁরা চাইছেন না।

তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে আধুনিক লেখকরা গল্প লেখার দিকে বিশেষ মনোযোগও দিচ্ছেন না। উপন্যাসের পাঠক বেশি, তাতে পয়সা বেশি পাওয়া যায় বলে আধুনিক লেখকরা গল্পকে অবজ্ঞা করেন, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরকম মনোভাব একটি দারুণ আশঙ্কার কারণ। দু-চারখানা ভাল উপন্যাস বাংলায় লেখা হয়েছে এ-কথা ঠিক; কিন্তু বাঙালী প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে তারাশঙ্কর—প্রেমেন-মানিক কিছু কিছু এমন গল্প লিখেছেন যা বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। গল্পের সে ঐতিহ্যকে আমরা হারাতে বসেছি এ কী কম আপশোষের কথা!

আমার মনে হয় যুগ-সংকটের উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য এ-কালে ছোট গল্পের চেয়ে ভাল মাধ্যম আর নেই। উপন্যাসের অসুবিধে এই যে তার মধ্যে জীবনের বৃহৎ পরিচয় দিতে হয় বলে বাস্তবের বহিরঙ্গের প্রতি তার আনুগত্য অত্যন্ত বেশি। উপন্যাস বস্তু তথ্য ভারাক্রান্ত, অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ তাকে দিতে হয়, অনেক বাস্তবানুগ চরিত্র তাকে সৃষ্টি করতে হয়। আর সেই বিপুলায়তন বস্তুর ভারে জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধি হারিয়ে যায়। অন্তরের বেদনার ভারমুক্ত অলঙ্কারমুক্ত বিশুদ্ধ প্রকাশ সেখানে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ছোটগল্পের ক্ষীণদেহে কোন ভার না থাকলেও চলে। লেখক অনায়াসে নিতান্ত আজগুবি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে জীবনের গূঢ় উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে পারেন। ব্যঞ্জনায়, প্রতীক ধর্মিতায়, ছোটগল্প কাহিনীর সীমাকে ছাড়িয়ে বহু দূরে বহু গভীরে চলে যেতে পারে।

ছোটগল্প হচ্ছে অতসী কাচের ক্ষুদ্র দেহের ভিতর দিয়ে বাস্তবের বৃহৎ অংশকে দেখা, microcosmএর ভিতর দিয়ে macrocosmকে দেখা। ভূমির মধ্যে ভূমাকে দেখা। অন্য জাতের ছোটগল্পও যে না হতে পারে তা নয়; কাহিনীর সীমার মধ্যেই গল্পের তাৎপর্য শেষ এমন গল্পের সংখ্যাই তো পনের আনা। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে মনকে অবাধ সঞ্চরণে সাহায্য করার যে সম্ভাবনা ছোট গল্পের আছে সে কেবল প্রথম জাতের গল্পের ভিতরই সম্ভব। সেইজন্যই বিদেশী সাহিত্যে গল্পের একটু বৃহত্তর সংস্করণ আজকাল খুব জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরীর উপদেশটির কথা আমার স্মরণ আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের গল্প, চুটকিজাতীয় গল্প, কোন চটকদার ঘটনা কোন আকর্ষণীয় চরিত্র ছোটখাট সুখ-দুঃখ হিংসা-ভালবাসাকে কেন্দ্র করে লেখা গল্প,—সব দেশের সব কালের সাহিত্যেই এদের দেখা মিলবে। পত্র-পত্রিকাদিতে এদের সংখ্যাই বেশি থাকবে, এবং সেটা স্বাভাবিক। মানুষ সব সময়ই গভীর রসের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে না; হালকা রস, পরিচিত অভ্যস্ত রস,—এ-সবের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এ-জাতীয় গল্প লিখে ও. হেনরী পৃথিবী বিখ্যাত লেখক বলে পরিচিতি লাভ করেছেন। কাজেই সহজ রসের পুনরাবৃত্তিশীল রসের যাঁরা যোগান দেন তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কোন অভাব নেই। আমি শুধু দুশ্চিন্তা বোধ করি যখন রম্য-রচনার লেখকরা গল্প লিখতে শুরু করেন। জাত গল্পলেখকের নিতান্ত সামান্য গল্পের মধ্যেও এমন-কিছু সূক্ষ্ম রস থাকে যার খবর মুজতবা আলীরা বা জরাসন্ধরা রাখেন না। নরেন্দ্র মিত্রের তুচ্ছতম ঘটনার উপর লেখা গল্পের মধ্যেও নায়ক-মনের চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিচয় থাকে, কিছু অন্তর্মুখিনতা থাকে কাহিনীর ঊর্ধ্বে যার ব্যঞ্জনা পৌঁছুতে পারে। মুজতবা আলীদের কুশলী হাতের ভাষায় ব্যঞ্জনা থাকে, কিন্তু মোটা তুলিতে আঁকা রাজা-উজীরদের কাহিনীতে নিছক খানিকটা চমৎকারিত্ব থাকে, ব্যঞ্জনা থাকে না। এ-সব গল্প নেহাৎ-ই বাস্তবের অতিরঞ্জন, fancy-র সৃষ্টি, imaginationএর সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। বৈঠকী গল্প হিসেবে এগুলো খুব ভাল; গল্পের আড্ডায় আমিও শুনতে পেলে খুশি হব। কিন্তু বইয়ের পৃষ্ঠায় আমি এ-গুলো দেখতে চাই না। এ-সব গল্পের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ পাঠকের সূক্ষ্ম রুচিকে নষ্ট করে দেয়।

কিন্তু আপাতত বেশ-ভাল মাঝারি-ভাল কোনরকম-ভাল ভালই-তো জাতের গল্প আমার সমস্যা নয়। আমার আলোচনার প্রসঙ্গ সেই জাতের গল্প যারা চিহ্নিত, যারা পাঠকের মনের উপর দাগ কেটে বসে যায়, আর দু'চারদিন লাগে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। এ গল্প পাঠককে যুগ ও সভ্যতা সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে, দৈনন্দিনতা, প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠতে পাঠককে সাহায্য করে। কোন দেশের কোন সাহিত্যেই এ জাতের গল্প খুব বেশি লেখা হয় না; কিন্তু যে কয়টি লেখা হয় তাই দিয়েই সাহিত্যের পরিচয়।

দুর্নীতির বিষয়টা নিয়ে আমি একটু বেশি আলোচনা করেছি এই জন্য যে দুর্নীতি বাংলাদেশে আজ ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তার কারণ পশ্চিমী দেশগুলোর তুলনায় আমরা এখনো একটু বেশী আশাবাদী; দেশে যান্ত্রিকীকরণ আংশিকভাবে সাধিত হয়েছে, পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণের দিল্লীকা লাড্ডুটা দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত এই আশাবাদ বজায় থাকবে। কিন্তু দ্রুত পুনর্গঠনের পথে আজকের সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি। সেইজন্যই দুর্নীতি আজ মানুষকে এতখানি বিচলিত করে তুলেছে। এর মধ্যে আজ যুগ-সঙ্কটের রূপকে দেখতে পাচ্ছি। এবং এই দুর্নীতির মধ্যে কোন রাজনীতি নেই, কোন শ্রেণীসংগ্রাম

নেই, কোন ছোট-বড়র ভেদ নে। ধুলোর মতই এই বিষ দক্ষিণে বামে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

তার মানে এই নয় যে একমাত্র দুর্নীতির মধ্যেই যুগ-সংকটের লক্ষণ বর্তমান। বরং বিদেশে দুর্নীতির চেয়ে অন্যান্য প্রসঙ্গ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে,—যেমন যান্ত্রিকতার প্রভাবে জীবনের যান্ত্রিকীকরণ মনোপলি—গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক—ব্যক্তি মানুষকে বিরাট বিরাট সংগঠনের নাট-বল্টুতে পরিণত করছে, ইত্যাদি। এ যুগে মানুষ তার অস্তিত্বের মৌলিক কতকগুলো প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এমন সব আত্মিক এবং মানসিক সমস্যা নিয়ে মানুষ ভাবছে যা সাহিত্যিককে দার্শনিক করে তুলছে। ছোটগল্পে তার ছাপ পড়ছে। সুতরাং ভালো ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর অভাব নেই, যদিও বাংলা দেশে অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে।

তবে বাংলাদেশের গল্পেও যে মাঝে মাঝে বৃহত্তর সমস্যার ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে না এমন নয়। দু'একটি উদাহরণ দিয়ে আপাতত এ আলোচনা শেষ করব। বিজ্ঞান গর্ব করে বলে যে আমরা অজানা ভয়কে দূর করেছি, সমাধানের অতীত সমস্যাগুলোকে কমিয়ে এনেছি। সত্য জিজ্ঞাসু সাহিত্যিক জীবনের গভীরে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন যে মানুষের অস্তিত্বের মূলে কতকগুলো ট্র্যাজেডীর সম্ভাবনা আছে যা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমন-কি আধুনিক যন্ত্রব্যবস্থাও এমন কতকগুলো ট্রাজেডির জন্ম দিয়েছে যা মর্মান্তিক। সমরেশ বসুর একটি গল্প উল্লেখ করছি। ট্রেন দুর্ঘটনায় নায়কের দুটি পা-ই উরু অবধি কাটা গিয়েছে। সে থাকে একটি ঘরে তার ভাইদের আশ্রয়ে, অশক্ত, উপার্জনে অক্ষম হয়ে। তার নিঃসঙ্গ সহানুভূতিশূন্য পরনির্ভরশীল জীবনে সহস্র অতৃপ্ত বঞ্চিত কামনার চিন্তা তাকে দিশেহারা করে তোলে। স্বভাবতঃই তার ব্যবহারে চালচলনে বিকৃতি আর অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় আর ভাইরা সেজন্য তার উপর অত্যাচার করে। সমরেশ বসু এই বিকলাঙ্গের মানস যন্ত্রণার বিস্তারিত নিখুঁৎ চিত্র অত্যন্ত নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। পরিশেষে শেষরাত্রে দরজা খোলা রয়েছে দেখে সেই সুযোগ নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে মাটি ঘস্‌তে ঘস্‌তে গিয়ে অনেক দূরের একটি পুকুরে আত্মবিসর্জন দিল। গল্পটির বিশেষত্ব হচ্ছে ট্রাজেডির অনিবার্যতা। লোকটির মর্মান্তিক দুঃখকষ্টের জন্য বিশেষ ভাবে কাউকে দোষী করা যায় না। একটি বিকৃত দর্শন ও বিকৃত রুচির মানুষকে ঘরে রেখে জীবিত বলেই স্বার্থপর ভাইরা যে খুব স্বস্তি বোধ করে না ও দরকার বোধ করলেই তার উপর অত্যাচার করে এ খুব স্বাভাবিক। প্রতিবেশীরা যে তাকে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তৈরি করা পুতুল বলে মনে করে তা-ও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এত পুঞ্জীভূত অবজ্ঞা বিতৃষ্ণা পরিহাস অত্যাচারের লক্ষ্য যে, দুঃখের বিষয় তার একটি মানুষী হৃদয় আছে। কাহিনীর এই অনিবার্যতার জন্যই তার ব্যঞ্জনা বিশেষ থেকে সাধারণে গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা আমাদের চারপাশে যে-সব ছোটখাটো অনিবার্য ট্রাজেডির সম্ভাবনা দেখতে পাই, যেগুলোর জন্য আপাতত অপরকে দোষী বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে কেউ দোষী নয়, সেইগুলির কথা গল্পটি স্মরণ করিয়ে দেয়। বিমল করের একটি গুণহীন নারীর ও একটি কীর্তি-হাত পুরুষের গল্পও এই জাতের। কিন্তু এ রচনাগুলি অতখানি সার্থক হয়ে ওঠেনি বলে বিশেষ নির্বিশেষে পরিণত হয়নি।

এ প্রবন্ধে আমি যে-কটি গল্পের উল্লেখ করেছি সে-সবের অধিকাংশই হয় বিয়োগান্ত, হয় তো ব্যঙ্গাত্মক। তার কারণ বোধ করি এই, যে বর্তমান যুগটাই মূলতঃ ট্রাজিক। যে কোন

পূর্বযুগ থেকে এ যুগের মানুষ বেশি হাসছে, কিন্তু সে হাসির আড়ালে আছে কথা। লেখকের অন্তরের যুগোপলব্ধিতে যদি ট্রাজেডি বা নৈরাশ্যবাদ থাকে তবে পাঠকের রুচির খাতিরে বা সমালোচকের পুঁথিগত তত্ত্বের ভয়ে তাকে এড়িয়ে যাবেন এ দাবী হাস্যকর। কিন্তু গঠনমূলক উপলব্ধিও আছে, এবং তার একটি উদাহরণ দিয়ে এ আলোচনা শেষ করব। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি গল্প এক চিত্রশিল্পীর আত্মস্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত। শিল্পী জীবনে নারীর ভালবাসা পায়নি; বাসে ওঠার সময় কয়েকদিন ধরে একটি নারীকে সহযাত্রিণীরূপে পেয়ে শিল্পীর মনোযোগ তার দিকে নিবন্ধ হয়েছে। জানতে পারল মেয়েটিও তার সম্পর্কে কৌতূহলী ও তাকে চেনে। সুতরাং আশা জাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা গেল মেয়েটির মন ইতিপূর্বেই অন্যত্র বাঁধা পড়েছে। মনে মনে দুঃখ বোধ করলেও শিল্পী এই সিদ্ধান্তে এল যে জীবনে অনেক অপূর্ণ কামনা সত্ত্বেও সে সার্থকতা লাভ করতে পারবে যদি সে তার প্রকৃতি প্রবণতা ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, আপাত ঔজ্জ্বল্য বা ফ্যাসানে মুগ্ধ না হয়ে, এক পরিপূর্ণ স্বকীয়তা অর্জন করতে পারে। গল্পটি যে পুরোপুরি সার্থক হয়েছে তা বলতে পারি না; কারণ সামান্য ঘটনার তুলনায় মনন বেশি এগিয়ে গিয়েছে; কিন্তু ছোটগল্পে এ দুয়ের যথাযথ পারম্পর্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু লেখক এমন একটি গ্রহণ-যোগ্য জীবন নীতিতে পৌঁছুতে চেয়েছেন যা তাঁর উপলব্ধি-সঞ্জাত বলেই মূল্যবান।

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক অনেক অর্থে দ্বিতীয় দশকের বিপরীত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিতীয় দশকে লেখকরা মানুষের কামনার অবাধ মুক্তি দাবী করেছিল; আজকে উদ্দাম উত্তাল বিকৃত কামনা অভিযুক্ত, কাঠগড়ার আসামী। দ্বিতীয় দশকের মার্কা-মারা ভাল ছাত্ররা ভাষার আশ্চর্য দীপ্যমানতায়, পরিশীলিত সংলাপে, বিন্যাসের চাতুর্যে পাঠকের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল আর্ট,—কী বলছি তার চেয়ে কীভাবে বলছি তার গুরুত্ব বেশি ছিল। বর্তমান দশকের অনেক লেখকই সাধারণ ঘরের সাধারণ ছাত্র, অনেকেরই পাণ্ডিত্য অনুল্লেখযোগ্য; তবু তাঁরা যেখানে আন্তরিকভাবে লিখছেন সেখানে যুগ-সঙ্কটের সত্য উপলব্ধিকে লিপিবদ্ধ করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। আর্টের বহিরঙ্গ যাই হোক আত্মজিজ্ঞাসাই আর্টের অন্তরঙ্গ। বর্তমান দশক অত্যন্ত কোলাহল-মুখর; সিনেমা, শস্তা জনপ্রিয়তা, সাহিত্যের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা—প্রভৃতি মিলিত-ভাবে সাম্প্রতিক লেখকদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে। কাজেই এই দশকের চিন্তা ও মনন আজও অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। কিন্তু যা প্রচ্ছন্ন, তাকে সুপ্রকাশ করাই সমালোচকের কাজ; লেখকরা যে-লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছেন অথচ যাকে এখনো চিনতে পারছেন না তাকে চিনিয়ে দেওয়াই সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সার্থকতার বিচারে বর্তমান দশক খুব ম্রিয়মাণ। তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের ছোটগল্পের আশ্চর্য সার্থক ফসলের সঙ্গে কোন তুলনা না-ই করলাম। এমন-কি দ্বিতীয় দশকের অনেক আপাত দ্যুতিময়তার মাঝে মাঝে যে ক্ষণদীপ্ত সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বর্তমান দশক সেখানেও খুব কদাচিৎ-ই পৌঁছুতে পেরেছে। তবু তরুণ লেখকরা যদি তাঁদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সাধনায় অগ্রসর হন তবে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

চৈতালী রাতের স্বপ্ন

উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়র

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ।

কুইন্‌স্‌, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রবেশ

বটম। আমরা সবাই হাজির?

কুইন্‌স্‌। সব ঠিকঠাক! আর এটা মহড়ার পক্ষে অত্যাশ্চর্য
সুবিধের জায়গা। এই সবুজ মাঠের ফালিটা
আমাদের স্টেজ; এই কাঁটাঝোপটা আমাদের
সাজঘর; এখন রাজার সামনে ঠিক যেমন
হবে তেমনি আমরা মহড়া দেব।

বটম। পিটার কুইন্‌স্‌।

কুইন্‌স্‌। কি বলছো; বটম গুণ্ডা?
এই "পিরামুস ও থিসবি" নাটকে এমন কিছু জিনিস
আছে যা অত্যন্ত কটুকাটব্য। প্রথমতঃ, পিরামুসকে
এক তলোয়ার টেনে আত্মহত্যা করতে হবে। এটা
মহিলারা সহ্য করতে পারবেন না। এর কি সমাধান করবে?

স্নাউট। মাইরি, এযে সাংঘর্টাতিক বিপদ!

স্টার্ভলিং। আমার মনে হয় শেষমেষ আত্মহত্যাটা বাদ
দিতে হবে।

বটম। কক্ষণো না। আমার মাথায় এক ফন্দী এসেছে
যাতে সব সুরাহা হবে। আমাকে একটা ভূমিকা
লিখে দাও; এই ভূমিকায় বলা হবে যে তলোয়ার দিয়ে
কোনো রক্তারক্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং
পিরামুস সত্যি সত্যি মরছে না। এমন কি, ও'দের
একেবারে নিশ্চিন্ত করতে বলে দেয়া যাবে যে আমি
পিরামুস কি সত্যি পিরামুস? আমি আসলে
তাঁতী বটম। এতে করে ও'দের ভয় ভেঙে যাবে।

কুইন্‌স্‌। বেশ, লিখে নেয়া যাবে অমনি এক ভূমিকা। পয়ার
ছন্দে আটমাত্রা ছ'মাত্রা সাজিয়ে লেখা যাবে।

বটম। দু'মাত্রা কম কেন? ওটা আটমাত্রা আটমাত্রায়
লেখা হোক।

স্নাউট। মহিলারা আবার সিংহ দেখে ভড়কাবেন না তো?

স্টার্ভলিং। হ্যাঁ, ঠিক ভড়কাবে, আমি লিখে দিতে পারি।

বটম। বন্ধুগণ, নিজেরাই ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। একতোড়া মহিলার মধ্যে এক বিকট সিংহ আমদানী করাটা অত্যন্ত ভয়ংকর জিনিস। তোবা! তোবা! কারণ বনের বন্যপক্ষীর মধ্যে সিংহই সবচেয়ে বিকট। আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

স্নাউট। অতএব আরেকটা ভূমিকায় বলা হবে যে সে সত্যি সিংহ নয়।

বটম। শুধু তাই নয়; অভিনেতার নামটাও বলতে হবে; আর চামড়ার ফাঁক দিয়ে সিংহের ঘাড়ের কাছে লোকটার আধখানা মুখও দেখা যাবে। এবং সে নিজেই সেই ফাঁক দিয়ে বলবে—মানে এই প্রকরণের কোনো কথা বলবে আর কি, যে, 'মহিলাবৃন্দ', বা 'সমাগতা সুন্দরীসকল—আমার ইচ্ছা' বা 'আমার অনুরোধ' বা 'আমার উপরোধ, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না, আমার মাথা খান! যদি ভাবেন আমি সত্যি সিংহ হয়ে এখানে এসেছি, তবে আমার প্রতি বড় অবিচার হবে। না, আমি সিংহটিংহ নই; সব মানুষের মতন আমিও একজন মানুষ।' এবং এর পরে সে প্রণাম করে নাম বলে খোলসা করবে যে সে আসলে মিস্ত্রী স্নাগ।

কুইন্‌স্‌। বেশ তাই হবে। কিন্তু আরো দুটি কঠিন ব্যাপার আছে। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আনবো কি করে? কারণ, জানোই তো, চন্দ্রালোকে পিরামুস ও থিস্‌বি-র দেখা হবে।

স্নাউট। যে রাতে অভিনয় সে রাতে চাঁদ থাকবে আকাশে?

বটম। পাঁজি! পাঁজি! পঞ্জিকা দেখে নাও; চাঁদ দেখ, চাঁদ দেখ!

কুইন্‌স্‌। হ্যাঁ সে রাত্রে পূর্ণিমা।

বটম। তবে তো হয়েই গেল। যে ঘরে নাটক হবে সেখানকার জানলার একটা কপাট খুলে রাখবো; আর সে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকবে দুদ্দাড় করে।

কুইন্‌স্‌। হ্যাঁ। আর তা না হলে একজন কেউ একহাতে কাঁটাগাছ অন্যহাতে লণ্ঠন নিয়ে এসে বলবে সে চাঁদমামার চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছে, মানে অভিনয় করছে। তারপর আর এক ঝামেলা আছে। স্টেজের ওপর একটা দেয়াল চাই যে, কারণ গল্পে আছে দেয়ালের ফুটো দিয়ে পিরামুস

আর থিস্‌বি প্রেমালাপ করেছিল।

স্নাউট। একটা আস্ত দেয়াল বয়ে আনা তো অসম্ভব।
কি করা যায় বটম?

বটম। একজন কাউকে দেয়ালের ভূমিকায় নামতে হবে;
তার সারা গায়ে লেপা থাকবে চুন, বা সুড়কি,
বা স্রেফ গংগামাটি। আর আঙুলগুলো সে
এমনি করে তুলে ধরবে; আর সেই আঙুলের
ফাঁক দিয়ে পিরামুস আর থিসবি ফিসফাস
করবে।

কুইন্‌স্‌। তা যদি করা যায় তবে আর ভাবনা নেই। বোসো
সবাই, বসে পড়ো, মহড়া দাও। পিরামুস,
শুরু করো, পার্ট বলা হয়ে গেলে ঐ ঝোপের মধ্যে
ঢুকে যাবে, এমনি প্রত্যেকে নিজের নিজের পার্ট
অনুযায়ী।

[পশ্চাতে পাক্‌-এর প্রবেশ]

পাক্‌। এরা কারা মাথামোটা, গেঁয়ো ভূতের দল?
পরীরাণীর শয্যাপাশে করছে দাপাদাপি?
একি? নাটক হচ্ছে নাকি? দর্শক হবো আমি;
আবার অভিনেতাও হতে পারি, তেমন তেমন বুঝলে।

কুইন্‌স্‌। বলো পিরামুস। থিস্‌বি, ওঠো।

বটম। থিসবি; পুষ্পের যেমতি রন্ধ্র অনিন্দ্যসুন্দর—

কুইন্‌স্‌। রন্ধ্র কোথায়? গন্ধ, গন্ধ!

বটম। গন্ধ অনিন্দ্যসুন্দর,
তেমতি তব শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রেয়সী প্রিয়তমা!
তিষ্ঠ! এ কাহার স্বর? অপেক্ষ হেথা ক্ষণকাল!
প্রত্যাবর্তন করিব শীঘ্র; ওগো মনোরমা!　　[প্রস্থান]

পাক্‌। মনোরমার শ্বাস উঠিবে হেরি বদনচন্দ্রিমা।　　[প্রস্থান]

ফ্লুট। এইবারে বলতে হবে?

কুইন্‌স্‌। হ্যাঁ, নয়তো কি? ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?
একটা শব্দ শুনে পিরামুস দেখতে গেছে, এক্ষুণি
আবার আসবে।

ফ্লুট। উজ্জ্বলকান্তি পিরামুস, শ্বেতোৎপলবর্ণ!
কান্তারকণ্টকে প্রস্ফুটিত রক্তজবা যেমতি উঠে উছলি,
যৌবনকামোদরাগে সদা ছটফট, হৃদয়েশ্বর কাবুলি
বিশ্বস্ত তুমি যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া। দেখা হবে পিরামুস মেনু-র কবর
পার্শ্বে।

কুইন্‌স্‌। দেত্তেরি! মেনু কোত্থেকে এল? নিন, নিনু-র
কবর পার্শ্বে! আর ওটা এক্ষুণি বলছো কেন?

কাকে বলছো? ওটা তো পিরামুস-এর কথার
জবাব। কি বিপদেই পড়লাম! তুমি কি তোমার
সব কথা একসংগে বলে যাবে নাকি? থামা-
টামার দরকার নেই? পিরামুস ঢোকো,
তোমার কিউ চলে গেছে যে;
'যেন ক্লান্তিহীন ঘোড়া' শুনেই ঢুকে পড়বে।

ফ্লুট। ও, বুঝেছি। 'বিশ্বস্ত তুমি যেন ক্লান্তিহীন্ ঘোড়া।'

[পাক্ এবং বটম্-এর প্রবেশ; বটম্-এর স্কন্ধোপরে গর্দভের মাথা]

বটম। 'যাহা মম তাহা তব, থিসবি, খোদ আমিই তব!'

কুইন্স্। কি ভীষণ! কি আশ্চর্য!' ভূতে ভর করেছে!
ভগবানকে ডাকো সবাই! পালাও সবাই!
মেরে ফেললে!

[কুইন্স্ স্নাগ, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রস্থান]

পাক। আসছি তোদের পিছে আমি, নাচ নাচাবো তেড়ে,
পচা পাঁক আর ঝোপঝাড় কাঁটা জলবিছুটি ফেড়ে,
ঘোড়া সেজে, কুকুর সেজে, শুয়োর ভালুক কবন্ধ
আগুন হয়ে হলকা হেসে করবো তোদের অন্ধ!
চিঁহি রবে, ঘেউ ঘেউ করে; ঘোঁৎ ঘোঁৎ, হুম হাম, দাউ দাউ,
ঘোড়া, কুকুর, শুয়োর, ভালুক, আগুন দেখে হাউমাউ! [প্রস্থান]

বটম। পালায় কেন? এসব ওদের বজ্জাতি, আমাকে ভয় দেখাবার ফন্দী।

[স্নাউট-এর পুনঃপ্রবেশ]

স্নাউট। হায় হায় বটম, তুমি বদলে গেছ! একি দেখছি তোমার
ঘাড়ে?

বটম। কি দেখছিস! তোর ঘাড়ে কটা মাথা? নিজে যেমন
গাধা তুই, তাই সবাইকে ভাবিস গাধা, নাকি?

[স্নাউট-এর প্রস্থান। কুইন্স্-এর পুনঃপ্রবেশ]

কুইন্স্। ছেড়ে দাও, বটম, ছেড়ে দাও। তুমি আর তোমাতে
নেই। তুমি অনূদিত। তুমি তর্জমা হয়েছ। [প্রস্থান]

বটম। হুঁ, ধরেছি বজ্জাতি। আমাকে গাধা বানাবার চেষ্টা!
ভয় দেখাবার মতলব! বাবা, এ কণ্ঠি বড় দড়;
এইখানেই জাঁকিয়ে বসবো, যা ইচ্ছে করুক।
এখানে পায়চারি করবো। চেঁচিয়ে গান গাইবো,
যাতে ব্যাটারা শুনে বোঝে ভয়ডর আমার ধাতে
নেই।

গান

কোকিল যতই কালো হোক
গান কি তারি কালো?

কাকাতুয়া-র কথা যা হোক,
ঝুঁটিখানি ভাল।

টিটানিয়া। [জাগিয়া] সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমায় জাগালো
কোন দেবদূত?

গান

শালিক, বাবুই, মাছরাঙা,
বউ-কথা-কও গায়,
শোনে সবাই ঘুম-ভাঙা,
নিজের কাজে যায়।

না গিয়ে উপায় কি? অমন বোকা পাখীর সংগে
কথা কয়ে বুদ্ধি বাজে খরচ করার কোনো অর্থ
হয়? কার দায়ে পড়েছে যে বলবে, ব্যাটা মিথ্যেবাদী
বউ কথা কও মানে? এত হাজার বছর ধরে বউ একটা কথাও
কয়নি? এও বিশ্বাস করতে হবে? অমন মিঠে
করে বউ-কথা-কও বললে কি হবে? সব গুল!

টিটানিয়া। মিনতি আমার, হে লোকালয়বাসী, আবার গাও!
তোমার গান করেছে আমার কানের মন চুরী।
আর চোখকে আমার করেছে যাদু ঐ মনোহর মূর্তি।
আর তোমার অন্তরে যে অনন্ত পৌরুষ তাতে মুগ্ধ আমি,
তাই প্রথম দর্শনেই বলছি তোমায়, শপথ করছি,
তোমায় ভালবাসি।

বটম। মাঠাকরুণ, বিবেচনা করে দেখুন, ওসব গদগদ
কথার কারণ নেই। তবে, সত্যি কথা বলতে কি,
দিনকাল যা পড়েছে, তাতে বিবেচনা আর প্রেমাপ্রেমির
মধ্যে খুব একটা সদ্ভাব নেই। পরিতাপের বিষয়;
একটা সাদামাটা পড়শি নেই যে দুটির ঝগড়াটা
মিটিয়ে দেয়। দেখছেন? দরকার পড়লে রসিকতাটা
আমার মন্দ আসে না।

টিটানিয়া। যেমন তোমার রূপ, তেমনি তোমার প্রজ্ঞা।

বটম। না, না, তা তেমন নেই। মানে এই বন থেকে
বেরুবার বুদ্ধিটুকু জোগালেই চলবে, উদ্ধার হয়ে
যেতাম; প্রজ্ঞাটজ্ঞার দরকার নেই।

টিটানিয়া। এ বন ছেড়ে কোথাও তোমার চলবে নাক' যাওয়া;
ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক থাকতে হবে হেথা।
দেখ চেয়ে, নই তো আমি সামান্যা অপ্সরী;
দেহে আজো আছে রূপ যৌবন বসন্তেরি:
আর ভালবাসি তোমায়; তাই এস আমার সাথে,
দেব তোমায় পরীর দল, সেবা দিনে রাতে;

আনবে তারা সাগর সে'চে মহামূল্য মণি;
ঘুম পাড়াবে ফুলশয্যায় গানে প্রহর গণি।
মৃত্যুর দাস মানুষের যত জড়তা ঝেড়ে ফেলে,
মুক্ত হয়ে ভাসবে তুমি শূন্যে পাখা মেলে।
কুমড়োফুল! উর্ণনাভ! মক্ষিরাজ! সর্ষেগ'ড়ো!

[পরীদের প্রবেশ]

প্রথম পরী। এই যে আমি!

দ্বিতীয়। আর আমি!

তৃতীয়। আর আমি!

চতুর্থ। আর আমি!

সকলে। কোথায় যেতে হবে?

টিটানিয়া। এই ভদ্রলোককে তোয়াজ করো, প্রণাম করো এ'কে;
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলো, হাসি আনো মুখে,
কুড়িয়ে আনো কিসমিস যত বনের ভেতর থেকে,
বেগুনে আঙুর, সবুজ ডুমুর, ডালিম খাওয়াও এ'কে,
মৌমাছির কণ্ঠ চিরে আনো মধু হে'কে;
মোমে-ভারী ডানায় মাছির জোনাকীর আগুন সে'কে,
রাতের আঁধার দূর করে জ্বালো বাতি লাখে লাখে
আহার বিহার করবে প্রিয় সেই আলোতে পথ দেখে
রঙীন প্রজাপতির পাখা পাতো ব'ধুর চোখে,
ঘুম যেন না ভাঙে চাঁদের দুষ্টু জ্যোৎস্নালোকে।
গড় করো এ'কে, পরীর দল, মাথা নোয়াও ঝ'ুকে।

প্রথম পরী। জয় হোক, মনুষ্যসন্তান!

২য় পরী। জয়!

৩য় পরী। জয়!

চতুর্থ পরী। জয়!

বটম। অধমের 'পরে দয়া রেখো, বাবাসকল! হুজুরের নামটা যেন কি?

দ্বিতীয়। উর্ণনাভ!

বটম। উর্ণনাভ মশাই, আপনার সংগে মিতালি পাতাবার ইচ্ছে আছে। আঙুল কেটেটেটে গেলে আপনার জাল বুনে বে'ধে দেবেন, কেমন? আপনার নাম, মহাশয়?

প্রথম। কুমড়ো ফুল।

বটম। আপনার মা পটলদেবী আর আপনার বাবা লাউমহারাজকে আমার নমস্কার জ্ঞাপন করবেন। কুমড়োফুল মশাই, আপনার সংগেও বন্ধুত্ব পাতাবার ইচ্ছে রইলো। আপনার নামটা বলবেন দয়া করে?

চতুর্থ। সর্ষেগংড়ো।
ষষ্ঠম। সর্ষেগংড়ো মশাই, আপনার পরিবারের ধৈর্য দেখে
আমি অবাক। সর্ষেবাটা দিয়ে রান্না করে লোকে
আপনাদের কতজনকে পিষে মেরেছে তার ইয়ত্তা
নেই। আপনাদের জন্যে লোকের চোখে জল
আসে। আরো ভালো করে আলাপ করা
যাবে 'খন।
টিটানিয়া। সেবা করো ওর, নিয়ে এস ওকে আমার কুঞ্জবনে,
আজকে যেন চাঁদের চোখে অশ্রু টলমল,
পৃথিবীর ফুল চাঁদের দুঃখে কাঁদছে মনে মনে,
কৌমার্যের ব্রত নিয়েও প্রকৃতি চঞ্চল।
কথাটি নয়; নীরবতা ঢাকুক বনস্থল।

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যের অন্য অংশ।

ওবেরন-এর প্রবেশ

ওবেরণ। টিটানিয়ার ঘুম কি ভেঙেছে? আর যদি ভেঙে থাকে,
কি দেখেছে সে নয়ন খুলেই, কার প্রেমে মজেছে?
[পাক্-এর প্রবেশ]
ঐ যে আসছে আমার দূত।
এই যে, পাগল নিশাচর!
ভৌতিক রাতের বনমর্মরে কিসের বারতা এনেছিস?
পাক্। রানী মোদের প্রেম করছে এক বিরাট জীবের সংগে।
পবিত্র তাঁর কুঞ্জবনে এসেছিল নাট্যরংগে
মেতেছিল মহড়ায় এক দংগল চাষী,
কড়া-পড়া হাত তাদের শ্রমিক শহরবাসী;
রুটির জন্যে গতর-খাটা আজীবনের পেশা,
রাজার বিয়েতে নাটক করবে চেপেছে বেজায় নেশা।
রানী তখন নিদ্রামগ্না অলস রাতের আবেশে;
দলের যেটা সেরা বোকা সেই মাথামোটা শেষে
ঢুকলো এসে ঝোপের ভেতর মহড়ার মাঝে
নাটকে সে অভিনেতা পিরামুস-এর সাজে।
সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুণ্ডু নিলাম কেড়ে,
বদলে তার পরিয়ে দিলাম গাধার মাথা ঘাড়ে।
একটু পরেই থিসবি প্রিয়া চেঁচিয়ে তাকে ডাকে;
অর্ধগাধা মূর্তি নিয়ে বেরুলো ঝোপের থেকে।
শিকারী-গুলির শব্দে ভীত বিগড়ি হাঁসের মতন,

বা খয়েরি মাথা ময়নার ঝাঁক আকাশে ওড়ে যেমন,
দেখেই তাকে বন্ধুর দল ছোটে ছত্রভংগ
ছুটতে ছুটতে উল্টে পড়ে, পালা হোলো সাংগ;
পড়ে গিয়ে চেঁচায় তারা, খুন করলে, খুন!
তার ওপরে আমি জুটে হাড়ে ধরাই ঘুণ!
বিষম ভয়ে বুদ্ধিলোপ, আতংকেরই চোখে
চারিদিকে কল্পনায় বিভীষিকা দেখে।
মনে হয় লতাপাতা কাঁটাগাছের ডাল
ছোঁ মারছে কেড়ে নিতে টুপী, জামা, শাল।
পাগলা ভয়ে দৌড় করালাম, বনজুড়ে কি আলোড়ন!
রইল পড়ে পিরামুস-এর নব-সংস্করণ।
সেই মুহূর্তে টিটানিয়া হঠাৎ জেগে উঠলেন
আর সড়াক ক'রে অমনি তিনি গাধার প্রেমে পড়লেন।

ওবেরন। এ যে মেঘ না চাইতে জল! আশার অতিরিক্ত!
আর সেই শহুরে বাবুর কি হোলো? দিয়েছিস চোখে
প্রেমাঞ্জন? ভরেছে তার চোখ? কাজটা করেছিস?

পাক্। হ্যাঁ, কাজশেষ, ঘুমন্ত দেখলাম তাকে;
আর অদূরে তার উপেক্ষিতা প্রেমিকা!
জেগে উঠেই চোখাচোখি না হয়ে উপায় নেই।

[হার্মিয়া ও লাইস্যাণ্ডার-এর প্রবেশ]

ওবেরন। গা ঢাকা দে, এই যে সেই ছোঁড়া।

পাক্। এই সেই ছুঁড়ি, ছোঁড়া তো এটা নয়।

ডিমিট্রিয়াস। কেন বকছো তাকে যে তোমার প্রেমে আকুল;
এ গঞ্জনার তিক্ততা শুনুক তোমার শত্রুকুল।

হার্মিয়া। এখন শুধু মুখে বলছি, এর পরে মারবো,
তোমার মতন বেহায়াকে টিট করে ছাড়বো।
নিদ্রিত লাইস্যাণ্ডার তোমার হাতে হয়েছে খুন,
রঞ্জিত হাত তারই রক্তে, তোমার এমন গুণ।
তবে ছোরা তোমার বিঁধিয়ে দাও আমূল আমার বুকে,
আমাকেও মেরে ফেল।
সূর্য যেমন দিনের চিরসাথী,
লাইস্যাণ্ডার আমার তেমনি; আমায় নিদ্রিত ফেলে
সে যেতে কি পারে চলে? বিশ্বাস করি না আমি।
তার আগে ধরিত্রী দ্বিধা হবে, সে রন্ধ্রপথে
চন্দ্র ছুটে যাবে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে;
যেখানে এখন সূর্যের রাজ্য, ভগ্নীর চপলতায়
সূর্য হবে ক্ষুব্ধ। তাই নিশ্চয়ই তুমিই তাকে হত্যা করেছ;
হত্যাকারীর মতনই তোমার মুখ প্রাণহীন নিষ্ঠুর।

ডিমিট্রিয়াস। হত্যাকারী নয়; নিহতের মতন আমার শীর্ণমুখ;
হৃদয় বিদীর্ণ তোমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে;
হত্যাকারী তুমি, অথচ তোমার কি উজ্জ্বল মুখ কি জ্যোতির্ময়,
নিজকক্ষে অধিষ্ঠিতা স্বাতী-নক্ষত্রের মতন।

হার্মিয়া। লাইস্যান্ডারের কি করেছ? কোথায় সে?
মিনতি রাখো ডিমিট্রিয়াস, ফিরিয়ে দাও ওকে।

ডিমিট্রিয়াস। ওকে খন্ড খন্ড ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

হার্মিয়া। দূর হ! কুকুর কোথাকার! দূর হ'! নারীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে;
মনে থাকে যেন! কি? তবে খুনই করেছ তাকে?
এরপরে আর মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিও না।
একবার, একবার সত্যি কথা বলো, আমার মুখ চেয়ে বলো!
ও জেগে থাকতে তো সাহস হয়নি; অসহায় নিদ্রিতকে মেরেছে!
কি সাহস! বিছে বা সাপের মতন তোমার বীরত্ব!
সত্যি দুমুখো সাপের চেয়েও তুমি ক্রূর বেশি।

ডিমিট্রিয়াস। অনর্থক উত্তেজনায় বলক্ষয় করছো।
লাইস্যান্ডারের গায়ে হাত দিইনি, মরেছে কি না জানিও না।

হার্মিয়া। তবে বলো, সে ভাল আছে?

ডিমিট্রিয়াস। ধরো বললাম, কি পাবো?

হার্মিয়া। জীবনে আমার মুখদর্শন না করার অধিকার।
তোমার ঘৃণ্য সংগ ছেড়ে যাচ্ছি বনের মাঝে,
লাইস্যান্ডার বাঁচুক মরুক, তোমায় চাই না কাছে। [প্রস্থান]

ডিমিট্রিয়াস। ওর এই রণরংগিণী মেজাজ থাকতে পিছে ঘোরা বৃথা;
এইখানটায় বসে খানিক ঠান্ডা করি মাথা।
ব্যর্থ প্রেমের ক্লান্তি যেন আরো ক্লান্ত, নিঃঝুম,
দুঃখের কাছে চুল বিকিয়ে দেউলে হোলো ঘুম;
ঋণের দায়ে পালিয়ে-বেড়ানো ঘুমকে ধরতে হবে;
শুয়ে থাকি, হয়তো এসে খানিক শান্তি দেবে।

ওবেরন। এ কি করেছিস? ভুল করেছিস! এ মেয়েটি কে?
রস দিয়েছিস অনুরক্ত কোন প্রেমিকের চোখে,
গোল বাধিয়ে খাঁটি প্রেমে দিয়েছিস ভেজাল;
ভেজাল প্রেমকে খাঁটি করতে পারলো না তোর চাল।

পাক্। তবে বিধি হয়েছে বাম! এইতো জানি লক্ষ মানুষ কপট ভালবাসে;
তার মানে যে একটা আবার সাচ্চা প্রেমিক আসে,
এটা জানবো কেমন ক'রে?

ওবেরন। বায়ুবেগে ছুটে যারে বন ভেদ ক'রে,
এথেন্স্-এর হেলেনাকে বার কর খুঁজে।
অভিমানে পাগলিনী, প্রেমের দীর্ঘশ্বাসে,
রক্ত শূন্য পান্ডুর মুখে বিষাদের হাসি হাসে।

মরীচিকার মায়াঘোরে ভুলিয়ে আন এখানে
তাকে সামনে রেখে এই ছোঁড়াকে দাওয়াই দেব টেনে!

পাক্। এই চললাম, এই চললাম, দেখুন ভৃত্য কেমন ওড়ে
তাতার দস্যুর ধনুক-ছেঁড়া তীরের থেকে জোরে! [প্রস্থান]

ওবেরন। কন্দর্পের তীরের স্পর্শে,
বেগুনে ফুলের মন্ত্র রসে,
চোখের মণি যেন ভাসে!
প্রেমিকাকে দেখলে শেষে
চোখে যেন মোহ আসে,
মেয়েটি তখন দূর-আকাশে
তারার মতন যেন হাসে।
ইন্দ্রজাল এ সর্বনেশে
ঐ মেয়ের পায়েই লোটা শেষে।

[পাক্-এর পুনঃপ্রবেশ]

পাক্। পরী ফৌজের সেনাপতি!
হেলেন আসছে দ্রুতগতি!
আর ভুল করে যে ছোঁড়াটা
ওষুধ পেয়ে চেতে ওঠা
আসছে মেয়ের পিছু পিছু,
প্রেমের মূল্য চায় সে কিছু।
দেখবেন এখন প্রেমাভিনয়ের ধোঁকা।
হায় ভগবান! মানুষ কি অসম্ভব বোকা!

ওবেরন। সরে দাঁড়া! যে হট্টগোল দু'জনে বাধাবে,
তাতেই ওরা ডিমিট্রিয়াস-কে জাগাবে।

পাক্। তখন দু'জনেতে একইজনকে প্রেম নিবেদন করবে,
হাসতে হাসতে দর্শকের পেটে খিল ধরবে।
আমার বিশেষ পছন্দ হয় এই ধরণের কান্ড,
যেথায় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ছন্দ লণ্ডভণ্ড!

লাইস্যান্ডার। কেন ভাবছো ভালবাসার অভিনয় করছি?
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অভিনয় কেউ করে?
দেখ, প্রেমের অংগীকারের সাথে অশ্রুমোচন করছি;
অশ্রুজাত অংগীকারে সত্য বিরাজ করে।
একেও তুমি উপহাস কেমন করে ভাবছো?
চোখের জলের লিখন এতে; সত্যনিষ্ঠা স্বচ্ছ।

হেলেনা। ক্রমশঃ তোমার চাতুরী তার পক্ষবিস্তার করছে;
নূতন শপথে, পুরোণো শপথ ভাঙছো খান খান!
হার্মিয়াকে যে দিয়েছে কথা তা যে পদদলিত হচ্ছে।
এদিকেও শপথ, ওদিকেও শপথ, নিক্তি রইলো সমান!

দাঁড়িপাল্লার দুই দিকে দু'রকমের কথা,
সমান হাল্কা, অবিশ্বাস্য অলীক রূপকথা।

লাইস্যাণ্ডার। ওকে যখন কথা দিই, বুদ্ধি তখন পাকেনি।

হেলেনা। বুদ্ধি এখনো অপক্ক, কথা যখন রাখোনি।

লাইস্যাণ্ডার। বোকামি কোরো না, শোনো। ডিমিট্রিয়াস ওকেই ভালবাসে,
তোমায় তো দেখতে পারে না দু'চক্ষে!

ডিমিট্রিয়াস। [জাগিয়া] হেলেন! দেবী, বনপরী, তিলোত্তমা, অপ্সরী!
তোমার চোখের তুলনা কোথায়? কোথায় ওদের জুড়ি?
ওদের পাশে স্ফটিক ঘোলাটে! ঠোঁট দুটো কি পক্ক,
ডাকে রসালো রাঙা চুম্বনে, পরাহত সব তক্ক!
পূবের হাওয়ায় নিদ্রিত উঁচু গিরিশিখরের তুষার,
মূর্ত শুভ্রতা; তোমার হাতের বর্ণচ্ছটায় অসার,
কাকের মতন কালো। দাও হাতখানা, চুমো খাই,
শুভ্র এই কুমারীর কাছে ভবিষ্যতের পরশ পাই।

হেলেনা। কি নিষ্ঠুর! কি অন্যায়! বুঝেছি, তোমরা সকলে মিলে
লুঠতে চাইছো মজা আমায় ছিনিমিনি খেলে।
ভদ্র যদি হতে তোমরা, জানতে যদি শিষ্টাচার,
অসহায় এক নারীর 'পরে করতে না এই অত্যাচার।
জানি আমায় ঘৃণা করো; সেই ঘৃণাই কি শেষ নয়?
তার ওপরে নৈবদ্য-চূড়া এই উপহাসের অভিনয়?
দেখতে তোমরা পুরুষের মতন, পুরুষই যদি হও,
তবে ভদ্রমহিলার সংগে কথা ভদ্রভাবে কও।
প্রেম জানাচ্ছো, রূপের গাইছো দীর্ঘ জয়গান!
বুকে চেপে বিষম ঘৃণা, এ কি অপমান!
হার্মিয়াকে ভালবাসো, তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বী,
আজ হেলেনাকে ব্যাংগ করতে হয়েছে কোনো সন্ধি।
কি তোমাদের বীরত্ব! কি আশ্চর্য পৌরুষ!
দেখতে চাইছো নারীর চোখে অশ্রুধারার জৌলুষ!
থাকতো যদি অন্তরেতে বিন্দুমাত্র মহত্ত্ব
খেলার ছলে অসহায়কে করতে না উত্যক্ত।

লাইস্যাণ্ডার। ডিমিট্রিয়াস, তুমি দয়াহীন, এমন কাজ করে না, ছিঃ, শোনো!
হার্মিয়াকে ভালবাসো, আমিও জানি, তুমিও জানো।
শোনো সবাই বলছি হেঁকে, আন্তরিক এই উপহার,
হার্মিয়ার ওপর সকল দাবী নিচ্ছি করে প্রত্যাহার;
বদলে দাও হেলেনাকে, তুমিও দাও ছেড়ে,
ভালবাসি হেলেনাকে, বাসবো জীবন ভরে।

হেলেনা। বৃথা প্রেমের পরিহাসে অতি-লোভী মরে।

ডিমিট্রিয়াস। লাইস্যাণ্ডার, দরকার নেই উপহার,

হার্মিয়া তোমার থাকুক, হঠাৎ কেন উদার?
হার্মিয়াকে কিঞ্চিৎ ভাল যদি বেসেও থাকি,
সে ভালবাসা উবে গেছে, কিছুই তার নেইকো বাকি।
হৃদয় আমার যাত্রীসম বেঁধেছিল ডেরা,
হেলেনই তার গৃহকোণ, তাই এবার ঘরে ফেরা—
চিরদিনের মতন।

লাইস্যান্ডার। হেলেন, একথা কি সত্য?

ডিমিট্রিয়াস। প্রেমের কিছু বোঝো? তুমি কামের মদে মত্ত!
আর এগিও না, বিপদ হবে, মুষ্টিযোগের ক্রিয়া!
ঐযে আসছে তোমার প্রেমিকা, ঐযে তোমার প্রিয়া!

[হার্মিয়া-র পুনঃপ্রবেশ]

হার্মিয়া। কালো রাত্রি ছিনিয়ে নেয় মানব-চোখের দৃষ্টি;
কানকে করে আরো তীক্ষ্ম, সজাগ শ্রবণ সৃষ্টি;
ফিরিয়ে দেয় সে দ্বিগুণ প্রমাণ চোখ থেকে যা নেয় সে কেড়ে
শ্রবণই তখন আঁধারে আলো, অনুভূতি সব কর্ণকুহরে।
লাইস্যান্ডার, আমার চোখ তোমায় পায়নি খুঁজে;
এসেছি শুনে শুনে কণ্ঠস্বর অন্ধ বনের মাঝে;
আমায় একা ফেলে দয়াহীন তুমি চলে এলে কেন বলো!

লাইস্যান্ডার। মরমে জেগেছে প্রেমের তান পড়ে থাকি কি করে বলো!

হার্মিয়া। আমার পাশ থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমায় এ আবার কি প্রেম?

লাইস্যান্ডার। হেলেনার রূপ পাগল করেছে; রাতের মাঝারে হেম;
নিশীথ আকাশের লক্ষ চক্ষুর অগ্নিময় আভা
হেলেনার পাশে নিস্তেজ তারা, লুপ্ত তাদের প্রভা।
আমার পেছনে ঘুরছো কেন? বোঝো না দেখেশুনে?
যে দেখতে পারি না দু'চক্ষে, তাই মুক্তি পলায়নে?

হার্মিয়া। এই কি তোমার মনের কথা? কক্ষনো না!

হেলেনা। ওহো! এ-ও আছে এই ষড়যন্ত্রে? আমায় ছলনা!
বুঝেছি এবার, তিনজনে মিলে করেছে অভিসন্ধি,
ঘৃণার উপহাসের কারায় আমায় করবে বন্দী!
পোড়ারমুখী হার্মিয়া! অকৃতজ্ঞ, হতচ্ছাড়ি!
এদের দলে ভিড়ে তুই আমায় ঠাট্টা করিস!
এতদিনের মান-অভিমান, এতদিনের মিতালি,
প্রতিদিন যে বিদায়বেলায় দুর্বারগতি মহাকালকে
দিয়েছি দুজনে অভিশাপ, সব ভুলে গেলি?
ছাত্রীজীবনের বন্ধুত্ব, শৈশবের নিষ্পাপ অনুরাগ?
হার্মিয়া মনে নেই? কতদিন দু'জনে সেজেছি নকল ভগবান
সৃষ্টি করেছি একটি ফুল একই শালের 'পরে,
বসে একাসনে! গেয়েছি একই গান, একই সপ্তকে

মাঝে মাঝে হয়েছে মনে, তুই আর আমি
এক দেহ, এক কণ্ঠ, এক প্রাণ। এইভাবে বড় হয়েছি,
এক বৃন্তে দুই ফল; দেখতে পৃথক, মূলে এক,
বিভিন্নতায়ও আশ্চর্য ঐক্য। সেই পুরাতন প্রেমকে আজ ছিঁড়বি?
দুই ছোটলোকের সংগে মিশে তোর বন্ধুকে করবি নির্যাতন?
বন্ধুত্বের একি পরিণাম? নারীত্বের একি প্রকাশ?
শুধু আমার নয়, সব নারীজাতির অভিশাপ কুড়োবি?

হার্মিয়া। এসব কি বলছিস উন্মাদের মতন? তোকে ঠাট্টা করবো কেন?
দেখেশুনে মনে হচ্ছে তুই-ই আমাকে ঠাট্টা করছিস!

হেলেনা। ন্যাকা সাজিসনি! লাইস্যান্ডারকে তুই-ই পাঠাসনি?
বলিসনি তাকে আমার মুখচোখের জয়গানে মুখর হতে?
আর তোর অন্য গুণমুগ্ধ ডিমিট্রিয়াস
একটু আগে আমায় পদাঘাতে করে গেল প্রত্যাখ্যান,
হঠাৎ সে আমায় দেবী, বনপরী, স্বর্গের অপ্সরী,
প্রেয়সী, তিলোত্তমা—এসব বলে কেন?
যাকে দেখতে পারে না তাকে এসব বলার কারণ কি?
তোর যোগসাজস ছাড়া এ ঘটতে পারে?
আর লাইস্যান্ডার হঠাৎ তোকে বিমুখ করে কেন?
তোর প্রেমে তো উথলে উঠতো ওর বুক! আর আজ
কিনা আমাকে করে প্রেমনিবেদন!! ছি ছি!
তোর প্ররোচনা, তোর সম্মতি না থাকলে এ হয়?
হতে পারে তোর মতন রূপ আমার নেই,
তোর মতন আমার নেই গুণমুগ্ধের ঝাঁক।
তবু প্রেম দিয়ে যে প্রেম পায়নি তাকে করুণা করা উচিত;
এই অবজ্ঞার কোনো অর্থ হয়?

হার্মিয়া। কিছুই মাথায় ঢুকছে না কি বলছিস!

হেলেনা। বাঃ, শাবাশ, ঠিক আছে, চালিয়ে যা!
মুখটাকে কর কাঁদো কাঁদো, আর আমি পিছু ফিরলেই
জীভ বার করে ভেঙিয়ে দিস! আর চোখ টিপে
ওদের সংগে হাসাহাসি কর! এমন রসিকতা কি গাছে ফলে?
চালিয়ে যা, ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।
ভদ্রতা বা আদবকায়দা যদি জানতিস
তবে এমন করে আমায় অপদস্থ করতে বাধতো!
চলি, বিদায় দে; আমারই দোষ; চলে যাবো দূরে,
বা মরবো শিগ্‌গির, এ ব্যথা ভুলতে দেরী হবে না।

লাইস্যান্ডার। দাঁড়াও, সুন্দরী, শোনো আমার বক্তব্য;
তুমি ধন, তুমি জীবন, তুমি হৃদয়েশ্বরী সুন্দরী হেলেনা!

হেলেনা। বাঃ, চমৎকার!

হার্মিয়া। এ কি প্রিয়তম! এমন করে ঠাট্টা করতে আছে?
ডিমিট্রিয়াস। ঠিক! হার্মিয়া-র কথা শোনো, লাইস্যাণ্ডার,
নইলে আমি বলপ্রয়োগ করে বসবো!
লাইস্যাণ্ডার। সে গুড়ে বালি! এর মিনতি আর তোমার লম্ফঝম্ফ,
সব অরণ্যে রোদন! হেলেনা, তোমায় ভালবাসি!
মাথার দিব্যি, সত্যি বলছি! যে উল্লুক বলবে
আমার প্রেম মিথ্যা, তাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে প্রাণ দেব—
সেই প্রাণ সাক্ষী আমার, তোমায় ভালবাসি!
ডিমিট্রিয়াস। এই, খবরদার! হেলেন, এর চেয়ে আমার প্রেম বেশি!
লাইস্যাণ্ডার। বটে? আয় তো দেখি, প্রমাণ দে তো দেখি?
ডিমিট্রিয়াস। এক্ষুণি! আয়!
হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডার! এসব কি হচ্ছে?
লাইস্যাণ্ডার। যা, ভাগ্, কেলোবতী!
ডিমিট্রিয়াস। না, না, বীরপুরুষ! অন্ততঃ হাত ছাড়াবার অভিনয়টা করো!
ভাব দেখাও আসবে যেন আমার পিছু পিছু,
তারপর কেটে পোড়ো। তুমি বড় কাপুরুষ, ছোঃ!
মেয়ের করতলগত হয়ে থাকো, ছেড়ে দিলাম যাও!
লাইস্যাণ্ডার। ছাড়্ আমাকে, বেড়াল কোথাকার! চোরকাঁটা!
ছিনে জোঁক, ছাড়্ বলছি, নইলে দেব এইসান ঝাঁকুনি,
সাপের মতন চেপ্টে থাকবি মাটিতে!
হার্মিয়া। এমন মুখখারাপ করছো কেন? এসব কি হচ্ছে?
আমাদের ভালবাসা কি—
লাইস্যাণ্ডার। তোর ভালবাসা! বেরো, হলদেচুলো গেছোমেয়ে, বেরো!
বেরো, নিমের পাঁচন কোথাকার! চিরতার জল, বেরো!
হার্মিয়া। এসব ঠাট্টা করছো তো!
হেলেনা। হ্যাঁ, করছে, তুইও করছিস তাই!
লাইস্যাণ্ডার। ডিমিট্রিয়াস, কথা রাখবো, আসছি এক্ষুণি লড়তে।
ডিমিট্রিয়াস। তোমার কথার বন্ধন বড় শিথিল বন্ধু।
একটা মেয়ের বাঁধন কাটাতে পারো না, কথার বাঁধনে বিশ্বাস কি?
লাইস্যাণ্ডার। কি করবো বলো! দু'ঘা বসিয়ে দেব? মেরে ফেলবো?
ছুঁড়িকে দেখতে পারি না! কিন্তু মেয়ের গায়ে হাত!
হার্মিয়া। আমাকে ছুঁড়ি বললে! গায়ে হাতের আর বাকি কি?
দেখতে পারো না? কেন? সর্বনাশ! কি হয়েছে লাইস্যাণ্ডার?
আমি তোমার হার্মিয়া! তুমি আমার লাইস্যাণ্ডার!
রূপ আমার এক রাতেই তো যায়নি মুছে।
আজ রাতেই তো আমায় ভালবেসেছিলে। তবে কি—
ভগবান না করুন—আমায় সত্যি ছেড়ে যাবে?
তাই কি ফেলে পালিয়ে এসেছিলে? এসব তবে ঠাট্টা নয়?

লাইস্যাণ্ডার। না, ঠাট্টা নয়। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না আর।
তাই ছাড়ো আশা, ছাড়ো তর্ক, ছাড়ো সন্দেহ;
নিশ্চিন্ত থাকো, এসব সত্যি, ঠাট্টা নয়;
তোমায় ঘৃণা করি, ভালবাসি হেলেনা-কে।

হার্মিয়া। কি সর্বনাশ! তুই যাদুকরী, তুই ফলের পোকা,
তুই মনচোর! রাত্তিরে লুকিয়ে এসে
আমার স্বামীর হৃদয় চুরি করেছিস!!

হেলেনা। বাঃ, মুখে আগল নেই একেবারে!
লজ্জা করে না? তুই না মেয়ে? ঘোমটার বালাই নেই?
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার মুখ থেকে গরম জবাব বার করবি?
যা, যা! ধাপ্পাবাজ কোথাকার! বেঁটে বক্কেশ্বর!

হার্মিয়া। বেঁটে! তাই তো! এতক্ষণে ধরেছি খেলা!
নিজে লম্বা কিনা, তাই দুজনের দৈর্ঘ তুলনা করে,
নিজের দীর্ঘাকৃতি জাহির ক'রে মেলে ধরে,
লাইস্যাণ্ডারকে ভুলিয়েছে। তুই উট্‌কোরকম লম্বা বলে
ওর উচ্চ ধারণা হবে? আর আমি
মাথায় ছোট বলে ওর চোখে ছোটলোক? কিসে ছোটো আমি,
রং মাখা ঢ্যাঙা বাঁশ কোথাকার? কিসে ছোট আমি, বল্‌!
ভেবেছিস এত বেঁটে, যে খামচে তোকে কাণা করে দিতে
নাগাল পাবো না?

হেলেনা। ভদ্রমহোদয়গণ, মিনতি করছি,
যদিও আমায় করেন ঘৃণা, ওর হাত থেকে বাঁচান।
ওর মতো আমি অসভ্য নই; দজ্জাল হয়ে উঠতে পারি নি;
আর দশটা মেয়ের মতই আমার কাপুরুষতা।
ওকে আটকান! ভাবছেন কি আমার চেয়ে মাথায় খাটো বলে
ওর গায়ের জোর কম?

হার্মিয়া। মাথায় খাটো! আবার বলেছে।

হেলেনা। হার্মিয়া, আমার সংগে চটাচটি করিস নি।
বন্ধুত্বের মান রেখেছি; কখনো দিইনি আঘাত;
তোকে আমি ভালবাসি, হার্মিয়া! চিরদিন বেসেছি!
শুধু একবার ছাড়া; ডিমিট্রিয়াস-এর মন পেতে
তোর এই বনে পালিয়ে আসার কাহিনী
বলে দিয়েছিলাম; তাও সে-ও এলো ছুটে,
আর আমিও এলাম পেছনে; কিন্তু সে আমার গাল দিয়েছে,
বলেছে মারবে, গায়ে থুতু দেবে, খুন করবে;
এখন মানে মানে যেতে দে ভাই,
মনের দুঃখ মনে পুরে ফিরে যাবো এথেন্‌স্‌-এ
আর আসবোনা তোদের জ্বালাতে; যেতে দে;

দেখেছিস আমার মনটা কি নরম!

হার্মিয়া। যা না! কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে আটকে রেখেছে?

হেলেনা। আমারই মুগ্ধ হৃদয় রেখে যাচ্ছি এখানে।

হার্মিয়া। কার কাছে? লাইস্যাণ্ডার?

হেলেনা। না, না, ডিমিট্রিয়াস-এর কাছে।

লাইস্যাণ্ডার। ভয় নেই কোনো, হেলেনা, ওর সাধ্য কি তোমাকে ছোঁয়?

ডিমিট্রিয়াস। আমি রয়েছি সেটা দেখতে; আপনার ফোঁপর দালালি
না করলেও চলবে!

হেলেনা। জানো না, খেপে গেলে ও ধূর্ত, ভীষণ;
পাঠশালায় ও ছিল সবচেয়ে দস্যি মেয়ে;
অমন বেঁটেখাটো হলে কি হবে? ও হিংস্র ভয়ংকর।

হার্মিয়া। আবার বেঁটেখাটো! থেকে থেকে বলে শুধু বেঁটে আর খাটো!
প্রতি কথায় অপমান করছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছো?
ছেড়ে দাও, দেখে নিই একবার?

লাইস্যাণ্ডার। দূর হ' এখান থেকে, বামন অবতার!
পকেট সংস্করণ! পাকানো দড়ির গোলগাল গিঁট!
রুদ্রাক্ষ! ট্যাপারি কোথাকার!

ডিমিট্রিয়াস। যে তোমার সাহায্য পায়ে ঠেলছে,
তার জন্যে এমন তৎপরতা বড়ই দৃষ্টিকটু।
খবরদার, হেলেনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবে না!
তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যদি দেখি
হেলেনা-কে সামান্যতম গদগদভাব দেখাচ্ছো,
তবে বুঝবে মজা!

লাইস্যাণ্ডার। বোঝাও না মজা, এবার তো কোনো বাধা নেই;
এস, সাহস থাকে তো চলে এস, দেখা যাবে
হেলেনায় কার অধিকার, তোমার না আমার!

ডিমিট্রিয়াস। আসবো বই কি! পাঁয়তারা কষে মুখোমুখি আসবো!

[লাইসাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস-এর প্রস্থান]

হার্মিয়া। এই যে সব কাণ্ড দেখছেন, সব আপনার কীর্তি, দেবী!
একি। পিছু হটছেন কেন?

হেলেনা। তোমাকে বাবা বিশ্বাস নেই।
অমন রুদ্র মেয়ের আমি ত্রিসীমানায় নাই!
হাত তোমার আমার চাইতে আঁচড় কাটতে দড়;
আমার পা কিন্তু তোমার চাইতে লম্বা দিতে বড়! [প্রস্থান]

হার্মিয়া। অবাক কাণ্ড! দেখেশুনে বাক্য হরে' গেল! [প্রস্থান]

ওবেরন। তোর গাফিলতির চোটেই আজব ব্যাপার ঘটছে;
পর পর ভুল করেই চলবি? না, ইচ্ছে ক'রে করছিস?

পাক্। বিশ্বাস করুন আমায়, ছায়ার দেশের রাজা!

ভুল হয়ে গেছে বেজায় শহুরে পোষাক দেখে;
আপনিই তো বলেছিলেন পোষাক দেখে চিনতে!
তবে দোষ কোথায় দেখলেন আমার নিশীথ-অভিযানে?
শহুরে লোকের চোখেই তো দিয়েছি প্রেম-পুষ্পের রস!
আর সত্যি কথা বলতে কি ভালই হয়েছে প্রভু!
এমন উল্টোপাল্টা প্রেমের খেলা দেখবো আর কি কভু?

ওবেরন। দেখেছিস ঐ প্রেমিক-যুগল মাতবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে;
যারে রবিন টেনে দেরে মেঘের পর্দা ঊর্ধে;
যমালয়ের কৃষ্ণ কুয়াশায় ঢেকে দে দিগন্ত,
আবরিত হোক রে গগণ তারার রাজ্য অশান্ত।
ক্রুদ্ধ দুজন যোদ্ধাকে তুই পথ ভুলিয়ে নিয়ে যা দূরে,
পরস্পরের ত্রিসীমানায় আসতে যেন আর না পারে।
লাইস্যান্ডারের কণ্ঠস্বরের নিপুণ অনুকরণে
ডিমিট্রিয়াসকে খেপিয়ে তোল ক্রোধের বিস্ফোরণে!
আবার ডিমিট্রিয়াস-এর কণ্ঠস্বরে লাইস্যান্ডার হোক ক্রুদ্ধ,
এমনি ক'রে পাক খাইয়ে বন্ধ কর্ এ যুদ্ধ,
যতক্ষণ না মৃত্যুবেশী নিদ্রা নামে চোখের 'পরে,
ক্লান্ত পায়ে বাদুড়ের মতন কালো ডানায় ভর ক'রে;
তৎক্ষণাৎ লাইস্যান্ডারের চোখে এই শিকড় দিবি টিপে,
এর রসে আছে মহৎ গুণ দিলে হিসেব মেপে—
চোখের মায়া প্রেমের ঘোর, কাটে এরই স্পর্শে,
চোখে মণি আবার পাবে সহজ দৃষ্টি হর্ষে।
এই কাজল চোখে প'রে ঘুম ভাঙবে যখন,
এই ঘৃণাকে মনে হবে রাতের অলীক স্বপন।
এথেন্স্ অভিমুখে ফিরবে সুখী প্রেমিক-জুটি,
এই নূতন বাঁধন জীবনভোর আর যাবে না টুটি।
করিস কাজটা! ওদিকে বিষম প্রেমের ঘোরে ভরেছি রাণীর চিত্ত
এই সুযোগে ভুলিয়ে নেব ভারতবাসী ভৃত্য।
তারপরেতে রাণীর চোখেও দেব মুক্তি মন্ত্র;
আজব পশুর মায়া ভুলবে জগৎ হবে শান্ত।

পাক্। এসব কাজ, হে পরীরাজ, করতে হবে তাড়াতাড়ি
মেঘের পথে রাতের দানব চলছে ছুটে পৃথ্বী ছাড়ি;
অদূরে ঐ পূবের গায়ে ঊষাদেবীর দৌবারিক;
গোরস্থানে যাচ্ছে ফিরে ভূত-প্রেত সব আঁধার-শরিক
অপঘাতে মরেছে যারা বিদেশ বিভুঁই সাগরে
অভিশপ্ত আত্মা তাদের ফিরছে কীটের গহ্বরে।
ভয় ঢুকেছে প্রেতের রাজ্যে করলে দেরী পাছে
ধরা পড়ে ভয়াল রূপ দিনের আলোর কাছে।

আলোর হাসির সংগ থেকে স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন;
থমথমে কালো রাত্রির সাথে তাদের প্রণয় সম্ভাষণ।

ওবেরন। আমরা পরী, আমরা সুখী, আমরা অশরীরী,
ভোরের আলোর সংগে মোদের খেলা জগৎ জুড়ি;
বন থেকে বনান্তরে ছোটাছুটি বাঁধনমুক্ত
অগ্নিদীপ্ত পূবের তোরণ যাক না হয়ে উন্মুক্ত,
সাগরজলে ছড়াক আলো আনন্দেরই সুর ঢালি,
গাঢ় সবুজ নোনাজলে তরল সোনার অঞ্জলি
নির্ভয়ে তবু কাজ করে যা; হয়তো উষার আগে
কাজ সারা হবে; গা ঢেলে দেব অরুণাভার রাগে। [প্রস্থান]

পাক্। এধারে ওধারে, এধারে ওধারে,
ঘুরিয়ে মারবো চক্রাকারে;
আমার ভয়ে জগৎ কাঁপে;
এধারে ওধারে পরীর শাপে!
এই যে একজন!

[লাইস্যাণ্ডার-এর পুনঃপ্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। কোথায় তুমি উদ্ধত ডিমিট্রিয়াস? বলো তুমি কোথায়?

পাক্। এই যে শয়তান! তলোয়ার হাতে প্রস্তুত! তুমি কোথায় পালালে?

লাইস্যাণ্ডার। এই যে আসছি, সামলাও!

পাক্। এস আমার সংগে; সমতল ভূমিতে হবে লড়াই।

[কণ্ঠস্বর অনুসরণ-করতঃ লাইস্যাণ্ডার-এর প্রস্থান। ডিমিট্রিয়াস-এর পুনঃপ্রবেশ]

ডিমিট্রিয়াস। লাইস্যাণ্ডার! কোথায় তুই।
পলাতক, কাপুরুষ, শেষকালে রণে ভংগ দিলি?
কোথায় তুই? ঝোপঝাড়ে লুকিয়েছিস? গা-ঢাকা দিলি?

পাক্। কাপুরুষ, তারার পানে চেয়ে তুই করিস ভারী বড়াই!
ঝোপঝাড়ের সংগে তোর যত বীরের লড়াই!
আয় না দেখি আমার কাছে, দুষ্টু ছেলে মস্ত!
চাবকেই তোকে ঢিট করবো, দরকার নেই অস্ত্র!

ডিমিট্রিয়াস। তাই নাকি! আয় না কাছে! যুদ্ধ শুধু দম্ভে না।

পাক্। গলা শুনে আয়রে সংগে, হেথায় যুদ্ধ জমবে না!

[উভয়ের প্রস্থান। লাইস্যাণ্ডার-এর পুনঃপ্রবেশ]

লাইস্যাণ্ডার। আগে আগে যাচ্ছে সে, কথায় করছে আস্ফালন;
গলা শুনে গিয়ে দেখি ব্যর্থ পদসঞ্চালন,
আমার চেয়ে হাল্কা পায়ে ভীরু শয়তান পালাচ্ছে;
যতই ছুটি ততই আরো দ্রুত সরে যাচ্ছে!
পথ হারিয়ে উঁচু নিচু হোঁচট খেয়ে অন্ধকারে
শ্রান্ত আমি এইখানেতে শোবো একটু হাঁফ ছেড়ে!

আসুক প্রভাত; ধূসর আলোয় হোক জগৎ দৃশ্যমান,
বার করবো শত্রু খুঁজে, শোধ দেব অপমান।
[নিদ্রা। পাক্ ও ডিমিট্রিয়াস-এর পুনঃপ্রবেশ]

পাক্। অহো হো কাপুরুষ! আসা হয় না কেন?

ডিমিট্রিয়াস। দাঁড়া যদি সাহস থাকে, কাণ্ড একি হেন?
দৌড়ে বেড়াস হেথায় হোথায় বুকের নেই পাটা;
মুখোমুখি দাঁড়াস না কেন? সাহসে আজ ভাঁটা?
কোথায় তুই?

পাক্। আয় না এখানে, এই যে আমি! আয় না!

ডিমিট্রিয়াস। দূর থেকে ঠাট্টা করছিস সহ্য আর হয় না!
দিনে দেখা হলে পিঠের চামড়া নেব খুলে;
যারে এখন যেথায় ইচ্ছা চোখ আসছে ঢুলে;
শীতল ভূমির শয্যা পরে চিৎপটাং হবো,
সকাল হলে পরে তবে তোকে দেখে নেব।
[শয়ন ও নিদ্রা। হেলেনা-র পুনঃপ্রবেশ]

হেলেনা। হে ক্লান্ত রাত্রি, হে দীর্ঘ, হে মন্থর,
খর্ব করো তোমার কাল, দ্বার খোলো পূব দিগন্তের,
ভোরের করুণধারায় যাবো সুদূর শুভ্র এসেন্স্ নগর;
ঘৃণার দহনে দগ্ধ হৃদয় শান্তি পাক অনন্তের।
দরবিগলিত দুঃখের নিদ্রা ছোঁয়ায় মায়াঞ্জন,
আপন থেকে আপনাকে কেড়ে ভোলাক শোকের রোমন্থন। [শয়ন ও নিদ্রা]

পাক্। এতক্ষণে তিনটে হোলো? আরেকটা নিখোঁজ যে!
জোড়ায় জোড়ায় চারটে হবে; এখনো এরা বেজোড় যে!
ঐ যে আসছে হারানিধি; দুঃখে বিপর্যস্ত;
কন্দর্পটা বেজায় দুষ্টু, রঙ্গে সিদ্ধহস্ত,
বেচারী বিবি একশা হোলো, জব্দ জবরদস্ত!

হার্মিয়া। শ্রান্তি এমন আসেনি কখনো, আসেনি এমন দুঃখ,
তুষারশীতল শিশিরে স্নাত, কাঁটায় চরণ আহত;
সহ্য হয় না পথ-চলা আর হারিয়ে চলার লক্ষ্য;
হৃদয়ের যত আকুলতা সব স্খলিত চরণে ব্যাহত।
বিশ্রাম চাই নিদ্রা গভীরে প্রভাত অপেক্ষায়;
লাইস্যাণ্ডার অক্ষত থাক স্বর্গ-তিতিক্ষায়। [শয়ন ও নিদ্রা]

পাক্। ঘুমোও শুয়ে
শীতল ভুঁয়ে,
দেব চোখে
ওষুধ মেখে,
উপেক্ষিতার মান রেখে।
[লাইস্যাণ্ডার-এর চক্ষে রস লেপন]

জেগে উঠবি,
ভালবাসবি,
মাথার দিব্যি
হবি ভাব্যি;
ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো!
লোকে বলে প্রবাদ জেনো,
জন্ম মৃত্যু বিয়ে
বিধাতাকে নিয়ে।
তুমিই বন্ধু দেখাবে
জেগে উঠেই খেড়াবে,
রাজপুত্তুর কন্যা পাবে;
নটে গাছটি মুড়িয়ে যাবে;
যে যার নিজের কনে নিয়ে ছাঁদনাতলা যাবে! [প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ।

লাইস্যান্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়া নিদ্রিত। পরীদল-সমভিব্যাহারে টিটানিয়া ও বটম্-এর প্রবেশ; পশ্চাতে অদৃশ্য ওবেরন।

টিটানিয়া। এসো প্রিয় বোসো হেথায় শুভ্র পুষ্পাসনে,
হাত বুলোই টোল-খাওয়া নরম তুলতুল গালে,
চকচকে ঐ মাথায় গুঁজি গোলাপ গুণে গুণে,
কুলোর মতন কানদুটিতে চুম্বন দিই ঢেলে।

বটম্। কুমড়োফুল কোথায়?

কুমড়োফুল। এই যে।

বটম্। আমার মাথাটা চুলকে দাও তো, কুমড়োফুল। উর্ণনাভ মশাই কোথায় গেলেন?

উর্ণনাভ। এই যে।

বটম্। উর্ণনাভ মশাই, মহাশয় উর্ণনাভ; অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে দুব্বা-র ডগায় বসা লাল-পেট মৌমাছি শিকার করে আনুন তো। অর্থাৎ, মশাই মৌমাছির মধুভরা পাকস্থলীটা চাই। খুব বেশী ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে পড়বেন না যেন; আর সাবধান থাকবেন, পাকস্থলীটা যেন হঠাৎ ফেটে না যায়; হুজুর যে মধুর প্রপাতে হাবুডুবু খাবেন এটা আমার ভাল লাগবে না। সর্ষেগুঁড়ো মশাই কোথায়?

সর্ষেগুঁড়ো। এই যে।

বটম্। হাতখানা দেখি, সর্ষেগুঁড়ো মশাই! দূরে দাঁড়িয়ে সম্মানপ্রদর্শন না করে

কাছে আসুন দিকি।

সর্ষেগুঁড়ো। কি আদেশ?

বটম্। কিছু না মশাই, শুধু বীর কুমড়োফুলকে একটু চুলকোতে সাহায্য করুন তো। নাপিত ডাকতে হবে দেখছি, কারণ মনে হচ্ছে মুখে আশ্চর্য রকমের দাড়িগোঁফ গজিয়ে গেছে; এবং আমি গাধা এমনই নরম যে দাড়ি চিড়বিড় করলেই না চুলকে পারি না।

টিটানিয়া। প্রিয়তম শুনবে কোনো সংগীত-রাগিণী?

বটম্। হ্যাঁ, সংগীত-আদি ব্যাপারে আমার কাণ মোটামুটি ভালই তয়ের আছে। হোক, একটু ঢাকঢোল হোক।

টিটানিয়া। নইলে বলো কোন্ ব্যঞ্জন খেতে ইচ্ছে করো।

বটম্। ব্যঞ্জন? তা, কয়েক মুঠো বিচালি আনো তো। আবার মিহি করে কুচোনো ঘাস চিবোতেও ভাল লাগে। তার চেয়ে বোধহয় এক বাটি খড় খেতেই ইচ্ছে করছে; তাজা খড়, মিষ্টি খড়ের চেয়ে আর কি জিনিস আছে?

টিটানিয়া। আমার দলে আছে এক সাহসী পরী; আনবে সে কাঠবেড়ালির ভাণ্ডার ভেঙে কচি কচি বাদাম।

বটম্। না, না, তার চেয়ে শুকনো আমের আঁটি এক আধটা হোক না। যাক, তোমার দলবলকে বলে দাও আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে; একটু যেন নিদ্রার উদ্রেক অনুভব করছি।

টিটানিয়া। ঘুমোও তুমি, বাঁধবো তোমায় মৃণাল বাহুপাশে।
পরীরা সব যা রে দূরে, আর আসিস না ফিরে।

[পরীদের প্রস্থান]

এমনি করে মাধবীলতা, বল্লরী আর লজ্জাবতী,
এমনি ক'রেই বনের ব্রততী জড়িয়ে ধরে বটের বাহু।
অশেষ আমার ভালবাসা, তোমার তরে পাগল।

[উভয়ের নিদ্রা। পাক-এর প্রবেশ]

ওবেরণ। [অগ্রসর হইয়া] আয় রে রবিন, দেখছিস, কি অপূর্ব দৃশ্য!
পাগলামির এই অসংযমে এখন যেন দুঃখ হচ্ছে!
একটু আগে রাণীর দেখা পেয়েছিলাম বনে,
ঘৃণ্য এই নির্বোধের মন পেতে আকুল;
ধমকে উঠে বাধিয়ে দিলাম প্রচণ্ড কলহ।
দেখি কি এর লোমশ ভালে পরিয়েছে মুকুট,
সুগন্ধ ফুলের মালা গেঁথে।
আধফোটা সব মুকুলমাঝে যে শিশিরবিন্দু জ্বলে,
মাঝে মাঝে মুক্তোর মতন মসৃণ গোল শুভ্র,
তারাই এখন রূপসী ফুলের স্তব্ধ নয়নে
টলমল করে অশ্রু-সম ফুলের অপমানে।
আয়েস করে মজা করে করা গেল উপহাস,
জবাবে সে শুধুই করে মার্জনা ভিক্ষা,

কিন্তু অটল থাকে প্রেমে। সেই সুযোগে
ঝগড়ার মূল ছেলেটিকে চাইবামাত্র দিয়ে দিল,
এক পরীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমার কুঞ্জবনে।
ছেলেটিকে পেয়েছি যখন, এইবারেতে সন্ধি;
চক্ষু থেকে দূর করবো জঘন্য এই মায়াঘোর।
আর এথেনস্-এর এই গো-বেচারার মাথা ফিরিয়ে দে,
যাতে জেগে উঠে ফিরতে পারে সবার সাথে শহরে।
আজকে রাতের দুর্বিপাক ওর মনে থাকবে জেগে
শুধুমাত্র দুঃস্বপ্নের করাল স্মৃতি রূপে।
রাণীকে আগে মুক্তি দেয়া যাক।

[টিটানিয়া-র চক্ষুতে রস প্রদান]

যেমন ছিলে তেমনি হও;
দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হও;
চাঁদের শিকড় করবে ক্ষয়!
মদনফুলের পরাজয়!

টিটানিয়া! রাণী আমার! এবার জাগো, ওঠো!

টিটানিয়া। ওবেরণ! কি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন!
দেখলাম, আমি গাধার প্রেমে পড়েছি।

ওবেরণ। ঐ যে তোমার প্রেমাস্পদ।

টিটানিয়া। একি! সত্যি নাকি? ঘটলো কি করে?
ঈশ! ওকে দেখে এখন আমার গা রী রী করছে।

ওবেরণ। একটুখানি চুপ করো। রবিন, সরা গাধার মাথা।
টিটানিয়া, আদেশ করো, জাগুক গীত-মূর্ছনা;
ঘুমন্ত এই পঞ্চমানব আরো গভীর ঘুমে লুটোক,
মৃত্যুসম বিস্মৃতিতে লুপ্ত হোক চেতনা।

টিটানিয়া। সংগীত হোক! নিদ্রার আরাধনা।

[সংগীত আরম্ভ ও শেষ]

পাক্। জেগে উঠে নিজের বোকাটে চোখেই ড্যাব ড্যাব করে তাকাস।

ওবেরণ। চলুক সংগীত! এস রাণী, দাও হাত হাতে,
নৃত্যছন্দে জাগাও দোলা এই ধরণীর বুকে।
পুনর্মিলন তোমার আমার আজকের দিন থেকে;
কালকে যাবে রাত্রি-নিশীথে আনন্দের বাণ ডেকে,
থিসিয়াস-এর গৃহে মোরা নাচবো জয়ের উৎসবে,
মুখরিত করবো গৃহ আশীর্বাদের সাম-রবে;
এরাও সেথায় জোড়ায় জোড়ায় বাহু বেঁধে হাজির হবে,
থিসিয়াস-এর সঙ্গে এরাও পরিণয়ের মন্ত্র নেবে।

পাক্। পরীর রাজা, ঐ শুনুন! খুব সাবধান!
কোকিল গাইছে ভোরের কুহুতান!

ওবেরণ। তবে এস রাণী আমার করুণ নিস্তব্ধতায়
রাত্রিছায়ার পেছনে দুটি অন্বেষণের মত্ততায়;
ভবঘুরে চাঁদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি
জগতের এক আঁধার-কোণ খুঁজে নিতে পারি।

টিটানিয়া। এস রাজা যেতে যেতে বলো দেখি আমাকে
কেমন করে আজকে রাতে পেলে খুঁজে আমাকে
মাটির পরে নিদ্রামগ্ন চারিদিকে মানুষ,
পরীর রাণীর হিয়ায় কেন এল হেন কলুষ।

[সকলের প্রস্থান। নেপথ্যে তূরীধ্বনি]

থিসিয়াস। যাও একজন, ডেকে আনো বনরক্ষককে।
পরিদর্শন, শেষ হয়েছে, উষা নবীন এখনো;
শুনবে প্রিয়া রুদ্রতাল শিকারী কুকুর-ডাক;
শিকল খুলে ছেড়ে দে ওদের পশ্চিমের ঐ উপত্যকায়:
যা রে ছুটে, বনরক্ষককে খবর দে! [জনৈক রক্ষীর প্রস্থান]
এস রাণী আমরা যাব ঐ শৈলের শিখরে,
শুনবে তুমি গর্জন আর প্রতিধ্বনির ঘূর্ণীঝড়,
এলোমেলো অসংগতির সুসংগীত মধুর স্বর।

হিপোলিটা। হয়েছিলাম বহু আগে হারকিউলিস-এর অতিথি,
দেখেছিলাম ক্রীট-দ্বীপে ভালুক-শিকার খেলা।
কুকুরগুলো স্পার্টা নগরীর। এমন আর শুনিনি কখনো
রণহুংকার আর গর্জন; সেই আশ্চর্য জয়গানে,
অরণ্য আর সুদূরে আকাশ, ঝর্ণাধারা চারিপাশ
জমাট বেঁধে উঠলো হয়ে বিশাল এক ঝংকার।
বে-সুরের কি অপূর্ব সুর! কি কোমল সে বজ্রপাত!

থিসিয়াস। আমার কুকুরগুলোও সেই স্পার্টায় প্রতিপালিত,
তেমনি এদের মুখের গড়ন, তেমনি হলুদ রং;
তেমনি দীর্ঘ কাণ নেড়ে এরা ঝাড়ে ভোরের শিশির;
তেমনি পেশল এদের গ্রীবা, তেমনি শক্ত পা;
গতি তেমনি মন্থর এদের; কণ্ঠে তেমনি বিষম জোর;
সুরেলা এমন চীৎকার কভু শোনেনি কোনো শিকারী,
না ক্রীট্-এ, না স্পার্টায়, না থেসালি।
শুনে নিজেই বুঝবে। একি? এ মেয়েরা কারা?

ইজিয়াস। প্রভু, এই আমার কন্যা হেথায় ঘুমিয়ে আছে:
এই যে লাইস্যান্ডার, আর এই ডিমিট্রিয়াস;
আর এই হেলেনা, নেডার-কন্যা হেলেনা;
সবাই এরা একসাথে হেথা জুটলো কেমন করে?

থিসিয়াস। ভোরে উঠে পালিয়ে এসেছে ঋতুর মহোৎসবে;
অপেক্ষা এদের আমাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতে।

কিন্তু ইজিয়াস বলো আজই তো সেই দিন,
আজই তো হার্মিয়া তার চরম জবাব দেবে?

ইজিয়াস। এই সেই দিন, প্রভু।

থিসিয়াস। যাও, শিকারীদের আদেশ জানাও তূর্যধ্বনিতে ভাঙাক এদের ঘুম।

[নেপথ্যে তূর্য ও কোলাহল; লাইস্যাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়ার চমকিত হইয়া জাগরণ]

সুপ্রভাত, বন্ধুগণ। হয়েছে গত বসন্তকাল;
এত পরে কেন এই বাহার রাগে মিলন কূজন?

লাইস্যাণ্ডার। মাপ চাইছি, প্রভু।

থিসিয়াস। উঠে দাঁড়াও তো সবাই।
আমি জানতাম তোমরা দুজনে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী;
ধরায় আজকে জাগলো কেন মিলের ঐকতান?
হিংসাদ্বেষ কি বিদায় নিয়েছে? নইলে এমন শত্রু
পাশাপাশি কেমন করে নিদ্রা গেল ভাবি!

লাইস্যাণ্ডার। হে রাজন্, বিস্ময়ে অভিভূত নিজেই আমি, তবু বলছি;
তন্দ্রা লেগে রয়েছে এখনো জাগরিত চোখে;
সঠিক কিছুই বলতে পারি না কেমন করে এলাম হেথায়;
তবে মনে হচ্ছে—যদ্দূর ঠাহর হয়—হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে—
হার্মিয়া-র সঙ্গে আমি এসেছিলাম হেথায়:
ইচ্ছে ছিল যেখানে হোক এথেন্স্-এর বাইরে,
এথেন্স্-এর কুটিল আইনের সীমানা ছাড়িয়ে
বাঁধবো একটি ঘর।

ইজিয়াস। হয়েছে, হয়েছে, প্রভু যথেষ্ট হয়েছে:
আইন কোথা? আইন মেনে দিন মৃত্যুদণ্ড।
এরা পালাচ্ছিল ছলনা করে। শুনেছ, ডিমিট্রিয়াস,
পলায়নে তোমায় আমায় করতো পরাজিত;
তোমার যেত স্ত্রীরত্ন, আমার যেত পিতৃগর্ব,
কারণ গর্ব আমার, কন্যা দেব তোমার হাতে তুলে।

ডিমিট্রিয়াস। মহান অধিপতি, জানতে পেরে হেলেনারই মুখে
ওদের পলায়নের উদ্দেশ্য ক্রোধের জ্বালায় পিছু নিলাম আমি।
আর রূপবতী হেলেনা এল ভালবাসার টানে।
কিন্তু; হে রাজন, জানি না সে কি মন্ত্রশক্তি,
মন্ত্র ছাড়া কিই বা একে বলতে আমি পারি,
যার বলে হার্মিয়ার প্রতি ভালবাসা
এক নিমেষে গলে গেল তুষারকণার মতন;
সে প্রেম এখন স্মৃতির পটে শৈশবের খেলনা-সম;
মেতেছিলাম অবোধ খেলায়—এখন মূল্যহীন।
বুকে আমার যত ধর্ম, হৃদয়ে যত ব্যাকুলতা,
চোখে যত নির্ঝরিণী আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের,

সবাই এখন হেলেন-কে ঘিরে। হার্মিয়াকে দেখার আগে,
ও-ই ছিল বাকদত্তা আমার, জানেন আপনি প্রভু।
কিন্তু রোগগ্রস্ত মুখে তো আর মিষ্টিফল রোচে না!
তবে সে রোগ থেকে মুক্ত হয়েছি, স্বাস্থ্য আবার সমুজ্জ্বল।
এবার নেব মাথায় করে উপেক্ষিত প্রেমকে আবার;
অন্তরে রাখবো তাকে দেদীপ্যমান,
এ জীবনে আর কভু ফেলব না ধুলায়।

থিসিয়াস। শ্রেষ্ঠ প্রেমিক তোমরা দুজন, হয়েছে দেখা শুভক্ষণে!
ক্রমে ক্রমে শুনবো আরো এ কাহিনীর বিবর্তন।
ইজিয়াস করছি নাকচ তোমার আবেদন।
কারণ মন্দিরে আজ আমার সঙ্গে এই দম্পতিরা
ফুলডোরে ধরা দেবে চিরমিলন আশে।
তপন-উদয়ে ভোরের ধূসর পেয়েছে ক্ষয়, শিকার আজ থাক!
চলো যাই এথেন্স্-এ! তিন জোড়া দম্পতি
মাতবো ভোজে স্মরণ করে ভবিষ্যতের সংহতি।
এস, হিপোলিটা! [থিসিয়াস, হিপোলিটা ও অনুচরবর্গের প্রস্থান]

ডিমিট্রিয়াস। এসব ঘটনা যেন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র, সুদূর—
দিগ্‌বলয়ের পাহাড় হয়েছে স্তম্ভিত মেঘ।

হার্মিয়া। দ্বিধাগ্রস্ত চোখ যেন দ্বিধায় বিভক্ত,
জাগছে চোখে প্রতি দৃশ্যের দুই বিভিন্ন রূপ।

হেলেনা। আমারো তাই মনে হচ্ছে।
ডিমিট্রিয়াস-কে পেয়েছি কুড়িয়ে অরূপরতন-সম;
পেয়েছি, অথচ পাইনি যেন!

ডিমিট্রিয়াস। জেগে আছি কি?
হয়তো এখনো সুপ্তিমগ্ন, হয়তো দেখছি স্বপ্ন!
রাজা এসেছিলেন এক্ষুণি? ঠিক জানো, জানিয়েছেন আমন্ত্রণ?

হার্মিয়া। এসেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন পিতা।

হেলেনা। হিপোলিটা-ও

লাইস্যাণ্ডার। মন্দিরে যেতে দিয়েছেন আমাদের আদেশ।

ডিমিট্রিয়াস। তবে তো জেগেই আছি! চলো যাই ও'র কাছে।
যেতে যেতে কথা হবে স্বপ্ন-সম্বন্ধে। [সকলের প্রস্থান]

বটম্। [জাগিয়া] আমার কিউ এলেই আমায় ডাকবে, উঠে পার্ট বলবো। পরের ধরতাইটা হোলো, 'হে, জ্যোতির্ময় পিরামুস!' একি? পিটার কুইন্স্! হাপরওয়ালা ফ্লুট! কামারের পো স্নাউট! স্টার্ভ্‌লিং! দেখেছ? দেখেছ? লম্বা দিয়েছে আমাকে ফেলে! আমি একখানা অসাধারণ স্বপ্ন দেখেছি, একটি অসম্ভব কল্পনা। সে স্বপ্ন যে কি স্বপ্ন তা বলা কোনো মানুষের বুদ্ধিতে কুলোবে না! এ স্বপ্নের তাৎপর্য বলতে যে মাথা কুটবে সে এক গাধা। দেখলাম আমি ইয়ে হয়েছি, কি যে হয়েছি

কি বলবে? দেখলাম আমি ইয়ে হয়েছি—দেখলাম আমার লম্বা দুটো ইয়ে—ইয়ে দুটো যে কি ইয়ে তা যে জানতে চাইবে সে আহাম্মুক রঙচঙে ভাঁড়! মনুষ্যচক্ষু কখনো শোনেনি, মনুষ্যকর্ণ কখনো দেখেনি, মনুষ্যহস্ত কখনো চাটেনি, মনুষ্যজীব কখনো ভাবেনি, মনুষ্যহৃদয় কখনো ছোঁয়নি এমন গোলমেলে স্বপ্ন! পিটার কুইন্‌স্‌-কে বলবো এই স্বপ্নটা নিয়ে একটা তরজা লিখে ফেলতে। তরজার নাম হবে "পাছাপেড়ে স্বপ্ন," কারণ এর আগাও নেই, পাছাও নেই। নাটকের শেষে রাজার সামনে একদিন তরজাটা গাইতে হবে। পাছাপেড়ে যখন, তখন রাণীর মৃত্যু-উপলক্ষে কীর্তনের মতন করে গাওয়াটাই শোভন হবে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। এথেন্‌স্‌। কুইন্‌স্‌-এর গৃহ।

কুইন্‌স্‌, স্নাগ, বটম্‌, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টার্ভলিং-এর প্রবেশ

কুইন্‌স্‌। বটম্‌-এর বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলে? ঘরে ফেরেনি এখনো?

স্টার্ভলিং। কোনো খবর নেই। মনে হয় সে পাগল হয়ে বিবাগী হয়েছে।

ফ্লুট। যদি না আসে, তবে তো নাটকটার দফা রফা; কি বলো? অভিনয় তো করা যাবে না।

কুইন্‌স্‌। অসম্ভব। পুরো শহরে পিরামুস-এর পার্ট করতে পারে এমন আর একটা লোক নেই।

ফ্লুট। সত্যি, মজুরদের মধ্যে অমন বুদ্ধিমান আর নেই।

কুইন্‌স্‌। ওর মতো ভাল লোকও আর নেই। আর গলা কি! যেন উপপতি মন্ত্র পড়ছে!

ফ্লুট। উপপতি নয়, উপাচার্য বলা উচিত; উপপতি মন্ত্র পড়বে কেন? উপপতি বড় বাজে মাল!

[স্নাগ্‌-এর প্রবেশ]

স্নাগ। শুনেছ? রাজা ফিরেছেন মন্দির থেকে; সঙ্গে আরো দু-তিনজন ভদ্রলোক ও মহিলা; এঁদেরও দল বেঁধে বিয়ে হয়ে গেছে। ঈশ, আজ যদি অভিনয়টা করতে পারতাম, তবে বকশিসের চোটে বাবু হয়ে বসতাম!

ফ্লুট। হায়রে বন্ধু বটম্‌ গুণ্ডা! তুই এ জীবনে কি হারালি! একদিনে চার আনা কড়কড়ে পয়সা পেতিস; পায়ে ঠেললি? চার আনা সে পেতই; পিরামুস-এর পার্ট দেখে রাজা চার আনা পয়সা দিতেন না? এ কখনো বিশ্বাস হয়? এত ভাল করছিল পার্টটা! চার আনা বকশিস পেতই! পিরামুস-এর পার্টে দিন চার আনা রোজগার; এমন কি আর বেশি বলেছি?

[বটম্‌-এর প্রবেশ]

বটম্‌। ছেলেগুলো গেল কোথায়? দিলদরিয়ারা গেল কোথায়?

কুইন্‌স্‌। বটম্‌! আজ কি সুখের দিন!

বটম্‌। বন্ধুগণ আশ্চর্য সব ঘটনা বিবৃত করতে পারি; জানতে চেয়ো না; যদি

বলি তবে আমি নেহাৎ চাষা! তবে পরে বলবো, সব বলবো, ঠিক যেমন ঘটেছিল।

কুইন্‌স্‌। বলো, সব বলো, বটম্‌!

বটম্‌। আজ একটি কথাও নয়। এটুকু বলতে পারি, রাজার ভোজসভা শেষ হয়েছে। পোশাক টোশাক গুছিয়ে নাও; দাড়িগুলোয় লাগাও নূতন সুতো; জুতোয় বাঁধো বাহারে ফিতে; একটু পরে রাজবাড়িতে এসে হাজির হয়ো সবাই; পার্টটার্ট দেখে রেখো প্রত্যেকে; কারণ মোটমাট আমাদের নাটক নির্বাচিত হয়েছে। আর যাই করো বাবা থিস্‌বি-র জামাকাপড় যেন পরিষ্কার হয়; আর সিংহের পার্ট যে করবে সে যেন নখ না কাটে, ওগুলোই থাবার মতন বেরিয়ে থাকবে। আর, ভাইসব, আজকে পেঁয়াজ-রসুন খেও না কেউ, দোহাই তোমাদের। মুখ থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরুলে তবে ভদ্রলোকেরা বলবেন, 'বাঃ, বেশ মিষ্টি নাটক!' আর কথা নয়, বেরোও সব, যাও এখান থেকে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এথেনস্‌। থিসিয়াস-এর প্রাসাদ।

থিসিয়াস, হিপোলিটা, ফিলোস্ট্রাটে, সম্ভ্রান্ত অতিথিবর্গ এবং অনুচরদিগের প্রবেশ

হিপোলিটা। ওরা যা বলছে থিসিয়াস সে তো বড়ই আশ্চর্য!

থিসিয়াস। আশ্চর্য কিন্তু অসম্ভব; হয় না আমার বিশ্বাস
পৌরাণিক কিংবদন্তী আর রূপকথার পরীর গল্প।
প্রেমিক আর উন্মাদের উত্তপ্ত কল্পনায়
উদ্ভট আর অবাস্তব নিত্য উৎসারিত,
বিবেচনা, বুদ্ধিসীমা অট্টহাস্যে লঙ্ঘিত।
পাগল, প্রেমিক আর কবি—
মনোলোকের বৈচিত্র্যে তিনজনই সমান।
একজনের চোখে ভাসে লক্ষ প্রেত নারকী,
তাকেই বলি পাগল; প্রেমিক তেমনি আকুলতায়
কৃষ্ণকলি মেয়ের মুখে দেখে অতুল রূপ;
কবির চোখও সূক্ষ্ম কি এক উন্মাদনায়
ছুটে বেড়ায় জগৎ থেকে আকাশ, আকাশ থেকে জগতে,
খুঁজে বেড়ায় পরশমাণিক, অন্তরের কল্পরূপ;
মনে মনে অসম্ভবের মূর্তি গড়ে, তারপর নেয় কলম;
লেখারেখায় সেই মুরতি আঁকে; যা ছিল নিঃসীম শূন্য,
তাকেই দেয় গৃহের সীমা; আনে তাকে কাছাকাছি;
নূতন নামের পরিসরে বাঁধে তাকে আদর করে।

মানব-মনের কি বিচিত্র খেলা; আনন্দের পরশ পেলেই
খুঁজে বেড়ায় খেয়ালিপনায় চিরানন্দের উৎসলোক।
তেমনি আবার রাতের আঁধারে মনে যদি ভয় ঢোকে,
ঝোপঝাড়কে ভাল্লুক ভেবে পালায় ছুটে কত লোকে!

হিপোলিটা। কিন্তু কাল রাতের কাহিনী বার বার শুনে,
চারজনেরই একই ভাষণ সাড়া জাগায় প্রাণে;
শুধুমাত্র কল্পনায় কি এ ঘটনা সম্ভব?
হোক না কেন আশ্চর্য, হোক না কেন বিস্ময়কর
পরস্পরের কথাই এদের সততার সাক্ষী।

থিসিয়াস। এই যে আসছে প্রেমিকরা, আনন্দে মুখর!
[লাইসাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হার্মিয়া ও হেলেনা-র প্রবেশ]
সুখী হও, বন্ধুগণ, হিয়ায় জাগুক নিতি নিতি
নতুন প্রেমের সাড়া।

লাইস্যাণ্ডার। তেমনি জাগুক প্রভুর গৃহে, উদ্যানে, শয্যায়!

থিসিয়াস। এস এবার: কি নাচ হবে, মুখোস নাচ?
ফুলশয্যার, এখনো তিন ঘণ্টা বাকি;
এই সুদীর্ঘ যুগ অতিবাহিত করবো কেমন করে?
কোথায় গেল বিদূষক, রাজসভার আমোদকর্তা?
আমোদপ্রমোদ হবে কি আজ? নাটক নেই কিছু?
লাঘব করবো কি উপায়ে প্রতীক্ষার এই যন্ত্রণা?
ফিলোস্ট্রাটে-কে ডাকো।

ফিলোস্ট্রাটে। এই যে এক নির্ঘণ্ট; সব ব্যবস্থার তালিকা;
দেখুন স্বয়ং হুজুর কোন্‌টা প্রথম শুনতে চান। [লিপি প্রদান]

থিসিয়াস। [পড়িয়া] 'সেণ্টর বাহিনীর যুদ্ধের পালাগান'
শিল্পী : এক এথিনীয় খোজা, তার-যন্ত্রে পটু।
না, এ চলবে না; গল্পটা পুরো বলেছি প্রিয়াকে
আত্মীয় আমার হারকিউলিস-এর সম্মানার্থে।
'মত্ত ব্যাকানালদের নৃত্য এবং অর্ফিয়ুস-হত্যা';
এ তো বহু পুরোনো নাটক; থীব্‌স্‌ থেকে ফিরলাম যখন
দিগ্বিজয় সেরে; এ নাটকই তো দেখেছিলাম।
'দরিদ্রদশায় শিক্ষার মৃত্যুতে বাক্‌দেবীর শোক';
এটা বোধহয় ব্যঙ্গনাট্য, ক্ষুরধার এর শ্লেষ;
অত্যন্ত বে-মানান বিবাহ উৎসবে।
'পিরামুস এবং থিসবি-র প্রেমোপাখ্যান
অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক ক্লান্তিকর নাটিকা; অতি করুণ হাস্যরস।'
করুণ অথচ হাস্যরস, ক্ষুদ্র অথচ ক্লান্তিকর!
এ যে দেখছি গরম বরফ, অতি আশ্চর্য তুষার।
এই অসংগতির সংগতিটা কেমন হবে জানো?

ফিলোস্ট্রাটে। নাটক এটা হুজুর মালিক গুটি দশেক কথার;
সত্যি এটা ক্ষুদ্র নাটক, ক্ষুদ্রতর দেখিনি।
আবার দশটা কথাও না থাকলেই হোতো যেন ভাল;
তাই ক্লান্তিকর। আগাগোড়া একটা কথার নেই সামঞ্জস্য;
নেই কোনো কান্ডজ্ঞান একটা অভিনেতার;
আর করুণ তো বটেই প্রভু, পিরামুস যে আত্মঘাতী;
মহড়া দেখতে বসে চোখের জলে ভেসে গেলাম;
এমন উচ্চ হাসির অশ্রুপাত করেনি কেউ কভু।

থিসিয়াস। অভিনয় করছে কারা?

ফিলোস্ট্রাটে। কড়া হাতের মেহনতি মানুষ এরা এথেন্স্-এর;
মাথা খাটিয়ে কাজ বোধহয় জীবনে এই প্রথম।
অনভ্যস্ত স্মৃতির পরে চাপিয়েছে বিষম বোঝা;
প্রাণপণে নাটক করবে হুজুরের বিবাহে।

থিসিয়াস। তবে শুনবো এ নাটক।

ফিলোস্ট্রাটে। না, না, মহান রাজা!
হুজুরের অযোগ্য; শুনেছি বারবার; বাজে জিনিস,
একেবারে বাজে! উদ্দেশ্যটা মহৎ ছিল; হুজুরের সেবা;
তবে প্রচণ্ড চেষ্টা আর প্রাণান্ত মুখস্থে
সে উদ্দেশ্য বেঁকেচুরে বিকটরূপ ধরেছে;
হাসতে যদি চান হুজুর শুনুন এই নাটক।

থিসিয়াস। শুনবো এই নাটক;
ওদের সারল্য আর শ্রদ্ধা মিশে অপূর্ণতা পূর্ণ হবে!
যাও, নিয়ে এস ওদের; মহিলাগণ, আসন নিন। [ফিলোস্ট্রাটের প্রস্থান]

হিপোলিটা। মূর্খতার ধ্বস্তাধ্বস্তি ভাল লাগবে না আমার;
রাজসেবার ঠেলায় এমন নিজের গলা কাটা, এ কি ভাল?

থিসিয়াস। কি বলছ প্রিয়তমা? অত খারাপ হবে না।

হিপোলিটা। ফিলোস্ট্রাটে বলে গেল অক্ষম ওরা অতিশয়।

থিসিয়াস। সেই অক্ষমতার অর্ঘ্য নেব কৃতজ্ঞ চিত্তে।
ওদের যেটা শূন্যতা সেটাই হবে পূর্ণতা আমাদের মনে।
রাজসেবায় হয়তো ওদের প্রমাদ অনেক থাকবে;
রাজার কাছে প্রয়াস বড়ো, প্রতিভার চেয়ে।
যেখানে গেছি শুনেছি অনেক স্বাগত-বক্তৃতা;
বহুযত্নে রচনা আর বহুকষ্টে মুখস্থ;
দেখেছি তাদের বিবর্ণ মুখ, কেঁপেছে হঠাৎ ভয়ে,
কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে বক্তৃতার মাঝেই;
অভ্যাসলব্ধ কথার তোড়ের কণ্ঠ রুদ্ধ ত্রাসে;
শেষ পর্যন্ত মূক হয়ে পালিয়েছে ছুটে,
স্বাগতম আর হয়নি বলা। তবু প্রিয়া

অন্তত সেই কথার মাঝেই পেয়েছি খ‍ুঁজে স্বাগতম;
সন্ত্রস্ত লাজুক যত রাজ-সম্ভাষণ,
কম নয় সে সপ্রতিভ বাগ্মিতা থেকে
না-বলার অন্তরালে বলে আমার কাছে
ভালোবাসার জীভ-জড়ানো সারল্য যার আছে।

[ফিলোস্ট্রাটের পুনঃ প্রবেশ]

ফিলোস্ট্রাটে। হুজুরের আজ্ঞা হোক, এবার গৌরচন্দ্রিকা হবে আরম্ভ!

থিসিয়াস। আরম্ভ হোক!

[তূর্যধ্বনি। সূত্রধারবেশে কুইন্স্-এর প্রবেশ]

সূত্রধার। যদি করি অপমান দর্শকবৃন্দে ইচ্ছাক্রমে সে অপমান।
স্বপ্নেও দিবেন না স্থান করাই মোদের উদ্দেশ্য,
ইচ্ছা করি শুধু। প্রদর্শিতে মোদের সরল সহজ নাট্যমান
ইহাই মোদের কাল হইল, বৈধব্যের হবিষ্য!
মনে করুন আপনারা অতি অভাজন। মোরা আসিনু হেথা অতীব ঘৃণায়।
আসি নাই মোরা তুষিতে সমাগতজনে
সত্য মোদের অভীষ্ট। সকলের মনের বাসনা পুরাতে কাণায় কাণায়;
আসি নাই হেথা। যেন জ্বলেন তৈলে ও বেগুনে,
নটগণ আসিছে হোথা! উহাদেরি অভিনয়
যাহা কিছু জানিবার আছে সবই জানায়!

থিসিয়াস। লোকটার কথায় দাঁড়ি-কমা'র কোনো বালাই নেই!

লাইস্যাণ্ডার। ওর বক্তৃতার তুলনা শুধু পাজী ঘোড়া! ছন্দহীন তালহীন লাফালাফি! একটা নীতিবাক্য শেখা গেল, প্রভু: শুধু বলিলে চলে না; থামিতেও জানা চাই।

হিপোলিটা। সত্যি, শিশুর হাতে ভেঁপুর মতন দিয়ে গেল বক্তৃতাটা; শব্দ আছে শব্দটা আয়ত্তে নেই।

থিসিয়াস। হ্যাঁ, যেন জট পাকানো দড়ি। ছেঁড়েনি কোথাও, তবে এমন তালগোল পাকিয়েছে যে দড়ি বলে চেনা যায় না।

[পিরামুস, থিসবি, প্রাচীর, চাঁদমামা ও সিংহের প্রবেশ]

সূত্রধার। ভদ্রমণ্ডলী সবে কি হয়েছ বিস্মিত এই মিছিল দেখি?
বিস্ময়ের ঘোর কাটিবে শীঘ্র সত্যের দীপ্ত আলোকে'
ঔৎসুক্য নিবারণ তরে বলি, এই ব্যক্তি পিরামুস বই কি;
আর এই অপ্সরা বিনিন্দিতা মহিলা থিসবি হেথা ঝলকে!
এই যে ব্যক্তি বক্ষে-পৃষ্ঠে চূণ-শুরকি বহে অকাতরে,
এ-ই হইল প্রাচীর অলঙ্ঘ্য, প্রেমের বাধাস্বরূপ;
ইহারই গাত্রে ছিদ্র পথে দুর্ভাগা প্রেমিক আলাপ করে;
নাট্যমধ্যে ইহারে দেখিয়া বিস্ময় না মানিও অপরূপ!
এই যে ব্যক্তি হস্তে ধরিছে প্রদীপ, কুত্তা, ফণীমনসা,
ইনিই চন্দ্রদেব সর্বোপাস্য, চাঁদমামা লোকে কহে যাঁহারে;

কেন না চন্দ্রালোকে প্রেমিক-প্রেমিকা আলাপনে হারাইবে দিশা,
নিনুর সমাধি-পার্শ্বে তাহারা হস্তধৃতাধৃতি করে।
এই জন্তু ভয়ংকর, সিংহ নামেতে বিদিত;
প্রেমিকা থিসবি প্রথমে পঁহুছিতে,
ঘাবড়াইল সিংহ হেরি আচম্বিতে,
পলাইতে গিয়া শালটি তাহার ধূলায় গেল গড়াগড়ি
সিংহ অমনি ভীষণ কামড়ি' শাল করিল রক্তাক্ত।
ক্ষণপরে তপন-সম উদিলেন পিরামুস নরহরি;
দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তমার শাল সিংহনখরে নিহত!
অমনি ভাতিল তরবার তাঁহার, বুভুক্ষু ভয়াল ভল্ল
নিমেষে ভীষণ ভুজংগপ্রয়াতে ভক্ষিল ভল্ল বক্ষ!
থিসবি আছিল তুঁতগাছে গুপ্ত, হেরি এই জীবনমল্ল
প্রিয়ের ভল্ল টানিয়া কল্ল আত্মহত্যা মোক্ষ।
আর যাহা আছে নাট্যরংগ, সিংহ, চন্দ্র, প্রাচীর, প্রেমিক
সকলে মিলিয়া করিবে খোলসা সাঙ্গ হইল মাংগলিক।

[অভিনেতৃবর্গের প্রস্থান]

থিসিয়াস। ভাবছি সিংহও কথা বলবে নাকি।

ডিমিট্রিয়াস। আশ্চর্য কি প্রভু? এত গাধা কথা বলছে, আর একটা সিংহ বলতে পারবে না?
স্নাউট এই নাটকে আছে এমন ঘটনা সুচির;
যে স্নাউট আমি দাঁড়ায়ে আছি সাজিয়ে প্রাচীর!
এমন দেওয়াল আমি শুন ভদ্রমণ্ডলী;
আছে দেহে ছিদ্র এক, ফুটো কহে কোন্দলী:
এই ছিদ্রপথে করে পিরামুস ও থিসবি
গুজগুজ ফুসফুস যথা বায়স-বায়সী।
এই মৃত্তিকা, এই শুরকি চূণ, এই ইষ্টকখণ্ড!
প্রমাণ করে আমিই সেই দেওয়াল দোর্দণ্ড!
সত্য শুনো ভদ্রজনে এই সেই ছিদ্র,
এই ফুটোয় নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ রুদ্র।

থিসিয়াস। ইঁট-পাথর এর চেয়ে ভালো বলতে পারে কখনো?

ডিমিট্রিয়াস। এমন সদালাপি শুরকি জীবনে দেখিনি প্রভু।

থিসিয়াস। পিরামুস এগিয়ে আসছে দেয়ালের কাছে! চুপ!

[পিরামুস-এর পুনঃ প্রবেশ]

পিরামুস। হে ভয়ংকর রাত্রি! হে মসীবিনিন্দ্য রাত্রি।
হে পলাতক দিবসের সিংহাসনলোভী!
হে রাত্রি! হে রাত্রি! হায় হায় হায় ধরিত্রী!
থিস্‌বি ভুলেছে প্রতিজ্ঞা তাহার জাগিছে চিত্তে ক্ষোভ-ই।
আর তুই হে প্রাচীর; হে সুমিষ্ট, হে সুন্দর!

হে প্রাচীর, সুমিষ্ট প্রাচীর, ওহে আমার সুন্দর!
তাহার বাপের আমার বাপের গৃহের মাঝে কি করিস!
দেখা দেখি ছিদ্র তোর নাহিলে পরাণ সংহারিস!
[প্রাচীরের অঙ্গুলি উত্তোলন]
ধন্যবাদ হে ভদ্র প্রাচীর; ইন্দ্র পরিষ্কৃবেন তব শ্যাওলা!
রে দুষ্ট প্রাচীর! তব ছিদ্রে না হেরি স্বর্গ, এ কি নিয়তির খেওলা!
এঁকি দেখাইলি? নাহি হেরি থিস্‌বি ফুল্লকমলবদন!
অভিশপ্ত তোমায় গতর ধ্বসুক তব ইষ্টক গাঁথন!

থিসিয়াস। দেয়াল যা জ্যান্তো, ও উল্টে শাপ দেবে।

পিরামুস। না, না, হুজুর, বইতে ওরকম নেই। "ইষ্টক গাঁথন" হোলো থিস্‌বি-র কিউ; থিস্‌বি-র ঢোকার সময় হয়েছে! তখন এই ফুটো দিয়ে আমি তাকে দেখতে পাবো। দেখবেন, সব দেখবেন, যেমন বলছি ঠিক তেমন ঘটবে। ঐ যে আসছে!

[থিসবি-র পুনঃপ্রবেশ]

থিস্‌বি। হে প্রাচীর, বহুবার তুমি শুনিয়াছ মম বিলাপ আকুলিবিকুলি!
নির্দয় তুমি রচিয়াছ ব্যবধান প্রেমিক আর মম মাঝে;
দাড়িম্ব ওষ্ঠযুগল মম করে ইষ্টক-সনে কেলি;
তব প্রস্তর-দেউল নির্মম হয়ে স্পর্ধিত হয়ে রাজে।

পিরামুস। এ কার কণ্ঠস্বর দেখি! ছিদ্রে আঁটিব চক্ষু,
দেখিব প্রিয়ার মুখ শুনি কি না শুনি!
থিস্‌বি।

থিস্‌বি। তুমি মোর প্রিয়তম, তোমারই তরে দিন গুণি!

পিরামুস। দিন গুণিয়া হইবে কি? আমি কামোন্মত্ত;
কন্দর্প চেপেছে কন্ধে, তেমনই অনুরক্ত!

থিস্‌বি। রতি-র মতই রহিব আমি, ভাগ্য বড়ই শক্ত!

পিরামুস। সূর্যদেবের মতই আমি কুন্তীদেবীর ভক্ত!

থিস্‌বি। কুন্তীদেবীর মতই আমি সূর্যদেবে যুক্ত!

পিরামুস। এই পাপিষ্ঠের ছিদ্রপথে করহ মোরে চুম্বন!

থিস্‌বি। চুম্বি শুধুই প্রাচীর-ছিদ্র, ওষ্ঠ করহ চুম্বন!

পিরামুস। থাক, হয়েছে! আসিবে কি তুমি বিদ্যুৎগতি নিনুর কবর পাশে?

থিস্‌বি। জীবনমৃত্যু সাক্ষী আমার যাইব মিলন আশে!

[পিরামুস ও থিসবি-র প্রস্থান]

প্রাচীর। প্রাচীরর পার্ট হেথায় সাংগ হইল,
তাই প্রাচীর এবার অন্যত্র চলিল! [প্রস্থান]

থিসিয়াস। একি! দুই পরিবারের মধ্যেকার চীনের প্রাচীর চলে গেল যে!

ডিমিট্রিয়াস। কি আর করা যাবে প্রভু? দেয়াল যদি আচমকা কথাবার্তা বুঝতে শুনতে শুরু করে তবে ওকে ধরে রাখা যায় কি করে?

হিপোলিটা। এমন বাজে মাল জীবনে শুনিনি।

থিসিয়াস। শ্রেষ্ঠ যে নাটক সে-ও তো জীবনের ছায়া মাত্র। নিকৃষ্টকেও শ্রেষ্ঠ করা যায় কল্পনার রং-এ রাঙিয়ে!

হিপোলিটা। কার কল্পনা? অভিনেতা, না দর্শক? এ ক্ষেত্রে দেখছি দর্শকের কল্পনা ছাড়া গতি নেই, কারণ অভিনেতাদের ও বস্তুটি নেই।

থিসিয়াস। নিজেদের ওরা নিকৃষ্ট মনে করে; প্রতিদানে সেই বিনয়ের অসম্মান করলে তার চেয়েও ওদের ছোট করা হবে। সে অপমান না করে দেখ—ওরা সরল, মহৎ মানুষ। এই যে আসছে দুই মহৎ পশু, একজন সিংহ, আরেকজন মানুষ।

[সিংহ ও চাঁদমামার পুনঃপ্রবেশ]

সিংহ। মহিলাবৃন্দ! আপনাদিগের হৃদয় বড় কম্পিত, হে সুন্দরি
ভীত সে হর্ম্যতলে হেরি ক্ষুদ্র ছুছুন্দরী!
এক্ষণে সে হৃদয়ে বাজে ত্রাসের শম্ভূ ডম্বরু,
কারণ জলজ্যান্ত সিংহ হেথায় লাগায় লম্ফঝম্পরু!
তাই ঘোষি পূর্বাহ্নে আমি স্নাগ নামে মিস্তিরি!
নহি আমি সিংহ সত্য, নহি সিংহের ইস্তিরি।
সিংহের শুধু চামড়া-মোড়া; হইয়া সত্য হিংস্র সিংহ
আসিতাম যদি হইত পাপ, হইত রসভংগ।

থিসিয়াস। বাঃ কি ভদ্র জন্তু! সিংহেরও বিবেকটিবেক থাকে তাহলে!

ডিমিট্রিয়াস। আজ পর্যন্ত এমন শান্তশিষ্ট পশু দেখিনি!

লাইস্যান্ডার। এই সিংহ দেখছি বীরত্বে শৃগাল।

থিসিয়াস। হ্যাঁ, আর জ্ঞানগম্যিতে পরমহংস!

ডিমিট্রিয়াস। উপমাটা ঠিক হোলো না প্রভু; শৃগাল সুযোগ পেলেই হংস ধরে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে যায়। এর বীরত্ব তো কই জ্ঞানগম্যির ভার বইতে পারছে না।

থিসিয়াস। আবার জ্ঞানগম্যিও ঠিক বীরত্বকে উস্কে দিতে পারছে না; শৃগাল হংসে যে আদা-কাঁচকলায়। যাক্ উপমা বাদ দাও; ওর জ্ঞানগম্যির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। এবার চাঁদ কি বলে শুনি।

চাঁদমামা। এই হের' লণ্ঠন—ষোলোকলা চন্দ্র—

ডিমিট্রিয়াস। কলাগুলো নিজেই খাওনা!

থিসিয়াস। খেয়েছে খেয়েছে, কলা খেয়েছে খানিকটা। পূর্ণশশীকলার খানিকটা এখনও অদৃশ্য হয়ে আছে; ও খেয়েছে সেটুকু।

চাঁদমামা। এই হের' লণ্ঠন ষোলোকলা চন্দ্র,
এ দাস যেন চাঁদমামা চন্দ্রলোকে বন্ধ।

থিসিয়াস। এ হে হে, বিসমিল্লায় গলদ! চন্দ্রলোকে বন্ধ যদি তবে লণ্ঠনের মধ্যে ঢুকুক; নইলে চাঁদমামা বলে মানবো কেন?

ডিমিট্রিয়াস। ভেতরের জ্বলন্ত সলতেটার ভয়ে কাছে ঘেঁষছে না। দেখছেন না? সলতের অনল একেবারে কোপানল হয়ে দাউ দাউ করছে।

হিপোলিটা। এ চাঁদ আমার ভাল লাগছে না! অমাবস্যা হয় না কেন?

থিসিয়াস। ওর জ্ঞানালোকের স্বল্পতা দেখে অনুমান করছি কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে;

তবু ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে অপেক্ষা করাই উচিত।

লাইস্যাণ্ডার। বলো, চাঁদমামা।

চাঁদমামা। বলতে চাই এইটুকু, এই লণ্ঠনটা চাঁদ; আমি চাঁদমামা; এই মনসাকাঁটা, চাঁদের কলংক; এই কুত্তা আমার বাহন।

ডিমিট্রিয়াস। দ্যেৎ, এ সবই তো তাহলে লণ্ঠনের মধ্যে থাকবে বাইরে কেন? এই, চুপ, থিস্‌বি আসছে।

[থিসবি-র প্রবেশ]

থিস্‌বি। এই হেথা সমাধি নিনু-র, কোথা মোর প্রিয়?

সিংহ। [গর্জন করিয়া] হালুম!

[থিস্‌বি-র দ্রুত পলায়ন]

ডিমিট্রিয়াস। বাঃ সিংহ! কি গর্জন!

থিসিয়াস। বাঃ থিস্‌বি! কি ধাবন!

হিপোলিটা। বাঃ চাঁদ! কি জ্বলন! না সত্যি, এ চাঁদের আলোর বাহার আছে!

[সিংহ কর্তৃক থিস্‌বি-র শাল দলন ও প্রস্থান]

থিস্‌বি। বাঃ, সিংহের কি প্রতাপ! যেন ইঁদুর ধরছে!

ডিমিট্রিয়াস। তারপরই এল পিরামুস!

লাইস্যাণ্ডার। পিরামুস কি! সিংহের মামা ভোম্বলদাস! তাই তো সিংহ হাওয়া!

[পিরামুস-এর পুনঃপ্রবেশ]

পিরামুস। হে মধুর চন্দ্রমা, সূর্যালোকে প্লাবিছ জগৎ!
ধন্যবাদ প্রদানি তোমা, কিরণরাশির মূল্য নগদ!
তব করোজ্জ্বল জ্বলজ্বল সমুজ্জল কজ্জলে,
দেখিব প্রাণের থিসবিরে মম আর কয়েক মুহূর্ত গেলে।
কিন্তু তিষ্ঠ! এ কি ব্যাগেড়া!
এ কী দেখি আমি বেচারা!
একি দুঃখের ফাঁস!
নয়ন, দেখিছ কি?
হায় প্রিয়া প্রাণের হাঁস!
তব শাল মখমল
রক্তে যে ছলছল!
কোথা আছ যম ভয়ংকর?
লও মৃত্যু ত্বরা করি,
জীবনসূত্র ছিন্ন করি,
ভুঙ্গো, ঝঙ্গো, খঙ্গো, প্রভঙ্গো, প্রলয়ংকর!

থিসিয়াস। এই আবেগের সঙ্গে যদি বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ যোগ দেয়া যায়, তবে হয়তো খামচে খানিকটা চোখের জল বার করাও যেতে পারে।

হিপোলিটা। হতে পারে আমি দুর্বলচিত্ত, কিন্তু লোকটার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে!

পিরামুস। কি হেতু হে প্রকৃতি সৃজিলা সিংহশাবকে?
সেই সিংহ আজি ঝলসিল মম জীবনপুষ্প হিংসার পাবকে!

সেই জীবনপুষ্প, মম প্রিয়া, আছে—না, না, ছিল—মোর হৃদয় মধ্যে,
থাকিত, হাসিত, খেলিত, প্রেমিত, প্রত্যহ জীবনযুদ্ধে।
　　এস, অশ্রু, খ্যাপাও মোরে;
　　এস অস্ত্র; আঘাতো সমরে,
পিরামুসের বক্ষ;
　　হ্যাঁ, এই বামদিকের বক্ষে
　　যাহা হৃৎপিণ্ড রক্ষে
　　[নিজবক্ষে অস্ত্রাঘাত]
এই মরিলাম, এই মরিলাম, এই হইলাম যক্ষ!
　　এখন আমি আকাট মৃত,
　　এখনো আমি অসৎকৃত;
প্রাণপক্ষী উড়িছে ঐ আকাশে!
　　জিহ্বার জ্যোতি নিভিয়া গেল!
　　চন্দ্র ঐ ছুটিয়া পলাইল!　　[চাঁদমামার প্রস্থান]
　　গেল, গেল, সব গেল!
এবার মরিতেছি, মরিতেছি, মরিতেছি, মরিতেছি, মরিলাম! [মৃত্যু]

ডিমিট্রিয়াস। বালাই ষাট, মরবে কেন? মৃত্যুর উপর টেক্কা মারো!

লাইস্যাণ্ডার। টেক্কা দেবে কি করে ভাই? ও তো মরে গেছে। অন্যের তুরুপের পিঠে টেক্কা দিয়ে বসে আছে।

থিসিয়াস। ডাক্তার টাক্তার ডাকতে পারলে এখনো হয়তো বেঁচে উঠতে পারে; তারপর টেক্কা না হোক গাধা সেজে এক্কা টানতে পারে।

হিপোলিটা। আচ্ছা, এটা কি হোলো? থিস্‌বি ফিরে এসে প্রেমিকের দেহ আবিষ্কার করার আগেই চাঁদ ভেগে পড়লো যে!

থিসিয়াস। তাহলে বোধহয় তারার আলোয় হবে। এই যে আসছে, এবং ওর অনুশোচনার সঙ্গেই নাটক শেষ।

[থিস্‌বির পুনঃপ্রবেশ]

হিপোলিটা। অমন একখানা পিরামুস-এর জন্যে খুব বেশি অনুশোচনা করাটা ভাল হবে কি? ছোট করে সারলেই বাঁচা যায়।

ডিমিট্রিয়াস। পিরামুস আর থিসবি-র মধ্যে অভিনেতা হিসেবে ফারাকটা ধুল পরিমাণ। যদিও একজন পুরুষের পার্টে, আর একজন মেয়ের। হায় ভগবান! যেমন পুরুষের মতন পুরুষ, তেমনি পুরুষের মতন মেয়ে।

লাইস্যাণ্ডার। ঐ পদ্মনয়নের দৃষ্টি হেনে ইতিমধ্যে দেহটা দেখে ফেলেছে!

ডিমিট্রিয়াস এবং ধর্মবতারের এজলাসে অধীনের ফরিয়াদ এইবার শুরু হবে।

থিস্‌বি। 　ঘুমায়ে রয়েছ প্রিয়তম?
　　একি! মরেছ, পায়রা মম?
হে পিরামুস, ওঠো!
　　কথা কও, কথা কও! রয়েছ বোবা?
　　মরেছে, মরেছে, হারায়েছে শোভা!

চাপিয়াছে সমাধির মুঠো!
এই নিমীলিত কমল চক্ষু,
এই বিম্বাধরোষ্ঠ ইক্ষু,
হলুদ গাঁদার প্রায় কপোল,
নাই, আর নাই, পেয়েছে ক্ষয়
কাঁদো, কাঁদো, প্রেমিকনিচয়;
চক্ষু আছিল যেন সবুজ শাপল!
হে ডাকিনী যোগিনী!
এস ডাকে অভাগিনী!
দুগ্ধফেননিভ হস্ত লয়ে;
ডুবাও হস্ত রক্তস্রোতে
প্রিয় মোর নিহত তোমাদেরি হাতে,
কাটিয়াছ জীবন রেশম বৃহৎ কাঁচি লয়ে।
জিহ্বা, কথা কয়ো না আর;
এস বিশ্বস্ত তরবার!
দাও মোর বক্ষযুগল ঘাঁটায়ে!
[নিজবক্ষে অস্ত্রাঘাত]
চলিলাম বন্ধুগণ!
এবার শমন-ভবন!
ছাড়ি দাও মোরে শেষ বিদায়ে! [মৃত্যু]

থিসিয়াস। বংশে বাতি দিতে রইলো এখন চাঁদ আর সিংহ।

ডিমিট্রিয়াস। আর দেয়াল রইলো।

বটম্‌। [হঠাৎ উঠিয়া] না, না দেয়াল আর নেই। এদের পরিবারের মাঝখানে যে দেয়াল ছিল সেটা ভেঙে গেছে। এসব পরিশিষ্টটা শুনবেন দয়া করে? নাকি আমাদের দুই নাচিয়ের খ্যামটা দেখবেন?

থিসিয়াস। পরিশিষ্টের দরকার নেই; তোমাদের নাটকের পক্ষে কোনো ওকালতির প্রয়োজন নেই। ওকালতি কক্ষণো করবে না; অভিনেতারা যখন মরে ভূত; কেউ অবশিষ্ট নেই, তখন পরিশিষ্ট দিয়ে কি হবে? কি জানো, যিনি এ নাটকের রচয়িতা তিনি নিজেই যদি পিরামুস-এর ভূমিকায় নামতেন এবং থিসবি-র মোজা গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়তেন, তবে সত্যি একটা করুণ রসঘন নাটক হোতো। তবু বেশ হয়েছে, অভিনয়টা খুব ভাল হয়েছে। লাগাও, খ্যামটা লাগাও; পরিশিষ্ট শিকেয় তোলা থাক। [নৃত্য]
মধ্যরাত্রির ধাতব কণ্ঠ দেউড়ি থেকে বলছে হেঁকে,
যামিনী গভীর! চলো, শুয়ে পড়ি সবাই।
গভীর নিশীথে পরীদের অধিকার, মন্ত্রমুগ্ধ মুহূর্ত!
রাত্রি যেমন কেটেছে প্রায় আনন্দ-জাগরণে,
তেমনি আবার সমাগত ভোরে নিদ্রায় হবো অচেতন।
উদ্ভট এই নাটক দেখে অজান্তেই কেটেছে কাল,

স্খলিত চরণ এগিয়েছে রাত্রি ক্লান্ত পদক্ষেপে।
চলো যাই শয্যায়। পনেরো দিন চলবে উৎসব,
প্রতিরাত্রি আনন্দমুখর নিশ্চিন্ত কলহাস্যে।

[সকলের প্রস্থান। পাক-এর প্রবেশ]

পাক্। এখন দূরে ক্ষুধার্ত সিংহের গর্জন,
চাঁদের পানে নেকড়ে-বাঘের বিলাপ;
ক্লান্ত কৃষকের নাসিকার তর্জন,
সাঙ্গ দিনের শ্রান্ত কার্যকলাপ।
শীতের আগুন নিভু নিভু রক্তিম আভায়
নিঃসঙ্গ প্যাঁচা ডাকে তীক্ষ্ণ চীৎকারে,
শোকাচ্ছন্ন যে জন কাতর নিদ্রাহীন শয্যায়
মরণভয়ে কেঁপে উঠে ইষ্টনাম করে।
এই সেই মুহূর্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,
প্রান্তরের কবরগুলো হাঁ করে মুখ আক্রোশে
বেরিয়ে আসে প্রেতাত্মারা দিনে যারা প্রচ্ছন্ন,
ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ের পথে ভৌতিক অট্টহাসে।
আমরা যক্ষ, আমরা পরী, ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে
তিন ডাকিনীর শাপের ভয়ে শুধুই চলার তাড়া;
সূর্যের রোষের দৃষ্টি কাঁপায় মোদের ত্রাসে,
অন্ধকারের পশ্চাতে স্বপ্ন-সম ঘোরা।
রাত্রি মোদের খেলার সময় উন্মাদনার খেলা;
এই শূন্য দেউল থাকবে শুধু শান্তিসুখের মেলা।
ঝাঁটা হাতে ভৃত্য আমি যক্ষরাজের আদেশে,
ধুলো ঝাড়বো আনাচেকানাচে দরজা-কপাট পাশে।

[ওবেন, টিটানিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ]

ওবেরণ। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দাও আলোকমালার রাশি;
উৎসবদীপ মৃতপ্রায় ঢুলছে জ্বরের ঘোরে;
যক্ষ, পরী, নৃত্যছন্দে ঘোরো আঁধার নাশি,
মালতীলতায় মুক্ত পাখী যেমন ছন্দে ওড়ে।
কণ্ঠে তোলো গুণ গুণ গান,
নৃত্য করো মুক্ত প্রাণ।

টিটানিয়া। দেখিস যেন ভুল না হয় গানের একটি স্বরে,
প্রতি তানকে স্পন্দিত কর্ মীড় গমক সুরে;
নৃত্যে তোদের প্রাণ ঢেলে দে হাতে হাত ধরে,
নূপুর থেকে আশীর্বাদ পড়ুক গৃহে ঝরে।

[নৃত্য ও গীত]

ওবেরণ। এখন থেকে ঊষার আলো যতক্ষণ না ঝরে,
যারে পরী ছুটে যা এ গৃহের ঘরে ঘরে;

প্রত্যেকের ফুলশয্যা করবো মোরা মন্ত্রঃপূত,
অনাগত শিশু হবে কল্যাণময় শুভ-সূত;
তেমনি থাকরে পিতামাতা পরস্পরের অনুগত,
সুস্থ সবল নিটোল হবে শিশু ওদের অনাগত
মাঠের তৃণের শিস থেকে চুঁইয়ে আনা এই শিশির
ছিটিয়ে দেবে ঘরে ঘরে নিদ্রামগ্ন শয্যা নিশির;
এতেই আছে শান্তিমন্ত্র অশেষসুখ ভবিষ্যতে
এতেই আছে শান্তিমন্ত্র অশেষসুখ ভবিষ্যতে
যা রে ছুটে, করিস দেখা প্রভাতলোক-সমাগত।

[ওবেরন, টিটানিয়া ও অনুচরবর্গের প্রস্থান]

পাক্। ছায়াজগতবাসী মোরা, দিয়েকি কি কষ্ট খুব?
মনে ভাবুন এইটুকু তবেই আবার হৃষ্ট রূপ :
ভাবুন না কেন চোখে হঠাৎ লেগেছিল তন্দ্রাঘোর,
যা দেখেছেন সবই খেয়াল, সবই স্বপ্ন, মায়ার ঘোর?
অক্ষম এই নাটকখানা, ঠাকুরমার এই রূপকথা,
খেয়ালখুশীর বিদ্রোহ এ, চৈত্ররাতের স্বপ্নগাথা।
দয়া করুন, বকবেন না, আমরা বড় অভাজন;
ভবিষ্যতে সত্যি গল্প করবো মোরা উত্থাপন!
তবু সব মিথ্যাই কি মিথ্যা নাকি? সব সত্যি কি সত্যি?
মনের ভেতর ছায়ার জগৎ নেই কি একরত্তি?
সর্পাঘাতে না যদি মরি, কিম্বা জলে ডুবে,
খুব শিগ্‌গির পুনরায় দেখা হবেই হবে;
নইলে আমি মিথ্যাবাদী! নমস্কার! নমস্কার!
রবিন আমি বলছি দেখা হবে পুনর্বার! [প্রস্থান]

অনুবাদ : **উৎপল দত্ত**

॥ সমাপ্ত ॥

যে যেমন সে তেমন

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ আর বরুণ এক মায়ের দুটি স্তনের মত এক ভাব-রসে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল ষোল বছর বয়েস পর্যন্ত। কে বলবে দু'জন বন্ধু, যেন দুটি যমজ ভাই। নাম দুটি এক ধরনের, কিন্তু পদবীতে তফাত ছিল। অরুণ চাটুজ্যে আর বরুণ সরকার। চেহারাতেও খুঁটিয়ে দেখলে কিছু অমিল ছিল। অরুণের নাকটি চাপা মুখখানি গোল, বরুণের মুখখানা একটু লম্বা ধাঁচের, নাক চোখা।

তবু অরুণ আর বরুণ অন্তরে এক। ম্যাট্রিক পাশ করল দুজনেই, তখন ওদের বয়েস ষোল। এ পর্যন্ত ওরা সর্বদা সবজায়গায় একসঙ্গে থাকত। অরুণ সিনেমা গেলে চোখ বুজে বলা যেত বরুণও সিনেমা গেছে। বরুণ সার্কাসে গেলে অরুণ খেলার মাঠে যেতে পারে না, তাকে সার্কাসে যেতে হবে।

ম্যাট্রিক পাশ করবার পর দুজন দু কলেজে ভর্তি হোল। তখন থেকেই একটু জোড় ভাঙল। অরুণ চাটুজ্যে আর্টস্ নিয়ে পড়ল বি.এ. পর্যন্ত আর বরুণ আই.এস-সি. পাশ করে কারিগরী বিদ্যালয়ে গেল বাড়ির নির্দেশে। এ সময় থেকে সর্বদা তাদের একসঙ্গে দেখা যেত না সত্যি, কিন্তু ভাবে আর ভাষায়, চিন্তায় আর কল্পনায় দুজনের মিল ছিল অদ্ভুত। অরুণ যদি বলত, সিনেমা আমাদের দেশের বড় ক্ষতি করছে, বরুণ তাতে অবধারিত নিয়মে সায় দিত, পরে একটু ভেবে যদি ধীরে ধীরে শোনাত যে ক্ষতি করছে বটে, তবে তেমন শিল্পী মানুষের হাতে পড়লে এ-ও একটা শিল্প হয়ে উঠতে পারে। বরুণ সায় না দিতে পারত না।

সব মন ঢেলে সায় দেয়া আর মন রাখবার জন্যে সায় দেয়া, দুটো এক কথা নয়। ওরা বোধহয় সেই সময় থেকেই একটু একটু বুঝতে পারছিলো যে কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো ভাবনায় মন রাখবার জন্যে সায় দিতে হয়। নিজের একান্ত আপন চিন্তা বোধ করি পুরোপুরি মাথায় আসে না। এ ওর চিন্তাকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে, ও এর ভাবনাকে স্পষ্ট হতে দেয় না। তার একটা মস্ত কারণ, দুজনের ওপর দুজনের মমতা।

এ ভালবাসা যেন নিজেদের ব্যক্তিত্বকেও অস্বীকার করে চলেছে দিনের পর দিন।

ঠিক এই সময় থেকেই ওরা বুঝতে পারছিল, মনের কোন একটা জায়গায় ওরা ভিন্ন. এক নয়। দুটো পুরোপুরি মানুষ দুটোই, একটা নয়।

যুদ্ধ শুরু হোল এই সময়টায়। বিগত ভয়াবহ যুদ্ধ। ভয়াবহতা যুদ্ধে নয়, মানসিকতায়। প্রাণের দাম, মনের দাম, মানুষের দাম দাঁড়াল একটামাত্র বুলেট। মানুষ তৈরির দাম নেই, মানুষ মারার কারিগর যে সবচেয়ে পোক্ত, তার দাম সবচেয়ে বেশী।

বরুণ সরকার মস্ত চাকরি নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল। বারণ করেছিল অরুণ, কি দরকার মরতে যাবার নয়তো বা মারতে যাবার। তার চেয়ে কলকাতায় কোথায় কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়ে থাকলেই হোত।

বরুণ স্পষ্টভাবেই একমত হতে পারল না। শেষটায় অরুণের মন রাখবার জন্যেই বাড়ির দোহাই দিতে হোল। অনেক টাকা মাইনে, দাদাও বলছে।

অরুণ বুঝল আপত্তি জানিয়ে লাভ হবে না। মত না দিলে তাদের ভেতর আজই এই মুহূর্তে থেকে দু'রকম মতের সূত্রপাত হবে। তাই এবারে শেষবারের মত মন রাখবার জন্যে সায় দিতে হোল।

এই শেষবার। এরপর আর কোনদিন তারা একমত হয় নি, হতে পারে নি।

যুদ্ধ থামল। দাঙ্গা থামল। বরুণ ফিরে এলো। অরুণ তখন একটি কলেজের অধ্যাপক। কয়েক বছরের ভেতর অরুণের কি যে হোল ও নিজেই ধারণা করতে পারল না। চোখের সামনে দেখলো, মানুষ কত রকমে কতভাবে নিজেদের অপমান করছে। নিশ্চিহ্ন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। যে মতবাদ মানুষ তৈরী করেছিলো, সেই মতবাদের কুয়োর বিষাক্ত জলে নিজেরা ডুবে মরছে। অরুণ অস্থির হয়ে উঠলো। এ অস্থিরতা এমন একটা অসহনীয় অবস্থায় পেঁাছোল যে ওকে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে হোল তক্ষুণী। ধরতে গিয়ে কোথায় যে কি ছিঁড়ে গেল, সেদিকে নজর দেবার মত অবসর ওর ছিল না। অস্থির মনে স্থির ভাবনা আসে না। তবু ও যেন বাঁচতে চাইল কোনমতে। পাশে বরুণ যদি থাকত, তবে এতটা অসহায় মনে হোত না নিজেকে, মা থাকলেও এতটা হোত না। বছরখানেক আগে মা মারা গেছেন। অরুণের সংসারের শেষ বন্ধন। অরুণ একা থাকত দোতলায়। একতলাটা ভাড়া দিয়েছিলো। একা একা এমন একটা নিরুপায় নিঃসহায় মনে হোল নিজেকে যে এই দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে অনেকগুলো ক্ষেত্রে ও নির্মম হয়ে উঠল। কঠোর সংযমের ব্রত সে আঁকড়ে ধরে মনে একটা উত্তেজনার সান্ত্বনা পেলো।

মা মারা যাবার পরে রেবা মাঝে মাঝে আসত ওর কাছে। মাসতুতো বৌদির বোন রেবা। বি, এ, পাশ করে বিয়ে হচ্ছে না। অনেক পাত্রপক্ষের অপছন্দের পাত্রী রেবা নিজের ভাগ্যকে উপহাস করবার জন্যে বোধ হয় বাড়িতে বলেছে, বিয়ে আর সে করবে না। চাকরির চেষ্টা করবে। দু-একটা মাস্টারীর খোঁজ বা মেয়ে পড়ানর কাজ যদি পাওয়া যায় তাই অরুণের কাছে আসা।

অরুণ যখন জানল রেবার বিয়ে না হবার অপরাধ ওর মস্ত মাংসল দেহখানা, ময়লা রঙ, আর ওদের পরিবারের অর্থাভাব, তখন থেকেই অরুণের মনটা মমতায় ভরে উঠল ওর জন্যে। সে মমতা যে কোন সময়ে আকাঙ্ক্ষার রূপ নিয়েছিলো সে খবর অরুণ জানত না। দিন, ক্ষণ, তারিখ মনে নেই। শুধু মনে আছে, যেদিন রেবাকে জড়িয়ে ও চুমু খেয়েছিলো, সেদিন প্রথম মনে হোল রেবার দেহের মাংস শুধু মাংস নয়, তাতে উত্তাপ আছে। আর সে তাপ অনেক ব্যথা সারিয়ে তোলে। আরাম দেয়।

রেবাও জানল, এমনি করে তার দেহের তাপে অরুণকে তাতিয়ে তাতিয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলে যদি তার বিয়ের প্রদীপ জ্বালান যায়, তবে মন্দ কি? ভাগ্যকে উপহাস করতে গিয়ে দেখল ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে উপহাসে, তোষামোদে নয়। ভাগ্যকে তোষামোদ করতে গেলে সে যেন পেয়ে বসে, খুশিমত মানুষকে নাচাতে থাকে। রেবা সুখ পেলো। ও সাধারণ মেয়ে, অরুণকে পেলে ও সুখী হবে। সংসারে যা কিছু সুখ মানুষ চায়, সবই পাবে। আর ভালবাসা? প্রেম? অতশত বোঝে না রেবা। কটা মেয়েই বা বোঝে?

অরুণও ওই ধরনের একটা কিছু হয়তো ভেবে থাকবে; কিন্তু ইদানীং সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কিছুদিন ধরেই রেবা লক্ষ্য করছিল, অরুণ ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে? অরুণ উত্তর দিয়েছিল, ভাল লাগে না। হঠাৎ এত ভাল না লাগবার কি কারণ হোল রেবার মত সাধারণ মেয়ের সাধারণ বুদ্ধিতে তা ধরা পড়ল

না। ও অবাক হোল, আতঙ্কিত হোল। তারপর একদিন নাটকীয় ভঙ্গীতে অরুণ বললে, —তোমার সঙ্গে এতদিন যা করেছি, পাপ করেছি, পাপ আর বাড়াতে চাই নে। তুমি আমাকে রেহাই দাও। আমাকে ক্ষমা করো।

রেবা অবাক হোল। এত বড় অপমানের পরেও একটা কথা বলল না। নীরবে মুখ ম্লান করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই থেকে রেবা আর আসেনি। অরুণ খুশি হয়েছে। এখন মেয়েমানুষ সম্পর্কে অরুণ অত্যন্ত সাবধানে চলে। পারতপক্ষে মেয়েমানুষের দিকে তাকায় না। কথা বলে না। মনকে ও এক চড়া সুরে বেঁধে ফেলেছে। শুধু কি তাই? অতি কঠিন তত্ত্ব আলোচনা নিয়ে দিনরাত মনকে মন্ত্র পড়া সাপের মত ফণা নামিয়ে রাখতে চায়। একটু তামাসা করতে এমন কি প্রাণ খুলে হাসতেও ভয় পায়, পাছে বাঁধনটা হাসির দাপটে পট্ করে ছিঁড়ে যায়। বেঁধে রাখতে হবে। সংস্কৃত স্তোত্র আর মন্ত্রের বাছা বাছা কঠোর দুর্বোধ্য শব্দগুলোর চাপে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখতে হবে, তবেই আরাম। আর রেহাই। আরামটা এই ভেবে যে বায়ুর মত যে ফসকে যায়, এমন মনকেও বেঁধে ফেলেছে, আর রেহাই পাপের ভয় থেকে। না, পাপ আর নেই। ধীরে ধীরে একটা মস্ত কিছু হয়ে উঠতে পারা যাচ্ছে। সংসারে যখন সর্বত্রই পাপ আর দুর্নীতি তখন আমার সঙ্গে তুলনা কার? অনেককেই কৃপা করতে পারা যায়। যেমন বরুণকে। বুরণকে শুধু কৃপা নয়, ঘৃণা করতেও বাধে না অরুণের। ঘৃণা করবে না-ই বা কেন। বরুণ সরকার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে জন্তু হয়ে। ও কি আর মানুষ আছে? মদ খায় না হয় খাক! শাস্ত্রেও এখানে সেখানে খুঁজে পেতে সোমরসের উল্লেখ দেখতে পেয়ে ক্ষমা করা যায়; কিন্তু তাই বলে নারীসঙ্গ? আর যথেচ্ছভাবে যে কোন নারীসঙ্গ! অরুণ স্তম্ভিত হোল দেখেশুনে।

বরুণ ওর বাসায় অরুণকে নেমন্তন্ন করেছিলো যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। একমাত্র বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হবার বাসনায় অরুণ চঞ্চল হোল, পরমুহূর্তেই ভাবল, না, অত চাঞ্চল্য কিসের? স্থিতধী হতে হবে। মনের ওপর কিছু প্রক্রিয়া চললো। তারপর খুব শান্তভাবে গিয়ে হাজির হোল বরুণের বাসায়। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে লক্ষ্য করলো অরুণ, বরুণের চেহারা-কে-চেহারাই পালটে গেছে। পিছনটা মোটা আর হাত-দুখানা মোটা আর ভারী। গালে কিছু মেছেতা দেখা দিয়েছে আর বরুণের অমন সুন্দর চোখদুটো যেন গোলালো আর লাল। এ কি চেহারা হয়েছে বরুণের! অরুণকে দেখে বরুণও অবাক। বিশীর্ণ মুখে ক্লান্তি আর বিষাদ স্পষ্ট। কপালে দু'তিনটে ভাঁজ পড়েছে। কথা বলছে যেন চিঁ-চিঁ করে। —কিরে, টি-বি-তে ভুগছিস নাকি? ব্যাপার কি? বিয়ে করেছিস, বউ বুঝি পাত্তা দিচ্ছে না? প্রেম করতে গিয়ে মেয়েমানুষের মার খেয়েছিস না কি?

আরে রাম! রাম! বরুণের কদর্য কথাগুলো শুনে তখুনী উঠে যেতে ইচ্ছে হোল অরুণের। তবু না, উঠবে না। বরুণ ওর বন্ধু। সে পাঁকে পড়লে তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অরুণ মুখটা খুব মারাত্মক গম্ভীর করে তাকাল। বললে,—ও সব কথা ছাড়ো। তারপর যুদ্ধে গিয়ে মানুষের কিছু উপকার করতে পারলে?

—উপকার! হো হো করে হেসে ওঠে বরুণ, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে। যুদ্ধে আবার উপকার কিসের রে! হোলসেল অপকার। কে কার কত অপকার করতে পারল তার ওপরই তো সব কিছু চলে। যাক গে, কি খাবি বল? পরোটা কাবাব, না ভাত মাংসের ঝোল? বলতে বলতে পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ ঘোরাল বরুণ। অরুণও। দেখল, একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। পাতলা শাড়ি ভেদ করে যৌবনের সব চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মাংসল হাতদুখানা আঁটসাঁট চামড়ায় মোড়া। তাতে আরও স্পষ্ট চোখে পড়ে তার অটুট যৌবন। ডাঁসা পেয়ারার মত শক্ত অথচ শাঁসালো মেয়ে বাঙালীর ঘরে বড় একটা চোখেই পড়ে না। রঙ একটু ময়লা কিন্তু খয়েরী চোখের তারা যেন ময়লা রঙকে উগ্র করে তুলেছে। তাকালো অরুণ। চোখ নামাতে পারলো না। না, চোখ আটকে গেছে মেয়েটির শরীরের বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গে। অরুণের বিশীর্ণ মুখ মুহূর্তের জন্যে রক্তাভ হয়ে উঠলো। শরীরটা যেন ঝাঁকানী দিলো কয়েকবার। কাণ দুটো গরম হয়ে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মনটা হায় হায় করে উঠলো। ছি, ছি, এমনভাবে মেয়েমানুষের দিকে সে কি করে তাকাতে পারলো! নারী তার ভোগ্য নয়। আর কোনদিনই ভোগ্য হতে পারে না। এই মুহূর্তের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? কেন তার এমন আকস্মিক স্খলন হোল?

—আরে এই যে রাণী! এসো। আমার বন্ধু অরুণ। বরুণ তাকালো অরুণের দিকে। অরুণ আর কোনমতেই মুখ তুলতে পারছে না। মুখ তুলতে হবে ভাবতেই ভয়ে ঘেমে উঠেছে অরুণ।

—তা হলে কি রান্না হবে? মেয়েটির জিজ্ঞাসা শুনল অরুণ। বরুণের উত্তরও শুনল।

—ভাত আর মাংস করো, কি বলিস অরুণ?

অরুণ একটা কথাও বলতে পারছে না। মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। একটু পরে পায়ের শব্দে বুঝল মেয়েটি চলে গেছে।

বরুণ বললে, কি-রে, তুই একেবারে হেডমাস্টারের সামনে ছাত্রর মত গোঁজ হয়ে রইলি কেন? কি হোল তোর? ও ভাবছিস, এমন একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করলুম কি করে? দূর গাধা, বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। ওটাকে জোগাড় করে এনে রেখেছি। চিটাগাংয়ে থাকবার সময় দেখতুম, মেয়েটা ইয়াংকী সৈন্যদের কাছাকাছি ছুকছুক করে ঘুরছে। ও ব্যাটাদের দৃষ্টি পড়বার আগেই সরিয়ে নিয়ে রাখলুম একটা ঘরে। মেয়েটা খুব গরীব আর কি। পরে শুনলুম চিটাগাংয়ের জেলেদের মেয়ে। জেলের মেয়ে না হলে অমন শরীরে বাঁধন হয়। যাই বলিস, মেয়েমানুষের যৌবন যদি বলিস, রাণীর মত অমন যৌবন হাজারে একটা মেলে না। আসবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এলো। যাক। মদটা-আশটা খেয়ে যখন বেসামাল হই, তখন রাণীর মত জাঁদরেল মেয়ে বলেই সামলাতে পারে। আমাদের চাকুরে ঘরের ফিনফিনে মেয়ে হলে ফিটের ব্যামো হয়ে যেতো। বলে জোরে হেসে ওঠে বরুণ।

অরুণ তখন দরদর করে ঘামছে। এক মুহূর্ত বসতে পাচ্ছে না আর। উঠে পড়ল অরুণ। তাকালো বরুণের দিকে। কোনমতে বললে,—শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আজ চলি ভাই। আরেকদিন আসব। আচ্ছা, চললুম। বরুণকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে অরুণ সেদিন চলে এলো। চলে তো এলো। কিন্তু আসবার পর থেকে বরুণের ওপর ঘৃণায় আর রাগে ও যেন জ্বলতে থাকলো দিন রাত। দিনটা তো তবু কাটে, রাত্তিরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বরুণের থুম্বো থুম্বো চেহারাটা। আর, আর ওই মেয়েটা। মূর্তিমতী কামের মত মেয়েটার প্রত্যঙ্গগুলো কি জঘন্যভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর কল্পনায়। কামনার কালি আর লালসার লালা দিয়ে যেন তৈরী মেয়েটা। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন সব মেয়ে কেন থাকে। দেশ তো স্বাধীন হোল বলে, এখন এ ধরনের মেয়েগুলোকে জেলে পুরে দেয়া যায় না? নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায় না? ইস্! কি অপবিত্র! কি ঘৃণিত! বরুণকে মনে পড়লেই মেয়েটাকে মনে পড়ে। বরুণ ওই নরম মাংসল দেহটা থেকে কি আনন্দ পায়!

কি জঘন্য আনন্দ! জেলে দেয়া উচিত! চুলোয় যাক। এ সব আর ভাববে না অরুণ। নরকে যাক বরুণ! নরকে যাক মেয়েটা! আর কোন সম্পর্ক রাখবে না অরুণ। ও সব মেয়ের কথা ভাবাও পাপ। আর পাপ করতে সে রাজী নয়। তবু ঘুম হতে চায় না। বরুণের ওপর রাগে, ঘৃণায়।

তৃতীয় রাত বিনিদ্র কাটাবার পর মত বদলায় অরুণ। সে আর একবার বরুণের বাসায় যাবে বলে স্থির করে। এ সংকল্পের পেছনেও একটা ভয় কাজ করেছিল। দুদিন রাত্রে ঘুম না হবার পর ওর ধারণা হয়েছিলো যে ও একটা ব্যাপারে একটু অন্যায় করে ফেলেছে। সেদিন ওভাবে না খেয়ে চলে আসায় বরুণ নিশ্চয়ই আহত হয়েছিলো, তাছাড়া কাজটা ভদ্রতার দিক থেকেও অন্যায়। হয়তো সেই অন্যায় বোধটুকুই ওকে স্থির হতে দিচ্ছে না। একবার দেখা করে এ অন্যায়টুকু সেরে এলেই ঘুমোতে পারবে। এমন একটা অস্বস্তিকর ভাব থাকবে না। হাজার হোক, বরুণকে ও ভালবাসে, এটা অস্বীকার করতে পারে না। সেদিন সন্ধ্যের মুখে গিয়ে পেঁছোল বরুণের বাসায়।

দোরে শব্দ করতে দরজা খুলে দিল রাণী। বরুণ নয়। কথা বলতে গিয়ে কথা আটকে যায় ওর মুখে। বোবা হয়ে যায় যেন। অরুণের চোখদুটো আপনা-আপনি নীচু হবার কথা, কিন্তু তা না হয়ে চোখদুটো আরও বিস্ফারিত হয়। এ কি বেশ-বাস! রাণীর পরণে শায়ার মত ঘাগরা আর বুকের আঁট জামার তলায় পেটের খানিকটা অংশ নিরাবরণ। একটা পাতলা ওড়না ঢেকে দোরটা খুলে দাঁড়ায় রাণী। টান-টান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অরুণ কথা বলবে কি, ওর বুকের ভেতরে গরম সীসে যেন টগবগ করে ফোটে। কি বলতে এসেছিল, কেন এসেছিল, সব যেন ভুল হয়ে যায়। সামনে দাঁড়ান রাণীর টান-টান দেহখানা ওর চোখে আর চোখ থেকে মগজে নেশার মত একটা আতপ্ত আরামের স্রোত বইয়ে দেয়।

রাণী শব্দ করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে টলতে টলতে ভেতরের দিকে চলে যায়। অরুণ একটু একটু এগোতে চেষ্টা করে। রাণীর হাসিটা যেন সশব্দ বিদ্রূপের মত ওর সর্বাঙ্গে এক গামলা গরম জল ঢেলে দেয়। জ্বলতে জ্বলতে এগোয় অরুণ। সেই বারান্দায় বসে রয়েছে বরুণ। রাণী বসেছে পাশের চেয়ারে। মুখ দুহাতে ঢেকে হাসির দমক সামলাচ্ছে, অরুণ কাছে এসে দাঁড়ায়। বরুণের হাতে গেলাস, টিপয়ের ওপর তিনটে বোতল। একটা ডিসে কিছু ভাজা-ভুজি।

বরুণ ওর দিকে তাকায়। আয়, বোস।

বরুণের চোখদুটো টকটকে লাল। কথা স্পষ্ট নয়। জড়িয়ে বলছে। রাণী মুখ তোলে, ওর ওড়না ঘাড়ের ওপর থেকে খসে পড়ে যায়। সামনের টিপয়ে একটা খাটো গেলাসে একটু বোধহয় অবশিষ্ট ছিল। খেয়ে ফেলে রাণী। খেয়েই অরুণের দিকে চোখ পড়ে; খয়েরী চোখের তারা ঝিলিক মারে। হাসতে হাসতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে রাণী। পিনোন্নত পয়োধরের ওঠানামার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় অরুণ। এ যেন স্বপ্ন রাজ্য। নরকের স্বপ্ন! কি জঘন্য, অথচ মনকে যেন টানে। হ্যাঁ টানে। আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। ধরাশায়ী হতে আর বাকী নেই অরুণের।

অরুণ জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে আসে। দরজা দিয়ে বেরোবার আগের মুহূর্তেও আবার শুনতে পায় সেই হাসি। রাণী হাসছে। নিশ্চয়ই ওকে পালাতে দেখে হাসছে।

মাস ছয়েক কেটে গেছে এর পর। এই ছ মাসে আকাশে অনেক মেঘ উড়েছে, গঙ্গায়

অনেক জল বয়েছে। আরও কত কাণ্ড হয়ে গেছে কত স্থানে। সব খবর কি আর আমরা রাখি। অরুণ বরুণের খবরও বাইরে থেকে রাখা যেত না। বাইরে থেকে খুব যে কিছু একটা বোঝা যেত তাও নয়। ওদের ভেতরেও নিশ্চয় অনেক রৌদ্র অনেক বর্ষা এসেছিল। হয়তো কিছু কিছু ঘটনাও ঘটেছিল, তা নইলে দুজন দুজনকে এমন চিঠি লিখে বসবে কেন? চিঠিদুটো দুজনই দুজনকে লিখেছিলো একই দিনে, কে জানে, হয়তো প্রায় একই সময়ে। আর সেই চিঠিদুটো ওদের জীবনকে কি করে আবার কোন পথে চালাল, সে খবর বলবার সাধ্য আমার নেই। তাই সবচেয়ে নিরাপদ ভেবে ওদের দুজনের চিঠিদুটোর হুবহু নকল তুলে দিচ্ছি। আপনারা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা যা ভাবার ভেবে নিন। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞের মত কোন মন্তব্য করার সাধ্যও আমার নেই, সাধও নেই। গল্প বলা আমার এখানেই শেষ।

ভাই বরুণ,

আজ সারাদিন ধরে ভেবে ভেবে অবশেষে এ চিঠি তোকে না লিখে আর পারলুম না। ক্ষমা চাইবার জন্যে, আনন্দ জানাবার জন্যে, নিজেকে আবিষ্কার করে কি পেয়েছি, তাই বলবার জন্যেই এই চিঠি। ইদানীং তোর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বলে শুনেছিলাম, মনও কি ভাল ছিল না? বোধহয় না। দিনকতক আগে হঠাৎ আমার ঘরে এসে তুই বসে রইলি চুপ করে, আমি কথা বলিনি। কারণ কি জানিস, তোকে ঘৃণা করতাম বলে। (অবশ্য আজ মনে হচ্ছে তোকে ঘৃণা কখনো করিনি, আসলে তোকে হিংসে করতাম। যেমন হিংসে করে ভোগী ধনী মানুষদের গরীব উপোসী মানুষরা। মুলে তারাও বলে, তারা ক্যাপিট্যালিস্টদের ঘৃণা করে। সত্যিই কি ওটা ঘৃণা, না ঈর্ষা? আর এই ঘৃণা অথবা ঈর্ষাকে মূলধন করে কেউ কি কিছু মঙ্গল করতে পারবে দেশের দশের? কি কথায় কি কথা এসে পড়ল! পলিটিক্স আমি করি না, ওসব কথা থাক। নিজের কথা যা বলছিলাম, তোকে ঈর্ষা করতুম।)

আমি কথা বলিনি দেখেই হয়তো তুইও কথা বলিসনি, মুখটা তোর সেদিনই বড় বিষণ্ণ মনে হোল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর ওঠবার আগে বললি, কিছুই ভাল লাগছে না। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললি, বুঝলাম মন তোর ভাল নেই। তখন কিন্তু বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে পাপে ডুবে আছে, হয়তো তার ভয়াবহ পরিণাম শুরু হয়েছে। আসলে তুই ইন্দ্রিয়ের যে ভোগগুলো করিস, সেগুলো যে জীবনের অতি জঘন্য কাজ, এইটে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলাম। প্রমাণ করছিলাম—কার কাছে জানিস? নিজের মনের কাছে। কেমন জানিস? একটা বাচ্চা ছেলে একটা রঙীন পুতুলের জন্যে বায়না ধরে বসলে যেমন তাকে প্রবোধ দিতে হয়, ও নিতে নেই. ওতে নোংরা মাখা, নিলে পাপ হয়। সেই রকম আর কি? আজ স্পষ্ট করে সব বুঝতে পেরে ভারী হাসি পাচ্ছে। বলি শোন, আমি একটু বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। সত্যি বলতে কি, নিজের মনকে ভাল করে না জেনে না বুঝে মন বেচারীকে চাবকে-চাবকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিলাম। তার একটা মস্ত কারণ ছিল।

ভয়। ভয় পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে যে নির্ভীক ছিলাম তা নয়। বরাবরই মনটা সূক্ষ্ম তারে বাঁধা। সুন্দরকে ভালবাসতাম। যা কিছু অসুন্দর তাকে সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু তখন তো জানতাম না, যা কিছু অসুন্দর তাকে সহ্য করবার তাকে সহজভাবে গ্রহণ করবার শক্তি অর্জন করতে হয়! তাই ভয় পেলাম। তুই চলে যাবার পর একা-একা থাকার ভয়। মা মরে যাবার পর আরও ভয়। যুদ্ধের খবরগুলো পড়ে শিউরে উঠতাম। জানোয়ারও বোধহয় জানোয়ারকে এমন করে মারে না! ভীষণ ভয় পেলাম! এ ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজতে গিয়ে যা কিছু খারাপ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। যা কিছু অমঙ্গল তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। আর সেইটে অভ্যেস করতে গিয়ে এমন একটা বাড়াবাড়ি করে ফেললাম যে নিজের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোকে অস্বীকার করতে গিয়ে বিকৃত হয়ে উঠলাম।

টাকার লালসা ছিল, জোর করে ভাবতে চাইলাম, টাকা অনর্থের মূল; অতএব চাই না। নারীর যৌবন উপভোগ করবার কামনাকে অস্বীকার করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় ভুল করে বসলাম। একটা ক্ষুধার্ত মনকে খাদ্যের অসারতা সম্বন্ধে লেকচার দিলে কি আর খিদে যায়! জ্বলতে লাগলাম। সে কি জ্বালা! তোর সঙ্গে দেখা হবার পর তোর রাণীকে দেখে প্রায় উন্মত্ত হতে বাকী রইল।

তাই হয় ভাই। পোলাও খাবার লোভ হলে পোলায়ের অপকারিতার কথা যতই ভাবো

না কেন, একটু খেয়ে না দেখলে সে লোভ যায় না। ভোগ না করে ত্যাগ করবার চেষ্টার মত মূর্খামী আর নেই। আর এ মূর্খামী যে কত গেরুয়াপরা মানুষ, করে চলেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ আমার মনে হয়, ছোটবেলা থেকে আমাদের সব এক-একটা সন্ন্যাসী স্বামীজী অথবা ত্যাগী মহাপুরুষ তৈরী করবার যে চেষ্টা করা হয়, তার চেয়ে বড় ভুল আর নেই। স্বামীজী ডজনে ডজনে ম্যানুফ্যাকচার করা যায় না। আর তার প্রয়োজনই বা কি? স্ব-ভাবই ধর্ম। প্রতিটি মানুষই যদি তার নিজস্ব ভাব নিয়ে চলে তাতে সে তার স্বভাবে পুরোপুরি বিকশিত হতে পারে। তা না করে যদি অন্য কোন মডেলের ছাঁচে নিজেকে তৈরী করতে চায়, তবে সে নিশ্চয়ই তার স্ব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়।

এ কথা কি তখন ভাবতে পেরেছিলাম! তাই তো আর একটা ভুল করে প্রায় পাগল হতে বসেছিলাম। কোনমতেই যখন তোর রাণীর যৌবনের প্রচন্ড আকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারছিলাম না, তখন রাত প্রায় নটা নাগাদ একদিন বাসায় হাজির হলাম। কি জন্যে গিয়েছি, কেন গিয়েছি, তখন স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলাম না। ঠিক একটি উন্মাদের মত গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। দোর খুলল রাণী। সেদিন রাণীর গায়ে ওড়নাও ছিল না। মুখখানা ওর জ্বল-জ্বল করছে। আর দেহ? রাণীর দেহের অটুট যৌবন যে কোন বাঙালী মেয়ের ঈর্ষার বস্তু—তোর এ কথা আজ মেনে নিচ্ছি। রাণী আমাকে দেখেই হাসতে লাগল। ভেতরে ঢুকলাম। রাণী দোর বন্ধ করে হাসতে হাসতে পিছোতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য দড়ি দিয়ে বেঁধে যেন আমাকে টানতে লাগল। তোর কথা জিজ্ঞেস করে জানলাম, তুই বাড়ি নেই। শুনলাম, তুই কোথায় গেছিস ও জানে না। তুই নাকি সকালে বেরিয়ে গেছিস আর ফিরিস নি। ও কি তবে একাই মদ খেয়েছিল? প্রতিদিন সন্ধ্যায় কি মদ খায়? জানিনে তবে সেদিন যে মদ খেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

আমি যত এগোচ্ছিলাম, ও হাসতে হাসতে তত পিছোচ্ছিল। হঠাৎ মেজের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে বেদম হাসতে লাগল। হাসির বেগে পা দুটো নাড়তে নাড়তে ওর শায়া অথবা ঘাগরাটা প্রায় হাঁটুর ওপরে উঠে এলো। মোটা মাংশল দুটো পায়ের গোছ। যৌবনের রসে সুস্পষ্ট। মনে হোল, পৃথিবীর সব সৌন্দর্য কাদা করে কোন কুমোর ওই পা দুখানা তৈরী করেছে। হাসিস না। আমার ঠিক যা মনে হয়েছিল তাই বলছি, সব সত্যি কথা বলব, একটুও লুকোব না। ও উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাসতে হাসতে যেন অস্থির হয়ে উঠল। তারপর অকস্মাৎ কি একটা যন্ত্রণায় বুক কঠিন মেজের ওপর ঘসতে ঘসতে এপাশ ওপাশ করতে লাগল। স্পষ্ট মনে হল ভীষণ জ্বালায় ও ছটফট করছে। সমস্ত শরীরে আমার আগুন ধরে গেল। নীচু হয়ে বসে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, হাসছ কেন? বলো কেন এত হাসছ?

ও এক ঝটকায় চিত হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বুকের চাপে ওর জামার বোতাম কয়েকটা ছিঁড়ে গেছে। আমার তখন কি অবস্থা আমি তোকে লিখে জানাতে পারবো না। ঠিক এমনি সময় ও হঠাৎ আমাকে দুহাতে ধরে টানল। সমস্ত দেহটা ওর আগুনের মত গরম। কি অসহ্য গরম। আবার তেমনি হঠাৎ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে বসল। আমি পড়ে গেলাম ঠিকই, কিন্তু চোখে তখন বাঘের মতো হিংস্র ভাব। নিশ্চয় আমার চেহারাটা তখন জানোয়ারের মত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। ও বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছিল আর হাসছিলো। আমি তখন ওর চেয়েও ভীষণ। আকাশ বাতাস দেয়াল কাঠের যদি চোখ থাকত, তবে তারা দেখতে পেত দুটো জন্তু কি ভয়ানক হয়ে উঠেছে!

একটা কথাও আর বলিনি। নীরবে চোরের মত তোর বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাড়িতে এসে পর পর তিনবার স্নান করেছিলাম। রাত বারোটা থেকে শুরু হোল পাপ-বোধের যন্ত্রণা। সমস্ত রাত ঘরে পায়চারী করেছিলাম। শান্তি নেই। মনে হোল আজকের পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যদি না মরি তবে আমাকে বদ্ধ পাগল হয়ে গারদে যেতে হবে। কি যন্ত্রণা আর সংশয়ের বেদনা!

রাত সাড়ে তিনটের সময় নিজে মরব বলে যখন প্রায় স্থির করে ঈশ্বরকে স্মরণ করছি, সেই সময়ই এক অলৌকিক শক্তিতে যেন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ঈশ্বরকে ডাকবার একটা অভ্যাস মাত্র এতকাল করেছিলাম, আজ কেন জানি না, প্রাণ ভরে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। মৃত্যুর আগে শেষবারের মত মনে-প্রাণে ডাকতে লাগলাম। ভগবান এ পাপের কি ক্ষমা নেই? আমাকে কি মরতেই হবে? দু চোখ ভরে জল এলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এই প্রথম নিজের মনই যেন বলে উঠল, না, পাপ আমি করি নি। আমার অবচেতন

স্বভাব আমাকে যা করিয়েছে, তা পাপ নয়। সামাজিক বোধে তা অন্যায় হতে পারে কিন্তু আত্মিক বোধে তা ন্যায়-অন্যায় কিছুই নয়।

ধর্ম মনের স্বভাবকে চেপে পঙ্গু করতে বলে না, বিকশিত করে পূর্ণ হতে বলে। সেই মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। জানিস বরুণ, আমি আবার বেঁচে উঠেছি, আর তোর জন্যেই বোধহয় বেঁচে উঠেছি। বিশ্বাস কর বরুণ, আর আমি তোকে ঘৃণা করি না। তোকে আমি ভালবাসি। আগের মতই ভালবাসি। আবার তোকে আমি আগের মত ভালবাসতে পারছি।

রেবা বলে একটি মেয়েকে ভালবাসতাম, তাকেও আবার ভালবাসতে পারছি। আজ সকালে তাকে বাসায় ডেকে নিয়ে এসেছি। তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি তাকে আমার প্রয়োজন। তুই রাণীকে নিয়ে আগামীকাল বিকেলে চলে আয়। রেবাও থাকবে।

আসিস কিন্তু। অরুণ।

প্রিয় অরুণ,

তোর জন্যে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি, তাই এ চিঠি লেখা। নিজের জন্যে এ চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; তবু নিজের কথাও কিছু তোকে বলব, শুনে নিশ্চয়ই তুই খুশি হয়ে উঠবি। প্রথমে তোর জন্যে চিন্তার কারণটা বলি।

প্রথম যেদিন তোকে দেখলাম ফিরে আসবার পর, খুব অবাক হয়েছিলাম। অস্বীকার করব না একটু ভয়ও হয়েছিলো। তোর চোখে-মুখে-কথায় হাবে-ভাবে জীবনের প্রতি কোন মমতা, কোন আনন্দ-বোধ খুঁজে পাইনি। আনন্দ বাদ দিয়ে জীবন কি করে চলতে পারে আমার জানা ছিল না, তাই তোকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, নিশ্চয় কোন প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে ঘা খেয়েছিস, পরে ভেবে দেখলাম সেটাও ঠিক নয়। তা যদি হোত, তবে তোর ভেতর একটা গভীর বেদনার ভাব লক্ষ্য করতাম—আর সে বেদনার ভেতরেও একটা আনন্দ থাকত। তা ছিল না। তোর চোখে-মুখে বেদনা-ভাবনা এ সব বিশেষ কিছুই ছিল না; বরং কিছুটা নিষ্ঠুর নীরস ভাব ছিল। আর ছিল মাঝে মাঝে আতঙ্কের চমক। এইটেই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক। তারপর তোর গোটাকতক কথায় আর ব্যবহারে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তুই যে তোর জীবনের চারদিকে এমন একটা পাথরের দেয়াল গেঁথে তুলেছিস, এ আমি ধারণাও করতে পারিনি। ছোটবেলা থেকে যতদূর জানি, তোকে দুর্বল শান্ত বলে ভাল লাগত। কখনো কোন নেয্য বা অনেয্য জেদ তোর ভেতরে আমি দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। তবে কেন এমন হোল? আমাকে জানিস, কোনদিনই বন্ধনকে আমি স্বীকার করি নি, তা সে নীতির বন্ধনই হোক, আর ধর্মের বন্ধনই হোক আর তথাকথিত ভদ্রতার বন্ধনই হোক। বন্ধন যা তা বন্ধন। আর একটা কথাও আমার মনে হয় যে বন্ধন যত দৃঢ়ই হোক না, তাতে যদি আনন্দ না পাওয়া যায় তবে সে বাঁধন নিজের মনই ছিঁড়ে একদিন টুকরো টুকরো করে দেয়।

কোনদিন বাঁধন মানতে চাই নি। যুদ্ধে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার পরিশ্রম আর ভয়াবহতা আমার মনকে ক্রমে আনন্দ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। কি করে আনন্দ পাওয়া যায় এ সন্ধান চিরদিনই করেছি। তাই তখন দেখলাম, মদ খাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই। মদ খেলাম। প্রচুর মদ খাই। তখনই আমি জানতুম, মদ খেয়ে আনন্দ পাবো না এমন একটা সময়ও আমার জীবনে আসবে, তখন আর মদ স্পর্শও কোরব না। রাণীকে জোটালাম। জেলের মেয়ে দুর্ধর্ষ যৌবন ওর। ওই যে বললাম, আনন্দ। রাণীর যৌবন দুরন্ত আনন্দ দেয়। জানি এ আনন্দ জীবনের সম্পদে টিঁকে থাকে না। নাইবা থাকল, যখন ভাল লাগবে না, ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

মনের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে চাইনি। তার কারণ, আমি জানতুম সকলের মন একরকম নয়, তাই সবাইতেই যে একই জিনিসে আনন্দ পেতে হবে এমন কোন কথা জোর করে বলা মূর্খামী। তাতে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যেন একটা অতি লোভী মনকে জোর করে জেলখানায় বন্ধ করে ভাল করবার চেষ্টা করা। আসল কথা, ভোগ না হলে ত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভোগ না করে ত্যাগ করবি কি? যার বহু ভোগের বস্তু রয়েছে, সেই ত্যাগ করবার কথা চিন্তা করতে পারে। টাকা থাকলে তবে তো টাকা ত্যাগ করবার প্রশ্ন ওঠে, যে দীনদরিদ্র তার টাকা ত্যাগ করবার কি অর্থ হয় আমি জানি না। তার বরং অর্থবানের ওপর ঈর্ষা ঘৃণা এগুলো জন্মাবেই। সেই পরীক্ষায় পড়ে তুই হেরে গেলি। প্রথম দিনই রাণীর

দিকে তুই যেভাবে তাকালি, তাতে আমি অবাক হলাম। তোর চোখে যা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেটা যাচাই করবার জন্যে রাণীকে সেইদিনই জিজ্ঞেস করেছিলাম,—বন্ধুটিকে তোমার কেমন মনে হোল? ও বেধরক হেসে বললে,—চোখ দিয়ে যেন আমায় গিলছিল।

পুরুষ সম্পর্কে রাণীর মতামত অব্যর্থ সত্য হয়ে থাকে, এ আমি আরও বহুবার দেখেছি। তাই বলছিলাম, অবাক হলাম, চিন্তিত হলাম। তুই যদি আমার রাণীর সম্পর্কে তোর মনের ভাব প্রকাশ করতিস, তবে তাতে আমার কোন আপত্তিই থাকত না। রাণী তো বিয়ে করা বউ নয়? আবার জিজ্ঞেস করলাম,—আর কি মনে হয় তোমার? ও একটু ভেবে বলল,—মনে হয়, তোমার বন্ধুটিকে দিয়ে পায়ের ধুলো চাটিয়ে নিতে পারি। কাণ ধরিয়ে ওঠ-বোস করাতে পারি। একটু ভেবে বলল,—কিন্তু তোমাকে দিয়ে পারি না। আজও পারলাম না। সে কথা যাক।

তোর কথা ভেবে মনটা বড়ই খারাপ লাগল, সেদিন প্রচুর পান করলাম। তোর জন্যে মনটা যত খারাপ লাগছিল, রাণীর দেহটাকে আমার ততই কদর্য মনে হচ্ছিল। কোন আনন্দ পাচ্ছিলাম না।

তারপর আরও কয়েকদিন তোর অবস্থা দেখে মনে মনে ভারী বেদনা পেলাম। তোকে ভালবাসি, তোর এমন একটা বন্দী অবস্থা আমার অসহ্য লাগছিল। মদ খেতে খেতে বোতলের পর বোতল খালি হয়ে গেল। এ কদিন প্রচুর পান করেছি আর ভেবেছি, এর জন্যে এত তাপ! আহা-রে, অরুণটা উপোস করে করে মরে গেল, আর আমার কিনা অরুচি ধরে গেল?

এই সামান্য সব স্ফূর্তি আনন্দে আমার যখন অরুচি ধরে এলো, তখন তোকে হয়তো গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তাও কি পেরে উঠবি? এ সব বস্তু আর আমাকে আনন্দ দিতে পারছে না। এ খবরটা তোর কাছে সুখবর হবে নিশ্চয়ই। তারপর তোর কথা শোন।

রাণীকে একদিন বললাম, অরুণকে একটু খুশি করো। ওটা ঝিমোতে ঝিমোতে মরে যাবে। রাণী প্রথমে একটু আপত্তি জানালেও রাজী হোল। তারপর সেদিন সন্ধ্যায় আমার অবর্তমানে যা ঘটেছে সবই আমাকে রাণী বলেছে, আর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েছে। আমিও হাসলাম, ভাবলাম ভালই হোল। কিন্তু পরমুহূর্তে তোর জন্যে ভয় হোল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি, তুই এ ব্যাপারটা এত সহজভাবে নিতে পারবি না। তোর কাছে নারীসঙ্গ ভয়ানক গুরুতর একটা ব্যাপার। আমাদের দেশের অনেকের কাছেই তাই।

সংসারের সবচেয়ে সাধারণ সহজ আর অবশ্য যে ব্যাপারটা তাকে নিয়ে মানুষের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা, নীতিবাগিশী বক্তৃতার অন্ত নেই। আমার তো ভাবলে হাসি পায়। এমন সংকীর্ণ ছোট মন নিয়ে ধর্ম-কর্ম, ন্যায়-নীতি কিছুই হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, যা কিছু গোপন, তাই পাপ। আর পুরুষ মেয়ের এমন একটা দৈনন্দিন সহজ সম্পর্ককে গোপন করতে করতে মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। আর পাপ-পাপ বলতে বলতে চোয়াল ব্যথা করে ফেলছে। এরা করুণার পাত্র! জানি সমাজে এগুলোর প্রয়োজন কিছু পরিমাণে আছে, কিন্তু আমার কাছে নেই। ধর্মের সংগে এসব সামাজিক ব্যাপারগুলোর সম্পর্ক সবচেয়ে কম। যে ভাব যে মানুষকে ধারণ করে আছে, তাই তার ধর্ম। তার বিপরীত সবকিছুই অধর্ম।

ধর্মের কথা বলবার আমার কি অধিকার জানতে চাইবি। এ কথা বলবার অধিকার তোর চেয়ে বোধহয় আমার বেশী। আমি আজ স্পষ্ট বলতে পারছি, মদ খেতে আমার ভাল লাগে না। নারীসঙ্গ আমার ভাল লাগছে না। আমি আরও অন্য আনন্দের সন্ধান করবো বলে স্থির করেছি। এ সব ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছি। একা থেকে আনন্দ পাচ্ছি। তোদের ভাষায় একটা বৈরাগ্য এসে উপস্থিত হয়েছে আমার মনে আর তাতে আনন্দ পাচ্ছি। ত্যাগের আনন্দ কি সেটা আমি আজ যতটা বুঝতে পারছি, তুই কি করে তা বুঝবি? তোর ভেতরে যে ভোগের লালসার ঘা দগ্‌দগ্‌ করছে। রাগ করিস নে, যা সত্যি তাই বললাম। আমি আগামীকাল কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি, এখন জানাব না। কেন যাচ্ছি, তার কিছুটা জানালাম। পরে যদি নিজের আনন্দকে আরও পূর্ণ করে তুলতে পারি, সেদিন জানাব।

তোকে অনুরোধ করছি, তুই আর কিছু না পারিস একটা বিয়ে কর। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিসনি, তোর মা থাকলে আমার মতই তোকে বিয়ে করতে বলত। বিশ্বাস কর, তোর ভাল হোক, এ আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে চাইছি। এর ভেতরে একটুও ফাঁক নেই। দাদাদের কাউকে কিছু জানালাম না। তাঁরাও তোর মত জানে আমি একটা পাষণ্ড হয়ে গেছি। তুই যদি পারিস, তাদের আমার কথা বলিস। কিই-বা বলবি। বলবি, বরুণ চলে গেছে। কোথায়

চলে গেছে সে কথা আর বলবি কি করে? সে কথা তো তোকেও এখন বলব না। পরে যদি প্রয়োজন মনে করি জানাব।

শেষ কথা বলি, বেশ কিছুকাল ভাল চাকরি করে খরচ করেও কিছু টাকা রয়ে গেছে। রাণীকে হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে আমার এক সহকর্মী অফিসারের জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। মানুষটি ভাল। রাণীকে ভালবাসবে। আর বাদবাকী প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার টাকা একটা ইনসিওর করা খামে তোকে পাঠাচ্ছি, তোকে নিতে হবে। তোর বিয়েতে আমার উপহার বলেই না হয় গ্রহণ করিস। আবার জানাচ্ছি, আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোর মঙ্গল কামনা করি।

ইতি— বরুণ।

ভাবগত অর্থে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা আন্দোলনহীন। কবিরা এখন আর কোন সমবেত চিন্তার মাত্রাবন্ধনে পরস্পর যুক্ত নন, কোন সমবেত ধ্বনির অন্তর্নিহিত নন। সীমাশ্রয়ী ব'লে আন্দোলন কিছু পরিমাণে আত্মক্ষয়ী হ'তে বাধ্য, কিন্তু তার অন্তর্গত উৎসাহ বড় কবির অভাব অনেকাংশে পূরণ করে। যুগসম্ভাবনা শোষণে প্রধান কবিরা অগস্ত্যবংশজাত। অপ্রধান কবিরা তা না হ'লেও আন্দোলনযুক্ত হ'য়ে মিলিত তৃষ্ণায় সমুদ্রশোষণ করতে পারেন। সুতরাং বর্তমানকালে, যখন কোন প্রধান প্রতিভা লক্ষ্যগোচর নয়, তখন ভাবগত আন্দোলন অবশ্যই কাম্য। এ কথা বলাই বাহুল্য যে চিন্তার ভূমিপরিবর্তনের ফলেই প্রকৃত আন্দোলন জেগে ওঠা সম্ভব এবং ভাবগত আন্দোলনই সম্পূর্ণ আন্দোলন।

সাম্প্রতিককালে চিন্তার কোন পীঠস্থান পরিবর্তিত হয়নি। কিছুদিন পূর্বের সাম্যবাদী দর্শনের উপলব্ধি এখন নানাকারণে অপ্রখর এবং অস্বচ্ছ। তখন যে নতুন চিন্তা উদ্ভিন্ন হয়েছিল বাংলা কবিতা এখনো তার কিছু ফলধারণ করছে বটে, কিন্তু তাও প্রায়শঃই অপ্রত্যক্ষভাবে। সেই আন্দোলনের ফলেই একালের কবিতা স্বভাবতঃই মানুষ এবং সমাজের অনেক বেশি নিকটবর্তী, অনেক বেশি জীবনলগ্ন। দৃষ্টিভঙ্গির এই গূঢ় গঠন উত্তরাধিকার-বলে এখনো নিঃশব্দে অবস্থান করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কবিরা নিজস্ব রূপাভিসারের দিকেও অগ্রসর হয়েছেন। সাম্যবাদী আন্দোলনকালীন বহির্মুখিতার দাবী অবসিত হ'লে কবির ব্যক্তিসত্তা আবার কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট, তাঁর নিজস্ব কথা, এমনকি নিছক ব্যক্তিগত কথাও, পূর্বের মত আর অপরিবেশনীয় নয়। প্রায় সব কবিই বর্তমানে তাঁদের নিজস্বতাকে নির্মাণ ক'রে সমবেত ধ্বনি থেকে নিজেদের অসম্পৃক্ত করেছেন। ফলে তাঁদের কবিতার ব্যাখ্যায় কোন একক সূত্র আর অবলম্বনীয় নয়। একমাত্র তাঁদের নিজস্ব সূত্রই সেক্ষেত্রে সম্যক আলোকপাত করতে পারে।

এ ঘটনা পূর্ববর্তী আন্দোলনের ক্ষয় থেকে উৎসারিত, তার প্রতিক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত, যদিও একই সঙ্গে সে আন্দোলনের মনীষা একালের কবিতা এখনো ধারণ করছে।

কবিরা সমবেত থেকে নিজস্ব হয়েছেন। সুতরাং স্পষ্টতঃই কেউ আর আন্দোলনে ইচ্ছুক নন্ বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য আন্দোলনহীন হলেও তরুণতর কবিদের রচনা বিশিষ্ট এবং সমবেত লক্ষণহীন নয়। এই বৈশিষ্ট্য প্রধানত প্রাকরণিক—শব্দ এবং ধ্বনি সম্বন্ধীয়। যেমন ধ্বনি বা বিষয়ের সৌকুমার্য, মসৃণতা, লাবণ্য প্রভৃতির প্রতি অনীহা, শব্দ নির্বাচনে সংস্কারহীনতা, কাব্যের আধার নির্বাচনে মুক্ত মানসিকতা, অত্যধিক 'স্মার্টনেস' ইত্যাদি। এ-সব লক্ষণ তরুণতর কবিদের একটি বৃহৎ অংশের রচনায় অনায়াস-লক্ষ্য এবং সেই সঙ্গে অন্তরালবর্তী প্রচ্ছন্ন জেদও পরিস্ফুট। যেন ইচ্ছে করেই, জেনে-শুনেই, পরিণতিচেতন হয়েই তাঁরা এসব করছেন। জেদ সর্বদা বিশ্বাসসূচক না হলেও এক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্বাস অপরিসীম ব'লেই মনে হয়। জেদের কারণ হয়ত কবিদের অতি-প্রখর আত্মসচেতনতা অথবা পূর্ববর্তী আন্দোলনের ক্ষতোৎসারিত ক্রোধ। কিংবা তাঁরা বাংলা কবিতার সংস্কারাশ্রয়ী বিন্যাসে বীতরাগ। অথবা এই সব কথারই জটিল স্রোতোরেখা

তাঁদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে। কারণ যাই হোক্, তার উপরোক্ত ফল আমাদের হাতে পৌঁচেছে।

এরই পার্শ্ববর্তী ধারা অতিরোমাণ্টিকতায় (সাধারণ অর্থে), অতিলালিত্যে আচ্ছন্ন। এমন তরুণ কবিও রয়েছেন যাঁদের কবিতায় এই দুই চরিত্রই সন্নিবিষ্ট, যদিও তার সমাহার ঘটেনি। তাছাড়া কিছু কবি কেবলই অতিলালিত্যের অস্থিহীন তারল্যে ভাসমান। যে অর্থে মৃতদেহ বিকৃত এই ধারাশ্রয়ী কবিতাও সেই অর্থে বিকৃত। কেননা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রোথিত উদ্ভিদ নয়। সুতরাং মৃত, প্রতিভাহীন। কবি হিসেবে এ'রা সৎ নন্, কবিতা হিসেবেও এ'দের কবিতা আলোচ্য নয়।

প্রথম ধারার কবিতায় নতুনত্বের প্রয়াস যে সদ্যোজাত তা নয়; পূর্বজ ধ্যান থেকে, রূপ-চিন্তা থেকে, প্রধানত জীবনানন্দ দাশের কাব্যধারা থেকে উৎসারিত যদিও ভঙ্গিটা সদ্যোজাতকের, অনন্যপূর্বের। জীবনানন্দ দাশ ছাড়া তিরিশের অন্য দু'একজন কবিকেও তাঁরা আশ্রয় করেছেন, যেমন বিষ্ণু দে ও সমর সেন। তফাৎ অবশ্য একটু আছে। তরুণতর কবিদের কাব্যে এসব প্রয়াস অত্যন্ত প্রবল, সম্পূর্ণ সচেতন এবং এসবের মধ্যেই বিপ্লব-সন্ধানী। এই বিশেষ বিভাগের মধ্যে তাঁদের মনোযোগ আমূল বিদ্ধ, অনুশীলন একাগ্র। রহস্যসন্ধানে জীবনানন্দ দাশের গভীর থেকে গভীরতর বিন্দুতে ভ্রাম্যমাণতার ইঙ্গিত তাঁদের কবিতায় নেই, চিন্তার দৃশ্যগত বুননে তাঁর পূর্বইতিহাসহীন অপরিসীম নৈপুণ্য এ'দের কবিতায় অনুপস্থিত—অন্তত তার পরিচয় এখনো আমাদের কাছে লভ্য নয়—কিন্তু ভিন্ন মানসিকতার সংরাগী হয়েও এ'দের অনেকে জীবনানন্দের কথনভঙ্গিকে আশ্রয় করেছেন। তার মধ্যে প্রধানত চমকসন্ধান করেছেন।

পূর্বোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি—

দু-জন ছাত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে তিনজন বিশুষ্ক কেরাণি
ভিন্নরূপে ফিরে পায় কান্তিমান কৈশোর শৈশব,
উত্তেজক স্মৃতিপুঞ্জে আঙুরের আরকের মতো,
নিঃশব্দে পোড়ালো তারা মৃত্যুহীন সময়ের শব।
সস্নেহে পকেটে পুরে পাঁচখানা অচল দুয়ানি
প্রাণ ভ'রে হেসে নিলো বাতাসের সঙ্গে অবিরত।

(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

নিজস্ব বুকের শব্দে জলপ্রপাতের শব্দ অনুভব ক'রে
পার্শ্ববর্তী কক্ষ থেকে রমণীরা চ'লে যায় দূরের শহরে।

(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

ভালোবেসে সুখ ছিলো, ভালোবেসে দুঃখ কি ছিলো না?
মহিলা বাসিবে ভালো, আমিও তো বাসিব তাহারে
ভালোমন্দ কিছু এক?

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

কমলালেবুর প্রতি খাওয়া ভালো। বহুদূর হতে

উহাদের ব্যবসায় শুরু হয়, ক্রমশঃ মেধায়
রক্তের চাপের ফলে তালকানা-হওয়া থেকে ওই
কমলাফলের হেতু ভেসে উঠি, জ্বরোভাব কাটে।

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

ভালোবাসিলেই দুঃখ। ভালোবাসে জনসাধারণ
কেননা, ওদের আছে ভুলিবার অসীম ক্ষমতা।

(পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

রোঁয়া ওঠা কুকুরের সাহচর্যে গ্রীষ্মের গোধূলি
হয়ত লাগবে ভালো।

(শামসুর রাহ্‌মান)

শবাধারে নষ্ট ফুল, জরায়ু গভীর থেকে ডিম্বের পুতুল
ক্ষোভে আর্তনাদে ভাঙে, রক্তের চীৎকারে কেঁদে ওঠে।

(দিব্যেন্দু পালিত)

এই ধারার কবিদের কাব্যে সাধারণত জীবন সম্বন্ধে তীব্র তিক্ততা প্রকাশিত। তার নেতি-বিন্দু অবশ্য কোন অস্তিবাচক সিদ্ধান্তের অভিসারী নয়। শুধু বঞ্চিতের, দারুণ ক্ষোভের, ক্ষয়ের আর্তস্বর। সৌন্দর্যের দিকে, সুষম রম্যতার দিকে যে তাঁরা একেবারেই দৃষ্টিপাত করেন নি তা নয়, কিন্তু সাধারণ অর্থে অসৌন্দর্যের দিকে, বিকলাঙ্গ কুশ্রীতার দিকে, জঞ্জালের দিকেই তাঁরা প্রবলভাবে আকর্ষিত। জীবনবিন্যাসের গূঢ় অর্থ হয়ত তাঁরা তার মধ্যেই খুঁজছেন এবং কোন কোন কবি তার নিম্নস্তরবাহী পঙ্কিল স্রোত কবিতার শিরায় রক্তে চালনা করছেন। এর ফলে সৎ কবিতা সৃষ্টি হতে পারে না এ সিদ্ধান্ত তর্কাধীন, কিন্তু বাংলা কবিতা এই পরীক্ষার ফলে কিছু লাভবান হয়েছে ব'লে মনে করার কারণও এখন পর্যন্ত ঘটেনি। এবং যতদিন না ঘটছে ততদিন এই পরীক্ষায় সৎ কবিতা সৃষ্টি হতে পারে এ সিদ্ধান্তও তর্কাধীন থাকবে। সৃষ্টি করেই প্রমাণ করতে হবে, প্রমাণ করার তাছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

এ প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত হ'তে একবার জনৈক অগ্রজ কবি তরুণতর কবিদের প্রচণ্ড সাহসের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নিবেদন করেছিলেন। সাহস জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কবিতার ক্ষেত্রে কোন কবি সাহসের পরিচয় দিলে তাকে অভিনন্দন জানান অন্যান্য কবি এবং পাঠকমাত্রেরই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। কিন্তু সাধারণ সাহস এবং কবিতার সাহসের মধ্যে চরিত্রগত তফাতের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। যে কোন ধরনের সাহসই কবিতার কাজে লাগে না। কোন কবি রাবণের মত রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হতে পারেন. কিন্তু দেখতে হবে তাঁর সাহসিকতায় কবিতা লাভবান হচ্ছে কিনা। কবিতার সাহসেব নিদর্শন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ। কবিতার সাহস মানে অবশ্যই যদৃচ্ছ আচরণ নয়, তার সঙ্গে সার্থক সৃষ্টির প্রশ্নও জড়িত।

মৃগাঙ্ক রায়

এক তরুণ কবির বইয়ের ভূমিকায় একটি খেদোক্তিতে এসে চোখ থামলো : 'বাংলাদেশের কবিদের দল ভাঙাগড়ার ফল আমাকে পেতে হল;' কারণ তাঁর অনেক কবিবন্ধু অধুনালুপ্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বহু কবিতা সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষঃ পর্যন্ত নাকি কথা রাখেন নি। উক্ত কবিও আমার ধারণা, নিশ্চয়ই কোন না কোন দলভুক্ত। কারণ শুনতে পাই বাংলাদেশে শিক্ষিতদের দুই তৃতীয়াংশ কবি, এক-তৃতীয়াংশ কোন না কোন সময় কবিতা লিখতেন এবং নিয়মিত কবিদের প্রত্যেকেই নাকি এক একটি দল। জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে হয়ত তাঁর মত পরিবর্তন করে লিখতেন : 'সকলেই কবি, কেউ কেউ কবি নয়।'

'কবি নয়'-এর মধ্যে যাঁরা পড়েন তাঁরা ভাগ্যবান। একজন তথাকথিত প্রতিষ্ঠাবান (কোন কোন সমালোচকের ভাষায় 'প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন') তরুণ কবির খেদোক্তিতে এ কথা এখন আরও বেশি মনে হচ্ছে। তবে অসংখ্য দল হলেও কবিতা লেখার ব্যাপারে কবিরা কিন্তু প্রত্যেকেই পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কবিতার কায়াগঠনে বিষয়বস্তুতে কথনে উচ্চারণে স্বরূপ যমজ সম্পর্কে অন্বিত। প্রায়শঃই কোন কবিতা কার রচিত নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

অথচ তরুণ বা তরুণতর কবিদের মধ্যে ক্ষমতার অভাব আছে বা তাঁদের রচনার মধ্যে দু চারটি পংক্তি স্মরণীয়ভাবে দ্যুতিত হয়ে ওঠে না এমন নয়। চিত্ররচনায় বা উপমাবয়নে তাঁদের কৃতিত্ব দুর্লক্ষ্য নয়, বক্তব্যের পরিবেশনেও তাঁদের মুন্সিয়ানা পরিদৃষ্ট হয়। ইতস্ততঃভাবে বর্তমান বইগুলি* থেকেই কয়েকটি পংক্তি বা কবিতাংশ তোলা যাক—

রাস্তায় আমার যেতে মনে হয় দুধারের বাড়ি
মস্ত উঁচু ডাঙা, আমি ছেঁড়া ফুল ভাসি জনস্রোতে

(অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, পৃ. ৬০)

ভয়ের এ মুখ সাহসে সহাস মুখোসে করেছি বন্ধ

(ঐ, পৃ. ৩০)

শালশিরীষের ফ্রেমে বাঁধানো এ গ্রাম
নির্জন ঘুমের মতো

(ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল, পৃ. ৪০)

স্নিগ্ধ নিবিড় মুখের মতো সবুজ দ্বীপের মুগ্ধ মায়ায়

(ঐ, পৃ. ২৮)

দু দিকে জানালা, মধ্যে অন্ধগলি
ধোঁয়া পাক খায় সন্ধ্যার নিশ্বাসে

(কয়েকটি কণ্ঠস্বর, পৃ. ১৫)

---

*ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল—সুনীলকুমার নন্দী। কোয়ার্টেট। কলিকাতা ১৯। ২·৫০
অন্ধকার উদ্যানে যে নদী—তরুণ সান্যাল। কবিপত্র। কলিকাতা ২৬। ২·০০
কয়েকটি কণ্ঠস্বর—মণিভূষণ ভট্টাচার্য। কবিপত্র। কলিকাতা ২৬। ২·৫০

সব স্মৃতি ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
(ঐ, পৃ. ৩০)

এই ধরনের আরও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারত। কিন্তু বর্তমান কবিদের সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, এ'দের বক্তব্য মোটামুটি এক, বক্তব্য পরিবেশনের ভঙ্গীও প্রায় একই রকম; একই ধরনের বক্তব্য একই ধরনের ছন্দে—পয়ারে—পরিবেশন, একই ধরনের চিত্র এমন কি কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দের প্রতি সমান আসক্তি লক্ষিত হয়। সুনীলকুমার নন্দী সম্পর্কে 'কবিপরিচিতি'তে বলা হয়েছে তাঁর কবিতাগুলিতে 'একটি ব্যথিত অথচ অবিচলিত সুস্থ আধুনিকতার প্রতিলিপি মিলবে।' কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতায় যে-আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা আর যাই হোক সুস্থ নয়। উদাহরণ, 'প্রতিমা' (গ্রন্থের চতুর্থ কবিতা) থেকে জানা যাচ্ছে গাঁয়ের একটি মেয়ের মস্তিষ্ক-বিভ্রম হয়েছিল, সে তার বহু 'পরিশ্রম দিয়ে গড়া সোনার সংসার আর প্রতিমার সমস্ত সম্মান ডুবিয়ে' শেষে 'পড়ন্ত যৌবনে এসে যৌবনের লম্পট তুফানে' নাকি এক অর্বাচীন যুবকের ডাকে ভেসেছিল; অবশ্য কবির মতে সেই যুবক তাকে শেষ পর্যন্ত 'শান্তির পবিত্র তীর্থে' নিয়ে যেতে পারে। 'নীলকণ্ঠী' (ষষ্ঠ কবিতা) কবিতার নায়িকা কয়েকটি যুবককে শিকার করে 'সারা চোখে মুখে' 'কামুক ছোবল চিহ্ন' নিয়ে 'এ'দো গলি ঘরে' ফিরে যায়। 'লোকটি' (দশম কবিতা) কবিতার লোকটিও 'প্রতিমা'র মতো একদিন 'যৌবনজ্বালা'য় কাতর হয়েছিল। উল্লিখিত পংক্তিগুলিতে আধুনিকতা স্পষ্ট, কারণ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিই কঠোরভাবে সত্য। আজকের সমাজ-সংসার কোন গভীর বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর আর দাঁড়িয়ে নেই, দীর্ঘদিন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার পরও স্ত্রী নতুন স্বামীর জন্য ব্যাকুল হয়, জীবনযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য মেয়েদের দেহ বিক্রীও করতে হয়। কিন্তু এইটিই কি একমাত্র সত্য? এই আধুনিকতাই কি 'সুস্থ' আধুনিকতা? অন্তত 'সুস্থতা' সম্পর্কে আমাদের ধারণার মানদণ্ডে এ আধুনিকতা সুস্থ কিছুতেই নয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মন তখনই কৌতূহলী এবং চিন্তিত হয়, যখন দেখি সুনীলকুমার নন্দীর মতো কিন্তু তাঁর চাইতে বেশি তরুণ সান্যাল এই 'আধুনিকতা'য় একান্তকেন্দ্রিত। প্রমাণ—

প্রসাধন সাঙ্গ করে
একক কঙ্কনে কিংবা হাতঘড়ির দুর্বল ডায়ালে
আমার জীবন যৌন যৌবনের কাল মাপো...
এসো যৌনতায় যৌবনে
(অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, পৃ. ১০)

আমার চোখের সামনে তুমি কী বেহায়া
কী নির্লজ্জ স্বর্ণজানু, ভেজা অন্তর্বাসে
ঠেলে উঠছে সাদা
(ঐ, পৃ. ২৮)

আমার কামাতুর কালো রক্তে
(ঐ পৃ. ২৯)

চিনে নিতে চাই বিগত দিনের সুখী
কিশোর পৃথিবী যৌনজড়িত মনে...
শেষ সিগারেটে লাম্পট্যের ঝোঁকে
দীর্ঘ চুমোয় সাজি রতিসজ্জায়
(ঐ, পৃ. ৩৪)

বিলাপের (?) হয়ো না মৌন দেহে নেই সতীত্বের চাবি
(ঐ, পৃ. ৫৪)

রক্তমাংস মুড়ে প্রেমিক প্রেমিকা একজোড়া
রতিরঙ্গে হামা দেয় আদিম রক্তের তাপে মেতে...
(ঐ, পৃ. ৫৯)

মণিভূষণ ভট্টাচার্যও এ জাতীয় 'আধুনিকতা'য় বিশ্বাসী। তাঁর গ্রন্থের একটি অংশের নাম 'অন্ধকারের গল্প' এবং মোট পঞ্চাশটি কবিতার সংকলনগ্রন্থে 'অন্ধকার' একষট্টিবার ও 'আঁধার' বার তিন ব্যবহৃত হয়েছে; যে কোন কবির পক্ষেই এ ঘটনা দুর্বলতা বলে পরিগণ্য। এই আধুনিক 'অন্ধকার' 'শব' প্রতীক-শব্দের বহুল ব্যবহারেও ব্যঞ্জিত। আর দেহ-আনুষঙ্গিক শব্দপুঞ্জ মণিভূষণ ভট্টাচার্যের রচনাতেও অনুচ্চারিত নয়—

রেডরোডের হাওয়া গাড়ী বহুমূল্য, বুকে পণ্যা নারী
সিনেমা সাহিত্য নারী যৌনতত্ত্ব রাজনীতি গান
শেষ হলে যুবকেরা ডুবে গেলো সূর্যাস্তের রঙে,
সন্ধ্যার দ্রৌপদী দিলো পাঁচ হাতে পাঁচখিলি পান
(কয়েকটি কণ্ঠস্বর, পৃ. ৩৭)

((কৃষ্ণকান্ত বাবু)...
মধ্যরাত্রে ঘরে ফিরে বাড়ান নিরীহ স্ত্রীর শোক,...
আগ্নেয় সুরায়, ঠাণ্ডা অবসন্ন নারীর শরীরে
নিমগ্ন অস্তিত্বে তাঁর শোনেন নিজেরই কণ্ঠস্বর
(ঐ, পৃ. ৪৪)

তবে তিনি তরুণ সান্যালের মতো ঐকান্তিকভাবে 'শরীরসর্বস্ব শিল্পে' (শব্দবন্ধের কৃতিত্ব সুনীলকুমার নন্দী'র) আত্মলীন নন। দেহকে তিনি প্রয়োজনমতো স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর আধুনিকতার 'অন্ধকার' দেহকে অতিক্রম করে আরো বিস্তীর্ণ আরো গভীর হয়েছে। যুগের ক্লান্তি, নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা, মূল্যবোধের অভাব তাঁর উপলব্ধিকে সজোরে নাড়া দিয়েছে—

গঙ্গাজলে শব দেখি, কী আশ্চর্য, দেখি না স্নাতক
(পৃ. ২১)

জলস্রোত অন্ধকার জলস্রোত অন্ধকারে আমি
সূর্যোদয় দেখি না কখনো। (পৃ. ৪৬)

আমার জীবিত শব ভেসে যাচ্ছে দিকচিহ্নহীন এক সমুদ্রের দিকে ·
(পৃ. ৪৮)

মাঝে মাঝে পাই নিজের বিবেক বিক্রীর কন্‌ট্রাক্ট
(পৃ. ৬৫)

'যৌবরাজ্যে অসুখী সম্রাট' হলেও জীবনে তাঁর বিশ্বাস বিদ্যমান এবং তা দৃঢ়মূল বলেই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' (পৃ. ২৬-২৭)-এর মতো বলিষ্ঠ কবিতা লিখতে পারেন, যে কবিতায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন : 'আমরা এখনো আছি আলো আর আকাশের দেশে...আমরা মৃত্যুর কথা বলি না কখনো।' এবং 'উদ্ভাসিত জন্ম ও অনিন্দিত মৃত্যু'র মতো আর-একটি উজ্জ্বল কবিতায় জানান, কাচের আধারে ফর্মালিনে দুটি যমজ শিশু দেখে তাঁর মনে হয়েছিল শিশু দুটি 'অকাল সমাধিমগ্ন সম্ভাবিত বুদ্ধ কিংবা যিশু।' আমার মনে হয় মণিভূষণ ভট্টাচার্য দলনিরপেক্ষভাবে স্বীয় প্রত্যয় ও উপলব্ধির পথে রচনার গতি যদি অব্যাহত রেখে যান তাহলে একদিন তিনি আজকের অনেক চীৎকৃত তরুণ কবির খ্যাতি ম্লান করে দিতে পারবেন।

দলের কথা বলতেই মনে হল 'শরীরসর্বস্ব শিল্প' নিয়ে আজকের কোন কোন তরুণ কবির অতিরিক্ত মাতামাতি এবং তৎসংলগ্ন দলীয় চিৎকার। শুনতে পাই, কবিতায় যিনি যত বেশি গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করতে পারেন তিনি তত বেশি আধুনিক। এই 'আধুনিকতা'র মোহে যদি তরুণ সান্যাল পড়ে থাকেন, তা হলে তাঁর জন্য দুঃখ বোধ করব। কারণ, তাঁর প্রতি কবিতাতেই, বলতে গেলে, দেহজ লোভ উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ তরুণ সান্যাল যখন 'অবসেসড' বা বিষয়বিশেষে আচ্ছন্ন নন তখন তিনি যথার্থ-উত্তীর্ণ কবি। 'পদ্মরাগ' (পৃ. ২১), 'জন্মে জন্মে' (পৃ. ৩১), 'তরঙ্গে তরঙ্গে' (পৃ. ৪৮), 'অন্ধকার উদ্যানে যে নদী' (পৃ. ৫১), 'পুরোনো মাল্লার কথা' (পৃ. ৫৫) বা 'স্মৃতি' (পৃ. ৬২)-র মতো কবিতারচনার জন্য তিনি নিশ্চয়ই পাঠকের ধন্যবাদ পেতে পারেন।

সুনীলকুমার নন্দীও বোধ করি সচেতনভাবে পূর্বোক্ত 'আধুনিকতা'র প্রয়াসী! কারণ তাঁর কবিতাতেও 'রিরংসা', 'লম্পট তুফান', 'উরুনাভি-স্তন-স্বর্গ', 'রমণীর আসঙ্গ-আশ্লেষ' ইত্যাদির অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়, তবে তরুণ সান্যালের তুলনায় ঐ সব শব্দ তাঁর কবিতায় কম। কামনাবেগ-নির্ভর, একটু অন্য ভাষায় কখনো বা শরীরী প্রেমকেন্দ্রিক, কবিতা রচনায় তিনি যে দক্ষতা দেখান নি তা নয়, 'প্রতিমা' (পৃ. ১৪) বা 'নীলকণ্ঠী' (পৃ. ১৭) তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে। বিশেষত 'নীলকণ্ঠী' (নামকরণে আমার আপত্তি, কারণ নীল-কণ্ঠের ব্যঞ্জনা নীলকণ্ঠীতে নেই) কবিতায় আজকের নাগরিক জীবনের একটি নিষ্করুণ বিষণ্ণ ছবি সার্থকতায় প্রস্ফুট হয়েছে। কিন্তু 'কালের পুতুল' (পৃ. ১২) এবং 'বৃদ্ধটি হোক শতায়ু' (পৃ. ২০) নামে যে দুটি কবিতা আমার ভালো লেগেছে, কবি স্বয়ং হয়তো তাদের অনাধুনিক বা অপেক্ষাকৃত অনাধুনিক বলবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার মতো আরো অনেকেই হয়তো ঐ কবিতা দুটি পাঠে তৃপ্ত হবেন।

সবশেষে, কোন কোন জায়গায় ভাষা ব্যবহারে তরুণ কবিদের অসতর্কতার সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ : 'যৌনজড়িত মন', 'কামুক সঙ্গম', উরু অর্থে 'জঙ্ঘা', 'প্রেতায়িত শব', 'শান্তবহ নদী'। কোন কোন পংক্তি আমার কাছে অর্থহীন (দুর্বোধ্য?) মনে হয়েছে—

বালুচর শাড়ি নদী (বেনারসী কাঞ্জিভেরামই বা নয় কেন!)

ক্ষিপ্র আগুন বাঁধে শরীরের তূণে ('তূণ' = বাণ রাখিবার আধার :
চলন্তিকা, পৃ. ২৪০)

জানি যা নীতির অদিতি কোঠায় রমা
('অদিতি' বিষ্ণু, সূর্য প্রমুখের মাতা : পৌরাণিক অভিধান, পৃ. ১৩)

নক্ষত্রের রন্ধ্র ছিঁড়ে আসে ('রন্ধ্র'= ছিদ্র, দোষ : চলন্তিকা, পৃ. ৪৯০)

এই বপ্রক্রীড় (?) স্থূল প্রসাধনে হৃদয় ভেজে না ('বপ্রক্রীড়া' = দাঁত বা শিং

দিয়া মাটি খুঁড়িয়া খেলা হাতি ষাঁড় ইত্যাদির : চলন্তিকা, পৃ. ৩৮০)
নগ্ন সুষুম্নার ডালে তেত্রিশ মৃদঙ্গ (প্রায় 'চর্যাপদে'র দুর্বোধ্যতাস্পর্শী !)

আমাদের দেহ ভেসে যাচ্ছে গোধূলির ক্লান্ত জলাধারে
(সীমাবদ্ধ আধারে গতিদ্যোতক 'ভেসে যাচ্ছে' ক্রিয়া অর্থহীন)

নপুংসক যযাতি (যযাতি 'জরাগ্রস্ত' কিন্তু পুত্রবান্ ছিলেন :
'পৌরাণিক অভিধান,' পৃ. ৩৫২। 'নপুংসক' ও 'জরাগ্রস্ত' একার্থবোধক
নয়)।

'কাস্তে'র মতো চাঁদ—এ ধরনের চিত্র এবং 'নদী-সমুদ্রে'র বা 'বেহুলা-লখিন্দরে'র রূপক বর্তমান বই তিনটিতে একাধিকবার পেয়েছি। বাংলা কবিতা থেকে এগুলির বিদায় নেবার দিন সমাসন্ন। তেমনি 'জননী আঁধার', 'পিতামহ অন্ধকার' ইত্যাদিও সময় সময় অর্থহীন বোধ হয় ('মাতামহ অন্ধকার', 'পিসীমা আলোক'-ই বা নয় কেন!)। 'অমল' শব্দটি বহু ব্যবহারে মলিন হয়ে পড়েছে। আর অবিলম্বে যাঁকে বাংলা কবিতার রাজ্য থেকে চিরতরে নির্বাসিত করা উচিত, তিনি 'ঈশ্বর' (সময় সময় 'ঈশ্বরী'সহ তিনি বিরাজ করেন, কখনও বা ভাষান্তরে 'আল্লা' হয়ে দেখা দেন)। 'ঈশ্বর' তো বাংলাদেশের কবি নন, তাঁকে কেন 'দল-ভাঙাগড়ার ফল' পেতে হবে!

বাংলাদেশের তরুণ কবিরা ভিন্ন বৃক্ষে ভিন্ন ফুল ফোটাবার সাধু প্রচেষ্টা যতই করুন না কেন, নিজস্ব কাব্যপ্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠ না হলে নিজের কথা নিজের ভাষায় বলতে প্রয়াসী না হলে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের রচনা বিশেষ একটি অন্ধকার উদ্যানের কয়েকটি কণ্ঠস্বরেই পর্যবসিত হবে, যে-স্বর বৃহত্তর সৎ পাঠকগোষ্ঠীর কানে এবং মরমে কখনই পৌঁছতে পারবে না।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সমালোচনা

যত দূরেই যাই—সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাঃ লিমিটেড। মূল্য তিন টাকা।

১৩৪৬ সালে, তেইশ বছর আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই "পদাতিক" বেরিয়েছিল। আজ সে-সব কবিতার প্রেরণা স্তিমিত হলেও, সে-সময়ে, মানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে, বামপন্থী-মহল তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিল। 'কমরেড', 'কৃষাণ-মজুর', 'বলশেভিক', 'মিছিল', 'লালপ্রত্যূষ' ছাড়িয়ে সেদিনে সুভাষের চেতনা অন্যপথগামী হয়নি। ফলে তিনি কোনো বিশেষ দলের বিশেষ তারিফ অর্জন করলেও, কাব্যপ্রিয়দের খুশী করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

যে বাস্তববাদকে কাব্যের উপজীব্য হিসেবে সুভাষ সেদিন গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে কবিতা লেখা চলতে পারে না। সাম্যবাদী বিপ্লবের আশায় যতো রোমান্টিকই তিনি হয়ে উঠুন এবং 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?' বলেই যতোই আবেদন পেশ করুন, ভারত সেই বাস্তববাদিতার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এই বাস্তবতা নিয়ে রোমান্টিক না হয়ে, সত্যিকারের রোমান্টিক যদি তিনি হতেন, যার ছোঁওয়া তাঁর মেজাজে ছিল, তাহলে হয়ত আজকের দিনেও "পদাতিক" সার্থক বলে গণ্য হতে পারত। সেদিনে তিনি এমন সুন্দর পংক্তি-ও ত লিখেছেন—

যেখানে আকাশ চিকণ শাখায় চেরা
চলো না উধাও কালেরে সেখানে ডাকি।

অথবা

হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী।

কাজেই আমার বক্তব্য অসমীচীন বলে মনে হয় না।

"পদাতিক" শুরু হয়েছিল বলে : 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য। তেইশ বছর পর "যতো দূরেই যাই" কাব্যগ্রন্থেও তাঁর ফুলের প্রতি সে-অণীহা যায়নি। এখনও তিনি বলছেন—

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনদিনই আমার টান নেই। (পাথরের ফুল)

কিম্বা

ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে। (ঐ)

তবে ইতিমধ্যে ফুলের প্রবেশ হয়েছে যে তাঁর জীবনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই প্রথম কবিতায়ই আছে।—

হাতের মুঠোটা খুললাম।
কালরাত্রের বাসি ফুলগুলো

সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। (যেতে যেতে)
রাত্রিতে অন্তত টাটকা ফুলই তাঁর হাতে ছিল!

"যত দূরেই যাই"-এর কিছু কবিতায় আছে, জার্মান রোমান্টিকদের মতো, রোমান্টিকতা হতে রূঢ় বাস্তবতায় জাগরণ। তাই 'এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা' তাঁর অনুভূতিতে 'রাক্ষুসী' হয়ে যায় (যেতে যেতে)। 'পোড়াশহরে' এই রোমান্টিকতার রূঢ় বাস্তবতায় জাগরণ সব-চাইতে বেশি স্পষ্ট—

বাইরে শাড়িতে ঢাকা
দুটো শুভ্র পা—
আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মত।
তার মুখচ্ছবি কেমন
কোনদিনই জানব না।
হঠাৎ
আমার ইচ্ছে হল ছুটে পালিয়ে যেতে।
আমার ইচ্ছে হল যেতে
যেখানে তার চোখের
উজ্জ্বল নীল মণির মত আকাশ।
যেখানে ঢেউ তুলে আমাকে ডেকে নেবে নদী।
যেখানে যাব
আর আসব না।
তারপর ট্রাম থেকে নেমে
ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলাম।
পালাতে পালাতে
পালাতে পালাতে
ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড একটা হা-মুখ
আমাকে ঢেকে নিল।

জীবনের সহজ মর্যাদায় জীবনকে বুঝে নেওয়া হৃদয় দিয়ে—এই মনোভাব সুভাষের কবিতায় উঁকি দিয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে যে তিনি নিঃশেষ হয়ে যান নি। এ ধরনেরই কবিতা, 'যত দূরেই যাই'—

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা গাঁথা
এক নদীর নাম—
আমি যত দূরেই যাই।
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।

এখানে বাংলা ঐতিহ্যের কবি সুভাষ। এর কাছে তাঁর অতীতের এসব প্রারব্ধও আমরা ভুলে থাকতে পারি—

পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায়। (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)।

"যত দূরে যাই"-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, "পদাতিকে"র প্রতিধ্বনি নয়, পদক্ষেপের অন্য ধ্বনি শুনছি। একে মোড় ফেরা এখনো ঠিক বলা যায় না তবে আশা করা যায় যতো দূরেই তিনি যান, আবেগ-সংবেগ পরিত্যাগ করে হয়তো আর চলতে পারবেন না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মনসিজ—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। অগ্রণী প্রকাশনী। কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

হেন্‌রি জেমস্-এর সঙ্গে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনরকম তুলনা চলে এ-ধরনের কোন ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। হেন্‌রি জেমস্ আমেরিকান সাহিত্যের অন্যতম ধ্রুপদী লেখক বলে স্বীকৃত। তাঁর মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা, সাংগঠনিক গাঁথুনি অসাধারণ এবং অতুলনীয়। তাঁর রচনা-রীতি ভারী; ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে না পড়লে প্রতি ছত্রে তিনি যে বিভিন্ন চরিত্রের মানস-পটের উপর নতুন নতুন আলোক-সম্পাত করছেন তা ধরা পড়ে না।

আমি হেন্‌রি জেম্‌সের নাম উল্লেখ করছি শুধু এই জন্য যে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা-রীতির সঙ্গে জেমসের রীতির খানিকটা বাহ্যিক মিল আছে। খুব সম্ভব এ মিল সচেতন অনুকরণ প্রয়াস জাত নয়। লেখকের শিল্পী প্রকৃতিই তাঁকে এই ধ্রুপদী রীতির দিকে টেনে নিয়েছে। তাঁর লেখার স্টাইলও ভারী, ধীরে ধীরে না পড়লে এ জিনিসের রস উপভোগ করা সম্ভব নয়। আধুনিক উপন্যাসে যে ত্বরিৎগতি ঘটনা প্রবাহের বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় তা অনুপস্থিত। নিতান্ত তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যবহার করে তিনি তাঁর চরিত্রদের মানস-লোক বিশ্লেষণে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। তিনি যখন একটি সংলাপ লিপিবদ্ধ করেন, তখন প্রতিটি চরিত্রের প্রতিটি উক্তির পিছনে যে চরিত্রগত অভীপ্সা কাজ করছে, মনের গভীরে যে-চিন্তা পারম্পর্যের খেলা চলছে, তিনি তার বিস্তৃত বিবরণ দেবেন। হেন্‌রি জেমসের পদ্ধতিও অনুরূপ। এই পদ্ধতির অসুবিধা সহজেই অনুমেয়। বিশ্লেষণের বাহুল্যে ঘটনা ও সংলাপ গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে বলে পাঠকের মনোযোগ অব্যাহত রাখা শক্ত হ'য়ে পড়ে। পাঠককে আকৃষ্ট করার সহজ পন্থা ত্যাগ করে জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ধ্রুপদী রীতি গ্রহণ করে তাকে জীবনের গভীরে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মনোবিশ্লেষণ নানা জাতের আছে। সচেতন মনকে যে অবচেতন মন মানুষের অজ্ঞাতসারে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে উদ্‌ঘাটন করেছেন ডি. এইচ. লরেন্স প্রভৃতি লেখক, বা আমাদের দেশের মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার আর এক জাতের মনোবিশ্লেষণ মূলতঃ মানুষের সচেতন মন নিয়েই কারবার করে। মানুষের অভীপ্সা, মূল্য ও নীতি-বোধ

এবং বিবেকের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে, যার ফলে মানুষের চরিত্র এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে সঞ্চরণশীল হয়, লেখক তাই উদ্‌ঘাটন করেন। হেন্‌রী জেমসের মধ্যে এই দ্বিতীয় পদ্ধতির সাক্ষাৎ মেলে। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যেও। কিন্তু তাঁর প্রয়াস এখনো অসম্পূর্ণ, অপরিণত; আর সেই জন্যই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে ক্রম-পরিণতির অভাব। তারা প্রায় একই বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকে। "মনসিজ" লেখকের "অন্তর্মনা" বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়। কিন্তু "অন্তর্মনা"য় লেখকের যে সুবিধে ছিল, "মনসিজে" তা নেই। "অন্তর্মনা"য় একটি অপরিণত অথচ সংবেদনশীল কিশোরের চোখ দিয়ে লেখক একটি দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারের নাটকীয়তা ও জটিলতাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঘটনার তীব্রতা ও রূঢ়তা কিশোর মনকে যন্ত্রণা-জর্জর করেছে, কিন্তু ঘটনার পিছনের কার্য-কারণ সূত্র সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। এই আলো-আঁধারির খেলাই বইখানিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কিন্তু "মনসিজে" এই তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ নেই। নায়ক এখানে পরিণত বয়স্ক যুবক। ঘটনার পিছনের কার্যকারণ-সূত্র সে বোঝে; এবং যেহেতু সে লেখকের প্রতিনিধি, সে বিভিন্ন চরিত্রের অভীপ্সা ও কার্য বিশ্লেষণে সুনিপুণ। কাজেই পূর্ববর্তী গ্রন্থের সুবিধা এ বইয়ে যেমন নেই, তেমনি একটি নতুন অসুবিধে দেখা দিয়েছে। এ বইয়ের প্রায় সমস্ত চরিত্রই অত্যন্ত পরিচিত। নানান্ জায়গায় নানান্‌ভাবে এই সব মধ্যবিত্ত চরিত্রের সঙ্গে আমাদের বারবার দেখা হয়েছে। এদের মধ্যে তাই নতুন কিছু আবিষ্কার করে দেখানো সহজ নয়। বিশেষ করে লেখক অন্ততঃ এ বইয়ের সীমার মধ্যে ক্রম পরিবর্তনশীল চরিত্রাঙ্কনের দিকে নজর না দিয়ে সুনির্দিষ্ট টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বলে তাঁর অসুবিধে আরও বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন চরিত্রকেই নতুন বলে মনে হয় না, বা পুরাণোকে নতুন করে দেখছি বলে মনে হয় না। বিধবা মা যিনি সন্তান স্নেহের শরীরী প্রকাশ মাত্র; ছোড়দি যে আরাম এবং বিলাস যথেষ্ট ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার পাত্রদের খাতিরে যে যে-কোন ত্যাগ-স্বীকারেই প্রস্তুত; অতীশদা, যিনি আপন-ভোলা রাজনীতি-করা লোক। চাকরির টাকা দিয়ে নিঃসম্পর্কিত এক পরিবারকে সাহায্য করেন; বড় লোকের মেয়ে স্মৃতি যে প্রেমে পড়েও খামখেয়াল অহঙ্কারকে ছাড়তে পারে না;—এঁরা সবাই আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। লেখকের পদ্ধতি বাস্তবধর্মী হলেও, প্রকৃতিতে তিনি রোমাণ্টিক বলে তাঁর সব-চরিত্রই আদর্শীকৃত। তার ফলে একাধিক ভার সংযোজন করে চরিত্রগুলো জটিলতর করে তুলতে চেষ্টা করেননি লেখক। অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই বলে চরিত্রগুলোর কোন নিজস্ব গতি নেই। বেগ নেই। কাজেই চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখক কোন অভিনবত্ব বা মৌলিকত্ব দেখাতে পারেন নি।

আগেই বলেছি, লেখকের কাহিনীর অংশ খুব নগণ্য। দৃশ্যগুলো প্রায় সবই গতানুগতিক দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনা-মাত্র। কাজেই তার মধ্যেও বিস্মিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। অথচ এই পরিচিত ও অকিঞ্চিৎকর উপাদান নিয়ে লেখক যে অতীশদা ও ছোড়দির প্রেম-কাহিনী এঁকেছেন তার আড়ম্বর-বর্জিত রূপটি উপভোগ্য। এই প্রেমের প্রকাশে কোন গদগদ ভাষা নেই। কোন আবেগ-কম্পিত প্রতিশ্রুতি নেই। নিতান্ত সহজ হাসি-ঠাট্টা, দায়িত্ব গ্রহণ ও ত্যাগ-স্বীকারের ভিতর দিয়ে তা এক অনায়াস সার্থকতায় উন্নীত হয়েছে। জীবনের অনিশ্চিতির দরুণ আকাঙ্ক্ষিত মিলন সম্ভব হচ্ছে না; কিন্তু অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় কোন ক্লান্তি নেই। এই চিত্রও আদর্শীকৃত; কিন্তু জীবনের সমস্ত অপ্রাপ্ত

আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে যে প্রেম ক্ষতিপূরণ করতে সমর্থ লেখক এই জোরালো বক্তব্যকে হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন।

বইয়ের প্রধান চরিত্র, অনিন্দ্য, যার চোখ দিয়ে লেখক সব-কিছু দেখছেন, সে নিজে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট থেকে গিয়েছে। স্মৃতির সঙ্গে তাঁর প্রেমও গতানুগতিক। স্মৃতির মধ্যে রয়েছে বড়লোক সুলভ অহঙ্কার; অনিন্দ্যের মধ্যে রয়েছে বিত্তবানদের সম্পর্কে অর্জিত সংস্কার। এই অহঙ্কার এবং সংস্কারের মামুলী দ্বন্দ্ব থেকে লেখক এদের প্রেমকে মুক্ত করতে পারেননি।

কাজেই সমগ্রভাবে লেখক এ বইয়ে সীমাবন্ধ সার্থকতা অর্জন করেছেন এ-কথা বলাই সঙ্গত। আগেই বলেছি সামগ্রিক ফলশ্রুতি যাই-হোক, লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক রস লুকিয়ে আছে যা শুধু ধৈর্যশীল পাঠকদের কাছেই লভ্য। ছোট ছোট কথার মধ্যে লেখকের কল্পনা-কুশলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বিবাহিতা বসুন্ধরা এসেছে ছোড়দির কাছে সেজেগুজে। তাকে দেখে অনিন্দ্য ভাবছে, 'বসুন্ধরা জানাতে চায় এমন একটা জীবনের স্বাদ সে পেয়েছে যার থেকে ও (ছোড়দি) বঞ্চিত। তবু মনে হল এই জীবনের স্বাদ পেলে ছোড়দির যা পরিবর্তন আসতে পারে তা সে এখুনি একবার কল্পনা করে নিতে পারে।' আবার একটু পরে—'বসুন্ধরার অবয়বের মধ্যে স্মৃতিরেখাকে যেন দেখতে ইচ্ছে করল। তাই বসুন্ধরার শরীরটাকে স্মৃতির শরীর ভেবে কল্পনায় কিছু একটা গড়ার চেষ্টা করল।'

স্মৃতির সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ার পর তাকে যখন অনিন্দ্য ট্রামে তুলে দিল এবং ট্রাম চলতে সুরু করল তখন ছেলেবেলার একখানা ছবির বইয়ের কথাই মনে আসছিল। একটা অন্ধকার টানেল আর তার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে একখানা ইঞ্জিন।

এই রম্যরচনার যুগে, লেখক নিঃসন্দেহে পাঠক-সমাজের মনোযোগ দাবী করেন।

অচ্যুত গোস্বামী

God was Born in Exile. *By* Vintila Horia. Translated by A. Lytton Sells. George Allen & Unwin Ltd. London. 16*s*.

দুর্নিরীক্ষ্য অতীতের প্রতি নির্মোহ হওয়া সহজ নয়। যা বর্তমানে অনুপস্থিত, কালের সুদীর্ঘ সেতু পার হয়ে যার পাশে পৌঁছন যাবে না, অথচ ইতিহাসে উপকথায় সাহিত্যে যার মুখের রেখা অস্পষ্ট হলেও মুছে যায় নি, তার প্রতি নির্মোহ হওয়া কঠিন। সময়ের ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকার পর্দার ওপারের সেই দূরের প্রতি বরং আমাদের পক্ষপাতিত্ব, তীব্র আগ্রহ। যদি কোন লেখক পিছনের দীর্ঘ পথের অন্ধকার সরিয়ে বর্তমানের আলোয় সেই দুর্লক্ষ্য অতীতের মুখ উদ্ভাসিত করতে পারেন, যদি সেই দূরের সঙ্গে একালে আমাদের একাত্মী-করণের অন্তত কয়েকটি সূত্র মেলে, তাহলে আমাদের তীব্র আগ্রহের সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময় মিশে যায়। এই বিষয়টি কিছু নতুন অথবা দুর্জ্ঞেয় নয়। চিরকাল শিল্পীরা এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। তবে কিছুকাল থেকে এদেশের এবং ইয়োরোপীয় অনেক ঔপন্যাসিক বিষয়টি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তার ফলে তাঁদের সুদূর অতীতাশ্রয়ী

উপন্যাসগুলি তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির স্বীকৃতি পেয়েছে। এই লেখকরা অতীতাশ্রয়ী হলেও তাঁদের সমসময়চেতনার তীক্ষ্ণতায় কমতি নেই। তার প্রধান কারণ দুঃসহ আত্মিক যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত কিছু মৌল প্রশ্ন সমকালীনতানিরপেক্ষ। অস্তিত্ব ও লুপ্ত অস্তিত্বের এই সব দুঃসহ যন্ত্রণার অনুভব ও বেদনার্দ্র প্রশ্ন চিরকাল সমকালীন; এখানে অতীত ও বর্তমান এবং আধুনিক ও অনাধুনিকের কথা ওঠে না। বস্তুত এই মূলগত সাদৃশ্য আছে বলেই ইতিহাস, উপকথা ও সাহিত্যবিধৃত কয়েক হাজার বছর আগের চরিত্রের সঙ্গেও একালে আমাদের সমীকরণ সম্ভব।

ভির্ণিটলা হোরিয়া নিজের জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দু হাজার বছর আগেকার একটি চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যের সূত্র খুঁজে পেয়ে আলোচ্য উপন্যাসটি রচনা করেছেন। প্রায় দু'হাজার বছর আগের সেই চরিত্র পার্বলিয়াস ওভিডাস নাসো। ওভিড খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোমের অসংযত বিত্তবানদের প্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর নিজের ঘোষণা অনুসারে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত প্রেমের উপাখ্যানের সংকলন *Amores* (প্রেম) তাঁকে প্রথম কবিখ্যাতি দিয়েছিল। পেনিলোপ, ডিডোর মত সুবিদিত মহিলাদের অনুপস্থিত প্রেমিকের প্রতি লিখিত কল্পিত পত্রের সংকলন *Heroides* (নায়িকা) এবং তাঁর *Ars Amatoria* (প্রেমের প্রকরণ) তাঁর কবি-খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। *Fasti*-তে রোমের বিভিন্ন উৎসবের অসম্পূর্ণ বর্ণনা এবং *Metamorphoses*-এ অজস্র উপকথা ও অতিকথার কাব্যিক বিবরণ দেওয়ার আগেই তিনি সে-কালের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। পরিণত বয়সে রচিত *Tristia*-য় (দুঃখ) এবং *Epistulae ex Ponto*-তে (কৃষ্ণসাগর থেকে লেখা চিঠি) ওভিডের নিজের জীবনের অনেক তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে *Tristia*-র প্রথমাংশে বর্ণিত রোমে তাঁর শেষ রাত্রির অভিজ্ঞতা তীব্র যন্ত্রণার আঘাতে কম্পিত। ওভিডের এই সব কাব্য পাঠে অবশ্যই তাঁর মননের ক্রম-উত্তরণের একটি আদল পাওয়া যায়। মনে হয়, সমগ্র মধ্যযুগে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং রেনেসাঁসের কবি-শিল্পীদের ওপর তাঁর স্পষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও, কোন গভীর অনুভব তাঁর মনে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি এবং অন্তত একালের অর্থে তাঁর নৈতিক শৈথিল্য ও তারল্য ছিল। ভার্জিলের মত ভাবগম্ভীর তিনি কখনও হতে পারেন নি, তাঁর ক্ষমতার পরিধি কখনও মহাকাব্যের নাগাল পায় নি।

খৃস্টীয় প্রথম শতকে রোমের অসংযত ইন্দ্রিয়গতপ্রাণ বিত্তবানদের প্রিয় কবি ওভিডের বিষয়ে এই সব কথা মনে রেখে ভির্ণিটলা হোরিয়ার বইটি পড়তে শুরু করলে পাঠক অত্যন্ত বিস্মিত হবেন। কারণ হোরিয়ার উপন্যাসে অন্য এক ওভিডের মূর্তি ক্রমান্বয়ে অনিবার্য রূপ নেবে। প্রথম শতকের প্রথম দশকে সম্রাট অগস্টাসের এক আদেশে ওভিডের অভ্যস্ত জীবনে বিপর্যয় আসে। 'একটি কবিতা ও একটি ভুলের' জন্য অগস্টাস তাঁকে ইটালী থেকে নির্বাসিত করেন। তাঁর 'একটি কবিতা' অবশ্যই *Ars Amatoria*, কিন্তু তাঁর 'একটি ভুলের' ব্যাখ্যা আজও নিশ্চিতরূপে মেলেনি। কৃষ্ণসাগরের তীরে রোমান সৈন্যাবাস ঘিরে গড়ে ওঠা ছোট শহর টোমিসে ওভিডের নির্বাসিত জীবন কাটে। এখানেই সতের সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বইটি ওভিডের নির্বাসিত জীবনের স্বরচিত স্মৃতিকথা নয়। ভির্ণিটলা হোরিয়ার এই উপন্যাস ওভিডের কল্পিত স্মৃতিকথা। বইটির মূল আখ্যানবস্তু নির্বাসন। গত বিশ্ব-যুদ্ধের পর ভির্ণিটলা হোরিয়া তাঁর নিজের দেশ কমিউনিস্ট রুমানিয়া থেকে দূরে ইটালী ও

স্পেনে স্বেচ্ছায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করেন। নির্বাসন মন ভেঙে দেয়, আবার মনকে গ্লানিমুক্ত ও বিশুদ্ধ করার অসাধারণ শক্তি আছে নির্বাসনের। নিটশে বলেছিলেন, 'সত্য উদ্ঘাটনের শক্তি লাভের জন্য আমি নির্বাসন বেছে নিয়েছিলাম।' ১৯৫৮ সালে ওভিডের দ্বিসহস্রতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ওভিডের কাব্যে নতুন করে মগ্ন হয়ে নির্বাসিত ভিন্টিলা হোরিয়া উপলব্ধি করেন, আত্মিক যন্ত্রণার অনুভবে তিনি ও ওভিড অভিন্নহৃদয়। কৃষ্ণ-সাগরের তীরে ডেসিয়ানদের দেশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ক্ষুদ্র টোমিস শহরে নির্বাসিত অন্য এক ওভিডের, অস্তিত্ব ও লুপ্ত অস্তিত্বের অজস্র মৌল প্রশ্নের ভারে ক্লান্ত অন্য এক ওভিডের মূর্তি তাঁর চোখে ধরা দেয়। যখন তাঁর মনে হয়, তাঁর ও ওভিডের একাত্মীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, হোরিয়া ওভিডের এই কল্পিত জর্নল লিখতে শুরু করেন।

বইটির আটটি পরিচ্ছেদ ওভিডের নির্বাসনের আট বছরের জর্নল। প্রথম বছরে ওভিড রোমানদের ঈশ্বরদের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে ভয়ংকর শূন্যতার সম্মুখীন। তারপর এক-একটি বছরে নতুন পরিচয়ে, নতুন প্রেমে, নতুন এক ঈশ্বরের সম্ভাবনার পথে হৃদয়ের সব প্রার্থনা বিছিয়ে দিয়ে তিনি সেই ভয়ংকর শূন্যতার আঘাত প্রতিরোধ করেছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় অনাহারে উন্মাদ ডেসিয়ানদের দ্বারা টোমিস শহর অবরোধের নিখুঁত বর্ণনা আছে, সাম্রাজ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ রোমান সৈন্যদের শিবির ত্যাগ করে ডেসিয়ায় পলায়নের বিস্ময়কর কাহিনী আছে। কিন্তু এসবই প্রায় বহিরঙ্গের বিষয়। বইটির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে ওভিডের আত্মার ক্রম-উত্তরণের ইতিহাস। ভিন্টিলা হোরিয়ার উপন্যাস নির্বাসনের শুরু থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওভিডের ভয়ংকর শূন্যতাবোধ, দুঃসহ একাকীত্ব, অতীত জীবনের অজস্র স্মৃতির ভার, রোমান ঈশ্বরদের অস্তিত্বে অবিশ্বাস থেকে এক নিগূঢ় উপলব্ধিতে উত্তরণের জর্নলধর্মী খতিয়ান।

বইটির প্রথমাংশে পাঠককে টানবার অনেক উপকরণ আছে, কিন্তু মাঝখানে অনেক-গুলো পাতা অতিক্রম করা রীতিমত ক্লান্তিকর। অবশ্য সারমাটিয়ানদের আক্রমণ, ওভিডের ডেসিয়া পরিক্রমা এবং গ্রীক চিকিৎসক থিয়োডোরের মুখে বেথলহেমের আস্তাবলে মেরির পুত্রের জন্মের বিবরণের সময় থেকে শেষ পর্যন্ত বইটি আবার পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। বইটির শেষের দিকে মানুষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সম্ভাবনার তীব্র আঘাতে কম্পিত এক ক্ষণকাল নানাবর্ণে চিত্রিত : If someone discovers this journal, he will be able to share in the torments and hopes of the unique age in which we are living : the age of expectation and certainty. It is only a moment in time, I know that, but it is one of the finest in the history of men, for God is now among us and He has not yet revealed His presence.

ওভিডের আট বছরের নির্বাসনের স্মৃতিকথা সঙ্গত কারণেই একটি নিটোল গল্প নয়। তবে ওভিড কয়েকটি নিটোল ছোটগল্পের সাক্ষী এবং সেগুলিকে লেখক আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন ডোকিয়া ও অনরিয়াসের কাহিনী, লিডিয়া ও হেরিমনের কাহিনী। এই সব ছোটগল্পের বৃত্ত এমন নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ না করে, দু'টি করে সরল-রেখার অনির্দিষ্টতা অক্ষুণ্ন রাখলে গ্রন্থকার বেশি সংযমের পরিচয় দিতেন। এই সংযমের অভাবে দু'হাজার বছর আগে লেখা ওভিডের কল্পিত জর্নলের সঙ্গে একালের প্রচলিত উপন্যাসের প্রকরণগত মিল অবাঞ্ছিতভাবে এসেছে।

অগস্টাস ও টাইবেরিয়াসের সাম্রাজ্যে গ্লানিকীর্ণ দিনযাপনের একটি স্পষ্ট আদল

বইটিতে পাওয়া যায়। অবশ্য হাওয়ার্ড ফাস্টের *Spartacus*-এ প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটির যে ঘনিষ্ঠ বর্ণনা আছে এখানে তা অনুপস্থিত। তবে মনে রাখতে হবে, *Spartacus*-এর মত *God was Born in Exile* ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। তাছাড়া ভির্গিটলা হোরিয়া অনেক বেশি প্রতীকনির্ভর : Not to think in symbols, not to seek a meaning in everything that takes place before our eyes, not to transform signs which carry on reflection of the present into images of what will one day come about, not to mix the gods and the stories we have invented about them with everyday happenings—but how can we prevent ourselves from doing this? Our whole education tends toward a symbolism in which we strive, in our morbid vocation for the inevitable and the tragic, to discover the face of our own future.

গ্রন্থকার আরও একটু মিতবাক হলে তাঁর যন্ত্রণার অনুভব এবং বক্তব্য হয়ত আরও তীক্ষ্মমুখ হত। জর্নালধর্মী সাহিত্যকর্মে প্রাচীন পৃথিবীর ঐতিহাসিক ও বিশেষতঃ ভৌগোলিক বিষয়ের নিখাদ তন্ময় বিবরণ নিশ্চয়ই তীক্ষ্মতা কমায়।

ভির্গিটলা হোরিয়ার উপন্যাসে অনেক বিচিত্র সুন্দর প্রাচীনগন্ধী উপমা আছে। তাছাড়া ওভিডের সমকালের করলগ্ন কয়েকটি প্রতীক অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদ করে। অথচ এর মধ্যে দু'একটি উপমা নিঃসন্দেহে বেমানান এবং প্রায় কিশোরোচিত। যেমন : We love each other, and this makes me think of two flowers growing on separate trees. They would fain be together, but only their wordless hues and distant scents can touch, amid all the stupidity and indifference of the world. লেখক এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন যাদের অনুষঙ্গ খৃস্টধর্মের হৃদয় থেকে উৎসারিত। ওভিডের নির্বাসনকালে, যখন যীশুর জন্মের সংবাদ মাত্র কোন কোন মহলে পৌঁচেছে, সেই সব শব্দের সেই অনুষঙ্গে ব্যবহার সঙ্গত মনে হয় না। অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার যে মূল উপন্যাসটি ফরাসী ভাষায় লিখিত এবং আমরা তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ছি।

সুধাংশু ঘোষ

এই দশকের গল্প—বিমল কর সম্পাদিত। পলাশী। কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।
মালঞ্চের রঙ—বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সম্বোধি পাবলিকেশনস্‌ প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা ১। মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ ন. প।

শিল্পে এবং সাহিত্যে নানা পরীক্ষা অনিবার্য। শিল্পী এবং সাহিত্যিক যেহেতু সামাজিক জীব, সেই কারণেই আশা করা সঙ্গত, সমাজের ভাঙা-গড়া তাদের মনে নতুন বোধের সৃষ্টি করবে। নতুন মূল্য প্রতিষ্ঠায় তাঁরা উৎসাহিত বোধ করবেন। কোনো লেখকের মধ্যে এ প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি স্বভাবতই শঙ্কার কারণ। যদিও অনস্বীকার্য, সাহিত্যকর্ম কোনো বিশেষ অভিধা আশ্রয়ী নয়। তবু এমন রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তত্ত্ব এবং বস্তুনিষ্ঠার সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত মানুষের ভাবনা ঘটনার সমান্তরাল। শিল্পীর চেতনায় তার

উত্তরণ। সে কারণেই কোনো লেখকের মানসিকতা নৈতিমূলক হওয়া অবাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস, যার ছায়া আশ্রয়ে আমাদের মন রসপরিপুষ্ট, ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে এই দশকের যাঁরা লেখক তাঁদের কাছে পুরাণো মূল্যগুলি কয়েকটি বিমূর্ত সংজ্ঞার মত উপস্থিত। অনুপ্রেরণার বাস্তবিক উৎস নয়। জীবন এ'দের কাছে অপেক্ষাকৃত জটিল। মন এ'দের কদর্য অবময়ে অবসিত। তাই নতুন লেখকের দায়িত্ব অনেক বেশী। অন্ধকারের অরণ্যে তাঁরা ক্ষীণ হলেও আলোর সংকেত করবেন, এ কি সত্যি দুরাশা?

নানা কারণেই এই দশকের গল্প একটি উল্লেখ্য সংকলন। যাঁদের লেখা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তাঁরা সকলেই বিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যবর্তী। সঙ্কলনের সম্পাদক ভূমিকায় বলেছেন, বয়সে, অন্তর্ভুক্ত লেখকবৃন্দ সকলই তরুণ। এবং দু'একজন বাদে সকলেরই সাহিত্যচর্চা স্বল্পকালের। এ'দের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষানবিশী-পর্ব অতিক্রম করে নিজস্ব পথটি খুঁজে পেয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত সঙ্কলকের এই শেষ বক্তব্যের সঙ্গে আমি দ্বিমত। এই সকল লেখক, তাঁদের রচনার বিচ্ছিন্নভাবে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কেউ কেউ বর্ণনায় অনন্য ক্ষমতার অধিকারী, কারও বস্তুনিষ্ঠা বিস্ময় সঞ্চারী, এবং কারো পর্যবেক্ষণ দ্বিধাহীন প্রশংসার পরিচিতি। এত কিছু সত্ত্বেও কখনও মনে হয় না, এদের সামনে কোনো পথ আছে। কোনো বিশেষ পথের এ'রা যাত্রী। অথবা কোনো নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ'রা অবতীর্ণ। অবশ্য রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর' এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। তাঁর লেখার প্রেক্ষিত এক অনাবশ্যক অবতরণিকা নয়। তাঁর বক্তব্য প্রত্যক্ষ।

একটি মৌল বিষয়ের প্রতি এই লেখকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা বোধকরি সঙ্গত। প্রকৃত সৃজনশীল শিল্পীর পক্ষে সকল অর্থে শূন্যবাদী হওয়া অসম্ভব। শিল্পীরও সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা লাইবনিৎসের মত মনকে অলিখিত শ্লেটের সঙ্গে তুলনা করে সে ছবির অবিকল প্রতিশব্দ উচ্চারণ করেন, তবে স্বতই সংশয় সম্ভব। ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁদের মনের বিবর জীবন বিবর্তনের আপাত ছাপ নিয়েই স্তব্ধ। তার জটিলতার বিন্দুতে পৌঁছুতে একান্ত অক্ষম!

"এই দশকের গল্প" গ্রন্থে সংযোজিত প্রত্যেকটি গল্প অপ্রত্যাশিত উদ্ভাসেই নিঃশেষিত। সেই গভীর হতে গভীরতর যামে যেন এদের সঞ্চারণ সম্ভব হয়নি। গল্পগুলি পড়ার পর কেমন যেন মনে এক অতৃপ্ত আস্বাদ। এ'দের অনেকেই আর সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নেই। অথচ বহু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, এ'দের মননে শৈশব এখনও উপস্থিত। সমসাময়িক কালে মতি নন্দী, দেবেশ রায় এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমধিক উল্লেখযোগ্য। এ'দের সাহিত্য চর্চা বহুদিনের। তা সত্ত্বেও এ'দের লেখা যেন কেমন বিশ্লিষ্ট। অবশ্য উল্লিখিত তিনজন লেখক সমগোত্রীয় নন। মেজাজের দিক থেকেও তাঁরা ভিন্ন। মতি নন্দীর বস্তুনিষ্ঠায় আশ্চর্য অধিকার। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ম এবং সতর্ক। দেবেশ রায় তত্ত্বাশ্রয়ী। ফলে ঘটনার প্রকৃত চরিত্র তাঁর মনের রঙে ভিন্ন পরিবেশ নির্ভর। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনায় রঙ লাগাতে ব্যস্ত। কিন্তু কারো পক্ষেই পরিণত লেখকে উত্তরণ সম্ভব হয়নি। কেবলই মনে হয়েছে, এক অপরিচ্ছন্ন অবহেলায় অনেক অঙ্কুর লতা বৃক্ষে পরিণত হতে পারল না। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজে ও প্রকাশে এত বেশী সুরেল, যে মাঝে মাঝে তা' অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হয়। ধারণা হয়, গদ্য রচনার মূল সূত্রটি তাঁর কাছে অবহেলিত।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর লেখা মূল্যাশ্রয়ী। কিন্তু তাঁর অসংযত আবেগ, অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার পথরোধ করেছে। প্রবোধবন্ধু অধিকারী এবং দিব্যেন্দু পালিত চতুর ঘটনাশ্রয়ী। তাঁদের লেখায় ঘটনার প্রাধান্য অনেক সময় শিল্পবোধের পরিপন্থী। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা এই তরুণগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকদিক থেকে প্রশংসনীয়। প্রধানত তিনি অনুভূতি প্রবণ। তাঁর স্নায়ুর জগতে বিচিত্র সব তত্ত্ব বর্তমান। অথচ তাঁর লেখা তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না। তাঁর তত্ত্বগুলি লেখা থেকে স্বতোৎসারিত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঘটনার বিন্যাসে বিস্ময় জাগায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-বেদনা, যন্ত্রণা এবং নৈরাজ্য এঁর অনায়াস আয়ত্তে। আর এই মাটির সংসারকে অতি নিপুণ রেখায় তিনি আঁকতে সক্ষম।

এছাড়া যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অজয় দাশগুপ্ত বিভিন্ন অর্থে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কারণ, দু-একজন ছাড়া আর কাউকেই আমার যত্নশীল মনে হয়নি। বোধ করি স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সেই অশিক্ষিত পটুত্বের এখন অন্তিম কাল। লেখক শুধু সৃজনশীল শিল্পীই নন। বস্তুত বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক কারুশিল্পীও। সংকলনটি পাঠের আগে, আশা করেছিলাম এক নতুন পরীক্ষার সন্ধান পাব। কিন্তু তা পূরণ হয়নি।

প্রসঙ্গত সম্পাদকের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। সঙ্কলনের জন্য গল্প নির্বাচনের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করলেই বোধ করি ভাল হত। কারণ এমন একটি গ্রন্থ সম্পাদনার পিছনে যে উদ্দেশ্য, তা উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই সফল হতে পারত। এমন লেখক বিরল দৃষ্টান্ত, যিনি নিজের গল্পের সার্থক বিচারক। লেখকদের ওপর নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে, তিনি যেন তার কর্তব্য অনেকখানি এড়িয়ে গেছেন।

"এই দশকের গল্প" গ্রন্থের লেখকগণের উপকরণ স্বাশ্রয়ী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁদের শৈশব পরিপুষ্ট। ফলে যা' তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছে এক বিরাট যন্ত্রণার ক্ষত হিসেবে প্রতিভাত, তাঁরা তাকে সমাজের এক অস্বাভাবিক প্রকরণ বলেই গ্রহণ করেছিল। উত্তর তিরিশের লেখকদের সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মালঞ্চের রঙ"।

গ্রন্থে সংগৃহীত সমস্ত গল্পগুলিই এক কালে বাংলা পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সেই দিক থেকে এই গ্রন্থটি মূল্যবান। কারণ এক সঙ্গে এতগুলি সার্থক গল্প পড়তে পারা সৌভাগ্যের বিষয়।

কিন্তু সঙ্কলনের অন্যতম উদ্দেশ্য, এক বিশেষ যুগের মানসিকতার উপস্থাপনা—এই ক্ষেত্রে পালিত হয়নি। মনে হওয়া স্বাভাবিক, বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কাহিনী-লোভী দলকে খুশী করার জন্যই এই গ্রন্থের সঙ্কলন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কাহিনীলোভীর দল কি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মঙ্গলগ্রহ', অথবা সন্তোষকুমার ঘোষের 'হায়না' কিংবা বিমল করের 'আর-এক জন্ম অন্য মৃত্যু' পড়ে তৃপ্ত হবেন?

গ্রন্থে সন্নিবেশিত অন্যান্য গল্প, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু,' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কা তব কান্তা', বনফুলের 'আইনের বাইরে', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ল্যাভেণ্ডার' সম্পাদকের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলেই প্রতীত হয়। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সুবোধ ঘোষের 'স্বস্ত্যয়ন' এক বিশেষ মূল্যের অধিকারী।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

প্রায় ৩০০ বছর আগেকার কথা। বিজাপুরের গোল গম্বুজে একদিন পদার্পণ করলেন সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহ্। সঙ্গে তাঁর নর্মসহচরী রূপসী রম্ভা। এই গোল গম্বুজের প্রতিধ্বনি তোলার বিচিত্র ক্ষমতাকে পরীক্ষা করে দেখাই তাঁদের উদ্দেশ্য। সোপান শ্রেণী অতিক্রম ক'রে উঠতে উঠতে রম্ভাকে মাঝপথে রেখে একেবারে শীর্ষদেশে উঠে গেলেন আদিল শাহ্। ... "আমাকে তুমি কি সত্যি ভালবাস, রম্ভা ?" মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন সুলতান। মেঘমন্দ্র প্রতিধ্বনি তুলে সে শব্দ-তরঙ্গ ভেসে এল তাঁর প্রিয়তমার কানে। "সত্যিই ভালবাসি, হজরত"—রম্ভার কোকিল-কণ্ঠ বহুক্ষণ ধরে ঝংকার তুলে ফিরল। "তোমার প্রাণের চেয়েও বেশী ?" ধীরস্বরে বললেন আদিল শাহ্। "আপনি কি আমার প্রেমে সন্দেহ করেন, জাঁহাপনা ?" শঙ্কিত আবেগে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে রম্ভার কণ্ঠ। কৌতুকে নেচে উঠল সুলতানের দু'টি চোখ। কপট গাম্ভীর্যে বললেন, "না হলে প্রশ্ন করব কেন ?" বজ্রনির্ঘোষের মতো সে ধ্বনি বিমূঢ় করে দিল রম্ভাকে। অকস্মাৎ বাতাসে ভেসে উঠল শুধু রেশমী কাপড়ের খসখস শব্দ আর ... আর পরক্ষণেই অলিন্দ থেকে নীচে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রূপসী রম্ভা।...

অতীতের এই করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে আপনি যখন গোল গম্বুজে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার সমাধির উপরের তল দিয়ে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে যাবেন তখন আপনার মৃদু চরণধ্বনি মেঘডম্বরের ন্যায় প্রতিধ্বনি তুলবে। ... আমাদের এই বিশাল দেশে মোটরগাড়িতে ভ্রমণের অন্যতম সুখ হ'ল অসংখ্য পুরাকাহিনী ও লৌকিক উপাখ্যান শোনার অপূর্ব সুযোগ আর অজানাকে আবিষ্কার করার অনাবিল আনন্দ।

ভারতে টায়ার শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা

DC-580 BEN

দেখছেন, সার্ফে কাচা খুকুর জামা কি ধবধবে ফরসা! সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাই সহজেই এত ফরসা কাচা হয়। শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সবই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—তফাৎটা দেখবেন!

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

SU. 25-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

HOW YOU CAN HELP

KEEP PRICES DOWN

PRODUCE MORE

Work more. Increase production. Cut out all slow methods. Be regular and punctual. It is that extra effort that produces more and adds strength to our fighting power.

GROW MORE

Get bigger yields from your fields. Sell your produce at fair prices. Food for all and none to waste.
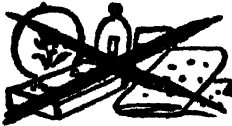
SPEND LESS

Buy only when you must. Avoid all wasteful expense. No feasts or festivities.

SAVE MORE

Save all you can and invest in the new Defence Savings Schemes. The more you save, the bigger the build-up of the country's defence power and quicker the victory.

পায়ে হেঁটে পরমায়ু
রোদের খরতা যখন কম, ঘর ছেড়ে আসুন
বাইরে—খোলা হাওয়ায়। চলুন পায়েহাঁটা পথ ধরে
যেখানে দু'চোখ চায়, বাধা নেই সেই প্রান্তরে।
খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, এই পথ প্রকৃতির। তাই নীরোগ
আনন্দ এই পথে, এই পথে পরমায়ু। এই হাঁটাপথে
চলতে পথিকের পরম বন্ধু বাটা।
টাফিন ১১.৯৫—১৪.৫০
আভা ১২.৯৫
লংলাইফ ডার্বিকোর্ড ১৬.৫০
কমফর্ট ২৪.৯৫
Bata
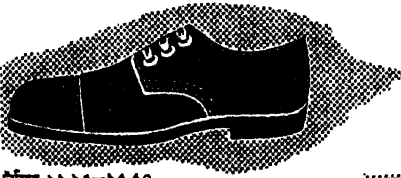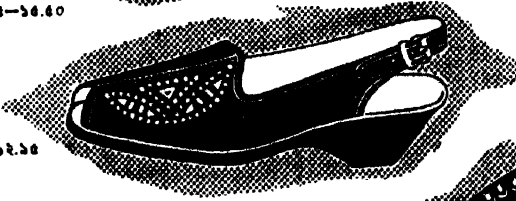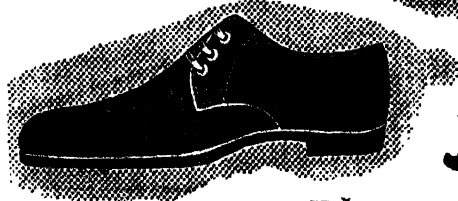
আমাদের সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার এখনই সময়

আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। সদা সতর্ক থাকুন, প্রতিজ্ঞায় অটল থাকুন—**কারণ এটা আপনাদেরই যুদ্ধ।** যা করার এখনই করুন। জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুন ● সমস্ত রকম অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং সব রকম অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করুন ● খাদ্য ও বস্ত্র মূল্যবান জিনিষ। এগুলির অপচয় করবেন না ● সময়ও অত্যন্ত মূল্যবান। ঘণ্টা বা দিন হিসেবে সময়ের পরিমাপ করবেন না, আপনি কতটুকু কাজ করলেন সেই অনুযায়ী সময়ের পরিমাপ করুন ● আপনার দায়িত্বগুলি পালন করুন। সব সময়ে সব জিনিষ শৃঙ্খলার সঙ্গে করুন।

সদা সতর্ক থাকুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৯

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

চতুর্বিংশতিতম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯

সাহিত্য সমাজ ও ইতিহাস

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য ও ইতিহাস—শব্দ দুটি এতই পরিচিত সহজবোধ্য এবং এদের শিষ্টজনোচিত ব্যবহার আমাদের আলাপ-আলোচনায় এতটা ছড়িয়ে থাকে, যে তাই নিয়ে আবার ব্যাখ্যা ও চর্চা ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে। কথা দুটির সাধারণ সংজ্ঞা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে অনেক সময় এদের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, এমন কি সর্বজনস্বীকৃত পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে অনেক ছোট-খাটো বোঝবার জিনিসও পার্শ্বচরিত্রের মতো নজর এড়িয়ে যায়। বৃহৎ কালের আয়ত পটভূমিকায়, প্রশস্ত আলাপের সহজ বিস্তারে, ভাসা-ভাসা রকমের দর্শন মাত্র দিয়ে ভালো করে ধরবার আগেই ঐ সব খুঁটিনাটি তথ্য তলিয়ে যায়। সুতরাং সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তব্য বেশ স্বচ্ছ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেও অনেক স্থলে বিশ্লেষণে উপযোগিতার অভাব দেখা দেয়। তাই অবতরণিকা পুরাতনী হলেও এর প্রয়োজন আছে।

সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়েই পরস্পরের কক্ষপথে প্রবেশ করে' কখনও পরস্পরকে স্পর্শ করে, কখনও বা করে না। কিন্তু সংক্রান্তি হোক অথবা অতিক্রান্তিই হোক, উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকেই। এ সম্পর্ক কখনও দৃশ্যমান, কখনও অপ্রকাশিত। কিন্তু কোথায় একটা সমধর্মিত্ব আছে এবং থাকবেও, যত দিন সাহিত্য আর ইতিহাসে মানুষের মন ও কর্ম প্রতিফলিত হতে থাকবে। বর্তমান সমাজ-চেতনার যুগে আমরা চেতনা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছি। তবু পুনরুক্তি হলেও এ কথা খুবই সত্য যে, ঐ সমাজ-চেতনা উভয়ের মধ্যেই রক্তবাহী নাড়ীস্পন্দনের মতো কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের একটি প্রকাশ হল ইতিহাস, অনেকটা বাহ্য এবং প্রত্যক্ষ। ঘটনা হোক, আন্দোলন হোক, চিন্তা হোক বা কর্মই হোক, ইতিহাসে—বিশেষ করে সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসে, ফলাফলগুলো যেন আরও স্পষ্ট ও বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। আর সমাজের যেটি অন্য প্রকাশ অর্থাৎ সাহিত্য, তার মধ্যে ঐ সব জিনিসই আছে, তবে অতটা প্রত্যক্ষ ভাবে নয়। তার কারণ, যে ব্যক্তি সাহিত্য রচনা করছেন তাঁর নিজস্ব মন, আর যে সব কথা এবং যে সব মানুষ, তাদের ভাবনা ও ক্রিয়া-কলাপ সাহিত্যের বিষয়ীভূত, এই দুটো প্রধান উপকরণে বাস্তবের সঙ্গে বেশ কিছু কল্পনার

মিশ্রণ ঘটে থাকে।

তবু মর্মজ্ঞ পাঠক, প্রকৃত সমালোচক ভালো করে খুঁটিয়ে নজর দিয়ে পড়েন বলেই, সেই ব্যক্তিনির্ভর মানসচিত্রের ভিতর সমাজের হয়তো একটি বিশিষ্ট কালের ছবি দেখতে পান। আর একটি কথা। লেখকের মন বা মনন যতই স্বকীয় হোক, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র যতই নিজস্ব চিন্তায় ও কর্মে চালিত হোক, তারা বায়ুশূন্য নিরালম্ব নিরাসক্ত পদার্থ নয়। স্ব-তন্ত্র, এমন কি উদ্ভট বা অসামাজিক হয়েও তারা সমাজেরই জীব, তার আবহের বহির্ভূত নয়। সমাজের ছাপ তাদের মনে ও আচরণে পড়েইছে, হয়তো বিপরীত প্রক্রিয়ায়। কিন্তু যে কারণে একটি মন বা চরিত্র স্বাভাবিক, আবার আর একটি মন বা চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক, সেই কারণটি সমাজ-পরিস্থিতিরই অনুকূল প্রভাব অথবা বিপরীত প্রতিক্রিয়া। তাই বলা চলে, সাহিত্য ও ইতিহাস দু'ধারের দুটি পাল্লা। মাঝখানে দাঁড়িতে ভার-সাম্য রক্ষা করে সমাজ।

বিভিন্ন লেখক তো ভিন্নধর্মী হবেনই। এক এক জনের চিন্তা ও তার ফলস্বরূপ সৃষ্টি এক একটি ছক বা প্যাটার্ন রচনা করে। কিন্তু ছকে বা নকশায় যতই পার্থক্য এবং অভিনবত্ব থাকুক. একটা বিশিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। সুতরাং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়েও তাঁরা একটি যুগেরই বিভিন্ন ফল। সে ফলগুলি কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর—নানা রসের সামগ্রী হতে পারে। কিন্তু 'রসো বৈ সঃ' হন যদি মহাকাল, তা হলে সেই অখণ্ড প্রবহমান সময়-স্রোতের একটি অংশ-বিশেষ রস আশ্রয় করে আছে কাল-পরিমিত ভাব-নিয়ন্ত্রিত একটা বিশিষ্ট সমাজ।

তবে সব চেয়ে বড়, যদিও সাধারণ, কথা হচ্ছে—তলিয়ে পড়তে হবে। ইতিহাস বা সমাজ-বিজ্ঞানের যিনি চর্চা করছেন, তাঁর কাছে উপাদান হিসেবে সাহিত্যের মূল্য অশেষ, ব্যবহারের. সুযোগ-সম্ভাবনাও প্রচুর। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যেটি প্রধান ও প্রাথমিক প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে ব্যবহার-কর্তা সত্যকারের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কাজ করবেন। তাঁকে অনেক নমুনা ঘাঁটতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে, সূক্ষ্ম সূত্রগুলি চিনে বার করতে হবে। উপর-উপর চোখ বুলিয়ে ভাসা-ভাসা সাধারণ মন্তব্য খাড়া করা অবিবেচনার দায়িত্ব-হীন কাজ। এবং সে কাজে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গ ঠিক উলটো দিকে ঘুরিয়ে বলা চলে, সমাজ-ইতিহাসের জ্ঞান-অধ্যয়ন থেকেও সাহিত্যের বোধ তেমনই অনেকখানি লাভবান হতে পারে। মনে হয়, অনেকের যে ধারণা আছে বেশি পড়াশুনা করলে সাহিত্যিক তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেন, অধীত বিদ্যার চাপে ও ছাপে তাঁর নিজস্ব ধার নষ্ট হয়ে যায়, তার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর নেই। যিনি গল্প লেখেন. তিনি স্বদেশের ও বিদেশের কথাসাহিত্যের ইতিহাস-ধারা জানবেন না, নমুনা আস্বাদ করবেন না? যিনি কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করেন, তিনি দেশী-বিদেশী কাব্যের ঐতিহ্য বা বিভিন্ন জাগ্রত মনের চিন্তাধারা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে মৌলিক অযোনিজ হয়ে ওঠার দাবী করবেন?

সমাজ, সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে যে পারস্পরিক অন্বয় রয়েছে, তার সূত্রগুলি মিলিয়ে দেখা যাক্। প্রথম কথা হল—খাঁটি ইতিহাসের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভার সংক্রমণ। একাধিক ইতিহাস-গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা আমরা পড়েছি অথবা যার কথা শুনেছি, এবং যাদের সম্বন্ধে বলতে পারা যায় যে সেগুলি সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ তাদের মধ্যে সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে লেখার গুণে, ভাষা ও ভাব-প্রকাশের ভঙ্গীতে তারা সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন করেছে। এ সব গ্রন্থের ইতিহাস-মূল্য হয় তো পরবর্তী

কালে তেমন আমল পায় নি, কিছুটা পুরানো বলে' অথবা তথ্যের অভাব কিংবা নতুন তথ্য-প্রমাণের আবিষ্কার হয়েছে বলে', তারা হয়তো খানিকটা বাতিল হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস হিসেবে তাদের প্রামাণ্য এখন স্বীকার করা না গেলেও, তাদের সাহিত্যিক গুণ আজও অগ্রাহ্য নয়। গিবন-রচিত রোমান সাম্রাজ্যের অধোগতি ও পতন, মেকলে-র ইংলন্ডের ইতিহাস, কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লব, ফ্রুড-এর ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ নাবিকদল কিংবা ক্রিজি-র লেখা পৃথিবীর যুগান্ত-কারী পনেরোটি যুদ্ধ-কাহিনী—এ সব বই পুরাতনগন্ধি হলেও অবসর-সময়ে আজও চিত্ত-বিনোদন করে। যে কোনও সময়ে এদের সবটা নয়, তবে অংশ-বিশেষ খুলে উপভোগ করা চলে নিশ্চয়ই।

দ্বিতীয় সূত্র—এরই আরেক দিক, অর্থাৎ ইতিবৃত্তের এলাকায় সাহিত্যের অনুপ্রবেশ। এ ঘটনাও বহুবার ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনা আজও সমানে রচিত হচ্ছে—কি স্বদেশে কি বিদেশে। আমাদের প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু ও মুসলিম কাহিনী-লেখকদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। হিন্দু যুগের প্রচলন সাহিত্য পুরো ইতিহাস নয়। কিন্তু এদের যথাযথ ইতিহাস-মূল্যে কোনও পণ্ডিতই অস্বীকার করেন নি। বাণভট্টের হর্ষ-চরিতকে পুরোপুরি সাহিত্য বলা যায়, অথচ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার আজও প্রচলিত, অতি-প্রশস্তির যথেষ্ট সমালোচনা সত্ত্বেও। সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত রামচরিত একটি দ্ব্যর্থবোধক শ্লেষ-সমন্বিত রচনা। কিন্তু এক অর্থে শ্রীরামচন্দ্র, অপর অর্থে রামপালের চরিতকথা বলে' এবং নানা অলঙ্কার-প্রযুক্ত ও অত্যুক্তিময় হয়েও, এ গ্রন্থ পাল-ইতিহাসের একটি প্রধান উপকরণ। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী, বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কচরিত, চাঁদ বরদই-কৃত পৃথ্বীরাজের কাহিনী, জায়সীর পদ্মাবতী ইত্যাদি বহু ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনার সাহিত্যিক মর্যাদাও তেমনই অক্ষুণ্ণ। এ সব লেখাকে, এক কথায়, ঐতিহাসিক সাহিত্যের গোষ্ঠীতে ফেলা যায়।

বাংলার নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্যের নমুনা চর্যাপদ ও বৌদ্ধ দোঁহার মধ্যে পণ্ডিতরা সামাজিক ইতিহাসের তথ্য সন্ধান করেছেন। যেমন আবার সেই সন্ধান পাওয়া যায় বাংলার মঙ্গল-কাব্যগুলিতে। লোক-সাহিত্য সর্বদেশেই একাধারে সাহিত্য আবার লোক-শিক্ষার বাহন, অবজ্ঞাত ও অস্ফুট সমাজ-কথার দূরায়ত দর্পণ-বিশেষ। অপর পক্ষে, ইতিহাসের কোনও দূর-বিশ্রুত অর্ধ-বিস্মৃত ঘটনা অবলম্বন করে যতগুলি কাব্য রচিত হয়েছে, যত-গুলি উপন্যাস লেখা হয়েছে, বিশ্ব-সাহিত্যপঞ্জীতে তাদের সংখ্যা বোধ হয় অগণিত বলা চলে। শুধু ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের কথা যদি ধরি, তা হলেও এ জাতীয় গ্রন্থ-সংখ্যা সহস্রাধিক নিশ্চয়ই। বিলাতে স্কট লিটন থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের বহু লেখক ঐতিহাসিক কোনও কাহিনী বা স্মৃতি অবলম্বন করে বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। আর বাংলা সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আধুনিক কোনও কোনও লেখক এই জাতীয় রচনায় কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। কেউ ইতিহাসের তথ্য অবিকৃত রেখে গল্প রচনা করেন, কেউ বা কাঠামো মাত্র রেখে কাল্পনিক দৃশ্য চরিত্র আমদানি করে একটি কালোপযোগী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন। এই পরিমণ্ডল বা তৎকালীন জগৎটাই কিন্তু আসল কথা, যেহেতু সেই জগৎকে চিনে বুঝে যথাযথ ফুটিয়ে তোলার জন্য দরকার হয় ইতিহাস-চেতনা। এই চেতনাই যুক্ত হয় একদিকে শিল্প-বোধ অপর দিকে সেই বিশিষ্ট কালের সমাজ-জ্ঞানের সঙ্গে।

বলা বাহুল্য, সাহিত্য ও ইতিহাসকে এই ভাবে অন্বিত করা খুব সহজ কাজ নয়। ইংরেজী সাহিত্যে এ জাতীয় উপন্যাসের নমুনা অজস্র থাকলেও, পুরোপুরি সার্থক রচনা বলতে যা বোঝায়, বর্তমান কালে তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে কয়েকজন লেখকের রচনা। রোমান ও কেলটিক ব্রিটেন নিয়ে লেখেন নাওমি মিচিসন, গ্রীক ও রোমান-কাল নিয়ে রবার্ট গ্রেভস এবং ক্রীটান সভ্যতার যুগ নিয়ে লেখেন হাল আমলের মেরী রেনল্ট। এ'দের হাতে সাহিত্য ও ইতিহাস একাত্ম হয়ে উঠেছে। যে শিল্পকৌশলের গুণে ইতিহাস-ভাবনা প্রকৃত সাহিত্যের আস্বাদ অর্জন করে, তার পরিচয় ঐ তিনজন বিদগ্ধ লেখক দিতে পেরেছেন। মিশরের অতি-প্রাচীন *Tale of Sinube,* চীনের কনফ্যুশিয়ন ও মান্দারিন আমল, জাপানের ফিউডাল শোগান-যুগ প্রভৃতির অতীত সমাজচিত্র পুনর্গঠন করে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয়েছে গত তিরিশ বছরে। এবং এই শ্রেণীর রচনায় যে শিল্পসহানুভূতির, কল্পনা-উপলব্ধির প্রয়োজন ঘটে, তাকে কেবল revivalism বা period-piece বলে ঔদাসীন্য দেখালে অবিচার করা হয়।

খাঁটি ইতিহাস কখন ও কি ভাবে সাহিত্যের রম্যতা ও মহত্ত্ব গুণ লাভ করেছে, তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। Mommsen, Burckhardt-এর লেখায় কল্পনার প্রসার, দৃষ্টির পরিধি এবং বর্ণনায় কাব্যের চরিত্র-প্রসাদ প্রতিকূল সমালোচকরাও স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু সাহিত্য কখন ও কি ভাবে ইতিহাসের পরিচিতি নিয়ে উপস্থিত হয়, ইতিহাসের উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়, সেইটিই মুখ্য আলোচ্য। বিদেশের জাতীয় মহাকাব্য, saga ও chronicle-চক্রগুলি কেমন করে বিস্মৃত যুগের সমাজ-ইতিহাস সরবরাহ করেছে, সমাজ-তত্ত্বের ছাত্ররা সে কথা জানেন। আমাদের দেশেও তেমনি প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের মালমসল্য সংগ্রহ করা যায় বেদ, ব্রাহ্মণ ও সংহিতা, মহাকাব্য, পুরাণ এবং প্রাচীন কালের 'আখ্যান-আখ্যায়িকা' থেকে। যখন অন্য কোনও ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যায় না, তখন এই সব আকর-গ্রন্থই আমাদের একমাত্র ভরসা।

কারণ এদের মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে অলিখিত ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের মূলবান উক্তি এই সত্যকেই সমর্থন করেছে। কোনও দেশের বা জাতির অর্ধ-জাগ্রত ক্রমস্ফুরিত চেতনা প্রচলন-সাহিত্যের মাধ্যমেই ধরা দেয়। যা কিছু শ্রুত অলিখিত, যা কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার, এমন কি জনশ্রুতি, কিংবদন্তী—অর্থাৎ যার মধ্যে জাতীয় সত্ত্বার বা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, সেই সব জিনিসই ব্যাপক অর্থে ইতিহাস। কবি এই সব মালমসলা, এই তথ্য-সম্ভারকে ইতিহাসের 'রূঢ় দ্রব্য' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। রূঢ় দ্রব্য বিদেশ ঘুরে 'পণ্য দ্রব্যে' রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এলেই তার মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। নইলে তাদের কদর হয় না, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন। সাধারণ চলিত অর্থে যাকে ইতিহাস বলা হয়ে থাকে, কবি তার চেয়ে গভীরে গিয়ে হেলায় ছড়ানো সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অগোচর জাতীয় ঐতিহ্য-স্মৃতিকেই প্রকৃত ইতিহাস বলে সমাদর জানিয়ে-ছিলেন।

গত পঞ্চাশ বছরে এখন এই কথাটাই পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হয়েছে, ইতিহাসের মূল সমাজের আদিম স্তরে। কোনও দেশের নিজস্ব ইতিহাস, স্থানীয় আঞ্চলিক ইতিহাস সন্ধান করতে হলে যেতে হবে তার সাহিত্যে—যেখানে রয়েছে তার আদিম শিকড়। উভয়েরই প্রাণরস আসছে মাটির নীচে থেকে—যাকে বলা হয় anthropological roots। সাহিত্যের নমুনা নিয়ে 'মিথ্' উপকথা প্রভৃতি লোক-স্মৃতি বিশ্লেষণ করে', কি ভাবে সাহিত্যকে ইতি-

বৃত্তের পুনরুদ্ধারে প্রযুক্ত করা যায় এবং পৌরাণিক আখ্যান-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে জাতীয় সমাজ-সত্তার মূল দর্শনে পৌঁছানো যায়, টমসন তাঁর বিরাট গ্রন্থে তা দেখিয়েছেন। ফ্রাঙ্ক-ফার্টও অনেকটা তাই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমাজ-বোধ, ইতিহাস-বোধ আর সাহিত্যের সংজ্ঞা-বোধ, এ তিন পদার্থের যে দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল, তা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নয়। যে সব ভাব ধারণা চিন্তা কর্ম প্রচেষ্টা সাহিত্যের অন্তঃস্থলে গুপ্ত হয়ে থাকে, সেই সব সুপ্ত বিস্মৃত তথ্য অতীতের পথে আসতে আসতে পড়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। এই হৃত সামগ্রীর পুনরাবিষ্কার হল ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য, অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। পুনর্বিচারে তাদের যথাযথ প্রতিষ্ঠা হল সংবেদনশীল সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব। যা তমসাচ্ছন্ন বলে বোধ হয়, যাকে মৃত অবলুপ্ত মনে হয়, তা অনুপস্থিত নয়। জ্ঞানের অভাব মানে অনস্তিত্ব নয়। ছাত্রের প্রতি Oman-এর সেই বিখ্যাত জবাব মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। অধ্যাপক অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছিলেন Dark Age সম্বন্ধে—'It is only dark to you!'

ইতিহাসকে মানুষ অনেক কাজে লাগিয়েছে সজ্ঞানেই। কখনো তা সাহিত্য-কর্ম হয়ে উঠেছে অনুপ্রেরিত ব্যঞ্জনায়, কখনো বা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ও ব্যাখ্যায় দর্শনের কোঠায় পড়েছে। ইতিহাস হয়েছে চরিত-কথা, ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকাশ-কথা। আবার কখনো তা রাজনীতির চর্চা, কখনো বা বিশেষ মতবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচার-কর্ম। সাহিত্যও তেমনই মানুষকে বহুবিধ প্রেরণা জুগিয়েছে। সাহিত্য পড়ে মানুষ বুঝতে চেয়েছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার রূপকে, শিল্পসাহিত্যের ধারাকে, মানবাত্মার অভিন্ন প্রকৃতি ও মাহাত্ম্যকে—এক কথায়, মানুষ জানতে চেয়েছে, চিনতেও শিখেছে মানুষকে এবং সমষ্টি-ধর্মকে, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য আর মূলগত ঐক্যকে।

ভালো সাহিত্য মাত্রেই সমাজের একটা রূপোদ্ঘাটন। এই প্রকাশমুখিতা, অর্থময়-তাকে অঙ্গীকার করাই হচ্ছে সাহিত্যের সাফল্য, তার প্রকৃত গৌরব। এটি আলোচনার তৃতীয় সূত্র, কার্যতঃ দ্বিতীয় সূত্রেরই অনুসূত্র হিসেবে ধরা যেতে পারে। সাধারণ ভাবে সাহিত্যের মারফৎ পাওয়া যায় বিভিন্ন কালের মানুষ কি বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছে ও কি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। তার পর যুগ-পরিবর্তনে সে সব চিন্তা ও প্রচেষ্টা, আচার-ব্যবহার কেমন বদলেছে,—সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপান্তর কি রকম স্বাভাবিক ভাবে তাদের ভাব ও কর্মকে প্রভাবিত করেছে, বিভিন্ন দেশের এক একটি যুগের এই সব স্বাভাবিক পরিবর্তন তৎস্থানিক ও তৎকালীন অথবা প্রায়-সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, এটি সুপরিচিত সত্য। সাহিত্য যদি মনের সহজ প্রকাশ বলে স্বীকার করা যায়, তা হলে নির্ধারিত ঘটনার সাজানো কাহিনীর চেয়ে বহির্জগতের পিছনে, দৃশ্যমান তথ্যের অন্তরালে অন্তরের যে সব ভাবনা কামনা কাজ করছে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত পরিচয় সামাজিক ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত হিসেবে কম মূল্যবান নয়। সমাজ-শক্তি বেশির ভাগ প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। তার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া মানুষের চিন্তায় ও কর্মে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে মানুষ ঠিক সচেতন থাকে না। সমকালীন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় অনেকটা অজ্ঞাতসারেই। সাহিত্য এই যুগধর্মের চাপ ও প্রক্রিয়া, সমাজের আকৃতি প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করে, তাই তার মানবিক আবেদন। সাহিত্য ও ইতিহাস—দুইটিরই মানুষ নিয়ে কারবার। কিন্তু বোধ হয়, সাহিত্যে মানুষ নিজের চেহারা আরও পরিষ্কার ভাবে দেখতে পায়, সমাজের বিস্তৃত পটভূমিতে নিজেকে খুঁজতে শেখে।

এর অর্থ নয় যে সাহিত্যকে প্রাপ্যের অধিক মর্যাদা দেওয়া উচিত, কিংবা আধুনিক মনের ইচ্ছা জল্পনা মতামত প্রভৃতি অর্থগৌরব সাহিত্যের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করানো হচ্ছে। সাহিত্য যে চিন্তা ও কর্মের ফল, সাহিত্য যে সমাজ-ইতিহাসের মূল্যবান দলিল, এ কথা বর্তমান কালের অনেক আগে—এমন কি মধ্য যুগেও, স্বীকৃত হয়েছিল। খলদুন ও আলবেরুনী যে দুই সভ্যতার ইতিহাস-রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তাতে সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। এঁদের পর্যবেক্ষণী শক্তি অসামান্য ছিল সন্দেহ নেই। বিশেষ করে খলদুন, যিনি বিশ্ব-ইতিহাসে প্রথম সমাজ-বিজ্ঞানী পণ্ডিত, যিনি সমাজ-ইতিহাসের মূল সূত্র ও তার বিভিন্ন অনুসূত্র-গুলি অত আগে চিনতে পেরে তাদের যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। যে জিজ্ঞাসায় সাহিত্যের সৃষ্টি, তারই অনুসন্ধিৎসায় সমাজ-ইতিহাসের জন্ম—এ সত্য মনে প্রাণে উপলব্ধি না করলে মধ্যযুগে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব হত না।

জীবনযাত্রার পদ্ধতি, সামাজিক পরিবেশ, নিয়ামক বিধি-ব্যবস্থা, আদর্শগত চিত্র যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই ইতিহাসের বীজ। সুমের-আক্কাদ, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীনতম সাহিত্যেই সেই আদি ইতিহাস সন্ধান করতে হয়। এদের উপকথা, পৌরাণিক আখ্যান, ধর্মীয় বিশ্বাস, দেবতাদের স্তুতি ও পূজা, সামাজিক বিধি-নিয়মগুলির মধ্যে দেশগত পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সভ্যতার প্রত্যুষকালে কোথায় একটা বড় মিল রয়েছে, যা সব নদীমাতৃক কৃষিপ্রধান আদি সমাজ-পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুমেরের প্রাচীনতম কাহিনী Adapa-র গল্পে মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসা, তার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে যম ও নচিকেতার কাহিনীতে। এই জীবন-জিজ্ঞাসা ও পরপারের রহস্যভেদের চেষ্টা, চিরন্তন শক্তি-সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার অর্জনের প্রয়াস পুনরাবৃত্ত হয়েছে ব্যবিলনের *Epic of Gilgamesh* নামক জাতীয় কাব্যে।

সুমেরের আর একটি উপকথা আছে, তাঁতি Tagtug-এর কাহিনী। দেবতারা মানুষকে সুখী করেই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সজ্ঞানে পাপ করার জন্য শাস্তি এল ভয়াবহ প্লাবনের রূপে। সকল জীবেরই প্রাণ গেল, বেঁচে রইল শুধু Tagtug। তবে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে তারও দীর্ঘায়ু হ্রাস হল, স্বাস্থ্যনাশ হল। এখন এই পৌরাণিক কাহিনী বাইবেল-বর্ণিত মানুষের আদিম পাপ ও শাস্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্পষ্টই বোঝা যায়—সুমেরীয় গল্পটি সেমিটিক উত্তরাধিকার রূপে ইহুদী সাহিত্যে স্থান পায় নোয়া-র গল্পে, এবং আদম ইভ-এর original sin-এ রূপান্তরিত হয়। তা ছাড়া, ঐ ভয়ঙ্কর মহাপ্লাবন নিশ্চয়ই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তুষার-যুগের পরবর্তী কালে বরফ যখন গলতে শুরু করে, তখন সেই জলরাশির তুমুলোচ্ছ্বাস এবং ধ্বংস-মূর্তি এশিয়ায় বহু অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যে ধরা আছে। চীনাদের পৌরাণিক উপকথায় তার স্থান আছে, মানু-রাজাদের রাজত্বকালে এক স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে। আর সেই প্রলয়কারী বন্যারই লোকস্মৃতি ভারতীয় সাহিত্যেও রক্ষিত আছে—'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি শরীরং......।' যাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে প্রাক্-ইতিহাস-সন্ধানী, mythology'র চর্চা ও তুলনামূলক আলোচনা না করে তাঁদের উপায় নেই।

আবার মিশরের *Myth of Osiris* সম্পর্কেও ঐ এক কথা। মরলোক, পাতাললোক ও স্বর্গলোক নিয়ে মানুষের জল্পনা-কল্পনা এই উপকথায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস, পাপপুণ্যের বিচার, শাস্তি ও পুরস্কার এখানে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি যেন পাওয়া যায় বাইবেলের Resurrection ও Judgement Day সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসে। উপরন্তু এই *Cult of Osiris* এতই জনপ্রিয় হয় প্রাচীন মিশরে যে, কাহিনীর নাট্যরূপ বিশেষ বিশেষ উৎসবে ভক্তিমান দর্শকদের দেখানো হত, যেমন Oberammergau-তে Passion Play আজও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। Osiris-myth যে আসলে Vegetation-myth, শীতার্ত পৃথিবীর হিমশীতল মৃত্যুর পর বসন্তে যে তার নবজীবন লাভ হয়, এ ব্যাখ্যাও সুপরিচিত এবং গ্রীসে Pluto ও Proserpine-এর কাহিনীতেও ঐ প্রাচীন মিশরী উপকথারই পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের গঙ্গা, মিশরের নীল। জীব-কল্যাণদাত্রী দেশপালিকা নদীকে দেবতা-জ্ঞানে উভয়ের আবাহন-রীতি অনেকটা একই। মিশরের ধর্মবিপ্লবকারী ফ্যারো ইখ্‌নাটন-রচিত যে 'অ্যাটন'-স্তুতি মন্দিরগাত্রে খোদিত আছে, তার সঙ্গে ইহুদীদের ১০৪ সংখ্যক Psalm এবং আমাদের বৈদিক ঊষা-স্তবের আশ্চর্য সাদৃশ্য. কি ভাষায় কি ভাবে। উদাহরণ-বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। প্রাচীনতম সাহিত্যের মধ্যে প্রাক্‌ইতিহাস কালের সমাজচিত্র-প্রসঙ্গ শেষ করি শুধু এইটুকু বলে যে, ক্রীটে ঈজিয়ন সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঐ অনুদ্‌ঘাটিত Minoan লিপি এবং সিন্ধু সভ্যতার অপঠিত লিপির পাঠোদ্ধার যখন সম্ভব হবে, তখন উভয় ভাষার অর্থভেদ হলে লুপ্তসম্পর্ক কোনও এক বৃহত্তর সমাজ-রহস্যের হয়তো লক্ষ্যভেদ হবে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় "ইলিয়ড" এবং "ওডিসি" হল প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি। এই দুই জাতীয় মহাকাব্যে ইতিহাসের বহু সূত্র ছড়ানো আছে। হোমরের রচনায় অপসৃয়মান মাইকিনির স্বর্ণযুগ আর নবাগত 'আখীয়ান' যুগ—এ দুয়ের মিশ্রণ ঘটেছে। এখানে দুই যুগের সমাজ-চিত্র শুধুই ধরা পড়ে নি, লোকস্মৃতি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে য়ুরোপের প্রাচীনতম রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা. আচার-ব্যবহার. শৌর্য-বীর্য. ধর্ম ও সংস্কার অনেক কিছুই বুঝতে সাহায্য করেছে। সেই রকম স্ক্যান্ডিনেভিয়ার Edda, ইংলন্ডের Beowulf, জার্মানির Nibelungenlied প্রভৃতি বিভিন্ন গাথা ও কাহিনী; মধ্য যুগে Arthurian legend, Chanson de Roland ও Troubadourদের গান এক একটি দেশের বিস্মৃত-প্রায় সমাজ-ধর্ম ও সমাজ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেছে। পেগান ও খৃস্টান য়ুরোপের মানস-ইতিহাস এই ভাবেই তার আঞ্চলিক সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে এবং অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস-পাঠকের কাছে এই সব নমুনার অনুশীলন ও তুলনামূলক চর্চা অপরিহার্য বলেই গণ্য হয়।

আমাদের দেশের প্রাথমিক ইতিহাসও ঐ রকম খুঁজে বার করতে হয় দেশের প্রাচীন সাহিত্য থেকেই। এ দিক থেকে মহাভারত তো বিশ্বকোষের সামিল। কথায় বলে—"যা নাই 'ভারতে', তা নাই ভারতে।" এ ছাড়া বেদ পুরাণ রামায়ণ তো আছেই। ভারতের ঐতিহ্য কি ভাবে তার প্রাচীন সাহিত্যে বিধৃত হয়ে আছে. সে কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক রচনায় বলে গেছেন। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, ভারতের প্রাচীন সমাজ, ধর্ম ও সংস্কার, এমন কি রাষ্ট্র-ইতিহাসের অনেক তথ্য, বিভিন্ন রাজ-বংশের তালিকা ইত্যাদি পুরাণের দৌলতে পাওয়া যায়। ইন্ডোলজির চর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে পুরাণের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য অশেষ। প্রাচীন রাজাবলীর উল্লেখ-পরিচয়ে, বিভিন্ন রাজবংশের কালনির্ণয়ে অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত পুরাণেরই নজির দেখিয়েছেন, নানা অসঙ্গতি অশুদ্ধি ও পাঠান্তর সত্ত্বেও

পুরাণের সাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ সব সুপরিচিত সত্য।

অবশ্য এ কথা ঠিক, যে জিনিস আকারে প্রকারে একটি শিল্প, তা দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস-চর্চার দাবী মেটানো সত্যই কঠিন। যাঁদের ধারণা 'No document, no history'—যেখানে দলিলপত্র নেই, সেখানে ইতিহাসও নেই—যাঁরা রেকর্ড আর কাগজপত্র ছাড়া ইতিহাসের অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন না, ইতিহাসের একটি মৌলিক উপাদান বলে স্রেফ্ সাহিত্য হজম করা তাঁদের পক্ষে শক্ত। যাঁরা সাহিত্যকে আবার পুরোপুরি শিল্প-সামগ্রী ও মানস সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ, তাঁরা সাহিত্যকে এই ধরনের গম্ভীর চর্চায়, বাস্তব তথ্যসন্ধানে নিযুক্ত করায় কোনও উৎসাহ বা আনন্দ পাবেন না। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটকগুলিতে খাঁটি নির্ভুল ঐতিহাসিক সত্যের পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তাদের মধ্যে এমন জিনিস সব আছে যা ইতিহাসের পাতা খুঁজলে মিলবে না। ঐতিহাসিক গবেষণায় হয়তো কোনও সময় ধরা পড়বে, Sir Thomas More-এর এবং টিউডর যুগের প্রচলিত বিবরণ-অনুযায়ী তৃতীয় রিচার্ডের আকৃতি-প্রকৃতি ও নৃশংস কার্যাবলী শেক্‌স্‌পীয়র যে ভাবে অঙ্কিত করেছেন, তার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ আছে। কিন্তু দলীয় স্বার্থ-প্রণোদিত সাময়িক বিবরণের সত্যাসত্য নির্ধারণ অথবা ত্রুটি-সন্ধান সাহিত্যিকের মুখ্য কর্ম নয়। বরঞ্চ যে সব চরিত্র ও ঘটনার কথা জানা আছে, শেক্‌স্‌পীয়র তার চেয়ে বেশি কিছু দিয়েছেন। চরিত্রের উপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, গূঢ় উদ্দেশ্য, মনের সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া, কোনও বিশেষ পরিস্থিতির বিচিত্র সম্ভাবনা এবং নাটকীয় পরিণতি—এইগুলি নাট্যকারের দান। বাস্তব ও ঐতিহাসিক কল্পনার মিশ্রণে যে জিনিস তৈরী হয়, তা নির্ভেজাল ইতিহাস হয় তো হল না। কিন্তু Lancastrian ও Yorkist আমলের স্বার্থসন্ধী সামন্ত সমাজের ভাঙন-ধরা চেহারা, অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চাশী অভিসন্ধি—যে সব কথা *Governance of England* বা *Paston Letters*-এর মধ্যে ছড়িয়ে আছে—সেগুলির যথার্থ শিল্প-চিত্রণ তো সাহিত্যেই পাওয়া গেল। ঐতিহাসিক ভূমিকার যে প্রস্তুতি রচিত হল, মধ্য যুগের শেষে ক্ষীয়মান বিশৃঙ্খল যে ফিউডাল সমাজ-চিত্র তারই ভিতর থেকে ফুটে উঠল, সেইটাই যথেষ্ট লাভ।

ঐতিহাসিক তথ্যের নিরাভরণ রূপ গবেষকের ঈপ্সিত-আদর্শ। কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে দেশমর্ম ও যুগধর্মের চরিত্র বুঝতে হলে, সমাজ-সচেতন দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রসত্যকে গ্রহণ না করলে চলে না। মুঘল-মারাঠা ও কোম্পানির প্রথম আমলের ইতিহাস জানবার জন্য বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের উপন্যাস অপরিহার্য না হতে পারে। কিন্তু দেশের চেহারা, সমাজের অবস্থা, জাতীয়তা বোধের উন্মেষ—এগুলি বোঝার জন্য তাঁদের রচনার একটা মূল্য আছে নিশ্চয়ই। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেও এঁদের ইতিহাস ও সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্য-কৃতির প্রশংসা করতে বাধা নেই। যেখানে একটি বৃহৎ সময়-কাল ধরে' বড় রকমের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়, সেখানে প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখকের সাহিত্যসৃষ্টি যে কত বেশি মূল্যবান্, তার প্রমাণ গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের রচনা। এঁদের জীবিতকালে ঘটেছে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিবর্তন। দীর্ঘায়ত খণ্ড-যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির চিন্তাধারা যে ইতিহাস-পরম্পরায় গ্রথিত হয়ে আছে তাঁদের পত্র ও রচনাবলীতে, এ কথা অবিদিত নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষক একদিন দেখবেন—সেখানে ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শ, পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কারের সঙ্গে মিশে অথচ তাকে ছাপিয়ে এক বিশাল মানস দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছরের অক্লান্ত লিপিকর্মে বিগত

যুগের ঐতিহ্য, আগন্তুক যুগের নূতন সংঘাত,—দুয়ে মিলে একটি সমগ্র দেশের নিজস্ব সমাজরূপ ও ক্রমাগ্রসর বিশ্বসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত মানস-চিন্তার বিবর্তন কি বিচিত্রভাবে চিত্রিত, প্রতিফলিত করেছে। এই একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ মাটি ও আকাশ নেমে এসেছে মিলবার জন্য। রবীন্দ্র-রচনার প্রকৃত মূল্যায়ন এবং যথার্থ প্রশংসা এইখানেই, যেখানে নিঃসংশয়ে বলা যায়—সাহিত্যের মূল আর ইতিহাসের শিকড় একই জায়গা থেকে রস আহরণ করে, দুয়ের সঙ্গতি হল কথা ও সুরের। উভয়ের মধ্যেই সমাজের প্রকাশ। আর সমাজ যেখানে জীবন্ত, সাহিত্য ও ইতিহাস সেখানে একত্র 'পুষ্ট পীন ও প্রবুদ্ধ' হতে থাকে।

রেনেশাঁস-যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত য়ুরোপের ও ইংলন্ডের সাহিত্য থেকে তার সমাজ ও ইতিহাসের মোটামুটি সম্পূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথা তাঁরা জানেন যাঁরা সাহিত্য ভালো করে না পড়লেও, সাহিত্যের ইতিহাস নাড়াচাড়া করে অন্ততঃ গৌণভাবে খবর রাখেন। ইলিজাবীথান, জ্যাকোবীয়ন, অগস্টান, ভিক্টোরীয়ান, জর্জিয়ান প্রভৃতি যুগের সমাজ-কাহিনী তদানীন্তন সাহিত্যের মারফৎই আমরা জানতে পারি। বিশেষ করে, ভিক্টোরীয় যুগে ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞান-চেতনা, সংস্কার ও যুক্তিবাদ, জাতীয়তা ও মানব-হিতৈষণা, গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিরোধী চিন্তা ও প্রতিষ্ঠানের যে সংঘর্ষ এবং সমাজের উপর সেই 'new material'এর সংঘাত আর সমাজ-বোধির উপর তার যে সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি, তা থেকে ভিক্টোরীয় যুগের ইতিহাস খাড়া করা খুব শক্ত নয়। পীল-কব্‌ডেন থেকে শুরু করে ডিসরেলি গ্ল্যাডস্টোন ও চেম্বারলেনের আমল পর্যন্ত সময়কার দীর্ঘ ইতিহাস ইংলন্ডের সাহিত্য থেকে অনেক পরিমাণে সংগ্রহ করা চলে। বিশেষ করে, ডিকেন্স-এর এবং থ্যাকারে-র উপন্যাস তো সমাজ-চিত্রের একটা বড় উপকরণ। ডারউইন হাক্‌সলির রচনা যেমন বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের পরিচয়, টেনিসন, ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্‌ড, ফিটজেরালড-এর কাব্য এবং মরিস, রসেটি, সুইনবার্ন থেকে অস্কার ওয়াইল্‌ডের লেখাও তেমনি শুধু এক একটি গোষ্ঠীর পরিচয় নয়, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উপর ধর্ম বিশ্বাস রুচি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারও ইতিহাস।

সাহিত্যে ইতিহাসের সূত্র সন্ধান আরও সচেতন ও স্পষ্টভাবে করা যায় ইংলন্ডের বিংশ শতকী সাহিত্যে। টমাস হার্ডি যখন উপন্যাসের কলম ছেড়ে কাব্যের তুলি হাতে নিলেন, সেই সময় থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত পর্যন্ত যে যুগ আয়ত, তার সাহিত্য-ইতিহাস এক হিসেবে দেশের সমাজ-মনের ইতিহাস। ব্যক্তি-সত্তা, সমাজ-সত্তা, মানব-সত্তার এত বহুমুখী ও সূক্ষ্ম-সচেতন অনুশীলন, বিজ্ঞান শিল্প ইতিহাসের এমন ব্যাপক চর্চা এবং সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে এত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আর কোনও যুগের বিলাতী সাহিত্যে এমন পরিষ্কার ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কাব্য উপন্যাস প্রবন্ধ ও নাটকের মাধ্যমে শিল্প বিজ্ঞান ধর্ম শিক্ষা সমাজ অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় মতবাদের প্রশ্নাকুল চর্চার যদি একটি বিশদ বিবরণ সঙ্কলন করা যায়, তা হলে এই শতকের শেষ জেনারেশ্যন প্রথমার্ধের সমাজ ও মানস-ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে পড়ে ও বুঝে নিতে পারবে। ওয়েল্‌স, বেনেট, গলসওয়ার্দি, বার্নার্ড শ থেকে য়েট্‌স ও এলিয়ট পর্যন্ত যত চিন্তাশীল লেখক-লেখিকার রচনা থেকে এ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হবে। দুটি মহাযুদ্ধ এবং তাদের মধ্যবর্তী সময়—যাকে গ্রেভ্‌স্ বলেছেন The Long Week-end—এই সমগ্র কালের সমাজ-চিন্তার বিবর্তন যদি সাহিত্যের মারফৎ হস্তগত এবং বোধগম্য হয়, তাহলে

Litrature as History বাক্যটির তাৎপর্য ও সত্যতা মেনে নিতে বাধা নেই। বাধা যে নেই, তার প্রমাণ ঐ 'Thirties'-এর সাহিত্য যেখানে য়ুরোপের অর্থসঙ্কট, সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, Nazism ও Fascism-এর স্বরূপ প্রকাশ, স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ, য়ুরোপে রাষ্ট্রীয় দলাদলি, মার্ক্সীয় দর্শনে সাহিত্যবিচার, সমাজ-বিচিন্তার নতুন ধারা, কম্যুনিজমের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ, আবার তার বিরুদ্ধে আদর্শহানির প্রতিক্রিয়া, ধর্মের ব্যাপারে Anglo-Catholicism-এর প্রসার ইত্যাদি বহু তথ্য মিলবে।

উপসংহারে আর একটি মূল সূত্রের আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সূত্রটি এই : সাহিত্যকে এতখানি ইতিহাস-মূল্য দেওয়া, সমাজ সাহিত্য ও ইতিহাসকে এ রকম পাকাপাকি ভাবে গাঁটছড়ায় বেঁধে ফেলা সঙ্গত হবে কি? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হলে একটা গোটা পুঁথি লিখতে হয়। কিন্তু সমাজ-দর্শনের অফুরন্ত বিতর্কের মধ্যে না ঢুকে একটা মোটা কথা বিচার করে দেখা যেতে পারে। সেটা এই : সাহিত্য কি একক সৃষ্টি, স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত একটি বিশেষ মানসদৃষ্টির ফল? না কি সামাজিক পরিবেশে, সমাজ-সম্পর্কে অন্বিত হয়ে বৃহত্তর মানব-বোধে ব্যক্তিসত্ত্বার উত্তরণ? মানুষ যখন একলা বসে ভাবে ও লেখে, সেটা স্বগত বা নেপথ্য উক্তি, বড় জোর রোজনামচা। কিন্তু সে যতদূর নিঃসঙ্গ উৎকেন্দ্রিক আত্মরত ব্যক্তি হোক, যে মুহূর্তে সে লিপিবদ্ধ চিন্তাকে সাজিয়ে প্রকাশ করে, তখনই সে নিজেকে নিয়ে সমাজের দরবারে হাজির হয়। যাকে বলা হয় 'কম্যুনিকেশন', সেটাই সাহিত্য এবং অপরের চিত্তের কাছে নিজের ভাবনাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে জড়িত। এই সেতুবন্ধন থেকেই প্রমাণ হয় সাহিত্যের সামাজিক অর্থ ও চরিত্র। নিঃসম্পৃক্ত, মানবতালেশহীন, আদান-প্রদানবর্জিত যে অ-প্রণয়জ রচনা, তা সাহিত্য হতে পারে না।

এই থেকে আর একটি অনুগামী প্রশ্ন এসে যায়। সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনা ভূমিষ্ঠ হয় কোথা থেকে? অবশ্যই মন থেকে, কারণ মনই হল গ্রহণের প্রকাশের মূলাধার। কিন্তু এক কালে, রোমান্টিক ট্র্যাডিশ্যন অনুযায়ী যে ধারণা ছিল যে প্রেরণা ও ব্যক্তিপ্রতিভায় সাহিত্যের জন্ম, সেটা স্বীকার করে নেওয়ায় বাধা রয়েছে। কেননা, তাহলে অসাধারণ সাহিত্য-সৃষ্টির একটা অ-সাধারণ ফর্মুলা তৈরি করতে হয়—প্রতিভার আবির্ভাব, প্রেরণার অভ্যুদয়, সৃষ্টির উন্মোচন। কিন্তু সাহিত্য-বহির্ভূত যে পরিবেশ ও প্রভাব অর্থাৎ যে সমাজ-শক্তিগুলি মানুষকে ও তার মনকে তৈরী করে, জাগায়, আন্দোলিত করে, ভাবায়, প্রকাশের ও বিনিময়ের তাগাদা দেয়, সেগুলি তা হলে যাবে কোথায়? কথাগুলো কিছু নতুন নয়। দা ভিঞ্চির বিচিত্ররূপী সৃজনকর্ম যে শক্তি থেকে উদ্ভূত, সেই শক্তিরই বিকাশ ও বিবর্তনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এলিয়টের এ উক্তি সম্ভব হয়েছে : 'He must be aware that....the mind of his own country—a mind which he learns to be much more important than his own private mind—is a mind which changes.' এখানে ঐ 'মন' আর 'পরিবর্তন'—এ দুটি বাক্য বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। বোঝা যাচ্ছে, অগ্রগতির যে স্বাক্ষর পড়ে মনে, সে মন দেশের ও সমাজের মন, পরিবর্তনে পুষ্ট ও জীবিত। যে কোনও সাহিত্য বা শিল্পকৃতিত্বের সামাজিক ঋণ তাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'যুগধর্ম' বাক্যটা হয়তো একটু ধোঁয়াটে ও বেশি সাধারণার্থক; রুচি আদর্শ ধারণার নানাবিধ পরিবর্তনকে হয়তো সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করে না। কিন্তু ওটাকে সদর্থক করে বলা চলে, একটা যুগের কতকগুলি সাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকে যা সমাজে

ও সাহিত্যে ধরা যায়। পিউরিটান যুগের সাহিত্য একটা বিশেষ রকমের জীবনধারা ও চিন্তাভঙ্গীকে প্রকাশ করেছে। অগস্টান যুগের সাহিত্যও সে কালের সামাজিক ব্যবহার ও ভাবরীতির বাহন বিশেষ। শেলি, কীট্স, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রনের কাব্য সম-পর্যায়ের নয়; কিন্তু নিজস্ব ছক ও গতিরীতি অনুসরণ করেও এ'দের কাব্য শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক ঐতিহ্যস্রোতে এসে মিশেছে। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গী, রুচি-গত পার্থক্য ও 'স্বকীয়' ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কে Raleigh-র একটি মূল্যবান উক্তি আছে : 'No poet makes his own language'। নূতন বাগ্ভঙ্গী, নূতন শব্দ-সৃষ্টি অথবা পুরাতন ভাষার পুনঃসংস্কার ও উজ্জীবনকেও ব্যাখ্যা করা যায়, ঐ যুগের কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর সিদ্ধ অভ্যাস বলে। এবং সে অভ্যাস একটা স্টাইল অর্জন করে, ভাব-ধারায় ও প্রকাশভঙ্গীতে সেই বিশেষ কালের সমাজ-বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। তাই তিনি আরও বলেছিলেন : 'A style, however individualistic, implies a society at the back of it.'

'সোশ্যাল হিস্ট্রি' কথাটির এখন খুব প্রচলন। জিনিসটি কিন্তু শুধু রাষ্ট্র-ইতিহাস আর অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটা মধ্যস্থ বন্ধনী মাত্র নয়। তার চেয়েও কিছু বেশি। ট্রেভেলিয়ান তাঁর ইংলন্ডের সামাজিক ইতিহাসের মুখবন্ধে লিখেছেন : Social history might be defined negatively as the history of a people with the politics left out। সামাজিক ইতিহাসের এই সংজ্ঞা-নিরূপণ কিন্তু সত্যিই 'নেগেটিভ'! রাজনীতি কি দোষ করল? সে কি সমাজচ্যুত পদার্থ? রাষ্ট্রচিন্তার জন্ম কি সমাজ-চিন্তা থেকে হয়নি? বরঞ্চ বলা চলে, সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটি দেশের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনায়ন। তার মধ্যেই আছে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর পারস্পরিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন বা সংযোগ, শ্রম ও অবসর-ব্যবস্থা, প্রকৃতিকে দেখার ও গ্রহণ করার ভঙ্গী, যে অবস্থা ও পরিবেশ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে তাই থেকে এক একটি কাল-পর্বের সংস্কৃতির উদ্ভব, আর ক্রমিক পরিবর্তনশীল ফর্মের মধ্য দিয়ে, যথা—ধর্ম সঙ্গীত সাহিত্য শিল্প জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, সেই সংস্কৃতির রূপায়ণ।

মার্ক্সীয় সমাজ-দর্শনে অর্থনৈতিক ও বাস্তব বিচারের প্রাধান্য। অন্যান্য মতবাদে ঝোঁক পড়েছে মানসিক ও আত্মিক বিকাশের উপর। কিন্তু যতই পার্থক্য থাকুক, একটা বিষয়ে সকলের মধ্যে মিল এই : সমাজ-ধারণার ভিত্তি হওয়া উচিত সমাজের অতীতের সঙ্গে সমাজের বর্তমানের সম্পর্ক নিরূপণ। কোন্ নিয়ামক সূত্রে সেটা নির্ধারিত হবে, তাই নিয়েই দ্বন্দ্ব। তবে সেই সঙ্গে ভাবতে হবে—সাহিত্যে যদি সেই সম্পর্ক জীবন্ত হয়ে চিত্রিত হয়, তা হলে সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্য সার্থক হয়। মানুষ নিয়ে সমাজের অস্তিত্ব। কিন্তু 'সমষ্টি'-প্রধান পদার্থ হলেও, ব্যক্তির চিন্তায় ও কর্মেই সমাজ বেঁচে আছে। কাজেই কে মুখ্য, কে গৌণ, কে কাকে পরিচ্ছিন্ন করছে, নিয়ন্ত্রিত করছে, সেই তর্ক-দ্বন্দ্বের চেয়ে বড় কথা হল, উভয়ের অন্বয় ভাঙবার নয়। সংশ্লেষ একেবারে অঙ্গাঙ্গী। কথাটা কিন্তু আপোসের নয়, গোঁজামিলও নয়।

সম্বন্ধটা যে অটুট—এটাই শেষ কথা। সমাজ সাহিত্য আর ইতিহাস পরস্পরকে জড়িয়ে বেঁচে আছে। সমাজের ফ্যাশন, সাহিত্যের রীতি, ইতিহাসের বিচারভঙ্গী ওঠে নামে, বদলায়। এই বদলের ছবি, ওঠা-নামার তাপমান যন্ত্র হল ঐ সাহিত্য। সাহিত্যের ধর্মই হল, সৃষ্টি, রচনা। সে নিজেকে যেমন নিত্য নূতন সৃষ্টি করে চলেছে, আবহমান

কালের সাহিত্যের মৌল বস্তুকেও তার প্রাণকোষে তেমনি সঞ্চিত করে রেখেছে। এই ঐতিহ্য-রক্ষাতেও তার সামাজিক চরিত্র, ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানেও কি সাহিত্য সেই কাজ করছে না? কোথায় এসে দাঁড়ালাম, কি দেখছি, কি ভাবছি—সভ্যতার সংস্কৃতির কি চেহারা লক্ষ্য করছি, আর কোথায় গিয়ে পৌঁছুব, শ্রম-শিল্পের ফলিত বিজ্ঞানের অভাবিত প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সভ্যতা আর বিশ্বমানবের কি অবস্থা হবে, সেটা ওয়েল্‌সের ভবিষ্য দৃষ্টি, হাক্সলির ফ্যান্টাসি আর অরওয়েলী কল্পনাকেও ইতিমধ্যে ছাড়িয়ে গেল। তাই পারমাণবিক যুগের উপযুক্ত সাহিত্যের পূর্বাভাস নিয়ে এসেছে ঐ Science Fiction, বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক আখ্যান। সমাজের আর জীবনের গতি যেখানে এত সাংঘাতিক দ্রুত, সেখানে ইতিহাস লেখার সময় নেই। শুধু আন্তঃগ্রহিক ধ্বনি আর তেজষ্ক্রিয় পদার্থ অনাগত ইতিহাসের ভ্রূণ-স্পন্দন সাঙ্কেতিক ভাবে নোট করে যাচ্ছে। বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র সমাজ বিচিত্রতর সাহিত্যে তার ঐতিহাসিক স্বরূপ হয়তো একদিন দেখতে পাবে।

কারণ যা হয়ে গেছে, যা হচ্ছে আর যা হবে—এ সবই ইতিহাস। আর মানুষ কি ভেবেছিল, কেমন করে বলেছিল, কি ভাবছে ও কি ভাবে বলছে আর ভবিষ্যতের ভাবনা ও কল্পনা কেমন করে আঁকছে ও চোখের সামনে তুলে ধরছে,—সব মিলিয়ে সাহিত্য। সে হিসেবে সাহিত্য হচ্ছে দলিল, মানবীয় দলিল এবং গভীর সত্যরূপেই সেটা সমাজ-গতির রেজিস্টার। সমাজ-বিজ্ঞান তথা ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের একাত্মভাব এখন আর অস্বীকার কেউ করেন না, তিনি যে পন্থীই হোন। সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ আসে মানুষের টানে, সমাজের আকর্ষণে, সভ্যতার ইতিকথার উপর স্বাভাবিক আগ্রহে। ইতিহাস-বিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানীর কাছে সাহিত্যের ব্যবহার-সুযোগ তাই একাধিক। কিন্তু একটি প্রাথমিক দাবী মেটাতে হবে। সমাজ-ইতিহাস পড়ে সাহিত্য-কার যেমন প্রচুর লাভবান হন, সমাজ-ইতিহাস-বেত্তাও তেমনই সাহিত্য পড়বেন ও বুঝবেন সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। কারণ সাহিত্যের উপযোগিতা ও ব্যবহার-ক্রিয়া শুধু তার ফর্মে নয়, বাহ্য আকৃতির বিভ্রান্তিকর বৈচিত্র্যেও নয়। তার সারবস্তু হল মর্মে—যেখানে শতবিচিত্র ভাব ও ভাষার মধ্য থেকে চিন্তার ও প্রকাশের 'নর্ম' খুঁজে নেওয়ার আগ্রহ অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে, যেখানে যুগপৎ মায়ের ও অনাগত শিশুর নাড়ীর 'বীট্' শোনা যাচ্ছে, এবং আরও কান পেতে শুনলে, হয়তো সম-তাল গোনাও যাবে।

সাহিত্য সমাজ ও ইতিহাস—এ তিনের সম্বন্ধ-ঋণ স্বীকার সংস্কৃতির সৌজন্য নয়। ঐটেই স-জ্ঞান মনুষ্যত্ব।
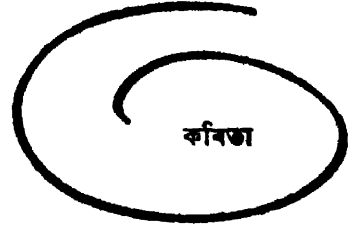
গার্ডেন-রিচ জেটি

অরুণকুমার সরকার

কপিকলে নেমে আসছে বড়ো বড়ো আঁটসাট পেটি
কী বিশাল পণ্যবাহী জাহাজের পেট।
নামালো দৈত্যের দেহ কিমাকার ভারি যন্ত্রপাতি,
কয়েক শো গমের বস্তা, কাগজের গোলা একরাশ।
আর নেই? আরো আছে। উঁকি দিচ্ছে ইস্পাতের গা।

কেমন সহজে সব হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রে ও মানুষে
একাকার গলাগলি, যেমনটি কৃষক-লাঙল।
স্বপ্নসমাহিত দাঁড়িয়ে এস্ এস্ ইভনিং স্টার
মাখছে সিঁদুর রঙ নিরাসক্ত নাবিকের হাতে।
ওদিকে নৌকোর মধ্যে উনুনেতে ভাত ফুটছে কার।

জলের নিকটে এলে মানুষ কি বোবা হয়ে যায়!
ভাবে, সেও গাছ মাটি মেঘের ছায়ার মতো কিছু।
শীতের দুপুর হাওয়া ধুলো রোদ সব কিছু জড়িয়ে
ছড়িয়ে রয়েছে তার অস্তিত্বের নিবিড় শিকড়।

চতুর্দিক শান্ত তাই, স্বাভাবিক। উঠছে নামছে
বস্তুভার ধাতুপুঞ্জ, মানুষেরই একাত্ম শরীর।
নাম ধরে ডাকলে কেউ চমকে উঠে ভাবলুম আমি কি
জাহাজ, নাবিক কিম্বা সোনালী ডানার গাঙ্‌চিল।

প্রিয়তম নামের জন্য

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যাকে রাখি, সে-ই রাখে। কিন্তু যাকে রাখি, সে আমার
প্রিয়তম নামের মর্যাদা যদি না-রাখে? আকাশ
আজ বড় শুদ্ধ, আজ অরণ্যে কোথাও
চরিত্রহীনতা নেই, বাতাস ভাঙে না
জলের দর্পণখানি, যে যার অখ্যাত লোমকূপ
পরিষ্কার করে নিয়ে নদীকে রেহাই দিয়ে গেছে।
নদী ক্ষমাময়ী, আজ নদীর শরীরে আর কেউ
ধাবিত নাকের বিষ্ঠা নিক্ষেপ কোরো না।

ভালবাসা! কাকে ভালবাসা?
যে তার গলিত কুষ্ঠ উদ্যানকে উপহার দেয়,
তাকে?
যে তার গোপন ব্যাধি প্রেমের তরঙ্গে ধুয়ে নেয়,
তাকে?
ভালবাসা! কাকে ভালবাসা?

এস হে সিতাংশু, আজ দু-একটি আদি অহঙ্কারে
বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যাক।
যখন ভীষণ শব্দে পৃথিবী চুরমার হয়, অন্তত তখন
বলা যাক,
রাম শ্যাম যদু ও মধুকে
একইসঙ্গে ভালবাসা, একইসঙ্গে আলিঙ্গন করা অসম্ভব।
বলা যাক, ধ্বনির উত্তরে প্রতিধ্বনি
প্রথমে উঠুক। তারপরে
ভাসাব নির্মল জলে প্রিয়তম নামের তরণী।

ও কে, ও কে, ও কে

মণীন্দ্র রায়

নদীচরে জ্যোৎস্নার ভিতর
নিশিপাওয়া পাখি অকস্মাৎ
ডেকে ওঠে : ও কে, ও কে, ও কে!
সেই শব্দে আমার এ ঘর
মেঝে থেকে অন্ধকার ছাদ
শিহরিত নিদ্রাহীন চোখে।

জানি না সে পাখি কার ছায়া
দেখেছিল জ্যোৎস্নার কুহকে,
কেবা তার মানসপ্রতিমা।
সেকি শুধু মতিচ্ছন্ন মায়া?
অথবা সে অনির্দিষ্ট ঝোঁকে
খুঁজে ফেরা দুরাশার সীমা!

তবু সে মথিত প্রতিধ্বনি
মাথার ভিতরে একি শোকে
ছিঁড়ে দিল চেতনার স্নায়ু?
অন্ধকারে এ কার তর্জনী
বলে শুধু : ও কে, ও কে, ও কে?
কাঁপে স্মৃতি স্বপ্ন পরমায়ু!

শিকি জ্যোৎস্নার আলোয়

শামসুর রহমান

নখ দিয়ে কুটি কুটি পারিনা ছিঁড়তে আকাশের
ছড়ানো ত্রিপল কিম্বা সাধ্য নেই পাহাড়ের চূড়া
নিমেষে গুঁড়িয়ে দেই, পোড়াই কোরিয়া হাসিমুখে,
ফোটাই সাধের ফুল ইচ্ছেমতো গোলাপ বাগানে
আর এক চুমুকে সমুদ্রের সব জল শুষে নিই
নিপুণ খেলার ছলে, পরাক্রান্ত সিমুমের ঝুঁটি
মুঠোর ভেতর ধরি, ঝরাই শ্রাবণ সাহারায়,
আম গাছে কালো জাম ফলাই চতুর কোনো শ্রমে,
সার্কাসের বিনীত পশুর মতো উঠবে বসবে
চন্দ্র-সূর্য তর্জনীর ইশারায় : সাধ্যাতীত সবি।

অকুণ্ঠ কবুল করি শিখিনি এমন মন্ত্র যার বলে
আমার বাঁশির সুরে শহরের সমস্ত ইঁদুর
রাঙা টুকটুকে সব ছেলেমেয়ে হবে অনুগামী,
কৃতকর্মে অনুতপ্ত পৌরসভা চাইবে মার্জনা।

যে রুটিতে বুভুক্ষার শুকনো ছায়া পড়ে প্রতিদিন,
হতে পারি অংশীদার তার সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ কোণে,
যে অঞ্জলি পেতে চায় তৃষ্ণার পানীয়, কয়েকটি
বিন্দু তারও শুষে নিতে পারি শিকি জ্যোৎস্নার আলোয়
আত্মার উষর জিভে,
অথবা যেমন খুশি পারি
আঁকতে স্বর্গের নক্সা। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোল জানি
জীবনে বাজানো চলে, যেমন গম্ভীর তানপুরা
গুণীর সহজ স্পর্শে মীড়ে মীড়ে অর্থময়, পারি
ঈশ্বরকে চমকে দিতে হৃদয়ের ধ্রুপদী আলাপে।

ঝোপ

সুনীলকুমার নন্দী

হাওয়া ছিলো অনুকূল আকাশে অথই নীল,
দাঁড় ফেলে ছপ ছপ পাড়ি দিলো ভরা বিল।

ঘাটলায় কাঁপা দীপ সরে সরে যায় দূরে—
'ঘরে ফিরে যাও, আসি' বলে ভাটিয়ালী সুর।

নৌকোয় শন শন বিলের ঝাঁপানো ধান;
ছুঁতে না ছুঁতেই খাল দেয় পিছুছেঁড়া টান।

নদীপথে পথে ফেরা তুফানের সংকট,
সামলাতে ভরাডুবি স্মৃতির আঙুলে জট।

হাওয়া দিলে নড়ে ঝোপ ঝাপসা বিলের বাঁক...
কোথা কম্পিত দীপ... ঝোপে ঝোপে মিশে যাক।

রাজপথ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে রমেশবাবু শুয়ে পড়েন। বিছানায় শুয়ে থেকে তিনি বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকেন। অন্ধকার ঘরে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনেন। বাইরে রাস্তার শব্দ বড় একটা কানে আসে না। একটু ঠান্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে বলে জানালাটানলাগুলিও তিনি ভেজিয়ে দিয়েছেন, কোন কোনটার ছিটকিনি আটকে দেওয়া হয়েছে, এতটুকু ফাঁক নেই। তার ওপর দোতলার ঘর। নিচের শব্দ শোনা না যাবারই কথা। ঘড়ির টিকটিক শুনতে শুনতে কান অভ্যস্থ হয়ে যাবার পর আর একটা শব্দ অবশ্য তিনি শুনতে পান। নিচের রাস্তার বা বাইরের কোন কিছুর শব্দ না। বাড়ির ভিতর এই শব্দের সৃষ্টি। শব্দটা মসৃণ তৈলাক্ত একটা পদার্থের মতন বাতাসের সঙ্গে চটচটে হয়ে মিলে গিয়ে কোন একটা ভেজানো জানালার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে বেশ টের পান রমেশবাবু। এই রকম মসৃণ চটচটে শব্দ ঘরের শান্তি বিশ্রাম বা ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না, বরং অনেক সময় সাহায্য করে। কতদিন রমেশবাবু তার চাকর হারানের এই অদ্ভুত নাক ডাকার শব্দটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দোতলার সিঁড়ির মুখে বারান্দায় হারান শোয়। ভাঁড়ার ঘরে শোবার কথা। কিন্তু ভিতরটা ঘিঞ্জি বলে হারানের সিঁড়ির মুখের ঐ জায়গাটা পছন্দ, তাই রমেশবাবু দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারান তার বিছানাটা ওখানে টেনে নিয়ে আসে। টের পেয়েও রমেশবাবু কোনদিন আপত্তি করেন না। বরং ভিতরে ভিতরে সুখী হন নিশ্চিন্ত হন। এতবড় বাড়িতে শুধু একটা চাকর নিয়ে থাকা। সেই চাকর যদি রাত্রে মনিবের শোবার ঘরের দরজার কাছাকাছি কোথাও থাকে তো যে-কোন মনিব আরামবোধ করেন। দরজায় কুকুর বা প্রহরী মোতায়েন রাখার আরাম।

কিন্তু রমেশবাবুর একটা বিশ্রী রোগ—দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পর ঘড়ির শব্দ শুনতে শুনতে, হারানের নাক ডাকা শুনতে শুনতে, পাঁচরকম ভাবনা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় বিছানায় উঠে বসেন। কেননা তাঁর মনে হয় দরজার ছিটকিনিটা যেন আটকান হয়নি হুড়কাটা দেওয়া হয়নি। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মশারির ধারটা তুলে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালেন এবং গলা বাড়িয়ে বন্ধ দরজার ওপর চোখ রাখেন। ছিটকিনি আটকান আছে হুড়কা দেওয়া আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে গলা মাথা ভিতরে গুটিয়ে এনে মশারির ধারটা আবার গুঁজে দেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়েন না। বসে থাকেন। চিন্তা করেন। প্রায়ই রোজই এমনটা হচ্ছে।

একটা আত্মধিক্কারের ভাব আসে তখন রমেশবাবুর। তাই অন্ধকার বিছানায় মশারির ভিতর চুপচাপ বসে অনুতাপ করেন। এমন হওয়া উচিত না। কোনদিন তো দরজা ভাল করে বন্ধ করতে তাঁর ভুল হয় না। কোনদিন হবেও না। তবে কেন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পর মনের এই সংশয় এই অস্থিরতা। অত্যন্ত সতর্ক সজাগ পুরুষ তিনি। এটা তো একটা মোটা বিষয়। দোরের খিল এঁটে শোয়া। না হলে তাঁর সর্বস্ব চুরি যেতে পারে। সর্বস্ব মানে ঘড়িটা আংটিটা রেডিওটা—বাসনকোসন জামা কাপড় জুতো বই এবং এই ধরুন টুকিটাকি আরও কত কি। বা যেমন কুড়ি পঞ্চাশ এক শ দু শ—বড়জোর তিন শ

সাড়ে তিন শ টাকা—নিজের খরচের জন্য রমেশবাবুকে যেটা ঘরে রাখতে হয়। না, সর্বস্ব বলতে চোর কিছু তাঁর এই প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি মাথায় তুলে নিয়ে যাবে না—আর টাকা বলতে যা বোঝায় তার সবটাই যে ব্যাঙ্কে আছে এটা চোরেরাও জানে। কিন্তু তা হলেও জামা কাপড় ঘড়ি আংটি বাসনকোসন রেডিও কি স্নেহলতার সেলাইয়ের কল চুরি করতেও চোরের দরজা খোলা পেলে ঘরে ঢুকতে কতক্ষণ। অবশ্য তাঁর বিত্তবৈভব—যেমন সাতকাঠা জমির ওপর শহরের সবচেয়ে অভিজাত পাড়ায় এমন চমৎকার দক্ষিণ-খোলা জমকালো বাড়ি ও ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়া অগাধ টাকার তুলনায় সেলাইয়ের কল রেডিও কি সোনার বোতামটা ঘড়িটা কিছু না। যে চুরি হয়ে গেলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। কিন্তু আর একটা কথা আছে। এই ভয়টাই সাংঘাতিক, এই আশঙ্কাটাই মারাত্মক। অবশ্য রমেশবাবুর শত্রু নেই। অজাতশত্রু বলা চলে তাঁকে। শত্রু নেই, আবার মিত্রও নেই। কেননা মিত্র থেকেই শত্রুর সৃষ্টি। মিত্রের স্বার্থে আঘাত লাগলে মিত্র বৈরীভাব ধারণ করে। জীবনের প্রথম থেকে এটা বুঝতে পেরে তিনি কারো সঙ্গে শত্রুতা করার মতন মিত্রতা করাও এড়িয়ে চলেছেন—কিন্তু আসল কথা তা না। রাত্রে দরজা খোলা পেয়ে কোনো উন্মাদ তাঁর ঘরে ঢুকতে পারে। অকারণে নিরপরাধ মানুষের বুকে ছোরা বসিয়ে দেবার মতন স্বভাব-দুর্বৃত্তও এই সংসারে যথেষ্ট আছে। কিছুই বলা যায় না। হুঁ, দোতলার সিঁড়ির মুখে হারান শুয়ে আছে। তা থাক। বাড়ির এত উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে যে ভিতরে ঢুকবে তার পক্ষে ঘুমন্ত হারানকে ডিঙিয়ে সোজা রমেশবাবুর কামরায় চলে আসা কিছু না। বা খুন করাই যার স্বভাব, আগে চাকরকে শেষ করে পরে সে মনিবকে সংহার করতে ছুটে আসতে পারে।

কাজেই এত বড় ভুল! দরজা খোলা রেখে শোয়া! আলপিনের জায়গায় আলপিনটা তুলে রাখতেও যার কোনদিন ভুল হয় না, সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলতে যিনি শতবার শত দিকে তাকান, গায়ে একটা ব্রণ মেছেতা দেখা দিলেও যে ব্যক্তি ডাক্তারের সঙ্গে একবারের জায়গায় তিনবার পরামর্শ করেন—তাঁর পক্ষে!

তাঁর পক্ষে এমনটা সত্যি সম্ভব না। কিন্তু তথাপি নিজের ওপর কেন এই সংশয় সন্দেহ। দ্বিতীয়বার আলো নিবিয়ে দিয়ে মশারির ভিতর বসে থেকে রমেশবাবু এর কারণ অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তাঁর মুখের ভিতরটা, জিভটা গলাটা কেমন শুকিয়ে ওঠে। আত্মধিক্কারের ভাবটা কেটে গিয়ে ভয়ংকর দুশ্চিন্তায় মন ভরে যায়। অথচ স্নেহলতা বেঁচে থাকতে কোনদিন এমন হয়নি। দরজা খোলা থাকলে তার পরিণাম কি হতে পারে ভাবা দূরে থাক, দরজা বন্ধ করা হয়েছে কি খোলা পড়ে রইল স্নেহলতা বেঁচে থাকতে—স্ত্রী বেঁচে থাকতে রমেশবাবু ভুলেও একবার লক্ষ্য করেছেন বলে মনে করতে পারেন না। অবশ্য তখন তিনি মদ খেতেন। মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। স্নেহলতা কি আপত্তি করত? আগে আগে করত, রমেশবাবুর মনে আছে, পরে আর আপত্তি করেনি। এটা তাঁর প্রয়োজন, সারাদিনের খাটুনির পর ক্লান্তি দূর করতে জিনিসটা তাঁকে খেতে হয়, শরীর রক্ষার জন্য খান—বোঝাবার পর স্ত্রী যেন আর এই নিয়ে কথা বলেনি। কিন্তু তা বলে মাতাল হয়ে বেহুঁস হয়ে তিনি কি আর ঘরে ফিরতেন। চমৎকার জ্ঞান থাকত। বরং তাঁর দৃষ্টি—তাঁর স্মৃতি শ্রুতি চেতনা যেন খরতর হয়ে উঠত এই অবস্থায় যখন ঘরে ফিরে এসেছেন। কবে কার চিঠি এসে পড়ে আছে উত্তর দেওয়া হয়নি, তখন তার ঠিক মনে পড়ে গেছে। উঠোনের পাশের নর্দমায় ময়লা জমেছে, দুদিন মেথর আসছে না, সারাদিন

যদি তিনি তা না-ও টের পেয়েছেন রাত্রে ঠিক টের পেয়েছেন, দুর্গন্ধ নাকে লেগেছে। এমনি আরো অনেক কিছু। দিনেরবেলা যে-খাদ্য গো-গ্রাসে গিলেছেন মদ খেয়ে ফিরে এসে সেই খাদ্য খেতে বসে তিনি তার নানারকম খুঁত বার করেছেন। এবং এই নিয়ে স্নেহলতাকে কথা শুনিয়েছেন। মদ খেয়ে হুঁস হারাবেন দূরে থাক সর্ববিষয়ে অতিমাত্রায় তিনি সচেতন হয়ে উঠতেন বলে ঐ সময়টা স্নেহলতা কেমন ভীত সন্ত্রস্ত সংকুচিত হয়ে থাকত। অন্তত কিছুটা সময়। রমেশবাবু জামাকাপড় ছাড়তেন, সিগারেট ধরাতেন, ইজি-চেয়ারে টান হয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করতেন, আবার উঠতেন, বারান্দায় খালি পায়ে পায়চারি করতেন, টবের ফুলের গাছগুলি দেখতেন, দিনের আলোয় যা চোখে পড়ত না অন্ধকারে পরিষ্কার সে জিনিস তিনি দেখতে পেতেন, এই গাছটার কুঁড়ি এসেছে, ওই গাছটার ফুল ফুটেছে—টবের গাছ দেখা শেষ করে তিনি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে গেছেন, ফিরে এসে আরসির সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় চিরুনি চালিয়েছেন, গলায় ঘাড়ে হাল্কা করে পাউডার ছড়িয়েছেন, শিস দিয়েছেন রেডিও খুলে দিয়ে একটু সময় কান পেতে থেকেছেন, তারপর খেতে বসেছেন।

তখন তাঁর রসনা চক্ষু ঘ্রানেন্দ্রিয় এত তীব্র তীক্ষ্ণ সতেজ হয়ে উঠত যে, কেবল খাদ্যের স্বাদ গন্ধ বর্ণ না, খাবার টেবিলের পাশে নতমুখ হয়ে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ের রং চুলের গন্ধ ভুরুর রেখা তো বটেই—তার নারীত্ব পাতিব্রত্য কি গৃহকর্মনৈপুণ্যেরও মধ্যে কি পরিমাণ ভেজাল আছে, সময়ে কতটা তলানি পড়তে পারে সব তিনি দেখতে পেতেন বুঝতে পারতেন। তাই তখনকার মতো তাঁর সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে স্নেহলতা কেমন যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে যেত, মুখটা আর একটু নিচের দিকে নামিয়ে রাখত। তখন রমেশ-বাবু কেন-জানি মনে মনে হেসেছেন, রোজ না, কোন কোন রাত্রে।

আহারের পর তিনি নতুন সিগারেট ধরিয়েছেন। হয়তো তাঁর হাতের সিগারেট শেষ হবার আগেই নাকেমুখে দুটি গুঁজে স্নেহলতা উঠে পড়েছে। বিছানা করেছে, মশারি খাটিয়েছে। রমেশবাবু বিছানায় ঢুকবার পর আর কিছু মনে করতে পারতেন না। অর্থাৎ কখন আলো নিভল কখন দরজা বন্ধ করা হল। তখন তিনি বেহুঁস। ঘুমে তলিয়ে গেছেন।

আশ্চর্য হয়ে তিনি এখন সেদিনের কথা ভাবেন। তবে কি—

কেননা যে কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে রমেশবাবুর জীবনের নিরাপত্তা ও গৃহসামগ্রী সুরক্ষিত থাকার প্রশ্ন আজকের মতন সেদিনও জড়িত ছিল। বরং সেদিনও রমেশবাবু বিত্তবান হননি। একটা থালা কি বাটি চুরি গেলেও তাঁর অনেকখানি যেত।

তবে কি এতবড় একটা ব্যাপারে তিনি একান্তভাবে স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাই বা কেমন করে সম্ভব। যার ওঠা বসা হাসি কথা থেকে আরম্ভ করে গৃহস্থালীর প্রায় প্রতিটি কাজেই রমেশবাবু কিছু না কিছু দোষ দেখতেন ত্রুটি খুঁজে পেতেন অসম্পূর্ণতা দেখতেন। সেই মানুষের ওপর এতবড় একটা কাজের ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন! রমেশবাবু আজ তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। এমন যদি হত, ত্রুটিবিচ্যুতি দোষ অপরাধ সত্ত্বেও স্ত্রীকে তিনি অন্ধের মতো ভালবাসতেন। কেউ কেউ বাসে। রমেশ-বাবু না। তিনি অন্য ধাতের মানুষ। অন্ধ হয়ে স্ত্রীকে ভালবাসতে পারেননি বলে অন্ধের মতো মানুষটার ওপর সব বিশ্বাস ন্যস্ত করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। বরং স্ত্রীর চেয়ে একদা মদ তাঁর অধিক প্রিয় ছিল। ছিলই তো। বিয়ের পর স্নেহলতা স্বামীর মদ খাওয়া নিয়ে যখন রাগারাগি করত কান্নাকাটি করত তখন রমেশবাবু লাথি ঘুষি চালাতেও দ্বিধা

করেন নি। আবার সেই মদও তাঁকে ছাড়তে হয়েছে। অবশ্য স্নেহলতা মারা যাবার পর। ছাড়তে হয়েছে কেননা মদের চেয়েও প্রিয় তাঁর নিজের স্বাস্থ্য—শরীর। মদের দরুন তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ছে—ডাক্তার সরাসরি মুখের ওপর যেদিন জানিয়ে দিল সেদিন থেকে রমেশবাবু মদ বর্জন করলেন। অর্থাৎ নিজের স্বাস্থ্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে আর কিছু প্রিয় হতে পারল না। নিজেকেই রমেশবাবু সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তিনি আত্মসুখী স্বার্থপর। না হলে যে বয়সে তিনি বিগতদার হয়েছিলেন সেই বয়সে অনায়াসে আর একটা বিয়ে করতে পারতেন। রমেশবাবু করেন নি। আর একজন তাঁর সুখ সম্পদের ভাগ বসাবে চিন্তাটা ক্রমশ তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকছিল। হয়তো স্নেহলতার ওপর কোনদিন সদয় না হতে পারার এ-ও একটা কারণ। স্নেহলতা একটি সন্তানও প্রসব করে যেতে পারেনি। রমেশবাবু মাঝে মাঝে চিন্তা করেন, একদিক থেকে এটা ভালই হয়েছে। পুত্রকন্যাকেও তিনি ভালবাসতে পারতেন না। তাঁর চোখে সবাই পর, সব মানুষ অবাঞ্ছিত। প্রিয় বলতে বাঞ্ছিত বলতে আপন বলতে তিনি শুধু নিজেকেই জানেন নিজেকেই চেয়েছেন নিজেকেই চিরদিন ভালবেসে এসেছেন। এবং যত বয়স বাড়ছে আত্মপ্রীতির মাত্রাটা বাড়ছে। আগে যদি উচ্ছৃংখলতার মধ্য দিয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছেন সুখের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন, এখন অতিমাত্রায় নিয়মনিষ্ঠ থেকে নিজেকে সুখী করতে সুস্থ রাখতে সক্ষম রাখতে ব্যস্ত। স্বাভাবিক। রক্তের জোর মানুষের চিরকাল কিছু এক রকম থাকে না। সুখে থাকাটাই বড় কথা। সুখ অর্জনের পথ ও প্রক্রিয়া বয়সের সংগে বদলায়।

এখন তাঁর চরম লক্ষ্য আয়ুকে দীর্ঘতর করা। আরো দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে এতবড় বাড়ি ও ব্যাংকের টাকা ভোগ করা। এখানেই তাঁর সুখ। কেননা তাঁর অবর্তমানে আর কেউ এসব ভোগ করবে ভাবতেও রমেশবাবুর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এবং দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী হতে হলে আহারে বিহারে যে পরিমাণ সংযম সতর্কতা, শয়নে বিশ্রামে যতটুকু নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলা দরকার তিনি মেনে চলেছেন। এসব ব্যাপারে কোনরকম ভুলভ্রান্তি অমনোযোগীতা বা শৈথিল্যের প্রশ্রয় তিনি দেন না।

এখন আর পাখি হয়ে ওড়াউড়ি করার দিন নেই তাঁর।

এখন এই দেহ একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে—একটা ঘড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ দম দেওয়া থাকবে চলবে—দম ফুরিয়ে গেলে অচল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ এখন আর জীবন তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। তিনি জীবনকে চালাচ্ছেন। এই দেহকে চলতে দিচ্ছেন। যত্ন নিয়ম শৃংখলা ও সতর্ক প্রহরার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেই নিজের প্রহরী।

কাজেই প্রহরীর ভুল হবে কেন। শয়নের পূর্বে শয়নকক্ষের দ্বার অর্গলবন্ধ না-করা। যে ভুল তাঁর অপঘাত-মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। না হয় চুরিটা কিছু না।

কিন্তু দরজা খোলা পেয়ে কোনো বিকৃতমস্তিষ্ক লোক ভিতরে ঢুকে যে ঘরে আগুন দিয়ে যাবে না কে বলতে পারে। এমন হয়। এমন ঘটনা তিনি খবরকাগজে পড়েছেন।

গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় রমেশবাবুর। আবার তিনি আলো জ্বালেন। আলো জ্বেলে মশারির বাইরে আসেন। খাট থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ান। ফ্যালফ্যাল করে দরজাটা দেখেন। সবুজ রঙের পাল্লা দুটো চৌকাঠের সংগে কামড় খেয়ে লেগে আছে। দুটো পাল্লার মাথার পিতলের ছিটকিনিটার প্রায় সবটা অংশ চৌকাঠের ছিদ্রের ভিতর ঢোকান। কেবল ছিটকিনির বর্তুলাকৃতি ঝকঝকে মাথাটা বেরিয়ে আছে। দ্বিতীয়বার সন্দেহভঞ্জন হওয়ায় রমেশবাবু মৃদু হাসলেন। অথবা এ-ও বলা যায় সবুজ রং করা বন্ধ

দরজার ছবিটা লম্বা কোট গায়ে দেওয়া শীতের রাত্রের কোন প্রহরীকে মনে করিয়ে দিল বলে রমেশবাবু মনে মনে হাসলেন। পিতলের বর্তুলটা যেন প্রহরীর জামার বোতাম। প্রহরী বা সৈনিক। সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে।

হাসলেন রমেশবাবু। আবার সেই সঙ্গে পাথরের দাঁত দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা চেপে ধরলেন।

কেন নিজের ওপর এই সংশয়। মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কি। চিত্তের অস্থিরতা। আত্মগ্লানি—আত্মধিক্কারের ভাবটা কেটে গিয়ে একটু অস্পষ্ট ভয় ও বিষণ্ণতায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এসময়টায়—দ্বিতীয়বার উঠে আলো জ্বালবার পর তাঁকে বাথরুমে যেতে হয়। কপালটা ঘাড়টা ধুয়ে ফেলেন। বাথরুম থেকে ফিরে এসে—মুখে কপালে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিতে দিতে অবশ্য কথাটা তাঁর মনে হয়েছে, বাথরুম থেকে ফিরে এসে মুখ ঘাড় তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে কথাটা ভাল করে চিন্তা করেন। এই দুর্বলতা, মনের চাঞ্চল্য কি অশুভ কিছুর ইঙ্গিত। সত্যি কি একটা ভয়ংকর অমঙ্গল তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে!

—কে!

—আমি।

হাতের তোয়ালেটা চেয়ারের পিঠে রাখলেন তিনি। হারানের গলা। ত্রস্ত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান। হাত তুলে ছিটকিনি নামিয়ে দেন, হুড়কা খুলে ফেলেন।

—কি চাইছিস, হারান?

—কে একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

—এত রাত্রে! চমকে উঠে রমেশবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে টেবিলের ঘড়িটা দেখে নিলেন। একটা বেজে গেছে! কোথায় সেই লোক—কি নাম?

—নাম বলছে না। নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

—নিচে দাঁড়িয়ে! হৃৎপিণ্ডের একটা ঝাঁকানি অনুভব করলেন রমেশবাবু। ভিতরে ঢুকল কি করে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙেগেছে বলে হারান হাই তুলল।

—অনেকক্ষণ যেন সদরের কড়া ধরে নাড়ছিল, একবার টের পেলাম, ভাবলাম কি জানি, অনেক সময় রাস্তার সেই ষাড়টা দরজা ধাক্কাধাক্কি করে বলে কড়াটা নড়ে—তারপর মনে হল মানুষ—উঠে নিচে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তাই।

কি একটু চিন্তা করে রমেশবাবু চাকরের চোখের দিকে তাকালেন।

—কেমন লোক দেখতে? ভদ্রলোকটদ্রলোক!

—না যেন। হারান বিড়বিড় করে বলল, সাধুসন্ন্যেসীর মতন। মাথায় লম্বা চুল। গায়ে একটা কম্বল।

—বলিস কি রে! রমেশবাবু দ্বিতীয়বার চমকে উঠলেন। পাগল টাগল না তো। খুনে বদমায়েস চোর ডাকাত—

অল্প হেসে হারান মাথা নাড়ল।

—না, সেরকম কিছু না। বেশ মিষ্টি কথা ঠাণ্ডা কথা। বলল, আমি নিচে অপেক্ষা করছি ততক্ষণ, তুমি বাবুকে ডেকে দাও।

কিন্তু তবু খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তিনি। আবার একটু কি চিন্তা

করলেন।

—না আমি নিচে যাব না। বরং তুই নামধাম জিজ্ঞেস করে আয়—এবং কেন এসেছে, কি চাইছে। তারপর না হয় ওপরে ডেকে আনা যাবে। আমি নিচে নামব না—এত রাত্রে আমি নিচে যাচ্ছি নে। রমেশবাবু দরজা ছেড়ে ঘরের ভিতর চলে আসেন। বাবু ভয় পেয়েছেন, হারান মনে মনে বলল ও বাবুর নির্দেশ মতন লোকটার নামটাম জেনে আসতে নিচে চলে গেল।

কিন্তু হারান একা ফিরল না।

রমেশবাবু হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের দিকে।

—চিনতে পেরেছ? রমেশবাবুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মানুষটি কিছুক্ষণ। তারপর অল্প হেসে বলল,—চিনতে না পারারই কথা। কতকাল পর দেখা।

রমেশবাবু কথা বললেন না। শুকনো একটা ঢোক গিললেন শুধু। তাঁর বলার অপেক্ষায় না থেকে আগন্তুক সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। রমেশবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

হারান চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

—গেট্ বন্ধ করেছিস? রমেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

হারান ঘাড় কাত করল।

—আচ্ছা, তুই এখন যা।

বাবুর নির্দেশ মতন হারান দরজা থেকে সরে গেল।

—তারপর? ভালই তো আছ, বেশ সুখে আছ মনে হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দুবার ঘরের ভিতরটা দেখল দ্বিজদাস। দেখা শেষ করে রমেশবাবু চোখে চোখ রেখে আবার মৃদু হাসল,—চমৎকার বাড়ি করেছ।

কথা না বলে রমেশবাবু পা ঝুলিয়ে খাটের ধার ঘেঁষে বসলেন। দ্বিজদাস যখন তাঁর ঘরের ভিতরটা দেখছিল রমেশবাবু দেখছিলেন দ্বিজদাসের গায়ে সাদায় কালোয় ডোরাকাটা কম্বল মাথায় লম্বা চুল মুখে দাঁড়ি গোঁফ, পরনে গেরুয়া, পায়ে মোটরগাড়ির টায়ারের পুরু চপ্পল।

—প্রায় ষোল সতেরো বছর পর দেখা, কেমন তাই না! কথা বলার সময় দ্বিজদাস মাথাটা একটু নাড়ল। রমেশবাবু তেম্নি নীরব থেকে ঘাড় কাত করলেন।

—সিগারেট খাবে? রমেশবাবু এই প্রথম কথা বললেন।

—না। দ্বিজদাস হঠাৎ যেন কি চিন্তা করছিল। অথবা দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল।

—এখন আছ কোথায়? রমেশবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

—বরানগর আশ্রম—আমার আর জায়গা কোথায়?

এবার দ্বিজদাস যখন হাসল দাঁত কটা দেখা গেল। যেন এখনো মজবুত আছে। আর আশ্চর্য ধবধবে সাদা। রমেশবাবু ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর ওপরের চোয়ালের তিনটে দাঁত এর মধ্যে পড়ে গেছে। দুটো নড়ছে।

—একেবারে আশ্রমবাসী হয়ে গেলে! রমেশবাবু না বলে পারলেন না। দ্বিজদাস শুধু মাথাটা কাত করল। এবারও হাসল। কিন্তু সুন্দর দাঁত কটা আর দেখা গেল না।

রমেশবাবু হাত বাড়িয়ে শিয়রের কাছ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে আনলেন।

আস্তে আস্তে একটা বার করে হাতে রাখেন, ধরান না, আবার বাল্যবন্ধু দ্বিজদাসের দিকে তাকান।

—তা হলে একদিক থেকে তুমিও বেশ সুখে আছ—কেমন না?

—তোমার কি মনে হয়? হাত বাড়িয়ে দিল দ্বিজদাস। দাও, একটা সিগারেট খাওয়া যাক।

রমেশবাবু বন্ধুর হাতে প্যাকেটটা তুলে দিলেন। কিন্তু 'তোমার কি মনে হয়' প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে টানতে লাগলেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বাপ ছেলে দুজনই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্কুলে মাস্টারি করত দ্বিজদাস। ছেলে কলেজে পড়ত। সবে কলেজে ঢুকেছিল বুঝি। কতটুকুন ছেলে, কত আর বয়েস হয়েছিল, ব্রিটিশ সৈন্যের গুলী খেয়ে শহীদ হল। আর দ্বিজদাস গেল জেলে। এসব খবর রমেশবাবু পরে জেনেছিলেন। কেননা তখন অন্য কোন খবর শোনার—আর কোনদিকে তাকাবার ফুরসৎ ছিল না তাঁর। তখন পাহাড়তলির এরোড্রামের কাজ চলেছে পুরোদমে। মিলিটারী কন্ট্রাক্টার রমেশ বাড়ুয্যে দলবল নিয়ে রাতদিন কাজ নিয়ে মেতে আছেন। জাপান এসে গেল বলে। দশদিনের কাজ একদিনে এগিয়ে না নিয়ে গেলে বিমানঘাঁটি তৈরীর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হবে না, জাপানকে রোখা শক্ত হবে। অবশ্য তাল বুঝে রাতারাতি বড়মানুষ হবার লোভেই রমেশবাবু মিলিটারী কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেটাও তো দেশের কাজ ছিল। একদিক থেকে বিচার করলে রমেশবাবুও সেদিন দেশের সেবা করেছিলেন। তবে কিনা সেটা ছিল ব্রিটিশের দেশ, ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া। কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের আগুন জেবলে দ্বিজদাস আর তার ছেলে যাদের তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

যুদ্ধ মিটল দেশ স্বাধীন হল।

দ্বিজদাস জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মিলিটারী ঘাঁটি তৈরীর কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রমেশবাবুও ফিরে এসেছেন কলকাতায়। দুই বন্ধুর দেখা হল। কিন্তু দ্বিজদাস ভাল করে কথাই বলল না, মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল রমেশবাবুর দিক থেকে।

ঘৃণা। রমেশবাবুর বুঝতে কষ্ট হল না। কিন্তু বন্ধুর সেই ঘৃণার দৃষ্টি ও তাচ্ছিল্যের ভ্রুভঙ্গী নিয়ে মাথা ঘামাবার বা তা নিয়ে মনস্তাপ করার সময় ছিল না তাঁর। কেননা আবার তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক ধরনের ঘাঁটি তৈরী করার দিন শেষ হয়েছে, কিন্তু আর এক ধরনের ঘাঁটি তৈরীর রাস্তা স্বাধীন ভারতে রাতারাতি খুলে গেছে। কালো-বাজারের ঘাঁটি। সিমেন্টের কালোবাজার, লোহালক্কড়ের কালোবাজার, চাউল চিনি তেল—অনেক কিছুর কালো কালো ঘাঁটিতে ভিড়ে পড়েছেন রমেশবাবু।

হ্যাঁ, পয়সা। তিনি লোভী স্বার্থপর।

কেবল নিজেকে দেখতে, নিজের জন্য করতে জীবনপাত করলেন রমেশবাবু এবং সেই জীবন তিল তিল করে ভোগ করতে এখনো বেঁচে আছেন—নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী দ্বিজদাস আজ একেবারে সন্ন্যাসী সেজে রাত দুপুরে বাড়িতে চড়াও হয়ে বন্ধুকে যদি সেকথা শোনাতে আসে, এবং এই বয়সে ইহকালের চেয়ে পরকালের চিন্তা অধিক কাম্য, তাই বন্ধুর উপকার করতে তাকে পরার্থপরতার মাহাত্ম্য শোনাতে চায় দ্বিজদাস তো সেসব কথার উত্তরে রমেশবাবু কি বলবেন চিন্তা করতে করতে একটি যুবকের মতো সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে মুখগহ্বর সরু করে চাকতি তৈরী করতে লেগে গেলেন।

তোমার স্ত্রী চমৎকার সরুচাকলি তৈরী করতে পারত। একবার খেয়েছিলাম। যেন

আজো মুখে লেগে আছে।

—হ্যাঁ—হঠাৎ বন্ধুর এধরনের একটা কথায় রমেশবাবু ঈষৎ চমকে উঠলেন। অনেক-দিন আগের কথা, তখনো যুদ্ধ বাধেনি, কুইট-ইণ্ডিয়া আন্দোলন সুরু হয়নি—মত পথ নীতি আদর্শ ইত্যাদি প্রশ্ন সামনে উপস্থিত হয়ে বন্ধুতার সম্পর্কে চিড় ধরেনি। এ-বাড়ি ও-বাড়ি দুই বন্ধুর নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে রমেশবাবু বিগত দিনের কথা মনে করে কিঞ্চিৎ হাসলেন।

—হ্যাঁ, স্নেহলতা চমৎকার সরুচাক্‌লি বানাতে পারত। আর তোমার স্ত্রী পারত আমের আচার করতে। অদ্ভুত হাত ছিল। একবার খেয়েছিলাম—একবার না দুবার যেন পাঠিয়েছিল আচার।

সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানির মধ্যে ফেলে দিয়ে দ্বিজদাস চুপ করে রইল।

গৃহ-ত্যাগী—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হঠাৎ হয়তো গৃহ-সুখের কথা মনে পড়েছে, সম্ভবত এই ঘরের ছবি দেখে নিজের অতীত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে দ্বিজদাসের। চিন্তা করে রমেশবাবু ভিতরে ভিতরে কেন জানি পুলকিত হলেন।

—আজ দুজনের একজনও বেঁচে নেই। দুজনই স্বর্গে গেছে। দ্বিজদাস গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। রমেশবাবুর হৃষ্ট প্রফুল্ল বদন আবার একটু গম্ভীর হল। হয়তো দুটি অকাল মৃত্যুর কথা তুলে দ্বিজদাস এই সংসারের অনিত্যতা ইহজীবনের তুচ্ছতা অসারতার কথা বলতে আরম্ভ করবে এখন। তাই তাড়াতাড়ি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে তিনি বন্ধুর দিকে তাকালেন।

—হ্যাঁ, দুটো জীবনই সময়ের আগে শেষ হল। তোমার স্ত্রী ভুগছিল ক্যান্সারে—আর স্নেহলতার হয়েছিল বোন্‌ টি বি। দুটোই মারাত্মক। চেষ্টা করে ঠোঁটের আগায় সামান্য হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে রমেশবাবু বললেন, ওরা যে বাঁচবে না বোঝা গিয়েছিল। তাই না?

হ্যাঁ না কোনরকম উত্তর না করে দ্বিজদাস বন্ধুর চোখ দেখতে লাগল। রমেশবাবু অস্বস্তিবোধ করলেন। তাঁর ভুরুর মাঝখানে রেখাটা ক্রমশ গভীর হয়ে যেন স্থায়ী হতে চলল।

—হঠাৎ কলকাতায়? অর্থাৎ সরাসরি হঠাৎ এখানে প্রশ্নটা করতে রমেশবাবুর বাধল। কবে এসেছ? গলার স্বরটাও তিনি যতটা সম্ভব শান্ত ও স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করলেন।

—বিকেলের ট্রেনে। দ্বিজদাস নিজের হাতের তেলো দেখছিল, বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিতে চোখ তুলল। বাদুড়বাগান আমার এক বোন থাকে তোমার মনে আছে বোধ হয়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রমেশবাবু দ্রুত ঘাড় নাড়লেন। প্রমীলা। মনে না থাকার আছে কি। ওর স্বামী না কোথায় কাজ করত?

—কাজ মানে কি—একটা ছোট ওষুধের দোকানের কম্পাউণ্ডার ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি তেমন ছিল না—খুব একটা চালাক চতুর ছিল না। ওই কোনরকম একটা চাকরি জুটিয়ে কায়ক্লেশে চালিয়ে যাচ্ছিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছিলাম যেন ওই রকম। রমেশবাবু ঢোক গিললেন। ওরা ভাল আছে তো? কটি ছেলে মেয়ে যেন?

—তিনটি। দ্বিজদাস পুনরায় চোখ নামিয়ে হাতের তেলো পরীক্ষা করতে লাগল। এই বোনকে বিয়ে দিতে হবে বলে দ্বিজদাস জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার ইস্কুলে

মাস্টারী নিয়েছিল। না হলে তখনই সে সংসার ছেড়ে দিয়ে আশ্রমবাসী হত। কেন না জেল থেকে বেরোবার পর তার মনের গতি বদলে যায়। তার জেলে থাকা অবস্থায় স্ত্রীবিয়োগ হয়। ছেলে তো আগেই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, সুতরাং—

তৃতীয় এক বন্ধুর মুখে মাঝে মাঝে দ্বিজদাস সম্পর্কে রমেশবাবু এধরনের একটা দুটো খবর পেতেন। প্রায়ই দ্বিজদাস বরানগর আশ্রমে যায়। সেখানে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। যদি বিবাহযোগ্যা প্রমীলা ঘাড়ের ওপর না থাকত তো কবেই সে—

শুনে হেসে রমেশবাবু সেই তৃতীয় বন্ধুকে একদিন উপদেশ দিয়েছিলেন।

ইস্কুলে চাকরি করে দ্বিজদাস আর কটাকা পায়। এ দিয়ে খাবেই বা কি আর হাতেই বা রাখবে কি যে জমিয়ে প্রমীলাকে নিশ্চিন্তমনে একটি সৎ-পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারবে। দিন ঘুরে গেছে। দেশ এখন স্বাধীন। ছেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ হয়েছে, নিজে স্বদেশী করে জেল খেটেছে—ঢের ঢের স্বদেশীওয়ালা এম এল এ, মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী দ্বিজদাসের বন্ধু। যদি সে একবার গিয়ে দাঁড়ায় ও মুখ ফুটে বলে তো রাইটার্স বিল্ডিং-এ এখুনি প্রকান্ড একটা পোস্ট নিয়ে বসতে পারে।

উপদেশটা যথাসময়ে দ্বিজদাসের কানে পৌঁছেছিল। এবং ঐ বন্ধুটি মারফৎ সে উত্তর পাঠিয়েছিল। কি? না, দ্বিজদাস সুযোগসন্ধানী মানুষ নয়, স্বার্থান্বেষী জীব নয়। দেশপ্রীতি এক জিনিস আর অর্থগৃধ্নুতা অন্য জিনিস। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পিছনে ফেলে রেখে স্বাধীনতার পাকা ফলটি আগেভাগে হাত বাড়িয়ে পেড়ে নেবে এমন লোভ সে অন্তরে স্থান দেয় না। যারা নিচ্ছে নিক। কিন্তু এমন লোভ সে অন্তরে স্থান দেয় না। বারো আনা মানুষ একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না সে-দেশে আর্দালী পিওন গাড়ি বাড়ি-ভাতা নিয়ে হোমরা-চোমরা অফিসার সেজে বসতে সে লজ্জাবোধ করে বৈকি।

দ্বিজদাস সম্পর্কে এক আধটু খবর টবর যদি রমেশবাবু নিতেন তারপর আর তা-ও নেননি। তারপর কবে প্রমীলার বিয়ে হল এবং ভারমুক্ত দ্বিজদাস পাকাপাকিভাবে আশ্রমে গিয়ে আসন পাতল রমেশবাবু সঠিক খবর রাখেন না।

—তিনটি সন্তান! দ্বিজদাস নীরব হয়ে আছে দেখে রমেশবাবুকে কথা বলতে হল। দুর্মূল্যের বাজার—তায় ছেলেটির এমন চাকরি—প্রমীলার বেশ কষ্টই হচ্ছে বলতে হবে।

—হ্যাঁ—দ্বিজদাস এবার মুখটা সোজা করে ধরল তারপর শান্ত নিস্পৃহ গলায় বলল, কষ্টের মাত্রা ষোল আনা পূর্ণ হয়েছে প্রমীলার। আজ এক মাস হয়ে গেল অপরেশ স্বর্গীয় হয়েছে।

রমেশবাবু চমকে উঠলেন। আবার মৃত্যু, আবার সেই অনিত্যতা!

—অপরেশ! অপরেশ কে? কেমন যেন ফিসফিসে গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন। ভুরুর মাঝখানে রেখাটা গভীর হয়ে উঠল।

—প্রমীলার স্বামী। ক্ষোভ নেই উত্তেজনা নেই বিষণ্ণতা নেই হতাশা নেই। সন্ন্যাসীর গলার স্বর রমেশবাবুকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দিল। তাই তাড়াতাড়ি মৃত্যুর প্রসঙ্গটা চাপা দিতে তিনি প্রমীলার বর্তমান অবস্থা জানতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অন্তত এমন একটা ভাব দেখালেন।

—তা হলে এখন কি করে চলছে তোমার বোনের—তুমি প্রায়ই আসছ তো—বড় ছেলেটির বয়স কত? ছেলেটি বড় না মেয়েটি—

এতসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিজদাস গ্রাহ্য করল না। অথবা সংক্ষেপে সব কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করল।

—চলছে কি করে ভগবান জানেন—হয়তো ভগবানই চালাচ্ছেন?

রমেশবাবু নির্বাক থেকে বন্ধুকে দেখছিলেন।

—না, আমি আর এসে কি করব। আমি তো এখন সংসারী মানুষ না যে একটা সংসারের দুঃখের বোঝা কমাতে পারব। আর ইচ্ছা করলেই কি একটি মানুষ আর একটি মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘোচাতে পারে ভাই—পারে না। সব তাঁর হাত। আঙুল দিয়ে মাথার ওপরটা দেখিয়ে দ্বিজদাস মৃদু হাসল। একটু থেমে থেকে পরে বলল, মনে হল যেন ঠোঙা টোঙা বানিয়ে বিক্রী করছে—সেলাই টেলাইয়ের কিছু কাজও বুঝি পাবে, একটা দর্জির দোকানের সঙ্গে নাকি যোগাযোগ হয়েছে—সেলাইটা ভাল জানা আছে তো প্রমীলার—আমি নিজে থেকে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি—বড় ভাগ্নীটা বলল।

—ও, তা হলে আজ গিয়েছিলে দেখতে। রমেশবাবু কিছুটা খুশি হলেন। কতক্ষণ ছিলে?

—আরে ওখানেই তো এতটা দেরি হয়ে গেল। ভাগ্নে দুটো মামা মামা করে এমন জড়িয়ে ধরেছিল—কিছুতেই ছাড়তে চায় না, শেষটায় কোনরকমে পালিয়ে এলাম আর কি। দ্বিজদাসের ভুরুর মাঝখানেও একটা অপ্রসন্ন রেখা উঁকি দিতে সুরু করল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সেটা মিলিয়েও গেল। দাও, আর একটা সিগারেট খাওয়া যাক। যেন গলার স্বরটা হাল্কা করতে সে রমেশবাবুর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিল।

—না, আমি আজ প্রমীলাকে প্রমীলার ছেলে মেয়েদের দেখতে কলকাতায় আসি নি। বেলেঘাটায় আমার এক গৃহী গুরুভাই থাকেন। তাঁর ছেলের টাইফয়েড। তাকে দেখতে এসেছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে সরাসরি তোমার কাছে চলে আসছিলাম। হ্যাঁ, তোমাকে—তোমার সঙ্গে দেখা করার একটু দরকারও আছে। রাস্তায় হঠাৎ মনে হল, কি জানি, মোটে সন্ধ্যা, এখন কি তোমায় বাড়িতে পাব—কাজের লোক অত সকালে ঘরে ফেরে না। তাই মাঝপথে ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম—দেখে যাই। কিন্তু এমন দেরিটা হয়ে গেল সেখানে ছোট ভাগ্নে দুটোর জন্য। না হলে এত রাত হল তোমার এখানে আসতে! নিশ্চয় শুয়ে পড়েছিলে—অসুবিধায় ফেললাম।

—না না না অসুবিধা কি। রমেশবাবু মাথা নাড়লেন। তা হলে বন্ধুকে মনে আছে —একেবারে ভুলে যাওনি—ভাবলাম, কি জানি, সাধুসন্ত লোক - আর আমরা বিষয় আসয় নিয়ে মত্ত, দ্বিজদাস হয়তো আমাকে—

—'ঘৃণা' কথাটা উহ্য রেখে 'ভুলে যাওয়া' কথাটাই তিনি দ্বিতীয়বার বললেন। এবং ঈষৎ হাসলেন।

দ্বিজদাসও মাথা নাড়ল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল,—না রে ভাই, ভুলে যাওয়া টাওয়া কিছু না। এখনো এত বড় হইনি যে জগত সংসারের সব কিছু ভুলে থেকে কেবল একজনকে নিয়ে থাকব—তবে আর ভাবনা ছিল কি।

রমেশবাবু আবার নীরব। দ্বিজদাস ঈশ্বরের কথা বলছে এবং এক সেকেণ্ডের জন্য সে উর্ধ্বনেত্র হল, রমেশবাবু তাও লক্ষ্য করলেন।

—হ্যাঁ, শোন কাজের কথাটা বলি—দ্বিজদাস একটু ঝুঁকে বসল।

—বলো—রমেশবাবু ঘাড় নামালেন না, শিরদাঁড়া শক্ত ও ঋজু রেখে স্থির চোখে

দ্বিজদাসকে দেখছিলেন। যেন ভিতরের অস্বস্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বলে বাইরে থেকে একটু বেশি কঠিন হয়ে রইলেন।

দ্বিজদাসের চোখ দুটো হঠাৎ ছোট হয়ে গেল, কপালটা কুঁচকে উঠল।

—চীন ভারত আক্রমণ করেছে তুমি জান বোধ হয়?

—হ্যাঁ, কাগজে তো তাই দেখছি। রমেশবাবু হঠাৎ হাল্কা গলায় হাসলেন। ঈশ্বর না পরকাল না। নিতান্তই এই জগতের খবর সন্ন্যাসীর মুখে। তুমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছ দেখছি?

—বা রে—শত্রু দেশের ওপর চড়াও হয়েছে চিন্তা করব না! দ্বিজদাস অবাক হল। কেন, তুমি কি চিন্তা করছ না।

তা—হ্যাঁ, একটু একটু করছি বৈকি। ভাল করে যুদ্ধটুদ্ধ বেধে গেলে আমার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। এ-যুদ্ধ তো আর সেই যুদ্ধ না। কালোবাজারের সুবিধাটা এবার থাকবে কিনা কে জানে—এখন থেকেই তোমাদের কংগ্রেস সরকার যেমন হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া গেলবার কতবড় দুটো মিলিটারি কন্ট্রাক্ট বাগিয়েছিলাম—আমেরিকা দুহাত উপুড় করে টাকা ঢেলেছিল মাসতুতো ভাই ব্রিটিশের ইজ্জত রাখতে—আজ তো আর সেই ভারত নেই—

—না তা নেই। এখন ভারত স্বাধীন। রমেশবাবুর কথায় দ্বিজদাস রাগ করল না, হাসল। তুমি তোমার ব্যবসা বাণিজ্য টাকা বাড়ির কথা ভাবছ বটে—কিন্তু এটা তো ঠিক, দেশকে বাঁচাতে হলে এবার আমাদেরই মৃত্যুপণ করে লড়তে হবে, চীনাদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা মাতৃভূমির সম্মান বজায় রাখতে হবে।

রমেশবাবু কথা বললেন না।

দ্বিজদাস হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল।

—নিজেরা অস্ত্র তৈরী করো—ভাল, বিদেশ থেকে অস্ত্র আসে—ভাল, না হলে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে চীনাদের যদি তাড়াতে হয় তবে সেভাবেও লড়বার জন্য দেশের মানুষকে তৈরী থাকতে হবে।

—আমাদের জোয়ানরা তো লড়ছে, কাগজে দেখছি।

হাতের দেশলাইটা রমেশবাবু নাড়াচাড়া করছিলেন।

দ্বিজদাসের মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হল।

—উপায় কি না লড়ে—নেফা পার হয়ে শত্রুসৈন্যের আসামে ঢুকতে কতক্ষণ। হ্যাঁ, আমাদের জোয়ানরা হাতে যেমন অস্ত্র আছে তাই নিয়ে লড়ছে, শেষ পর্যন্ত লড়বেও।

—তা তুমি কি বলতে চাও! রমেশবাবু নতুন করে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। রাত দুপুরে তুমি আমাকে কেন এসব শোনাতে এসেছ বুঝতে পারছি না।

দ্বিজদাস হঠাৎ কথা বলল না।

—আর অবাক লাগছে ভেবে, তোমার ঘর নেই সংসার নেই, চাকরির ভাবনা নেই বিষয়সম্পত্তির দুশ্চিন্তা নেই—দিব্যি একটি আশ্রমে আছ, তিনসন্ধ্যা ঈশ্বরের নাম করছ—তুমি কেন হঠাৎ যুদ্ধ নিয়ে দেশ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ আমায় বোঝাতে পার। একটু থেমে রমেশবাবু শেষ করলেন, তোমার তো এসব ভুলে থাকাই উচিত।

এবারও দ্বিজদাস রাগ না করে হাসল।

—হ্যাঁ, ভুলে থাকা উচিত। যদি সব ভুলতে পারতাম তবে তো হয়েই যেত। কিন্তু

পারছি কই। দেশকে স্বাধীন করব বলে আমার ছেলে বুকের রক্ত দিয়েছিল, আমি জেল খেটেছি—মিলিটারী পুলিশ আমার ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল। এখন আবার দেশের স্বাধীনতা চলে যাবে ভেবে বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল।

—তা আমায় কি করতে হবে বলো। রমেশবাবু নড়েচড়ে বসলেন। ঘড়ি দেখলেন। অনেক রাত হয়ে গেল।

—না, তোমায় আর কষ্ট দেব না। আমাকেও এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে। ট্রামবাস এখন নেই। ট্যাক্সি ধরতে হবে—রাত শেষ হবার আগে আমাকে আশ্রমে উপস্থিত থাকতে হবে—ব্রাহ্মমুহূর্তে হোম আরম্ভ হবে।

—হোম! মানে যজ্ঞ? চীনের ধ্বংস কামনা করে? রমেশবাবুর ঠাট্টা দ্বিজদাস গায়ে মাখল না, শান্ত গলায় বলল, চীনের ধ্বংস আমরা চাইছি না। কোন দেশ ধ্বংস হোক ভারত কি তা কামনা করতে পারে! ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য—দেশের স্বাধীনতা যাতে অক্ষত থাকে তাই কাল আমাদের আশ্রমে হোমের আয়োজন করা হয়েছে।

—ভাল ভাল। রমেশবাবুর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ল। তাই মাথাটা দোলাতে লাগলেন। হুঁ, সন্ন্যাসীরাও খুব দেশপ্রেমিক হয়। ছেলেবেলায় আনন্দমঠ পড়েছিলাম। মনে পড়েছে। মাতৃমন্ত্রের সাধক। দেশকে তারা জননী জ্ঞানে পুজো করত। মায়ের শৃঙ্খল মোচনের জন্য সন্তানের দল বুকের রক্ত দিয়েছিল। কেমন, তাই না?

দ্বিজদাস গম্ভীর থেকে ঘাড় কাত করল।

রমেশবাবু এখনো ঠাট্টাই করছিলেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছিলেন।

—তোমাদের আশ্রমে তোমার মতন এমন আর কজন সন্ন্যাসী আছে? তারা কি সবাই জেল খেটেছিল, সবাই দেশপ্রেমিক?

—সবাই জেল খেটেছিল কিনা জানি না। তবে সকলেই দেশকে ভালবাসে। দেশের জন্য তারা সকলরকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

রমেশবাবুর ঠোঁটের মোচড়টা সমানভাবে জেগে রইল। দ্বিজদাস এইজন্য একটুও দুঃখিত হল না। বলল, —কেবল আমাদের আশ্রমের না, আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—দেশ আক্রান্ত দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন—কথাটা তাদেব বুঝিয়ে দিতে হয়নি—যেন হাওয়ায় হাওয়ায় জানাজানি হয়ে গেছে, সবাই বুঝে গেছে আবার আমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে, তাই চারদিকে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে. তৈরী হও তৈরী হও—আক্রমণকারী দস্যুকে রুখতে হবে. দেশের মাটি থেকে শয়তানকে হটাতে হবে—

—দুপুর রাতে এরকম বক্তৃতা করার কোন মানে আছে, দ্বিজদাস—রমেশবাবুর ঠোঁট থেকে বক্র হাসিটা উধাও হল, কপালের কুঞ্চনগুলি প্রকট হয়ে উঠল। তুমি শেষ পর্যন্ত আমায় কি বলতে চাও বুঝতে পারছি না।

আবেগে দ্বিজদাসের গলার স্বর বেশ চড়া পর্দায় উঠে গিয়েছিল, বুঝতে পেরে হঠাৎ লজ্জিত হল বিব্রত হল।

—না বলছিলাম কি, হঠাৎ চীন এভাবে আক্রমণ করবে দেশের মানুষ বুঝতে পারেনি। এখন জেনে গেছে কত বড় বিপদ সামনে। সবাই সচেতন হয়ে উঠেছে। দেশকে বাঁচাতে হবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আর তার জন্য প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করছে। ওদিকে লড়াই করে জোয়ানরা যেমন প্রাণ দিচ্ছে তেমনি দেশের মানুষ টাকা দিচ্ছে, সোনা দিচ্ছে, রক্ত দিচ্ছে—যার যেমন সাধ্য যার যেমন সঙ্গতি। নিশ্চয় কাগজে

এসব খবর তুমি রোজই দেখছ। অনুনয়ের গলা দ্বিজদাসের, অত্যন্ত করুণভাবে সে এবার বন্ধুর চোখের দিকে তাকাল।

—দিক্ দিক্—রমেশবাবু এমনভাবে চোখ ঘোরালেন মাথা নাড়লেন যেন এই বিপদে তিনি একটুও কাতর নন চিন্তিত নন শঙ্কিত নন। কাগজের অত শত খবর খুঁটিয়ে পড়ার আমার সময় নেই উৎসাহও নেই। যে যা পারে দিক—আমি এক পয়সাও দিই নি—বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষ এদেশে লেগেই আছে, কিন্তু কোনদিন আমি একটি আধলা দান করিনি—কারোর জন্য কোন সাহায্য—

না, তোমায় দান করতে হবে না, তুমি কিছুই সাহায্য—দ্বিজদাস ব্যস্ত হয়ে বলতে যাচ্ছিল, রমেশবাবু তাকে বাধা দেন।

—আমি শুধু নিজেকে জানি, নিজেকে দেখছি, আমি চিরদিন স্বার্থপর—আর অতিরিক্ত স্বার্থপর বলে তোমরা স্বদেশীওয়ালারা তো চিরকাল আমায় ঘৃণা করে এসেছ—আজ আবার নতুন করে এসব কথা তুমি শোনাতে এসেছ কেন। যেন কিছুটা রাগে কিছুটা অভিমানে রমেশবাবুর গলার স্বর কাঁপছিল।—তোমরা দাও, তোমরা সন্ন্যাসীর দল আর তো কিছু দিতে পারবে না—ঐ লোটা কম্বলগুলি যুদ্ধতহবিলে পাঠিয়ে দাও, তাতেও ভারত রক্ষায় সাহায্য হবে।

দ্বিজদাস শব্দ করে হেসে উঠল।

– আরে শোন শোন—ইস্! তুমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ!

কম্বলের তলা থেকে একটা ছোট মোড়ক বার করে সে বন্ধুর চোখের সামনে ধরল। এটা তুমি কাল রাজভবনে পেঁছে দেবে—হুঁ, প্রতিরক্ষা তহবিল খোলা হয়েছে—মানুষ সোনাদানা টাকাকড়ি দিয়ে আসছে—

—এটা কি? রমেশবাবুর চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল।

—সোনার হার—খুব বেশি সোনা নেই—দু ভরির মতন—দ্বিজদাস মোড়কের কাগজটা খুলে ফেলল। গহনাটা রমেশবাবু হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন না। ফ্যালফ্যাল করে একটু সময় দ্বিজদাসের হাতের দিকে চেয়ে থেকে পরে বন্ধুর চোখের দিকে তাকালেন।

—এই হার কার?

—আমার স্ত্রীর—নীহারের গলায় ছিল।

—এটা দিয়ে দিচ্ছ! রমেশবাবু চমকে উঠলেন।

দ্বিজদাস একটা ঢোক গিলল।

আর তো কিছু দেবার নেই ভাই—যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম কোন ভাল কাজে মহৎ কাজে দান করব বলে।

—আশ্চর্য! রমেশবাবু বিড়বিড় করে উঠলেন। তাঁর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। যেন হঠাৎ কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কটমট করে একবার দ্বিজদাসের হাতের দিকে, একবার তার চোখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কেন, তুমি কি এটা প্রমীলাকে দিয়ে দিতে পারতে না? না হয় ওর বিয়ের সময় না দিয়েছিলে—এখন বেচারা কষ্টে পড়েছে, অনাথ হয়ে পড়েছে—তিন তিনটে সন্তান নিয়ে বোন পথে দাঁড়িয়েছে—আজ এই গহনা তার অনেক কাজে লাগবে—তুমি কি পাগল হয়েছ—ওকে না দিয়ে পাঠাতে চাইছ রাজভবনে। রমেশবাবুর চেহারাটা বিকৃত হয়ে উঠল।

দ্বিজদাস একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

—তোমার কথাও সত্য—তোমার যুক্তিও সুন্দর—কিন্তু বলতে বাধা নেই তোমায়, আমার স্ত্রী যেমন আমার নিকট প্রিয় ছিল তেম্নি তার গায়ের অলংকারও আমার অতি আদরের অতি প্রিয় জিনিস। এটার ওপর আমার অন্যরকম মায়া বুঝতে পাচ্ছ। সংসারের সব ছেড়েছি—কিন্তু এই হার সংগে সংগে রেখেছি। বলেছি, ভাল কাজে—মহৎ কাজে দান করব বলে গহনাটা প্রমীলাকে তার বিয়ের সময় দেওয়া হয়নি। কেননা প্রমীলার চেয়েও আমার কাছে প্রিয় আমাদের আশ্রম। আশ্রমে একটা ইস্কুল হবে। অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছে। কিছু কিছু করে চাঁদাও তোলা হচ্ছে। আমার ইচ্ছা ছিল ইস্কুলের জন্য আমি এটা দান করব। কিন্তু এখন দেখলাম তার চেয়েও বড় ও মহৎ কারণ উপস্থিত হয়েছে—হুঁ, দেশ—দেশের জন্য এই সোনাটুকু যদি দান করি তো স্বর্গে থেকে আমার স্ত্রীও তৃপ্ত হবে শান্তি পাবে। কেননা আমি যেমন দেশকে ভালবাসি, আমার ছেলে যেমন ভালবাসত, তেম্নি নীহারও দেশকে ভালবেসেছিল। যেন একটু বেশিই ভালবেসেছিল। আগস্ট আন্দোলনে আমাদের ছেলে বুক পেতে ব্রিটিশের গুলী বরণ করেছিল। মনে আছে, সেদিন সকালবেলা ছেলে যখন বাড়ি থেকে বেরোয় নীহার তার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিজদাসের গলা একটু ধরে এল। হঠাৎ থেমে গেল।

রমেশবাবু লক্ষ্য করছিলেন সন্ন্যাসীর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয় কি না। হল না। দৃষ্টি স্থির কঠিন। ইস্পাতের গুলির মতন চোখের মণি দুটো ঝকঝক করছিল। থুতনি তুলে আলোর দিকে চোখ রেখে দ্বিজদাস ভাবছে। হয়তো '৪২-এর আগস্টের সেই সকাল তার একটু বেশি মনে পড়ছে।

—বেশ—স্বরটাকে আর তিক্ত হতে দিলেন না রমেশবাবু, খুব একটা মিষ্টি করে যে বললেন তা-ও না, স্বভাবোচিত অবজ্ঞা ও ঔদাস্য চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলে তিনি অন্যদিকে তাকান।—তোমার জিনিস তুমি যেখানে খুশি দান কর, ফেলে দাও, আমার বলার কিছু নেই—কিন্তু আমাকে বলছ কেন—স্ত্রীর গলার হার রাজ্যপালের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুমি তুলে দিয়ে এসো।

—আমার যে ভাই কাল সময় হবে না।

—পরশু দাও।

—পরশুও আশ্রমে কাজ আছে।

—পরদিন এসে দিয়ে যাও।

দ্বিজদাস চুপ করে রইল।

রমেশবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। হাই তুললেন। হাইটা মিলিয়ে যাবার পর বললেন,—তা ছাড়া রাজভবনেই যে তোমায় ছুটে আসতে হবে তার কি মানে আছে। সেখানে থেকেও তুমি দান করতে পারবে। প্রতিরক্ষা তহবিল ফাঁপিয়ে তুলতে তুমি কি মনে কর মন্ত্রিরা কংগ্রেসের পাণ্ডারা তোমাদের বরানগরে ছুটে যাবে না। হয়তো দেখবে দান তুলতে কালই সেখানে বিরাট সভা ডাকা হয়েছে। অপেক্ষা কর। ব্যস্ত কেন।

—আমি নিজের হাতে জিনিসটা দিতে চাইছি না।

—তোমার বৌয়ের গায়ের গহনা। মহৎ কাজে দিচ্ছ—তুমিই তো হাতে ধরে দেবে। কাগজে তোমার নাম বেরোবে। রমেশবাবু হাসলেন, হাসির চেয়ে ভুরুর কুঞ্চনটাই অবশ্য অধিক চোখে পড়ছিল।

দ্বিজদাস নখ দিয়ে হাতের জিনিসটা খুঁটছিল।

—কি হল! রমেশবাবু তেম্নি তাকিয়ে।

দ্বিজদাস চোখ তুলল।

—আমি চাইছি না কাগজে আমার নাম বেরোক।

—কেন? রমেশবাবু ঢোক গিললেন। কাগজে ছাপার অক্ষরে দ্বিজদাস গাঙ্গুলী নামটা দেখতে তোমার আপত্তি?

দ্বিজদাস ঈষৎ হাসল।

—যদি বলি হ্যাঁ?

যেন হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝে গেলেন রমেশবাবু।

—ও বুঝেছি—প্রমীলার চোখে পড়লে মনে কষ্ট পাবে—ভাববে, আমায় বঞ্চিত করে দাদা নতুন করে সুনাম কিনতে দেশপ্রেমিক নামটা ছড়াতে বৌদির হারটা দান করে ফেলল—এই তো?

—প্রমীলার জানা না-জানায় কিছু এসে যায় না। ও তো জানতই আশ্রমে ওটা দিয়ে দিচ্ছি—একদিন না একদিন দিতামই। ঠোটের হাসি মুছে ফেলে দ্বিজদাস গম্ভীর হয়ে গেল।

রমেশবাবু অসহায় বোধ করলেন। কিন্তু তবু হাল ছাড়লেন না।

—ও বুঝেছি। লোকে ভাববে সন্ন্যাসী এই সোনা কোথায় পেল। যে গৃহত্যাগী সর্বত্যাগী তার কাছে তো সোনাদানা থাকবার কথা না—কেমন এই তো?

—ধর যদি তাই হয়? দ্বিজদাস আবার ঠোঁট টিপে হাসছিল। ভয়ংকর বিরক্ত হন রমেশবাবু। একটা সামান্য জিনিস নিয়ে একটা বাজে কথা নিয়ে লোকটা এত সময় নষ্ট করবে তিনি ভাবতেও পারেননি।

—তো আমায় টানছ কেন—বেশ তো, দান করে নাম গোপন রাখতে চাইছ—তোমার অনেক গুরুভাই আছেন আশ্রমে—তা-ও যদি অপছন্দ—কলকাতায় তোমার জানাশোনা কত মানুষ রয়েছে—তাদের কাউকে দিয়ে ওটা পাঠিয়ে দিও।

দ্বিজদাস প্রবলবেগে মাথা নাড়ল।

—তা হয় না, তা যদি হত তো তোমার কাছে ছুটে আসব কেন। আমি চাইছি তোমায় দিয়ে ওটা দান করাতে—গাড়ি করে নিজে যাও বা লোক দিয়ে পাঠাও—বেশতো, তোমার সময়ের অভাব, ডাকে পাঠালেও চলবে। তাই বরং ভাল হবে, সেভাবেই পাঠাবে।

রমেশবাবু কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথাগুলিও অস্পষ্ট হয়ে গেল।

—আমি বুঝতে পারছি না, তুমি এই একটা সাধারণ জিনিসের সঙ্গে আমার নামটা কেন জড়াতে চাইছ—ক ভরি সোনা আছে—ভাল করে দু ভরিও হয়তো হবে না, দেখি? দ্বিজদাসের হাত থেকে হারটা একবার তুলে পরীক্ষা করে পরে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেটা বন্ধুর হাতে তিনি ফিরিয়ে দিলেন।—আমি না—আমি এতে নেই—আমায় মাপ করো ভাই।

—তাতে কি, হোক না সাধারণ জিনিস—অতি তুচ্ছ একটা সোনার হার—কিন্তু তা হলেও কাগজে তোমার নাম বেরোবে।

—তাতে তোমার লাভ? রমেশবাবু প্রায় গর্জন করে উঠলেন। তুমি কি বলতে চাইছ ভাল করে বল তো শুনি?

দ্বিজদাস রাগ করল না, ভয় পেল না। স্থির সৌম্য দৃষ্টি বন্ধুর মুখের ওপর মেলে ধরে আস্তে আস্তে বলল, অনেক লাভ। লাভ বলেই তো ছুটে এসেছি। আমার বন্ধু লক্ষপতি রমেশ রায় একেবারে হাতের মুঠ বন্ধ করে থাকেনি—দেশের এই চরম সংকটে একেবারে চুপ করে নেই—যা হোক তবু কিছু একটা দিয়ে সাহায্য করেছে দেশকে—লোকে জানবে, লোকে বলাবলি করবে। সেখানেই আমার আনন্দ।

রমেশবাবুর মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা বেরোল না, মুখের পেশী থরথর করে কাঁপছিল। শরীরটাও কাঁপছিল! ক্রোধ সংবরণ করতে কষ্ট হচ্ছিল বলে হাতের মুঠ দুটো তিনি শক্ত করে ফেললেন।

অথচ দ্বিজদাস নির্বিকার। তার কণ্ঠস্বরে এতটুকু দ্বিধা বা জড়তা ছিল না। হাসি হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল।

—এটা রইল, কাল যা হোক করে পাঠিয়ে দাও—আমি চলি, এখন বেরিয়ে না পড়লে অসুবিধা হবে—হয়তো ট্যাক্সি পাব না—ভোর হবার আগে আমাকে আশ্রমে—

—খবরদার! রমেশবাবু হুংকার ছাড়লেন। কাগজে জড়িয়ে সোনার জিনিসটা টেবিলের ওপর রেখে দিতে হাত বাড়িয়েছিল দ্বিজদাস। রমেশবাবু কেমন যেন ছিট্‌কে গিয়ে বন্ধুর সামনে পড়লেন এমন ভাবে রুখে দাঁড়ালেন যেন এখুনি দ্বিজদাসের মাথাটা দু হাতে দেওয়ালের সংগে ঠেসে ধরে ঠুকে দেন। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল তাঁর। কথাগুলি জড়িয়ে যাচ্ছিল।

—আমায় অপমান করতে রাত দুপুরে ছুটে এসেছ—না? মশা মেরে আমি হাত কালো করব! রোল্‌স রয়েস গাড়ি হাঁকিয়ে রাজভবনে ছুটে যাব দু ভরির একটা গয়না দান করতে—লোকে মুখ ঘুরিয়ে হাসুক—তুমি তাই চাইছিলে—লোকের ওই ঠাট্টা বিদ্রূপ চমৎকার করে উপভোগ করতে—

—আরে না না—ছি—দ্বিজদাস এবার রীতিমত আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে কথা বলছিল।

রমেশবাবু বাধা দিলেন, আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

—চুপ, আর একটা কথা না। চুপ করে এখান থেকে তুমি সরে যাও—যদি ফের এরকম প্রস্তাব নিয়ে এখানে আর কোনদিন আস গলাধাক্কা দিয়ে আমি বাড়ি থেকে বার করে দেব।

দ্বিজদাস মুখ তুলল না। মাথা গুঁজে চৌকাঠের দিকে সরে গেল।

—এই কে আছিস! রমেশবাবু হাঁক দিতে চাকরটা ছুটে এল। একে বার করে দিয়ে সদর বন্ধ করে দে। কাঁপতে কাঁপতে রমেশবাবুও চৌকাঠ পর্যন্ত যান, তারপর আর অগ্রসর হন না।

চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দ্বিজদাস আর একবার ঘুরে দাঁড়াল। যেন শেষ বারের মতন কথাটা বলে যেতে চায়। তার চোখে অনুনয়।

—বুঝলে বন্ধু, আমি সরল মন নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম। কোনরকম দুরভি-সন্ধি—

—থাক্‌—বলছি তো আর একটিও কথা না। ভেংচি কাটতে গিয়ে চেহারাটাকে বীভৎস করে তুললেন রমেশ। তুমি আমায় দেশপ্রেম শেখাতে এসেছিলে, দান শেখাতে এসেছিলে, পরার্থপরতা শেখাতে এসেছিলে। বুঝতে পারিনি কি—বেশ বুঝতে পেরেছি—দয়া করে এখন বেরিয়ে যাও।

তারপর দ্বিজদাস আর একবারও মুখ তুলল না দাঁড়াল না। মাথা গুঁজে বারান্দা

পার হয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল। পিছনে রমেশবাবুর চাকর।

দুটো মাথা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি এই মুহূর্তে দ্বিজদাস আবার ওপরে উঠে আসত, দেখত মুখের বিকৃতি সরে গিয়ে অভিমানী ছেলের মতো বন্ধুর ঠোঁট কাঁপছে চোখ ছলছল করছে।

সত্যি রমেশবাবু কাঁদছিলেন। অপমানের জ্বালায় কাঁদছিলেন। তাঁর আশঙ্কা তাঁর সন্দেহই ঠিক হল। দোরে খিল এঁটে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পর তিনি আঁৎকে উঠেছেন, বিছানায় উঠে বসেছেন। যেন কে আসছে—কি এসে ঘরে ঢুকল। ক'রাত ধরে এই ভয় অস্থিরতা। আজ ঠিক এল। ডাকাত না খুনে না। মূর্তিমান ঠাট্টার মতন দ্বিজদাস নিশুতি রাত্রে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। আর বৌয়ের গলার সরু একটা হার, রমেশবাবুর কুকুরের গলার চেন্-এর চেয়েও সস্তা খেলো জিনিসটা দিয়ে দ্বিজদাস তাঁকে আঘাত করল। এই আঘাত তিনি ভুলতে পারছেন না। তাঁর মুখের কপালের চামড়ায় কালশিরা পড়ে গেছে। অপমানের কালশিরা। বারবার হাত বুলিয়ে রমেশবাবু আঘাতের চিহ্ন অনুভব করছিলেন আর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন। তারপর একসময় তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

বটে! এই অপমানের প্রতিশোধ তুলতে হবে। চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি ক্রুর কঠিন হয়ে উঠল। তিনিও পাল্টা আঘাত করবেন। ত্রস্ত হাতে রমেশবাবু দেরাজ টেনে ব্যাঙ্কের বইটা বার করলেন। দেড় দু ভরি না, স্নেহলতার গায়ের দু শ ভরি সোনার গয়না আজও ব্যাঙ্কে জমা আছে। সবটা সোনা তুলে এনে ডেলা করে তিনি ছুঁড়ে মারবেন। যাতে দ্বিজদাসের নাক মুখ থেঁতলে যায়। না না, তার সঙ্গে আরো কিছু। রমেশবাবু চেক্-বই•বার করে দু হাজার টাকার চেক্ কাটলেন। সব কাল রাজভবনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ফিরবেন। কেননা এসব দিয়েও—এই সোনা টাকা গিয়েও তাঁর অনেক থাকবে—অ—নে—ক, এবং তারপর যদি কোনদিন দ্বিজদাস এখানে আসে......

কলমের মুখটা বন্ধ করে রমেশবাবু চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছিল।

—কাজ হল, সাধুবাবা? রমেশবাবুর চাকর প্রশ্ন করছিল।

—আশা করি হবে। গেট্এর বাইরে পা বাড়াতে গিয়ে দ্বিজদাস থমকে দাঁড়াল ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখে মৃদু হাসি। সেবার দেশের কাজ করতে গিয়ে সঙ্গিনের খোঁচা খেয়েছিলাম, এবার খেলাম বন্ধুর গলা-ধাক্কা। বলে দ্বিজদাস লম্বা পা বাড়িয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

রাগদর্পণ

ফকীরউল্লাহ্‌

[রাগদর্পণ গ্রন্থটি ফকীর উল্লাহ্‌ কর্তৃক রচিত। ইনি প্রথমে বীর সৈন্যাধ্যক্ষ রূপে আওরংজীবের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন; পরে আগ্রা, কাশ্মীর, বিহার এবং এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত হন। ফকীর উল্লাহ্‌ একাধারে সাহসী যোদ্ধা ও সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। "রাগদর্পণ" গোয়ালীয়রের সঙ্গীতজ্ঞ শাসনকর্তা রাজা মানের নামে রচিত "মানকুতূহল" নামক গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ। একে ঠিক অনুবাদও বলা যায় না কারণ তিনি তদানীন্তন সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত এবং তদীয় মন্তব্যাদিও এই গ্রন্থে যোজনা করেছেন। ফলে এর স্বকীয়তাও যথেষ্ট রয়েছে। গ্রন্থটি নিপুণ গবেষণার ফল এবং সাহিত্য হিসাবেও মূল্যবান। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে লেখকের মৃত্যু হয়। গ্রন্থটি তিনি লিখতে আরম্ভ করেন ১৬৬৩ সালে সর্‌হিন্দ্‌-এ এবং শেষ করেন ১৬৬৬ সালে, কাশ্মীরে।]

এই গ্রন্থে দশটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়—প্রস্তাবনা; দ্বিতীয় অধ্যায়- রাগসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়; তৃতীয় অধ্যায়—মৌসুম নির্ণয়, ঋতু অনুসারে গ্রাম, রাগ ও রাগিণীর গায়ন, নিষিদ্ধ হরফ নির্ধারণ, গণতত্ত্ব ও গ্রামসমূহের কাল নির্ধারণ; চতুর্থ অধ্যায়—সুর সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিবিধ নিবন্ধ গীতরূপের বিবরণ; পঞ্চম অধ্যায়—ব্যাদাদি, নায়ক, নায়িকা ও সখী সম্বন্ধীয় বিবরণ; ষষ্ঠ অধ্যায়—গায়কের দোষ; সপ্তম অধ্যায়—আওয়াজসমূহের সনাক্তকরণ ও কণ্ঠসম্বন্ধীয় তথ্য; অষ্টম অধ্যায়—গায়ক কি ভাবে সাফল্য অর্জনে সমর্থ হন তার বিবরণ; নবম অধ্যায়—বৃন্দসম্বন্ধীয় তথ্য এবং বৃন্দগানের সুফল; দশম অধ্যায়—জীবিত ও ভূতপূর্ব গায়ক ও বাদকগণের পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়

ফকীরউল্লাহ্‌ প্রথমে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং মার্জিতরুচি প্রধান রাজপুরুষদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। ১০৭৩ হিজরী সনে (১৬৬৩) একটি পুরাতন গ্রন্থ ফকীরের নজরে পড়ে। লেখকের সময় এই গ্রন্থটি মানকুতূহল নামে পরিচিত ছিল। এটি রচিত হয় গোয়ালীয়রের শাসনকর্তা রাজা মান সিং-এর সময়ে। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁর এত খ্যাতি যে তাঁর সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। রাজা তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত গায়ক ছিলেন, যথা—নায়ক ভানু, নায়ক বখ্‌শু, নায়ক পান্দুয়ী (ইনি তিলঙ্গ দেশ থেকে পুণ্য ও স্নানের জন্য কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন।), মাহ্‌মুদ্‌, লোহঙ্গ্‌ এবং কিরণ। অধ্যাপককেই (মু'আল্লিম) নায়ক বলা হয়। উল্লিখিত গায়কগণ যখন মিলিত হলেন তখন রাজা ভাবলেন যে এই যুগ এবং কাল অতিক্রান্ত হলে এই শ্রেণীর নায়কদের একত্র হওয়া কঠিন হবে। সাধারণের হিতার্থে রাগসম্বন্ধীয় এই সব বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে শিক্ষার্থিদের অসুবিধা দূর হয়। এই কারণে রাগ, রাগিণী ও পুত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হল। রাজা নিজের নামে গ্রন্থ রচনা করলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। এই গ্রন্থকে আদর্শ অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে হওয়ায় ফকীর এই গ্রন্থের তর্জমা করলেন যাতে অনুসন্ধিৎসু-

গণের পক্ষে ভরতসঙ্গীত, সঙ্গীতদর্পণ ও সঙ্গীতরত্নাকর দেখবার প্রয়োজন হয় না। এই গ্রন্থে যাতে সময়ানুসারে সব বৃত্তান্ত পাওয়া যায় সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এটি রচনা করা হয়েছে। এই কারণেই এর নাম দিয়েছি রাগদর্পণ—যেমন একটুকরো দর্পণে পর্বত ও মরুভূমির সবই প্রতিফলিত হয়। এতে রাগগায়নের সময় এবং সম্পূরণ প্রভৃতি তথ্য লিপিবন্ধ করা হয়েছে। কয়েকটি রাগ নৃত্যনির্ণয় অনুসারে লিপিবন্ধ হয়েছে ও চন্দ্রাবতী লিখেছেন। অপর যেসব রাগ এ অঞ্চলে নজরে পড়ে না সেগুলিও লিখিত হয়েছে। সুনিপুণ বাদকদের এমন সমাবেশের সুযোগও দেখা যায় না। রাজা নিজে বিশ্লেষণপূর্বক এটি রচনা করিয়েছেন। লেখকের এটি বোধগম্য হয়েছে এই বিশ্বাসেই ভগবানের ইচ্ছায় লেখায় হাত দেওয়া হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানকুতূহল গ্রন্থে রাগসমূহ এই ভাবে লিখিত হয়েছে।

শুদ্ধরাগ : ভৈরোঁ—সম্পূর্ণ, প্রাতঃকালে গেয়।

মালকোশ, হিন্দোল—বসন্তকালে গেয়। সময়—প্রাতঃকাল; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে প্রযোজ্য।

দীপক—সম্পূর্ণ

শ্রী—সম্পূর্ণ; বীররস; খরজগ্রাম; সময়—সায়ংকাল।

মেঘ—খরজগ্রাম।

এই ছটি হচ্ছে আসল রাগ।

শ্রেণীবিভাগগুলি এই ভাবে দেখানো হয়েছে—

শুধ্, সংকীর্ (সংকীর্ণ), সালঙ্ক, সম্পূর্ণ, খাড়ো (খাড়ব) এবং ওড়ো (ওড়ব)।

শুধ্—যে ছটি রাগ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি।

সংকীর্—যে সব রাগ রাগিণী ও পুত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

সালঙ্ক—এগুলি ছাড়া যেগুলি বর্তমানে ও ইতঃপূর্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুন্দর এবং অতুলনীয়ভাবে রচনা করেছেন। তাঁরা কয়েকটি রাগ একত্র করে একটি উত্তম রাগিণী রচনা করেন এবং এর নাম দিয়েছেন সালঙ্ক।

সম্পূরণ—সাতটি স্বর একত্র করে যে রাগ রচিত হয় তাকে সম্পূরণ বলে।

খাড়ো—ছটি স্বরে সহযোগে প্রস্তুত

ওড়ো—পাঁচটি স্বরে গঠিত

এর চেয়ে কম স্বরের কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় না।

রাগিণী মানে স্ত্রীলোক (জন্) ও পুত্র মানে ছেলে (পুর্)।

প্রত্যেক রাগের পাঁচটি রাগিণী ও আটটি পুত্র আছে কিন্তু শ্রীরাগের ছ'টি রাগিণী ও ন'টি পুত্র।

দ্বিতীয়—সঙ্কীর্ণ পর্যায়।

ভৈরোঁরাগের রাগিণীগুলির তালিকা দেওয়া হল। ওস্তাদ্‌গণ এইভাবেই সিদ্ধান্ত করেছেন এবং শ্রীরাগ সম্বন্ধেও কিছু বলেছেন। প্রথমে ভৈরোঁ। বাঙ্গালী, ভৈরবী—সম্পূরণজাতীয়; বেলাওলী—এগুলি শৃঙ্গার রসে ব্যবহৃত হয়।

পুত্র—বঙ্গাল (সম্পূর্ণ)। আনন্দজনক পরিবেশে গাওয়া হয়। সময়—প্রাতঃকাল।
পঞ্চম—বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুতরসে প্রযোজ্য। গ্রীষ্মে দিবসের প্রথম প্রহরে গেয়। খরজগ্রাম।
মাধ্, হরখ্ (হর্ষ), বৈশাখী, ললত -সম্পূর্ণজাতীয়। প্রাতঃকালে গেয়। বীররসে প্রযোজ্য।
বেলাওল—প্রাতঃকালে গেয়।
মাধুণ্ড্।

ভৈরোঁর রাগিণী ও আটটি পুত্রের উল্লেখ করা হল। এখন মালকোশ-এর রাগিণী ও পুত্রাদির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে—

গৌণ্ডক্রী, গান্ধারী, শহ্বরী (শর্বরী?) অন্ধিয়ালী, ও ধনাশ্রী।

পুত্র—মারোয়ী, নাদপ্রবল, মশ্তাঙ্গ্, চন্দ্রকোশ, ভূরষ্টন (?), খুখর।

হিন্দোলের রাগিণী ও পুত্রগণ।

রাগিণী—তিলঙ্গী, দেওগিরি—ওড়ব, দিবসের চতুর্থপ্রহরে গেয়। বাসন্তী, সিন্ধুরী, আভিরী।

পুত্র—মঙ্গল, চন্দ্রভান, সুভাঙ্গ, আনন্দ্, বিভাস। সম্পূর্ণ; প্রাতঃকালে গেয়। পরধন, বসন্ত- সম্পূর্ণ; প্রভাতে গেয়।

দীপকের রাগিণী ও পুত্রগণ।

রাগিণী—কামোদিনী—খরজগ্রাম, সন্ধ্যাকালে, সূর্যাস্তে গেয়। পটমঞ্জরী, তোড়ী—সম্পূর্ণ; এটি শুনলে প্রাণে আনন্দ সঞ্চারিত হয়। গুর্জরী অথবা গুজরী—শৃঙ্গার রসে প্রযোজ্য; প্রভাতে গেয়। গাম্ভলী।

পুত্র—গোল, কোসম্ভ্ (কৌশম্বী?) রাম, কণ্টল্ (কুন্তল?), কুলঙ্গ্, লহল্ চম্পক, হিমাল।

শ্রীরাগের রাগিণী ও পুত্রগণ।

রাগিণী—বীরারী—সম্পূর্ণ, রস-শৃঙ্গার
কর্ণাটী, সাভরী, গৌরী—বীররস। দিবসের চার ঘড়ীতে গাওয়া বিধেয়।
রামকরী, কেহ কেহ রামকলী বলেন:- সম্পূর্ণ, সব সময়েই গাওয়া চলে।
সিন্ধবী—সম্পূর্ণ; সবরসেই প্রযুক্ত হয়।

পুত্র—সিন্ধু, মালু—সায়ংকালে গেয়।
গোন্দ্—সম্পূর্ণ; প্রাতঃকালে গেয়।
গম্ভীর, গুণসাগর, বিকট, কল্যাণ: সম্পূর্ণ, সায়ংকালে গেয়।
কুম্ভ, আকট।

মেঘের রাগিণী ও পুত্রগণ।

রাগিণী—মল্লারী—প্রভাতে গেয়।
সুরঠী—সম্পূর্ণ, সায়ংকালে গেয়।
আসাওরী—সম্পূর্ণ, করুণরসে প্রযোজ্য। গায়ক বেঙ্কটমানী।

পুত্র—নটনারায়ণ—সম্পূর্ণ, বর্ষাকালে গেয়।
কান্হরা—সূর্যাস্তের পরে গেয়।
সারঙ্গ্—সম্পূর্ণ, দিবা দ্বিপ্রহরে গেয়।

কিদারা—সম্পূর্ণ, অর্ধরাত্রে গেয়।

গোন্দ্‌মল্লার, জালন্দাহ্‌, শঙ্করাভরণ—সম্পূর্ণ, প্রভাতে গেয়।

অতঃপর মিশ্ররাগের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কোন কোন রাগ একত্র হলে নতুন রাগিণীর চেহারা ফুটে ওঠে সেটি দেখাবার জন্য লেখক কানড়া থেকে আরম্ভ করেছেন। এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কানড়ার পাঁচটি প্রকারভেদ প্রদর্শন করেছেন।

শুধ্‌-কানহরা—যখন কান্‌হরাকে ধনাশ্রীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একে বাগেশ্রী বলা হয়।

আড়ানা—যখন কানহরাকে মল্লারের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

শাহানা—যখন ফিরোদস্ত্‌কে কান্‌হারার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

পুরিয়া—যখন কান্‌হরাকে ধুলশ্রী ও মঙ্গলাষ্টকের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

খাড়ো কামোদের পাঁচটি প্রকারভেদ নির্দিষ্ট হয়েছে।

কামোদা—গোন্দ্‌ ও বেলাওল যখন একত্রিত হয়।

শুধ্‌ কামোদা—উক্ত কামোদাকে শুধ্‌-এর সঙ্গে একত্র করলে শুধ্‌ কামোদা হয়।

কল্যাণ কামোদ—যখন কামোদকে কল্যাণের সঙ্গে একত্র করা হয়।

সাওন্ত্‌ কামোদ—যখন সাওন্ত্‌কে (সামন্ত) কামোদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

তিলক কামোদ—কামোদকে খট্‌রাগের সঙ্গে একত্রিত করলে তিলক কামোদ হয়।

মালশ্রী—মালশ্রী, সরস্বতী, কেদারা, শঙ্করাভরণ। সম্পূর্ণ। সব সময় গাওয়া চলে। মালশ্রী ও বিভিন্ন রাগ একত্র করলেও তাকে মালশ্রীই বলা হয়। কারণ কেবলমাত্র মালশ্রী শুদ্ধভাবে বর্তমান থাকলে তার নাম মালশ্রীই থাকে। (গ্রন্থের পাদটীকায় বলা হয়েছে যে ভরত তাঁর গ্রন্থে মালশ্রীর স্থানে মধ্‌মাধ্‌ এনেছেন।)

ধনাশ্রী—গৌরী, মারু ও জেতশ্রী।

জেতশ্রী—ধুল, বীরারী, দেশকার। সম্পূর্ণ

ধুলশ্রী—যখন বীরারীকে জেতশ্রীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

রামকেলী—ভীমপলাশ, ললত ও রিওয়া।

গুণকলী—গোন্দ্‌, আড়ানা, গৌরী। সম্পূর্ণ। সায়াংকালে গেয়। একে গুণকরীও বলা হয়।

দেশকলী—দেশী, টোড়ী, ললত।

গোন্দ্‌কলী—গুজরী, আসাওরী। কথিত আছে গোরখ্‌নাথ এইটি প্রথমে গেয়েছিলেন।

খট্‌সার—টোড়ী, আসাওরী, শ্যাম, বহুল, গান্ধার ও বীরারী।

মঙ্গলাষ্টক—কেদারা, কল্যাণ, কান্‌হরা, চতুরশ্রী, শ্যাম।

চোরাষ্টা (চৌরাষ্টক ?)—আসাওরী, পূর্বী, ভৈরোঁ, দেওগান্ধার।

নটের নয়টি প্রকারভেদ এইভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে :—

শুধ্‌-নট—বাগেশ্রী, পুরিয়া, মধ্‌মাত। সম্পূরণ। সন্ধ্যাকালে গেয়।

নটকল্যাণ—কল্যাণের সঙ্গে নট সংযোজন।

নট কান্‌হরা—কান্‌হরাকে নটের সঙ্গে সংযোজন।

নট কেদারা—কেদারাকে নটের সঙ্গে সংযোজন। সম্পূর্ণ

হীর্‌ নট (আহীর-নট ?)—যখন নটকে হীরের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

নটমল্লার—নটকে মল্লারের সঙ্গে সংযোজন।

কামোদনট—কামোদকে নটের সঙ্গে সংযোজন।

নটসারঙ্গ—নটকে সারঙ্গের সঙ্গে সংযোজন।

হমীর নট—নটকে হমীরের সঙ্গে সংযোজন। সম্পূর্ণ। প্রাতঃকালে গেয়।

নয়টি নট ব্যতীত আরও কয়েকটি দেখানো হয়েছে।

নটনারায়ণ—লঙ্ক্‌দহন, মধ্‌মাধবী, বীরারী, শঙ্করাভরণ। (পাদটীকায় বলা হয়েছে—রাগসাগর নামক গ্রন্থে এই রাগ এবং পঞ্চমকে ষড়রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; মালকোশ ও মেঘকে বাদ দেওয়া হয়েছে।)

রাজনারায়ণ নট—গাম্ভারীকে টোড়ীর সঙ্গে সংযোজন।

নাটকরম্ভা—ধূল, মধ্‌মাত, ধনাশ্রী, কল্যাণ, কামাদ, কেদারা আহীরী, কান্‌হরা—এই রাগগুলিকে নটের সংগে একত্র করলে তাকে নাটকরম্ভা বলা হয়। এই রাগটি বলদেব গান করেছিলেন।

গ্রন্থপহাড়ী—শ্রীরাগ, মালুহ্‌ ও নট—এই তিনটির মিশ্রণে উৎপন্ন।

সরস্বতী—গৌরী, বিভাস ও করাহ্‌ (কোড়া?)—এই তিনটির মিশ্রণে উৎপন্ন

পূরিয়া—গৌরী এবং মালুহ্‌কে একত্র করে উৎপন্ন। সম্পূর্ণ। আনন্দজনক পরিস্থিতিতে গেয় (হঙ্গামে খুশ্‌হালী বায়েদ্‌ সুরূদ্‌)। দিবসের চতুর্থ প্রহরে গাওয়া বিধেয়।

বড়হংস—জয়েৎ, পাহাড়ী, মারু যখন ধনাশ্রীর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন এই রাগটি উৎপন্ন হয়।

ফিরোদস্ত্‌—পূরবী, গৌরী ও শ্যাম একত্র হলে তাকে ফিরোদস্ত্‌ বলে। এই রাগটি আমীর খুস্‌রও আলাইহে অল্‌রহমৎ রচনা করেছিলেন।

মনোহর (গৌরী)—তর্‌উন্‌ (ত্রবণ), পাহাড়ী, মারু একত্রিত হলে এই রাগ উৎপন্ন হয়। একে গৌরীও বলা হয়।

মধ্‌মাত—মল্লার ও মালশ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন। ঔড়ব রাগ। প্রাতঃকালে গেয়।

ত্রবণী—নটনারায়ণ, জেতশ্রী ও শঙ্করাভরণের মিশ্রণে উৎপন্ন।

শঙ্করাভরণ—বেলাওল ও কেদারার মিশ্রণে উৎপন্ন। এইটি মহাদেব গেয়েছিলেন।

লঙ্কদহণ বা লঙ্কাদাহণ (হনূনট)—জেত, পাহাড়ী ও কেদারার মিশ্রণে উৎপন্ন। একে হনূনট বলা হয়। পাদটীকায় বলা হয়েছে যে এর অপর নাম হনূ-নট।

পরবী—দেবগিরি, পূরবী, গৌরী ও গোন্দ্‌-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

খম্বাবতী(১)—মালশ্রী ও মল্লারের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগটি প্রথমে ভরত গান করেন।

অম্ধাবতী—দেশী, আসাওরী, খট্‌রাগ-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

বীরারী—দেশকলী, টোড়ী ও এবণী-র মিশ্রণে উৎপন্ন। সম্পূর্ণ। এই রাগটি প্রথমে তির্‌হুতে গাওয়া হত। এই স্থান থেকেই মারু, ধূল, ধনাশ্রী ও গাম্ভারী—এই চারটি রাগ উৎপন্ন হয়েছে।

পটমঞ্জরী—উপরোক্ত চারটি রাগ, অর্থাৎ, মারু, ধূল, ধনাশ্রী ও গাম্ভারীর সহযোগে উৎপন্ন।

১ আদর্শরূপে গৃহীত পুঁথিতে এটি "কভাবতী" লিখিত আছে। উইলার্ডের-*A tratise on the Music of India*-তে এটি খম্বাবতী বলা হয়েছে। এই পাঠটিই সমীচীন বোধ হয়।

কণ্ঠা—মারু, কেদারা, জেতশ্রী ও শুধ্-এর মিশ্রণে উৎপন্ন। পাদটীকায় বলা হয়েছে ভরতসংগীত নামক গ্রন্থে এর নাম "খটশ্রী" লিখিত আছে।

টঙ্ক—ভৈরোঁ কান্হরা, শ্রীরাগ, শারঙ্গ-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

নাগধন্ (নাগধ্বনি)—সুহুর্ রাগকে মল্লার ও কেদার সঙ্গে মিলিত করলে এই রাগ উৎপন্ন হয়। এর সম্বন্ধে লিখিত আছে যে একটি নাগলোকে গাওয়া হয়।

পাদটীকায় বলা হয়েছে যে কারো কারো মতে মাটির নিচে সর্পের বসতি বর্তমান। অপর মতে মাটির ঊর্ধ্বেও সর্পের বসতি আছে এবং এই প্রাণীরা রাক্ষস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আভিরী—দেশকলী, কল্যাণ, গুজরী ও শ্যামের মিশ্রণে উৎপন্ন। সায়ংকালে গাওয়া বিধেয়। এই রাগটিকে প্রথমে কাহ্না বলা হত।

রবহংসমঙ্গল—শঙ্করাভরণ, সুরঠী ও আড়ানার মিশ্রণে উৎপন্ন।

সুরঠী—বঙ্গীয়াল, গুজরী, পঞ্চম, গান্ধার ও ভৈরবীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

রাজহংস—শ্রীরাগ ও মালুহ্—এই দুটির মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগটি ভরতের সম্মুখে নারদ গান করেছিলেন।

সীসমুধ্ (শেষ মুধ?)—টঙ্ক, শুধ্, গান্ধার, মালশ্রী ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

সোহনী—ধুল ও গোন্দের মিশ্রণে উৎপন্ন।

দেশী—টোড়ী ও খট্রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন। করুণরসে প্রযুক্ত হয়। সব সময় গাওয়া যেতে পারে।

দেওগিরি—সারঙ্গ, পুরবী ও শুধ্-এর মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগটি দেবতারা গেয়েছিলেন।

কোলাহল—কল্যাণ, বিহাগড়া ও কান্হরা একত্র করে এই রাগ উৎপন্ন হয়েছে। এটিও ভরত গেয়েছিলেন।

শ্রীরওন—শঙ্করাভরণ, শ্রীরাগ ও মালশ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

ককৎ(?)—বিলাওল, পুরবী, কেদারা, দেওগিরি, মাধু—এই রাগগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন। শরৎ ঋতুতে গাওয়া হয়। করুণ রসে প্রযোজ্য।

গুজরী—রামকেলী, শ্যাম, গান্ধার ও মঙ্গলের মিশ্রণে উৎপন্ন।

বিচিত্রা—চৈতী, গৌরী, শ্রীরওন, বীরারী—এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন।

কুলালী—নটনারায়ণ, কান্হরা, মল্লার এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন।

হিন্দোল রাগ—ললৎ, লীলাবতী, ভৈরোঁ, পঞ্চম, পুরিয়া এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন। ভরত লিখেছেন যে যাবতীয় রাগ যেগুলিতে রাগিণী মিশ্রিত হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটি এক এক করে মহাদেবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। দীপক রাগ মহাদেবের পত্নী পার্বতী গেয়েছেন।

মেঘ—বসন্ত, সাওন্ত, কল্যাণ ও কামোদার মিশ্রণে উৎপন্ন।

বহুলা—রামকেলী, গুজরী, দেওকলী, বঙ্গীয়াল একত্র করে এই রাগ উৎপন্ন হয়েছে।

দেশাখ—শুধ্, শঙ্করাভরণ, কান্হরা ও মল্লারের মিশ্রণে উৎপন্ন।

শ্রীরাগ—গৌরী, টঙ্ক ও বড়হংসের মিশ্রণে উৎপন্ন।

বসন্ত—সারঙ্গ, নট, মল্লার বিলাওল ও দেওগিরির মিশ্রণে উৎপন্ন।

শঙ্করমন—লঙ্কাদাহন, সুরঠী ও বিলাবল একত্র করে এই রাগটি উৎপন্ন হয়েছে। এই রাগটি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে মহাদেব ব্যতীত অপর কেহই এটি জানতেন না।

বিলাওলী—বিলাওল ও সারঙ্গ—এই দুটির মিশ্রণে উৎপন্ন।

কামোদিনী—সুহ্‌রায়ী (সম্ভবত সুঘ্রায়ী) ও সুরঠীর সহযোগে উৎপন্ন।

ইমন (বা এমন্)—কল্যাণ, কেদারা ও বিলাওলকে একত্র করে প্রস্তুত হয়েছে।

হমীর—কেদারা, কল্যাণ, ইমন—এই তিনটির মিশ্রণে উৎপন্ন। এইটি প্রথমে গোরী-নাথ গেয়েছিলেন।

গান্ধার—সিন্ধু, ভৈরোঁ এবং আসাওরীর মিশ্রণে উৎপন্ন। সম্পূর্ণ।

দেওয়ারী-মালশ্রী, গম্ভারী ও সরস্বতীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

গম্ভারী—ধনাশ্রী ও সুরটের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগ গণেশ রচনা করেছিলেন।

মধ্‌মিথুন—নটনারায়ণ, মল্লার, শুধ্, হমীর ও মধ্‌বন্ একত্রিত হয়ে এই রাগ উৎপন্ন হয়েছে। একে মাধবীও বলা হয়।

অগ্রম পঞ্চম—ললৎ, বিভাস, বসন্ত, দেশকার—এইগুলি মিশ্রণে উৎপন্ন।

পঞ্চম—ললৎ ও বসন্তের সহযোগে উৎপন্ন।

গৌররাগ—নট, হমীর, হীর্ (আহীর?)—এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন। মূল রূপটি গুজরাট থেকে এসেছে।

বেহাগরা—কেদারা, গৌরী, শ্যাম। সায়ংকালে গেয়।

নাটসারঙ্গ্—দেওগিরি ও মল্লারের মিশ্রণে উৎপন্ন।

সারঙ্গ—দেওগিরি ও শুধ্-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

সুহা—বিলাওল ও বাগেশ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

শিবরতি—বড়হংস ও সিন্ধুর মিশ্রণে উৎপন্ন। এটি কামের পত্নী রতি প্রথমে গেয়েছিলেন।

সিন্ধবী—আসাওরী ও শিবরতির মিশ্রণে উৎপন্ন।

মরোয়া—ললৎ, দেশাখ, কান্‌হরা ও শ্রীরাগ যখন পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন এই রাগ উৎপন্ন হয়।

কলাপ্রবীণ—কোকলৎ (?), কান্‌হরা, সুহা একত্রিত করে উৎপন্ন। এটি নারদ রচনা করেছিলেন।

ভূপালী—ইমন, গুণকলী ও কল্যাণ একত্রিত করে উৎপন্ন।

তোড়ী—ললত, ধনাশ্রী, ধূলশ্রী একত্রিত করে গঠিত।

ভৈরবী—শুধ্, শ্যাম, ভৈরোঁ একত্রিত করে উৎপন্ন।

দীপাবতী—দীপক ও সরস্বতীর মিশ্রণে উৎপন্ন। এটি রাজা বসন্ত[১] রচনা করেন।

আভীরবী—টঙ্ক, টোড়ী ও দেওগান্ধারের মিশ্রণে উৎপন্ন।

বঙ্গালী—বীরারী, গোন্দ্, গুজরী একত্রিত করে উৎপন্ন।

ললত—দেশী, বিভাস ও পঞ্চমের মিশ্রণে উৎপন্ন।

মল্লার—নট, সারঙ্গ ও মেঘের মিশ্রণে উৎপন্ন।

সাওন্ত—নট, কেদারা, কান্‌হরা ও কামোদিনীর মিশ্রণে উৎপন্ন। সম্পূরণ। প্রাতঃকালে গেয়।

এই পর্যন্ত এই কিতাব থেকে তর্জমা করে দেখালুম। এইগুলি ছাড়া আরও কিছু

[১] পুঁথিতে এই নামটি স্পষ্ট নয়। "বসম্প্"-এইরকম পাঠ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটি বসন্তই হবে।

সংখ্যক রাগিণী ও রাগ লেখকের নজরে পড়েছে যা গাওয়া হয়ে থাকে। এইগুলি রাগসাগর, রাগপ্রকাশ ও রিসালা-ই-সইদ্ মন্সুর—এই গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়াও রচনা করেছিলেন আমীর খুস্রও, শেখ্ বাহাউদ্দীন্ জ্যাকোরিয়া মুলতানী ও সুলতান হুসেন্ শরকী প্রভৃতি ওস্তাদবৃন্দ—এইরকম বর্ণিত হয়েছে।

আমীর খুস্রও সমস্ত রাগ থেকে বারটি রাগ নির্বাচিত করে প্রদর্শন করেছিলেন। এইগুলির নামসমূহ এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

বীরারীতে মালশ্রী, দুগাহ্ ও হুসায়নী একত্র করে মুয়াফ্ফেক্ নাম দেওয়া হয়েছে। একে দেওয়ালীও বলা হয়।

টোড়ীতে পঞ্চগাহ্ ও মুহাইয়ীর-এর গোশা একত্র করে মহীর্ নাম দেওয়া হয়েছে।

পূরবীকে ঘনম্ বলা হয়।

ফার্সী মোকাম থেকে শাহ্নাজকে খট্রাগের সঙ্গে মিশ্রিত করে জীলফ্ নাম দেওয়া হল।

ফার্সীতে খট্রাগকে "ঘজাল" বলা হয়। আরবীয় এবং আমাদের মার্গ ও দেশী সঙ্গীতে খট্ একটিই বর্তমান। এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। খট্রাগ ভিন্ন ফার্সী ও হিন্দীতে সমান হয় এমন কোনও রাগ নেই। দেশী ও মার্গ পর্যায়ে কিছুসংখ্যক রাগ আছে যাদের মধ্যে তফাৎ নেই। মূল ছটি রাগ,—অপর রাগের মধ্যে,—কল্যাণ, দেশকার, দেশাখ, গুজরী, গোন্দ্, সুরঠী, সিন্ধু, মধ্মাত, সাওন্ত, তর্ওয়ান্, বহুলা, জয়জয়ন্তী, মঙ্গল, ভৈরবী, বঙ্গাল—এই রাগসমূহের মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ তারতম্য হতে পারে।

গৌরাকে ফর্ঘানা নাম দেওয়া হয়েছে।

ফরঘানার সঙ্গে ফার্সী মোকাম মিশ্রিত করে সারঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে তার আখ্যা দেওয়া হল উশ্শাক্।

গোন্দ্-এ বিলাওল, গৌরসারঙ্গ ও ফার্সী মোকাম থেকে "রাস্ত্" সংযুক্ত করে "সর্পর্দা" নাম দেওয়া হয়েছে। কবি তাঁর স্বরচিত "কিরান্-উস্-সাদায়িন্' গ্রন্থে লিখেছেন—"গাহ্ তরান্নুম্ ব্নুয়ায়ী কে খাস্ত্। জানিব্ সর্পর্দা শুদ্ আজ্ রাহ্ খাস্ত্॥" অর্থাৎ তুমি যখন গান গাইতে চাইবে সরপর্দা হবে ঠিক রাস্তা।

উল্লিখিত রীতি অনুসারে আসল রাগের সঙ্গে অপর রাগের যোগ সাধন করে যেমন নতুন রাগ গঠন করা হয় সেই ভাবে কান্হরার সঙ্গে কয়েকটি রাগ একত্রিত করে ফিরোদস্ত্[১] নাম দেওয়া হয়েছে।

ইমন্-এর সঙ্গে নীরীজ্ যোগ করে তাকে ইম্নী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পূরবী, বিভাস, গৌরী, গুণকলী এইগুলিতে ফার্সী মোকামের অন্তর্ভুক্ত ইরাক মিশ্রিত করে সাজগীরী নাম দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কিরান্-উস্-সাদায়িন্ গ্রন্থে তিনি নিজে বলেছেন—জম্জমা-ই-সাজগীরী দর্ ইরাক্। কর্দা বা আহঙ্গ্ ইরাক্ ইত্তিফাক্॥ অর্থাৎ, ইরাকের মধ্যে রয়েছে সুর সাজগীরী। ইরাকের সঙ্গে অপর সুর মিলিয়ে এটি করা হয়েছে।

দেশকার-এর সঙ্গে ফার্সী মোকামের অন্তর্ভুক্ত বাখর্জ্ যোগ করে বাখর্জ্ নাম দেওয়া হয়েছে।

[১] ইতিপূর্বে ফিরোদস্ত-এর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে এই বর্ণনার মিল নেই। আগের বর্ণনা মানকুতূহল থেকে গৃহীত, এটি গ্রন্থকার সংগ্রহ করেছেন।

কল্যাণের সঙ্গে নীরীজ্ মিশ্রিত করে সনম্ আখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এটি যেন গোপন না থাকে যে সাজ্‌গীরী, বাখরজ্, উশ্‌শাক্ ও মুয়াফ্‌ফেক্—এই চারটির মধ্যে বড় রকমের কাজ করা হল যাতে এর মধ্যস্থ অন্য রাগগুলি রীতিসম্মত ও সুন্দরভাবে একত্রিত করা যায়। অন্যান্য রাগগুলিতে মোকামের মিশ্রণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু করা হয়নি এবং এক একটি আখ্যা প্রদান করা হয়েছে মাত্র।

আমীরের অন্য সমস্ত রাগ থেকে "ইমন্-বসন্ত" পৃথক রচনা। এতে ইমন্ এবং বসন্ত—এই দুটিকে একত্র করা হয়েছে।

সুলতান হুসেন শর্কী রাগসমূহ মিশ্রিত করে যেগুলি রচনা করেন সেগুলির আঠারোটি নাম প্রদান করেন। যেমন নাটের নয়টি প্রকারভেদ আছে—সেইরূপ বারোটি শ্যাম তিনি সংগঠিত করেন। সেগুলির নাম দেওয়া হল।

গৌরা-শ্যাম, শ্যাম-মল্লার, ভূপাল শ্যাম, কন্‌হর্-শ্যাম, সুহু-শ্যাম, পূরবী-শ্যাম—সম্পূর্ণ, শ্যাম-রাম, মেঘ-শ্যাম, বসন্ত-শ্যাম, শ্যাম-বীরারী—সম্পূর্ণ, শ্যাম-কুড়ায়ী ও গোন্দ্-শ্যাম।

কুড়ায়ী[১] রাগটিকে "সঙ্গীতবল্লভ" "সুঘ্রায়ী" বলেছেন। পূরিয়া, শঙ্করাভরণ, কান্‌হরা এই তিনটিকে একত্রিত করে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

শর্কী কর্তৃক চারটি টোড়ী এইভাবে রচিত হয়েছে—

টোড়ীতে রামকলী ও মালশ্রী মিশ্রিত করে রামটোড়ী নাম দেওয়া হয়েছে। জৌনপুরী টোড়ীতে মালশ্রী ও মুয়াফ্‌ফেক্ মিশ্রিত হয়েছে। রসূলী টোড়ীতে মুলতানী ও ধনাশ্রী মিশ্রিত হয়েছে।

ভীল্‌মী টোড়ীর পরিচয় লেখবার সময় মনে পড়ছে না। বর্তমান সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে লেখা যেতে পারে।

আসাওরীতে জৌনপুরী-টোড়ী যুক্ত করে জৌনপুরী-আসাওরী নাম দেওয়া হয়েছে। বসন্তরাগে জৌনপুরী-টোড়ী একত্র করে তার জৌনপুরী-বসন্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শেখ্ বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া মুলতানী যিনি একজন সিদ্ধ আওলিয়া এবং শেখ সমূহের শেখ শহাবুদ্দীন ওমর্ সেহর্‌ওয়ার্দির শিষ্য ছিলেন তিনি এই নামগুলি প্রাচীন উল্লেখ থেকে উদ্ধার করে প্রদান করেন।

ধনাশ্রীতে মালশ্রী মিশ্রিত করে তাকে মুলতানী-ধনাশ্রী বলা হয়।

নায়ক বখ্‌শু তিনটি রাগ রচনা করেন।

টোড়ীতে দেশকার যুক্ত করে বহাদুরী নাম দেওয়া হয়েছে। সুলতান বাহাদুর গুজরাটির নাম অনুসারে এই নামকরণ করা হয়। অপর একটি কান্‌হরা তিনি রচনা করেন যাতে শ্যাম ও খম্বাইচী যোগ করা হয়। আর একটি কল্যাণ তিনি রচনা করেন যাতে হমীর, কল্যাণ ও জয়েৎকল্যাণ যোগ করা হয়। এই কল্যাণ ও কান্‌হরাকে নায়কীকল্যাণ ও (নায়কী) কান্‌হরা বলা হয়। লোকান্তরিত মিয়াঁ তানসেন মল্লারে কান্‌হরা যোগ করেন এবং কান্‌হরায় কল্যাণ যোগ করেন; তিনি আসাওরীতে দেবগান্ধার যুক্ত করেন। উক্ত কান্‌হরাকে দরবারা-কান্‌হরা নাম দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে তিনি যখন সম্রাট আকবরের কাছে তাঁর রচনা প্রদর্শন করেন (তখন এই নাম দেওয়া হয়)। আর একটি রাগের নাম দেওয়া

---

[১] গ্রন্থের পাদটীকায় বলা হয়েছে "কুড়ায়ী, অর্থাৎ আনন্দসূচক" (কুড়ায়ী ইরানে খুশ্-হালী আমদ্)। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় আকবর এই রাগের নাম দেন—সুঘ্রায়ী।

হয়েছিল পুরিয়া-ধনাশ্রী। ওস্তাদগণের মধ্যে কোন নায়ক এটি রচনা করেছিলেন তা জানা নেই তবে নায়ক বখ্শু, মিয়াঁ তানসেন ও মালোয়ার শাসনকর্তা বাজবাহাদুর,—এঁরা ছিলেন গীতকলায় অদ্বিতীয়। ওস্তাদ্গোষ্ঠীর সকলেই এই রাগে পারদর্শী ছিলেন। ধনাশ্রীর সঙ্গে সমানভাবে পুরিয়া মিশ্রিত করে এই নাম রাখা হয়েছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জ্ঞাত আছেন যে প্রত্যেক রাগে অপর একটি রাগ যোগ করলে আসল রাগটি গাইবার সময় প্রথমে আসবে। এটি এইভাবে বোঝান যায়। যেমন,—শ্যাম-রাম। এক্ষেত্রে শ্যাম প্রথমে আসবে। একটি রাগের সঙ্গে অপর একটি রাগ মিশ্রিত হয়ে সেটিও প্রথমে আসে। যেমন,—পুরিয়া-ধনাশ্রী। এক্ষেত্রে পুরিয়া প্রথমে এবং ধনাশ্রী পরে আসে। সবক্ষেত্রেই যে এটি হবে এমন নয়। ব্যতিক্রম হতে পারে যদি কেউ উত্তমভাবে রাগ বা রচনা প্রস্তুত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ টোড়ীর[১] ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে। অপর একটি রাগের সঙ্গে টোড়ী গাইবার সময় অপরটি আগে আসবে এবং তারপরে টোড়ী আসবে। ওস্তাদগণ এইরূপ সিদ্ধান্তই করেছেন যে একে টোড়ী বলা হবে। কয়েক প্রকার টোড়ী আছে সেগুলি কলির পূর্বভাগে গাওয়া হয়। অপরগুলি গানের শেষ অংশে প্রযুক্ত হয়। সব ভাষাতেই বর্ণগুলি এমনভাবে আসা উচিত যাতে পদের শেষ মিলটি যথাযথ হয়। এইটিই নিয়মসম্মত প্রথা।

একপ্রকার ললত-পঞ্চম আছে যাতে পঞ্চমের সঙ্গে ললত যোগ করে এই নামটি রাখা হয়েছে।

আর একটি রাগ হচ্ছে—পরজ। মারুতে ধনাশ্রী যোগ করে এটি রচিত হয়েছে। এটি প্রায়ই গাওয়া হয়ে থাকে।

অপুর রাগ হচ্ছে আড়ান-আসাওরী। আসাওরীতে আড়ানা মিশ্রিত করে এটি রচিত হয়েছে।

অন্য একটি রাগ হচ্ছে জয়েৎ-কল্যাণ। কল্যাণে জয়েৎশ্রী যোগ করে এটি রচিত হয়েছে।

এই ধরণের আরও বহু রাগ আছে; যেমন—গৌর-সারঙ্গ্; খমাইচী; (এইখানে একটি টোড়ীর উল্লেখ আছে সেটি স্পষ্ট পড়া গেল না), মুলতানী-টোড়ী; মাঝ; জয়তী; গৌরী; ছায়ানট—দিবাশেষে গেয়; রুঝুরী-জয়জয়ন্তী—সায়ংকালে গেয়; ইমন্-কল্যাণ; ইমন্-বিলাওল; ইমন্-কেদারা; ইমন্-সারঙ্গ্; ক্ষেম-কল্যাণ; পুরিয়া; মুখারী—এটি খাড়ব; মৌন-ধ্যান; ঘারা-শ্যাম—সম্পূর্ণ, সন্ধ্যায় গেয়; বাড়ী—সায়ংকালে গেয়; গৌর—দিবার অপরার্ধে গেয়; আভীরী—ওড়ব, সায়ংকালে গেয়; সালঙ্গ্-নাট—সূর্যাস্তের পর গেয়; তুর্ক-তোড়ী—ফার্সী মোকামসমূহ থেকে "ইরাক" দাখিল করে এই রাগটি রচিত হয়েছে। হোসেনী টোড়ী—এতে দুগাহ্ ও হোসেনী একত্রিত হয়েছে। সাওনী-লীলাবতী—এটি খাড়ব রাগ; মানিয়াহী কল্যাণ—পাদটীকায় বলা হয়েছে একে "সাওনী"ও বলা হয়। এটি গোয়ালীয়রের রাজা মান রচনা করেন। দেশকার, গৌরী ও বিভাসকে একত্রিত করে তরওয়ন (এবণ) রচনা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ; সায়ংকালে গেয়।

জয়েতী খম্বাবতী, জয়েতশ্রী, আহীরী, টঙ্ক্, বীরারী—এইগুলিকে একত্র করে কাপুর-গৌরী রচিত হয়েছে। এটি গুজরাট অঞ্চলে গাওয়া হয়।

[১] পুঁথিতে এখানে "পূরবী" আছে এবং আরও দু-এক জায়গায় টোড়ীর স্থানে পূরবী বসান হয়েছে। সম্ভবত এটি লিপিকারের প্রমাদ।

মালীগৌরা, ধনাশ্রী, পূরিয়া, বহুলো, পাঢ়ী (পূর্বে বাঢ়ী নামে একটি রাগের উল্লেখ করা হয়েছে), আসাওরী—এইগুলি একত্র করে মালীগৌরা রচিত হয়েছে।

টোড়ী, করঞ্জ, সালঙ্গনট, দ্রবড় (দরাওর), গৌরবথাল—এইগুলিকে একত্র করে দেশকার বলা হয়। এটি সম্পূর্ণ; দিবসের দ্বিপ্রহরে গেয়। শীত ঋতুতে গাওয়া হয়।

হিন্দোল, বসন্ত, জয়জয়ন্তী, পঞ্চম, খট্‌রাগ, মারু, সারঙ্গ ও সাওনী—এইগুলি একত্র করে গাইলে মালকোশ উৎপন্ন হয়।

ফকীর (লেখক) নিজেও কিছু রাগ রচনা করেছেন। জয়েৎশ্রীতে হিন্দোল, কেদারা মিশ্রিত করে তার নাম রেখেছি—জয়েৎ-বসন্ত্। জয়েৎশ্রী, কল্যাণ, পূরিয়া-ধনাশ্রী, বসন্ত--এইগুলিকে একত্র করে নাম দিয়েছি,--রাবী-সিন্ধবী। কুড়ায়ী, গৌর-সারঙ্গ্, বিহাগ্‌ড়া, সুহু, বিলাওল, দেওগিরি, নট—এইগুলি একত্র করে নাম রেখেছি--সুন্দরাবতী। আড়ানা ও কেদারা একত্র করে তার নাম দিয়েছি—আড়ানা-কেদারা।

কিন্তু, এই বিষয়টি জানা উচিত যে যদি কেউ কয়েকটি রাগ একত্র করে একটি রাগ বাঁধতে চান তাহলে রাগসমূহ সেইভাবে একত্রিত করে প্রদর্শন করা উচিত হবে যেমন করে কেউ কয়েকটি বিভিন্ন তার যথাযথভাবে বেঁধে নিয়ে সেইগুলি থেকে একটি খাঁটি সুর উৎপন্ন করেন। কেবলমাত্র রাগগুলি একসঙ্গে এলেই তার থেকে এমন কোনও রাগ উৎপন্ন হবে না যার একটি নির্দিষ্ট নাম দেওয়া যায়। এইগুলিকে (অর্থাৎ এইভাবে পর পর কয়েকটি রাগ গেয়ে যাওয়াকে) "রাগসাগর" বলা হয়। ওস্তাদগণ এই রীতি প্রস্তুত করেছেন ও গেয়েও থাকেন। মহরাঞ্জলায়ী[১]-তে এটি দেখানো হয়েছে। পাঠকগণের কাছে এটি যেন গোপন না থাকে যে আমি মানকুতুহল, রাগসাগর ও রাগপ্রকাশ থেকে বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে অনুবাদ করেছি। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়সমূহে আলোকপাত করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি সে ফাঁক পূরণ করেছি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে। এই বিষয়টি গাণিতিক। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এটি স্পষ্টভাবে জ্ঞাত আছেন যে সঙ্গীতবিদ্যা অতিশয় কঠিন বিদ্যাসমূহের অন্যতম। পূর্-ই-সীনা[২] জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং সে সব বিষয়ে কত আলাপ আলোচনাই না করতেন। কিন্তু সংগীত-বিদ্যার আলোচনায় যখন তিনি গণিতে এসে পেঁছোতেন তখন তাঁকে স্বীকার করতে হত যে গণিতের একটি বড় অংশ হচ্ছে সঙ্গীত। সঙ্গীতজ্ঞকে বিষয়টি বোঝবার জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালন করতে হয়, স্মৃতির উত্তম আলোড়ন ঘটে। বিভ্রান্ত ব্যক্তির কী শক্তি আছে যে নিজের ওপর নির্ভর করে এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন। এটি অবশ্যই সত্য যে আমিও সব জিনিস জানি না। মিস্‌রা—এই জ্ঞান হল যে সব বিষয়ে আমার জ্ঞান হয়নি (দানেস্তা শুদ্‌ কে হিচ্ নদানেস্তায়েম্ মা)।

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে মৌসুম (ঋতু) সমূহের বর্ণনা, ঋতু অনুসারে গ্রাম, রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদির প্রয়োগ; নিষিদ্ধ হরফের উল্লেখ; গণ-সম্বন্ধীয় তথ্য; ঋতুসমূহে প্রযুক্ত গ্রামগুলি

---

[১] এই নামটি স্পষ্টভাবে বোঝা গেল না। সম্ভবত এটি কোন গ্রন্থের নাম।
[২] আবু আলী বীন্ সীনা, Avicenna নামে পরিচিত।

গাইবার কালনির্দেশ—এইগ্নলি বিবৃত হয়েছে। পাঠক বা শিক্ষার্থিদের কাছে এটি যেন অগোচর না থাকে যে প্রাচীন সংগীত দেবতাদের দ্বারা নির্দিষ্ট; কেননা এঁরাই এই বিদ্যার আবিষ্কর্তা।

একটি বৎসরকে ছয়টি ঋতুতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক এক ঋতুতে দুটি করে মাস। এইসব ঋতুগুলিতে গাইবার জন্য ছয়টি রাগও নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক ঋতুতে একটি রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদি সমেত গাওয়া হয়। সময় অনুসারে গ্রাম নির্দিষ্ট করা হয়; পরে দেবতা ও মধ্যে নায়কগণের স্থান নির্দেশ করা হয়। পণ্ডু বা গোপাল সবরকম গান এইভাবেই গাইতেন। তৎকালে প্রত্যেক সময়ের নির্দেশ অনুযায়ী যেসব গান গাওয়া হত শ্রোতাদের ওপর তাদের একটা প্রভাব পড়ত। বর্তমানে এই সমস্ত বিধি উঠে গেছে; এই কারণে সেই সব প্রভাবও অল্পেই অনুভূত হয়। এখনও যদি শিক্ষার্থীরা এই বিধি অনুসরণ করেন তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন এই নীতি কতখানি প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। যদি কোনও ভক্তজনের (আহ্‌ল্‌ল্লাহ্‌) কাছে গান করা যায় তাহলে ভাল, মন্দ যাই হোক না কেন তার একটা প্রভাব তাঁদের ওপরে পড়বেই। যখন তাঁরা খুশী হন তখন তার পরিমাপ করা যায় না। এই কারণেই বলা হয়েছে;—মসনবী—ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাঁদের ওপরে আছে তাঁরা ডোঙার (যা দিয়ে ক্ষেতে জল দেওয়া হয়) আওয়াজেই মস্ত্‌ হয়ে যান। তাঁরাও ডোঙার মত নাচতে থাকেন॥ সেই সময় বুঝতে পারা যায় সংগীতের প্রভাব ভাল কি মন্দ। মন তখন খুশী হয়ে ওঠে। বিশেষ বিবেচনা করেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথমে মৌসুম এবং প্রত্যেক মৌসুমে প্রযুক্ত রাগের কথা বলা হচ্ছে।

বসন্ত ঋতু—চৈত্র ও বৈশাখ—এই দুই মাস।
গ্রীষ্ম ঋতু—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুই মাস।
বর্ষা ঋতু—শ্রাবণ ও ভাদ্র—এই দুই মাস।
শরৎ ঋতু—আশ্বিন ও কার্তিক—এই দুই মাস।
হেমন্ত ঋতু—অগ্রহায়ণ ও পৌষ—এই দুই মাস।
শীত ঋতু—মাঘ ও ফাল্গুন—এই দুই মাস।

এখন দেবতাগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদি যে সব ঋতুতে গাওয়া হয় হয় সে বিষয়ে বলা হচ্ছে—

প্রথমে বহার বা বসন্ত ঋতু নির্দিষ্ট হয়েছে। বসন্তকালে রাগ হিন্দোল রাগিণী ও পুত্রাদি সহ গাওয়া হবে। গ্রীষ্ম ঋতুতে রাগ দীপক, বর্ষায় মেঘরাগ, শরৎ কালে শ্রীরাগ, হেমন্তকালে রাগমালকোশ ও শীতকালে ভৈরোঁ গাওয়া বিধেয়।

গ্রামসমূহের কাল নির্ধারণ—

হেমন্তকালে খরজগ্রামে গাওয়া হয়। গ্রীষ্মে মধ্যম গ্রাম ও বর্ষায় গান্ধার গ্রাম প্রযুক্ত হয়।

সকালে খরজগ্রাম, দ্বিপ্রহরে মধ্যম ও সন্ধ্যায় গান্ধার গ্রামে নির্দিষ্ট হয়েছে। অপর তিনটি ঋতুতেও গ্রামসমূহের নির্দেশ করা হয়েছে।

ধ্রুপদ প্রভৃতি গীতে নিম্নলিখিত আটটি হরফ নিষিদ্ধ হয়েছে। এইগুলির প্রয়োগ অশুভজনক।

হ, জ, খ, ন, ধ, র, ঘ, ভ।

এতদ্ব্যতীত চারটি গণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জ-গণ, র-গণ, স-গণ ও ত-গণ[১] এইগুলি নায়কগণ পরিজ্ঞাত আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বরসমূহ ও নিবন্ধ গীত সম্বন্ধীয় তথ্যাদি এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

সাতটি স্বরের সাতটি নাম দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামের স্বরগুলি এক একটি জানোয়ারের আওয়াজ থেকে গৃহীত। এইগুলির উৎপত্তি ও বিস্তার এবং কণ্ঠ থেকে কিভাবে এগুলি নির্গত হয়—এই সমস্ত এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। নিম্নজঠর থেকে গলা, মস্তিষ্ক পর্যন্ত বাইশটি রগ আছে। নাভিদেশ থেকে মনোহর গতিতে বায়ুপ্রবাহ উত্থিত হয় এবং বিস্তারগত প্রকৃতির আধিক্য ও মন্থরতা অনুসারে এই আওয়াজ উত্থিত হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও দশম থেকে ক্রমান্বয়ে দ্বাবিংশতম—এই রগগুলিতে বায়ুপ্রবাহ পেঁছায়[২] এবং এই আঠারোটিতে যে আওয়াজ জাগ্রত হয় তাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেটি এইভাবে নির্ণয় করা হয়েছে :

ষড়জ—ময়ূরের আওয়াজ থেকে গৃহীত। চতুর্থ রগ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।। বায়ু-প্রবাহ নাড়ি থেকে গলদেশ ও বক্ষে, বক্ষ থেকে মুখগহ্বরে এবং সেখান থেকে জিহ্বায় ও দন্তে পেঁছায়। খরজ এই ছ'টি স্থানে পরিব্যাপ্ত।

রেখাব—পাপিয়ার আওয়াজ থেকে গৃহীত। সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত পেঁছায়। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে গলদেশ এবং গলদেশ থেকে মস্তিষ্কে পেঁছায়।

গান্ধার—পুং ছাগের আওয়াজ থেকে গৃহীত। নবম থেকে ত্রয়োদশতম পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। বায়ুপ্রবাহ নাভিদেশ থেকে গলদেশ, সেখান থেকে বক্ষদেশ এবং উক্ত স্থান থেকে মুখে পেঁছায়।

মধ্যম—সারসের শব্দ থেকে এটি পরিচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শতম রগ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে বক্ষে পেঁছায়।

পঞ্চম—কোয়েলের সুরেলা কণ্ঠ থেকে গৃহীত। সপ্তদশতম রগ অধিকার করে আছে। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে বক্ষের উভয় পার্শ্বদেশে এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে এবং উক্ত স্থান থেকে বক্ষদেশে পরিভ্রমণ করে।

ধৈবত—ভেকের আওয়াজ থেকে গৃহীত। অষ্টম (অষ্টাদশ হওয়া উচিত) থেকে দ্বাবিংশতম রগ পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে মুখের টাকরায় এবং সেখান থেকে গলদেশ, উক্ত স্থান থেকে মস্তিষ্কে; মস্তিষ্ক থেকে বক্ষদেশে পরিভ্রমণ করে।

নিষাদ—হাতির আওয়াজ থেকে গৃহীত। দ্বাবিংশতম থেকে পরবর্তী মণ্ডলীর তৃতীয় পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে গলদেশ, গলদেশ থেকে মুখের টাকরা এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে পেঁছায়।

---

[১] এ সম্বন্ধে পুথি স্পষ্ট নয়। সঙ্গীত দামোদর-এর উক্তি থেকে জানা যায়—জ, র, স, ত—এই চারটি গন বীপরীত ফলপ্রদ। "গণ" শব্দে গুরু ও লঘু হিসাবে তিনটি বর্ণের সমাবেশ বোঝায়। সঙ্গীতরত্নাকরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। পুথির পাদটীকায় এই দোঁহাটি উদ্ধৃত হয়েছে—

হ জ ধ র থ ন ঘ ভ আদি গীত গাওত নিসান।
অশুভ হুয়ী পিঙ্গল কহি আরি কুনি মন জান॥

[২] এই উক্তি ভ্রান্ত বলে মনে হয়। আইন্-ই-আকবরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে—পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ—এই চারটি রাগে বায়ুপ্রবাহ পেঁছোয় না। এইটিই সঙ্গত নতুবা বাকি আঠারোটি রাগের কথা উঠতে পারে না।

এই সপ্তস্বর পর পর তিনটি পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য এই তিন সপ্তকের অবস্থিতির মধ্যে নিখাদ বাইশটির বেশি অতিক্রম করবে না।

গীতসম্বন্ধীয় বিবরণ

ফার্সী শের-এর (কবিতা) যেমন বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে যথা—মসনবী, কসিদা, ঘজল, রুবায়ী, মুখাম্মস্, মুসজ্জা, কিতা, মুস্তজাদ—হিন্দী ভাষাতেও এইরকম বহু রচনা আছে। কিন্তু, এগুলি গীতের অন্তর্গত (শের বা কবিতা নয়) এবং গায়কগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এইগুলির সংখ্যানির্ণয় করা হচ্ছে—

গীত—তিন প্রকার। দেবতা ও বাদশাদের প্রশংসা হচ্ছে এর বিষয়বস্তু।

সূর্যপ্রকাশ ও চন্দ্রপ্রকাশ—এই দুই প্রকার গীত একই রকম। একটি সূর্যের ও অপরটি চন্দ্রের স্তবসূচক। প্রথমটি, অর্থাৎ সূর্যপ্রকাশের দ্বাদশটি কলা (খণ্ড)। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চন্দ্রপ্রকাশের সর্বসমেত ষোলটি কলা। খণ্ড অনুসারে তাল ও রাগ আবর্তিত হয়।

সর্বতোভদ্র—এতে চারটি ক্রম অনুযায়ী তাল আবর্তিত হয়।

রাগকদম—কয়েকটি কলিতে নিবন্ধ। কয়েকটি স্থানে রাগ ও তাল যুক্ত হয়। এতে নায়িকার সজ্জা বা যুদ্ধ সম্বন্ধীয় রচনা পাওয়া যায়। বর্তমানে এটি মার্গপদ্ধতির অন্যতম। এটি দেবতাগণ রচনা করেছিলেন। এখন সেই সব রীতি লুপ্ত হয়ে গেছে। এই স্থানে উক্ত সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কমই আছেন এবং এই শ্রেণীর গীত প্রচলিত নেই বললেই চলে। দক্ষিণ দেশে এর প্রচলন থাকতে পারে কেননা সেখানে দেশীপদ্ধতিতে রাগসঙ্গীতের প্রচলন একেবারেই ছিল না। যা কিছু রাগ রাগ সেখানে গাওয়া হত সব মার্গপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ ঐদিকে এইগুলি এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু, যে সমস্ত নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি ফকীরের (লেখক) কাছে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কথায় জানা যায় যে ঐদিকেও মার্গসঙ্গীতে অভিজ্ঞ গায়ক আর নেই। এমন ব্যক্তিও অল্পই আছেন যাঁরা সবরকম রাগের বা দেশী গীতের অনুষ্ঠান করতে সক্ষম।

ঝোমরা—চারিটি কলিতে নিবন্ধ। দেবতাদের স্তুতিসূচক গীত। (বাকি অংশ ছিন্ন হওয়াতে স্পষ্ট বোঝা গেল না)।

স্বরবর্তনী—(প্রথম অংশ ছিন্ন)। এর মধ্যে এমন শব্দ থাকে যার কোন অর্থ নেই।

প্রবন্ধ—দুটি কলিতে নিবন্ধ। দেবতাগণের প্রশংসাসূচক গীত (কিছু অংশ ছিন্ন)। *ধ্রুপদের অস্তিত্ব এতে ছিল কিন্তু এই থেকেই ধ্রুপদ আসেনি (বর্ ইন্ বুদ্ তা ধ্রুর্পদ্ ব্-ওজুদ্ নি-আমদা বুদ্)।*

মন্—এতে আত্মপ্রশংসা ও সামান্য পরিমাণে অপর বিষয় গাওয়া হয়। এটি দেশী পর্যায়ের গীত।

ধ্রুপদ—প্রধানতঃ এই গীতকে গঠন করেন গোয়ালীয়রের রাজা মান যাঁর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এটি চারটি কলিতে নিবন্ধ। (পাদটীকায় এই চারটি কলি উদ্ধৃত হয়েছে—উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুয়া ও আভোগ)। সম্মেলনে আগত নায়ক বখ্শু, নায়ক ভানু, মাহ্মুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ—এঁদের সাহায্যে এই গীতটি রচনা করা হয়। এই ধরনের রচনা অভিজ্ঞ এবং সাধারণ সকলেরই পছন্দ হয়েছিল এবং উত্তম বলে পরিগণিত হয়েছিল। এ অঞ্চলে এর মত উত্তম রচনা আর নেই। এর প্রমাণস্বরূপ আমার দুটি বক্তব্য আছে। প্রথম শ্রেণীর

ধ্রুপদের রাগ ও গীত মার্গপদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত। অপরটিতে রাগসংগীত অল্পতর হলেও রচনার সংগঠনে শৈথিল্য ঘটেনি। এই জাতীয় সংগীত লোকে দেশীয় বা দেশওয়ালী ভাষায় গেয়ে থাকে। একথাও আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ধ্রুপদে গায়নবৈশিষ্ট্য গায়ক নিজেই প্রদান করেন। এই কারণে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছে সেটি দেশী ও মার্গ উভয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত। সবকিছু থেকে সামান্য সামান্য গ্রহণ করে এই বিস্ময়কর গীত সৃষ্ট হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, রাজার নিজের আমলের গায়ক সম্মেলন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে; তথাপি সেই প্রতিষ্ঠার গৌরব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পরবর্তীকালে যদি উক্ত রাজার মত আর একজন জন্মগ্রহণ করতেন এবং তাঁর মত ক্ষমতাসম্পন্ন হতেন তাহলে তাঁর সময়েও ধ্রুপদের মত সংগীত সৃষ্ট হতে পারত। সেই ক্ষমতা, মহত্ত্ব ও প্রসারতার অস্তিত্ব অসম্ভব নয় কিন্তু মনে হয় যে সেরকম বুঝি আর হবে না। একথা বলছি কেননা মার্গীয় রাগসংগীত, দেশীভাষায় সম্পাদিত মার্গসংগীত এবং দেশী পদ্ধতিকে একত্র করে যে উত্তম নাদের (সংগীতের) সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে কেউ যদি কোনও নূতন রচনা করেন তাহলেও তা সব-কিছুই রাজার নির্দেশে প্রস্তুত ধ্রুপদকেই অনুসরণ করে থাকে। দেশী ভাষায় অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ সময়ানুসারে বা স্থানানুসারে খরোড়া ভাষায় গাওয়া হয়। মার্গীয় রীতিতে অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ সংস্কৃত ভাষায় গাওয়া হয়। দেশীয় প্রথায় অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ গোয়ালীয়ার থেকে আকবরাবাদ্ ও বারী অঞ্চলে প্রসারিত। উত্তরে মথুরা পর্যন্ত এর সীমা। পূর্বে এটাওয়া, দক্ষিণে উন্‌ছ্ এবং পশ্চিমে ভুসাও ও বয়ানা পর্যন্ত এর সীমা নির্দিষ্ট। এই শহরগুলিতে হিন্দুস্থানের ভাষাসমূহ বহুল পরিমাণে শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হয়। পারস্যের সঙ্গে উদাহরণ দিতে গেলে এই শহরগুলিকে শিরাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

দক্ষিণাঞ্চলে দ্রাবিড়ী ভাষায় রচিত গীতসমূহকে ছন্দ্ নাম দেওয়া হয়েছে। এর তিনটি প্রকারভেদ বর্তমান। চারটি চরণ একত্র করে এটি নিবন্ধ, অথবা তার বেশিও হতে পারে। এটি প্রশংসজ্ঞাপক গীত। তিলঙ্গী ও কর্ণাটকের ভাষায় রচিত গীতকে "ধরু" বলা হয়। এগুলি প্রেমসংগীত। বাঙ্গালায় প্রচলিত গানকে "বঙ্গলা" বলে। এটিও প্রেমসংগীত। জৌনপুরে প্রচলিত গীতকে "চুট্‌কলা" বলা হয়। এতে দুটি কলি থাকে। পদান্তে মিল থাকে না ও তালে গাওয়া হয় না। দুটি কলির দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ কবিতার মত বিন্যস্ত। প্রথম কলিতে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। এটি প্রেম ও বিরহ বিষয়ে রচিত এইরূপ লিখিত আছে। এই গীত যুদ্ধ সম্পর্কেও রচিত হয় এবং উক্ত গীতকে 'সাধর্-চুট্‌কলা' বলা হয়। এই গীতের স্রষ্টা হচ্ছেন সুলতান হুসেন শর্কী। ইনি জৌনপুরের বাদ্‌শা ছিলেন। ইনি দিল্লীর বাদশা বাহ্‌লুল লোদীর সঙ্গে অনর্থক বহু যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে রাজ্য ও সর্বস্ব হারান। পুরাতন ইতিহাসসমূহে (পাস্তানী নামাহা) এইরকম লিখিত আছে।

দিল্লীতে প্রচলিত গীত—কওল, তরানা, খিয়াল, নক্‌শ্, নিসার, বসিৎ, তিলাল্লানা, সোহ্‌লা। এইগুলি মীর খুস্‌রও কর্তৃক প্রবর্তিত। তাঁর সামৎ ও ততার নামে দুই বন্ধু ছিলেন। ফার্সী সউৎ ও নক্‌শ্ এবং হিন্দী সংগীতের মিশ্রণে এই গীতগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কওল—এটি গীত-এর সমতুল্য।

নায়ক গোপাল সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লীতে আসেন। মীর গীত-এর

প্রতিপক্ষ হিসাবে কওল রচনা করেন। এই সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তটি এইভাবে প্রচলিত আছে।

নায়ক গোপাল স্নানের জন্য থানেশ্বরের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রে আসেন। এই কূপটি থানেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত। সম্রাট আকবর এর চারদিকে ইঁট ও লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। (এইখানে কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে—অংশটি ছিন্ন)। হিন্দুদের (হুনুদ্) বিশ্বাস এইখানে ভীমসেন বহু হাতীকে হাওয়ায় নিক্ষেপ করেছিলেন। আজ থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বে এই যুদ্ধ হয়েছিল। কয়েক কোটি লোক এই যুদ্ধে হত হয়। একশত লক্ষে এক কোটি হয় এবং একশত হাজারে এক লাখ। এত লোকের মোট সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এই স্থানে প্রতিদিন তীর্থ উপলক্ষ্যে লোকজন আসে। বৎসরে একবার স্নান করে লোকে পাপ ক্ষালনপূর্বক পুণ্য অর্জন করে। এইরকম এক-শতেরও অধিক স্থান আছে।

বয়েৎ—শরীরকে ধুয়ে কি ফল যদি পবিত্র শরীর নিয়েই আসতে!

(শুস্তনে কালেব্ আগর্ কালেব্ জিদা আম্দী।)

তাহলে জলের প্রাণীরাই তো শুদ্ধতায় এগিয়ে থাকত। এই উক্তিটি বিখ্যাত—

মিস্রা–এক আহাম্মক বললে আর এক গর্দভ বিশ্বাস করলে।

(আহ্মকে গুফ্ৎ ও খরে বাওর্ করদ্।)

বর্তমানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আজকালকার লোকেদের মধ্যে এটা দেখছেন যে যা কিছু ব্রাহ্মণরা বলে তারা তাই বিশ্বাস করে। কিছুমাত্র বুদ্ধি খাটায় না। যদি তারা বুদ্ধি খাটাত তাহলে ঈশ্বরের উপাসনা ছেড়ে পুতুল পূজা করত না (আগর আক্লী মী দাশ্তন্দ্ খুদাপরস্তীরা গুজাশ্তা বুৎপরস্তী নমীকর্দন্দ্)।

নায়ক স্নানের উদ্দেশ্যে এলেন। এই সময় আলাউদ্দিন খল্জী সুলতান ছিলেন। সুলতান জালালুদ্দিন খল্জী ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। পবিত্র রমজান মাসে রোজা উপলক্ষ্যে উপবাসী (রোজাদার) সুলতান পবিত্র কুরান পাঠ করে ফিরবার সময় নিহত হন। পুরাতন ইতিহাসসমূহে এই কথাই বলা হয়েছে। তিনি শহীদ্ হবার পর আলাউদ্দিন নিজে রাজত্বের ভার গ্রহণ করেন। পূর্বসূত্রে অধিষ্ঠিত গায়ক মীর খুস্রও নাচার হয়েই তাঁর অধীনে রয়ে গেলেন। তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রের এক তীর থেকে অপর তীরের মত বিস্তৃত। তিনি একটি "ডাণ্ডী" ব্যবহার করতেন। এটি ছিল কাঠের তৈরি—এক হাত দুই আঙুল লম্বা। কেহ কেহ বলেন এটি এক ওয়াজব্ (৯ ইঞ্চি) ও দু আঙুল লম্বা। এর আওয়াজ থেকে তিনি ভাল করে সুরগুলি পেতেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যন্ত্রে সুর রাখা। এই যন্ত্রটি একমাত্র তাঁরই ছিল কেননা পারস্যে (ভিলায়াৎ) দম্ঘজ্ঘা[১] ব্যবহৃত হত। জলাজল্ (ঘণ্টা) ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা হত। অপর কেউ বাঁধলে তার সঙ্গে লড়াই হত—দুজনে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হতেন। যুদ্ধের গায়কেরাও থাকতেন। যুদ্ধেও সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়। ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধে আহত ব্যক্তির প্রাণে এই সঙ্গীতের জন্য কষ্ট কম হয় এবং আবার লড়াই-এর ক্ষমতা আসে। এই সঙ্গীতের জনাই মরণাপন্ন ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পায়[২]।

যখন খবর পেঁাছোলো যে গোপাল লড়াই-এর মতলবে আসছেন তখন মীর সুলতান

[১] পাদটীকায় হাকিম্সুজানের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে;—এখন তখ্তার চেয়ে সরলতর লাউ ব্যবহৃত হবে। দম্ঘজ্ঘার তখ্তার স্থানে পিছনদিকে লাউ থাকবে।

[২] এই অংশটি খুব স্পষ্টভাবে লিখিত হয়নি। কিছুটা আন্দাজ করে অনুবাদ করা গেল।

আলাউদ্দিনকে বললেন—"বর্তমানে গোপালের সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তাঁর সঙ্গে বারোশোরও বেশি শিষ্য রয়েছেন। কাহারের পরিবর্তে তারাই তার সিংহাসন বহন করে আনছে।" অতঃপর খুসরুওকে একটি চারপায়ার তলায় লুকিয়ে রেখে সুলতান গোপালকে আহ্বান করে বললেন—"খুসরুও অসুস্থ—সুস্থ হলে তিনি আসবেন। সেই সময় পর্যন্ত আপনি সঙ্গীত পরিবেশন করুন।" গোপাল এসে গান করলেন। যখনই গোপাল আসতেন খুসরুও আগে থেকেই এসে মঞ্চের তলায় লুকিয়ে থাকতেন। এইভাবে ক্রমাগত ছ'টি প্রভাত অতিক্রান্ত হবার পর সপ্তম মজলিসে মীর শিষ্যসমভিব্যাহারে সামৎ ও ততারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন। গোপাল পরিশ্রম করে গাইলেন এবং মীরকে গাইতে অনুরোধ করলেন। মীর বললেন—"আমি মুঘল,[১] দেশ থেকে সবে এসেছি। আমার দিল্‌কে খুশী করবার জন্য হিন্দুস্তানের কিছু গান আমি স্মৃতিতে রক্ষা করেছি। আপনাদের মত আমার বাদ্যযন্ত্র নেই। আমি ডান্ডী বেঁধে নিচ্ছি। আপনি আগে গান করুন তার পরে আমার যা আসে তাই গাইব। গোপাল গান শুরু করলেন। তিনি একটি হরগীত, একটি মন্ ও স্বরবর্তনী গাইলেন। মীর বললেন—'এই সব গান আমি আগেই বেঁধেছি।' গোপাল বললেন "গেয়ে দেখান" মীর হরগীতের উত্তরে কওল ও বসিৎ গাইলেন। গোপাল বিস্ময়ের সমুদ্রে গিয়ে পড়লেন এবং বিশেষ বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। অতঃপর মীর বললেন—"এগুলি যা গাইলাম তা এখানকার গুণিদের সহবাসে লব্ধ; কিন্তু যা কিছু আমি নিজে সৃষ্টি করেছি সে সমস্ত আমি আপনাদের শোনাব।" তাঁর নিজস্ব রচনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি সেগুলি গাইলেন। গোপাল ও সমস্ত মজলিস এই সুরবৈচিত্র্য এবং বাক্যের যাদুতে খুশী হয়ে উঠলেন। উক্ত মজলিসে অমাত্যাদি থেকে সাধারণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে বললেন যে তাঁর উপর প্রচুর ভগবৎ-কৃপা বর্তমান কেননা তিনি একটি শুনেই সব শুনে ফেলেছেন এবং স্মৃতি থেকে এই গানগুলির প্রত্যুত্তরে কওল প্রভৃতি রচনা করেছেন। (এইখানে একটি বয়েৎ উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু ছিন্ন বলে ভাল পড়া গেল না)।

খিয়াল—দুটি কলিতে গঠিত। দেশী ভাষায় গাওয়া হয়। বর্তমানে এটি দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত। আকবরের সময়ে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন আকবরাবাদ রাজধানী হল সেই সময়ে যাবতীয় গায়ক ও ওস্তাদ যাঁদের তুলনা কোনও যুগে দেখা যায় নি তাঁরা ওই স্থানে জমা হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই গোয়ালীয়রের বাসিন্দা ছিলেন। এখন এটা হচ্ছে ১০৭৬ হিজরী। এর আগে শাহ্‌জাহানের সময় দিল্লীর কাছে শাহ্‌-জাহানাবাদ ছিল রাজধানী। এর একদিকের বিশ্ববিখ্যাত সুন্দর ইমারৎগুলি সুলতান ফিরোজ শাহের তৈরি। এইগুলি দক্ষিণে দিল্লীর সঙ্গে মিশে গেছে।

(এর পর শাহ্‌জাহানাবাদের প্রশংসা ও দীর্ঘ শের আছে। অপ্রাসঙ্গিক বোধে এই অংশের তর্জমা করা হল না।)

বর্তমানে যে সব ভাষা ভালভাবে বলা হয় তা দশ শতেরও অধিক। এইসব ভাষায় প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধীয় গান রচিত হয়েছে। কতকগুলি খেয়াল আছে যেগুলি চারটি কলি সহযোগে গঠিত। কিন্তু প্রথম দুটি কলির পদান্তে মিল শেষের দুটি কলির মিল থেকে ভিন্ন।

নক্‌শ্‌—এতে গদ্যাংশ থাকে। উপরের অর্থাৎ প্রথম ভাগে তা, না, তলী—এইগুলি

---

[১] খুসরুও মুঘল ছিলেন না। তাঁর পিতা ছিলেন তুর্কী কিন্তু তাঁর জন্ম ভারতে, তাঁর মাও ভারতীয়া ছিলেন।

উচ্চারিত হয়। "মন্" নামক গীতের পদ্ধতিতে এটি রচিত।

নিগার—স্বরবর্তনীর পাল্টা রচনা।

বসিৎ—"ছন্দ্"-এর পাল্টা রচনা।

তরানা—ইচ্ছামত কবিতা ও গদ্য হতে পারে কিন্তু এতে তা, না, তলী—এইসব শব্দ থাকবে।

তিলল্লানা—সম্পূর্ণ তা, তা, তলী—এই শব্দাদিদ্বারা গঠিত।

ফারসী—এতে কিছু বয়েৎ থাকবে। ইচ্ছা হলে কসীদা সহ ঘজল্ তাল সহযোগে গাওয়া যেতে পারে।

ফর্দ্—এতে একটি বয়েৎ রাগ ও তাল সহযোগে গাওয়া হয়।

সোহ্লা—কয়েকটি কলিকে একত্র নিবন্ধ করে রচিত হয়। কোন ব্যক্তির প্রশংসায় বা কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

বিষণপদ—এটি চার থেকে আট পংক্তিতে নিবন্ধ। এতে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করা হয়।

ত্রিবট্ (তর্ওয়ট্)—দুই থেকে চারটি কলিতে নিবন্ধ। এর সঙ্গে পাখোয়াজ বাদিত হয়।

কাবী—সিন্ধু দেশের গান। এতে প্রেমের প্রাচুর্য থাকে।

লচারী—তির্হুতের ভাষায় গাওয়া হয়। প্রেমঘটিত মনান্তর এর বিষয়বস্তু।

গুজ্রী—গুজ্রাটে গাওয়া হয়। এটি প্রশংসাজ্ঞাপক গীত।

কড়্খা—যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। এটি চার থেকে আটটি কলিতে নিবন্ধ। এর দুটি দুটি কলি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গাওয়া হয়।

সাদ্বা—চার, ছয় বা আটটি কলিতে নিবন্ধ। বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয়। যুদ্ধ-বিষয়ক গীত।

বাললীলা—উৎসবাদিতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি খিয়ালের মত দুটি কলিতে নিবন্ধ। সন্তানের জন্মোৎসবে পিতামাতার চোখের সামনে আলোকোজ্জল অনুষ্ঠানে দোলনায় দোল দিতে দিতে এই গান গাওয়া হয়।

উৎসব উপলক্ষ্যে ওস্তাদগণ মঙ্গলাষ্টক, জয়েৎশ্রী প্রভৃতি রাগ গেয়ে থাকেন।

ছন্দ্—লাহোরে প্রচলিত। কয়েকটি কলিতে নিবন্ধ। সেখ্ বহাউদ্দিন্ জ্যাকেরিয়া মুলতানী একে ফার্সীতে "চন্দ্" বলে অভিহিত করেছেন। এতে সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতা যুক্ত হয়। এটি প্রেমসঙ্গীত।

ডপা (টপ্পা)—পাঞ্জাবেই বেশির ভাগ গাওয়া হয়। ঐ দেশের ভাষাতেই এটি রচিত হয়। দুই থেকে চারটি কলিতে নিবন্ধ। এর বেশিও হতে পারে। তবে, দুটি দুটি কলির পদান্ত ভিন্ন ভিন্ন মিলযুক্ত হয়। এটি প্রেমসঙ্গীত। মৃত্যুকামনা বা আত্মোৎসর্গও (প্রেমের জন্য) এর বিষয়বস্তু হয়ে থাকে।

মাঙ্গল—সব ভাষাতেই গাওয়া হয়। জৌনপুরে অধিক প্রচলিত। কয়েকটি কলি বর্তমান। এর কলিগুলিও ভিন্নভাবে মিলযুক্ত হয়। দুটি কলি গাইবার পর—আবার প্রধান কলিটি আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। এর পরে তালটি সম্পূর্ণ হয়। এর বিষয়বস্তু—প্রেম, প্রেমিক ও বিরহ।

বার্—এটি ঢাঢ়ী ব্যতীত অপর সম্প্রদায় গান করেন। এতে কবিতার কয়েকটি কলি থাকে। এতে যুদ্ধবিষয়ক আখ্যায়িকা সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়। কমপক্ষে দুজনে এই গীত

গেয়ে থাকেন। প্রথমে ওস্তাদ দুটি কলি গান করেন। তারপর—শিষ্য তৃতীয় কলিটি গান। অতঃপর ওস্তাদ আবার দুটি দুটি কলি গান করেন ও তাঁর সঙ্গী প্রত্যেক অংশের পরে প্রথম কলিটি আবৃত্তি করেন।

জক্‌রী—এই গীত সম্পর্কে কিছু বিধিবন্ধ নিয়ম নেই তবে কয়েকটি কলিতে এটি গঠিত। ইচ্ছানুসারে এটি নিয়মিত হয়। দুটি কলির ভিন্ন ভিন্ন মিল হয়ে থাকে। প্রত্যেক কলির শেষে তাল সম্পূর্ণ হয়। এর রচয়িতা কাজী মাহ্‌মুদ্‌ গুজ্‌রাতিয়ৎ। তাঁর গ্রন্থে প্রেম, প্রেমিক, মৃত্যুস্মরণ প্রভৃতি বিষয়ক গীত লিখিত আছে। এইসব লিখিত গীত ব্যতীত চতুর্দিকে বহু গীত প্রচলিত আছে। বর্তমানে যেসব গীত প্রচলিত সেগুলি উদ্ধার করে দেখান হল।

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে বাদ্য, নায়ক ও সখী সম্বন্ধীয় বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে।

বাদ্য চার প্রকার :

তত—যেগুলি তার সহযোগে বাজান হয়।

বিতত—যেগুলি চর্মের উপর বাজান হয়।

ঘন—যেগুলি ধাতুসহযোগে বাজান হয়।

সুখর্‌ (সুষির)—যেগুলি ফুৎকার সহযোগে বাজান হয়।

বহু প্রকার বাদ্য আছে। এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

প্রথমে যন্তর—কাষ্ঠনির্মিত। লম্বায় একগজ। ভিতরটা ফাঁপা। দুদিকে দুটি লাউ থাকে। লাউ দুটির ওপরের দিকের এক অংশ কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। দণ্ডের ওপর ষোলটি পর্দা সংযুক্ত থাকে এবং তার ওপর দিয়ে পাঁচটি লোহার তার দুই প্রান্ত থেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে।

বীণ—যন্তরের মত কিন্তু এতে তিনটি তার বর্তমান।

কিন্নরবীণ—বীণের মত, কিন্তু দণ্ডটি ঈষৎ বেশি লম্বা এবং তিনটি লাউ ও দুটি তার থাকে।

সুরবীণ—বীণার মত কিন্তু এতে পর্দা থাকে না।

অম্বরতী (অমৃতী ?)—এর দণ্ডটি সুরবীণের দণ্ড অপেক্ষা ছোট। একটি ক্ষুদ্র লাউ ওপরের দিকে একটু নিম্নভাবে সংলগ্ন থাকে। একটি লোহার তারে অপরিবর্তিতভাবে সব কটি পর্দা বাজান যায়।

রবাব—এতে ছ'টি তাঁতের তার থাকে। কোন কোন যন্ত্রে বারোটি এবং কোনটিতে আঠারোটি থাকে। যাতে বেশি তার থাকে তাতে তামার তার লাগানো হয়। এর দুটি প্রয়োজনীয়তা আছ। এক হচ্ছে যাতে এর দরুণ বর্ষাকালের হাওয়ায় তাঁতের তারগুলি ঢিলে হয়ে যাবার ফলে বৈলক্ষাণ্য না ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, এর দরুণ চুটকলা এবং খিয়ালের সঙ্গে সঙ্গত যথাযথভাবে হতে পারে এবং বাদ্যের কোমলত্ব বজায় থাকে। রবাবী তার বেশি লাগান যাতে আওয়াজ করুণ[১] হয়। কিন্তু ওস্তাদ যদি পটু হন তাহলে ষট্‌তন্ত্রী রবাবেও

[১] এখানে "হজীন্‌" শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। "হজীন" অর্থ করুণ; কিন্তু এক্ষেত্রে করুণ মানে মোলায়েম অথচ গম্ভীর আওয়াজ বুঝতে হবে।

যথাযথ সঙ্গত করতে সক্ষম হন; কেননা এর আসল কারণ রবাব নয় বাদকের কৌশলটাই হল প্রধান।

বয়েৎ—বাজাবার কৌশল যে পর্যন্ত না মোলায়েম হবে সে পর্যন্ত কানে মোম গলতে থাকবে। (তা মোলায়েম নওয়াজীশ্ ফন্ শুদ্। গোশ্হায়ে তরফ্ মোম রওঘন্ শুদ্।)

স্বরমণ্ডল—কানুনের মত যন্ত্র। পঁচিশটি তার থাকে। কেউ তামার তার ব্যবহার করেন কেউ লোহার তার। অর্ধেকগুলি শেষের দিকে থাকে আর অর্ধেকগুলি কানুনের মত। কানুনে চল্লিশটি তার থাকে। তিনটি একদিকে চারটি অপরদিকে আলাদা আলাদা বসানো। অপর তারগুলি একজায়গায় দুটি করে বাঁধা থাকে। এর তারগুলি সবই ভিন্নভাবে থাকে।

সারঙ্গী—ঘিচকের মত বাজান হয়। রবাবের চেয়ে ছোট।

পিনাকচুবী—কাষ্ঠনির্মিত। ধনুকের মত ঈষৎ বক্র। তাঁতের তার বাঁধা হয়। কাষ্ঠনির্মিত পেয়ালের মত একটি বস্তু এই বাদ্যের দুদিকে উল্টোভাবে বসানো থাকে। কেহ কেহ এর বদলে লাউ-এর অর্ধাংশও যোজনা করে থাকেন। এই যন্ত্রটিও ঘিচকের মত বাজানো হয় কিন্তু বাঁহাতে একটি ছোট লাউ রাখা হয়। এটি বাজাবার কাজে লাগে।

ধিউটী—এতে একটি লাউ ও দুটি তার থাকে।

কিঙ্গীরা—বীণের মত। এতে দুটি তাঁতের তার থাকে। এর লাউগুলি তম্বুরার লাউ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। এইগুলিকে তাজী (আরবী) তম্বুর বলা হয়। উক্ত বাদ্যে লোহার ও তামার পাঁচটি তার থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই যন্ত্রে ইচ্ছানুসারে চামড়া দিয়ে বাঁধা হয়: অপর ক্ষেত্রে চামড়া লাগানো হয় না। যখন চামড়া দিয়ে বাঁধা হয় তখন বীণের মত রাগ অনুযায়ী বাজাবার জন্য কম বেশি করা হয়। যেগুলিতে চামড়া দেওয়া হয় না সেগুলিতে অমৃতীর মত অপরিবর্তিতভাবে বাজান হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়—বিতত।

পাখাওয়াজ—নৃত্যরত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ফার্সী ভাষায় এই বাদ্যকে "তরঙ্গ্" বলা হয়। তবে পাখাওয়াজ এর চেয়ে বড়। মোটা কাঠ থেকে হরিতকীর মত আকৃতিতে তৈরি করা হয়। এর মাঝখানটা ফাঁপা থাকে। লম্বায় একগজের কিছু বেশি হয়। যদি এর মধ্যভাগ বগলের ভিতর দিয়ে ধরা যায় তাহলে দুহাতের আঙুল একত্র মিলবে। এর মুখদুটি কলসীর মুখের চেয়ে কিছু চওড়া হয়। এদের চামড়া দিয়ে ছাওয়া হয়। এর চারদিকে নাকাড়ার মত চামড়ার পাত টানা থাকে। চারটি কাঠের টুকরো এক হাতের কিছু কম দূরে বাঁদিকে পাখাওয়াজের বৃত্তে লাগানো থাকে। এই কাঠের টুকরোগুলিকে মুচড়ে সুর নামানো চড়ানো হয়।

আওয়াজ—এটি ফাঁপা কাঠ থেকে তৈরি। দুটি ছোট তবল্ পিছন দিক থেকে জোড়া দিলে যেরকম হয় সেরকম। দুটি মুখ চামড়ায় ছাওয়া হয় এবং দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে।

দুহুল—এটি সুপরিচিত (অর্থাৎ ঢোল)।

দফ্—এটিও বিশেষ পরিচিত

দুহুলকী—দুহুলের অর্ধেক।

ঢঢা—দুহুলের মত কিন্তু প্রান্ত দুটি দুহুলের চেয়ে ছোট।

অর্ধাওয়াজ—আওয়াজের অর্ধেক।

খন্জরী—দফের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভিতরে রণনাত্মক ঘণ্টি থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ের বাদ্য।

সিন্‌জ্‌—একে হিন্দীভাষায় তাল বলা হয়। মুখ দুটি সমান করে গঠন করা হয়। দেখতে বিস্তৃত ওষ্ঠযুক্ত পেয়ালার মত।

কাঠ্‌তাল—ছোট মাছের মত আকৃতি। চারটি করে থাকে। কাঠের বা পাথরের তৈরি।

জলতরঙ্গ—চিনেমাটির চার ধরণের পেয়ালা (পিয়ালহায়ী চিনী) ব্যবহৃত হয়। একটি থেকে আর একটি ক্ষুদ্রতর। এগুলিতে জল রাখা হয়। রাগ অনুসারে এই জলের পরিমাণ কম ও বেশি করা হয়। দুটি কাষ্ঠদন্ড হাত দিয়ে ধরে নাকাড়ার মত বানানো হয়। পারস্যে এই বাজনা আছে কিন্তু এর নাম নেই। এই বাজনাকে "চিনী-নাওয়াজ" বলা হয়। কবিতাতেও এইরকম উল্লেখ পাওয়া যায়। বয়েৎ—

একদিকে চিনীনাওয়াজগণ চতুর কৌশলী; পাত্রে মদ না থাকলেও মজলিসকে তারা মাতাল করে তুলল।

(দর্‌ ভিলায়েৎ ইন্‌ সাজ্‌ হস্ত্‌ আমা নাম্‌ ন-দারদ্‌ ও সাজন্দ্‌হায়ে ইন্‌রা চিনী-নাওয়াজ্‌ গুয়েন্দ্‌। চুনাঞ্চে দর্‌ শের্‌ হম্‌ বস্তা আন্দ্‌।

বয়েৎ—এক্‌ তর্‌ফ্‌ চিনী নওয়াজান্‌ সবক্‌দস্ত্‌ আজ্‌ ফুনুন্‌; করদা মজ্‌লিস্‌রা জ্‌ সাঘর্‌হায়ে বে-মাই সর্‌-গিরান্‌।)

চতুর্থ পর্যায়ের বাদ্য।

শাহ্‌না—ফার্সীতে একে সুর্ণা বলে।

মশ্‌ক্‌—এতে দুটি ছোট বাঁশি থাকে এবং তাতে মাপ অনুযায়ী কয়েকটি ছিদ্র থাকে। এই বাঁশি দুটি মশ্‌ক্‌ অর্থাৎ চামড়ার থলিতে মিলিত হয়। ফার্সী ভাষায় একে "নাই-অম্বান্‌" বলে।

মুরলী—একে "তাজী-নাই" বলা হয়। লম্বায় বাঁশি-শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট।

উপাঙ্গ্‌—একপ্রকার বাঁশি। ভিতরটা ফাঁপা। লম্বায় এক গজ। এর ওপরের দিকে মধ্যস্থানে একটা ফুটো থাকে এবং এই ফুটোর ভিতরে একটি সরু বাঁশি বসানো থাকে।

নায়ক-বর্ণনা :

অনুকূল—যে এক স্ত্রী ভিন্ন অপরের সঙ্গে বিহার করে না।

দক্ষিণ—অনেক মহিলাতে যার সমান আসক্তি থাকে।

ধৃষ্ট—যে স্ত্রীলোক কর্তৃক তিরস্কৃত হলেও লজ্জিত হয় না এবং দোষ দেখিয়ে দিলেও মিথ্যা কথা বলে।

শঠ—যে স্ত্রীলোকের প্রতি কপট আচরণ করে।

নায়িকা তিন প্রকার :

স্বকীয়া—গৃহকর্মে নিপুণ; বন্ধুতাযুক্তা; সত্যতা থেকে ভ্রষ্ট হয় না; চক্ষু চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হয় না; ছিদ্রান্বেষণ করে না; হাসে কিন্তু দন্ত উন্মিলিত করে না; স্বামী আসবার সাড়া পেলে আপনা থেকে ত্বরান্বিত হয়ে বহির্গত হয়; বাক্যে ক্রোধ প্রকাশ করে না।

পরকীয়া—নৈপুণ্যের সঙ্গে গোপনে অপরের সঙ্গে প্রণয় করে।

সামান্যা—কারুর অধিকৃত নয়; বাঁধা থাকে: বেশ্যা।

স্বকীয়া তিন প্রকার :

মুগ্ধা—যৌবনসীমান্তে উপস্থিত।

মুগ্ধা তিনরকম :

অজ্ঞাতযৌবনা—যার মধ্যে বালিকাভাব ও যৌবন মিশ্রিত হয়ে গেছে, গলার আওয়াজ বাঁশির মত; নিজের সম্বন্ধে উদাসীন।

জ্ঞাত যৌবনা—যৌবনপ্রাপ্তা।

বিশ্রব্ধনূঢ়া—স্বামী বর্তমানেও স্বামীর কাছ থেকে পলায়নপরা।

মধ্যানায়িকা—যার লজ্জা ও স্বামী সম্ভোগের ইচ্ছা সমান।

প্রগল্ভা নায়িকা—স্বামীর প্রতি গভীর আসক্তিসম্পন্না এবং অতিরিক্ত কামপরায়ণা।

মধ্যানায়িকা তিন প্রকার—

ধীরা—যে অন্যসহবাসকৃত স্বামীকে উপহাস করে।

অধীরা—যে অন্যসহবাসকৃত স্বামীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে।

ধীরাধীরা—যে অন্যসহবাসকৃত স্বামীর প্রতি অভিমানযুক্ত হয়ে ক্রন্দনসহযোগে তিরস্কার করে।

স্বকীয়া নায়িকা দুই প্রকার :

জ্যেষ্ঠা—যার প্রতি স্বামী অপর রমণী অপেক্ষা অনুরক্ত।

কনিষ্ঠা—যার প্রতি স্বামীর আসক্তি কম।

পরকীয়া নায়িকা দুই প্রকার—পরোঢ়া ও কন্যকা।

পরোঢ়া—যে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়েও ভয়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

কন্যকা—অবিবাহিতা। মাতাপিতার অজ্ঞাতে পুরুষের প্রতি প্রণয়ে বন্ধ হয় ও কার্যসিদ্ধি করে।

পরোঢ়া ছয় প্রকার :

গুপ্তা, বিদগ্ধা, লক্ষিতা, কুলটা, অনুশয়ানা, মোদিতা।

গুপ্তা—যে গুপ্তভাবে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়।

বিদগ্ধা—এটি দুই প্রকার বাক্‌বিদগ্ধা ও ক্রিয়াবিদগ্ধা।

বাক্‌বিদগ্ধা—সাহসী, বাক্‌পটু, মনোরঞ্জনে সক্ষম (কর্‌দারে শগর্‌ফ্‌), ক্ষমতা-সম্পন্না।

ক্রিয়াবিদগ্ধা—কার্যে অতিশয় তৎপর এবং পরপুরুষের সহিত প্রণয়কারিণী।

লছ্‌তা (লক্ষিতা)—প্রিয়ের সঙ্গে মিলনে যে গোপনতাকেও ভয় করে না।

কুলটা—যথেচ্ছ সহবাসকারিণী।

অনুশয়ানা—উদ্যান, মাঠ, গাছ প্রভৃতি স্থানে রাত্রে গোপনে প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হয়। শীত বা বর্ষায় সেই সব স্থানে যেতে পারে না কেননা গোপনতা রক্ষা করা যায় না। তখন ঐসব স্থান দেখে কাতর হয়ে পড়ে ও চিন্তান্বিত হয়।

মোদিতা—বাসগৃহ থেকে স্বামী প্রভৃতি বহির্গত হলে শূণ্য বাসগৃহে নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়।

সামান্যা নায়িকা তিন প্রকার :

সম্ভোগ দুঃখিতা, বিকৃতকৃতা, ও মানবতী।

সম্ভোগদুঃখিতা—দূতীর সঙ্গে নায়কের সহবাসের পরিচয় পেয়ে দুঃখিতা।

বিকৃতকৃতা—আমার মত দুঃখী আর নেই—এই ভাবযুক্তা। এটি দুই প্রকার : প্রেমকৃতা ও সৌন্দর্যকৃতা।

প্রেমকৃতা—নায়ক যাকে বেশি কামনা করে। স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় থাকলেও

মনে মনে তার প্রতি অপ্রসন্ন।

মানবতী—অপরের সঙ্গে সহবাসকৃত নায়কের প্রতি মানযুক্তা।

তিনটি নায়িকা—স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্যা—এদের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলা হল। এই তিনটির আবার আরও আটটি প্রকারভেদ হতে পারে।

প্রোষিতভর্তৃকা—যার স্বামী প্রবাসে আছে।

খণ্ডিতা—যার স্বামী পরকে উপভোগ করে সেই চিহ্নসহ স্ত্রীর কাছে আসে। স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে তার হাতে একটি আয়না প্রদান করে। নায়ক বখ্শু এই নায়িকাকে অবলম্বন করে চমৎকার ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। উপরের দুটি কলিতে এই নায়িকার উল্লেখ আছে। এটি সুহু রাগে নিবদ্ধ। আরোহণে ঔড়ব।

নয়া রঙ্গ্ মকীন্ আওত দেখ্ পিয়ারী অধর কর
দর্পণমহল মে লে আয়ী॰
যব্হি॰ পিয়ার ও নিজহ চিন্ চিন্
সখী তব্ মুখ মোড় মোড় মুস্‌কাইন্।

একে প্রৌঢ়া খণ্ডিতাও বলা হয়ে থাকে।

কলহান্তরিতা—অপর সহবাসকৃত নায়ককে তীব্র তিরস্কারের পর অনুতপ্তা।

বিপ্রলব্ধা—নতুন মিলনস্থানে প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত না হওয়ায় ব্যথিতা।

উৎকণ্ঠিতা—প্রিয় আসছে না এই কারণে চিন্তান্বিতা। একে "উৎকার"ও বলা হয়।

বাসকসজ্জা—প্রিয় আসবে ও মিলিত হবে এই অপেক্ষায় আহ্লাদিত চিত্তে সুসজ্জিত হয়ে প্রতীক্ষমানা।

স্বাধীনভর্তৃকা—প্রিয় যার ইচ্ছার অধীন।

অভিসারিকা—যে নিজেই প্রিয়ের কাছে ত্বরান্বিত হয়ে গমন করে।

প্রোষিতভর্তৃকা সেই ক্ষেত্রেও হবে যে ক্ষেত্রে নায়িকার প্রিয়ব্যক্তি ভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক কিন্তু নায়িকা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাকে অন্যভাবে নির্দিষ্ট করছে;—যদিচ আসলে তার কোনও কারণ নেই।

সখী—দীর্ঘকালের পরিচারিকা যার ওপর আস্থা স্থাপন করা যায়। নায়িকার সেবায় আত্মনিযুক্তা; তার আনন্দে আহ্লাদিতা এবং চিন্তা অপনোদনে নিযুক্তা। এরা হাস্যপরিহাসে নায়ক-নায়িকার সখ্যতা বৃদ্ধি ও মিলন সংঘটিত করে।

যদি কোনও স্ত্রীলোক নায়ক-নায়িকার সংবাদ বিনিময় করে তাহলে তাকে দূতী বলে। যদি এই কাজ পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে দূত বলা হয়। এই ব্যক্তি মিলনের দিন ও বিচ্ছেদ সম্বন্ধে জ্ঞাত। সখ্যতা ও অসখ্যতা সম্বন্ধে এর ভালরকম জানা আছে; নায়ক-নায়িকার বিভিন্নতা অনুসারে মনোহারী কাহিনীতে তাদের আনন্দ প্রদান করে। এরা অভিষ্ট প্রণয়পাত্রের সঙ্গে মিলনসাধনে পটু এবং পত্রলেখায় অভিজ্ঞ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে গায়কদের দোষের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কাছে এটি যেন গোপন না থাকে যে গায়কদের দোষ পঁচিশপ্রকার। দোষগুলি এই : সন্দষ্ট, উদ্‌ঘুষ্ট, সুৎকারী, ভীত, শঙ্কিত, কম্পিত, করালী, বিকল, কাকী, বিতাল, করভ, অধির (উদ্ভট

হওয়া উচিত), বোম্বক, তুম্বকী, বক্রী, প্রসারী, বিনিমীলক, বিরস, অপস্বর, অব্যক্ত, স্থান-ভ্রষ্ট, অব্যবস্থিত, মিশ্রক, অনবধান, সানুনাসিক।

দাঁত চেপে গান করাকে সন্দষ্ট বলে। খুব উঁচুগলায় গান করাকে উদ্‌ঘুষ্ট বলে। দাঁতে দাঁতে চেপে উঁচু দিকে নিশ্বাস টেনে "সুৎ" আওয়াজের সঙ্গে গান করাকে সুৎকারী বলে। গান করতে গিয়ে সাহসে কুলোচ্ছে না—এমন দেখা গেলে তাকে ভীত বলে। ত্বরান্বিত হয়ে গান করলে তাকে শঙ্কিত বলে। গানের সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপতে থাকলে তাকে কম্পিত বলে। মুখ ফাঁক করে সমস্ত দন্ত উদ্‌ঘাটিত করে গাওয়াকে করালী বলে। গাইবার সময় সুর কম, বেশি হলে তাকে বিকল বলে। কাকের কত কর্কশ আওয়াজ হলে তাকে কাকী বলে। তালের আন্দাজ না থাকলে তাকে বিতাল বলে। উটের মত ঘাড় উঁচু করে গান করাকে করভ বলে। ছাগলের মত আওয়াজ হলে তাকে অধির (এটিকে রত্নাকরে 'উদ্ভট' বলা হয়েছে) বলে। শির, কপাল, গ্রীবা, মুখ বিকৃত করে গাওয়াকে বোম্বক বলে। তুম্ব বা লাউ-এর মত গলা ফুলিয়ে গাওয়াকে তুম্বকী বলে। গলা বক্র করে গাওয়াকে বক্রী বলে। গাওয়ার সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শ্লথ এবং স্বর শ্লথ হলে তাকে প্রসারী বলে। চোখ বুঁজে গান করাকে বিনিমীলক বলে। গানে রস ও রঞ্জকতা না থাকলে তাকে বলে বিরস। গানের সময় ঠিক সুর রক্ষা না করে কম করলে তাকে অপস্বর বলে[১]। গানের সময় কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হলে এবং কণ্ঠনলী থেকে স্পষ্ট ধ্বনি নির্গত না হলে তাকে অব্যক্ত বলে। মন্দ্র, মধ্য ও তার—এই তিন স্থানে গলা পেঁাছোতে অশক্ত হলে তাকে স্থানভ্রষ্ট বলে। উক্ত তিনটি স্থানের একটিতেও যথাযথভাবে সুর লাগাতে সক্ষম না হলে তাকে অব্যবস্থিত বলে।[২] শুদ্ধ, ছায়ালগ প্রভৃতি রাগগুলিকে একত্র (অর্থাৎ মিশ্রিত) করে ফেললে তাকে মিশ্রক বলে। সঞ্চারী ও আস্থায়ী—এ সব সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে তাকে অনবধান বলে।

সপ্তম অধ্যায়

কণ্ঠ ও আওয়াজের পার্থক্য নিরূপণ এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। অভিজ্ঞগণ কণ্ঠের চারটি প্রকারভেদ নির্দিষ্ট করেছেন। এইগুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন। এইগুলি হচ্ছে—খাহুল, নারাট, বোম্বাক[৩] ও মিশ্রিত।

কণ্ঠের কফযুক্ত মেজাজ হলে তাকে খাহুল বলে। এর তিনটি গুণ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্নিগ্ধ[৪]—অর্থাৎ চর্বিযুক্ত গম্ভীর আওয়াজ; মধুর অর্থাৎ মিষ্ট আওয়াজ, সুকুমার অর্থাৎ মোলায়েম আওয়াজ। খাহুল ধ্বনি মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকে পরিব্যাপ্ত হলে তাকে আডিল্ল[৫] বলে। যে গলা আরও উঁচুতে ওঠে তাকে বলে নারাট। এর চারটি গুণ। ত্রিস্থান অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য এবং তার—এই তিনটি স্থান। ঘন অর্থাৎ অন্তঃসারতাযুক্ত। গম্ভীর অর্থাৎ গভীর এবং ব্যাপক আওয়াজ। লীন অর্থাৎ নরম ও মোলায়েম আওয়াজ। যে কণ্ঠে শ্বাস বা হাওয়া গানের মেজাজকে অবরুদ্ধ করে তাকে বোম্বক বলে। এটি চার

[১] এটি যথার্থ ব্যাখ্যা নয় বর্জ্য বা নিষিদ্ধস্বরে গান করাকেই অপস্বর বলা হয়।

[২] এই ব্যাখ্যাটিও যথাযথ নয়। আসলে স্থানত্রয়ে ব্যবস্থিত ভাবে অর্থাৎ প্রত্যয়ের সঙ্গে সুর লাগাতে না পারলে তাকে অব্যবস্থিত বলা সঙ্গত।

[৩] এটি "ইউবঙ্গ্" লিখিত হয়েছে।

[৪] এটি "সুগন্ধ" লিখিত হয়েছে।

[৫] এটি "আদল্" লিখিত হয়েছে।

প্রকার। নিঃসার অর্থাৎ দুর্বল ও ঢিলে আওয়াজ। পরুষ অর্থাৎ শুষ্ক আওয়াজ। উচ্চ[১] অর্থাৎ চড়া আওয়াজ। স্থুলং[২] অর্থাৎ শক্তিহীন আওয়াজ। কফজ, বাতজ এবং স্থুল—কণ্ঠে এই তিনটির সংমিশ্রণ হলে তাকে মিশ্রিত বলে।

প্রশ্ন—খাহুল চর্বিযুক্ত (স্নিগ্ধ)গুণসম্পন্ন এবং বোম্বক শুষ্কতাবিশিষ্ট হওয়াতে চর্বিযুক্ত এবং শুষ্কতা পরস্পরবিরোধী। তাহলে এ দুটির একত্রকরণ কিভাবে সমুচিত বিবেচিত হচ্ছে?

জবাব—বিরুদ্ধতাকে বাদ দিয়েই এই মিশ্রণ সম্ভব হবে। নারাট, বোম্বক, ঘন ও নিঃসার—এগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যখন মিশ্রণ হবে তখন বিরুদ্ধতাগুলিকে পরিহার করে এই কাজ করতে হবে।

এই প্রশ্ন ও জবাবের বিশেষ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি খাজা মহম্মদ সলাহ্ সলমিয়া তাঁর নিবন্ধ এল্মে মৌসিকী-তে লিখে গেছেন। রাগপ্রকাশ-এ এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মিশ্রিতও চার প্রকার। নারাট-খাহুল হচ্ছে উত্তম। এর অংশদুটিতে নিঃসারতা এবং পরুষতা নেই। মিশ্রকের মধ্যে বোম্বক-খাহুল হচ্ছে মধ্যম শ্রেণীর। নরোট-বোম্বক হচ্ছে অধম শ্রেণীভুক্ত। বোম্বক ও নারাট মিশ্রিতের মধ্যে যদি নিঃসার ও পরুষতা থাকে তাহলে সেটি অতি নিকৃষ্ট। শিক্ষার্থীদের কাছে এটি যেন গোপন না থাকে যে আওয়াজ সম্বন্ধীয় তথ্য কণ্ঠের গুণ সম্পাদনের জন্য জানা প্রয়োজন এবং এই কটি শব্দের অর্থ জানাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই ভরতসঙ্গীত প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে।

কণ্ঠের গুণ পোনেরটি : মৃষ্ট, মধুর চেহাল, ত্রিস্থানক, সুখাবহ, প্রচুর, কোমল, গাঢ়, শ্রাবক, করুণ, ঘন, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ন (সুল্‌ছন্), রক্তিযুক্ত, অস্থমান[৩]।

মৃষ্ট—গানের সময় শ্রোতা আনন্দ লাভ করেন। মন্দ্র, মধ্য, তার—এই তিন স্থানেই কণ্ঠ পরিব্যাপ্ত হয়।

মধুর—কণ্ঠ সোজা তার স্থানে পরিভ্রমণ করে এবং মিষ্টতাসম্পন্ন।

চেহাল—চর্বিযুক্ত এবং বেশি সরু নয়। গলা ও নিশ্বাস সঙ্কুচিত করে গাইলে এই স্বরটি উৎপন্ন হয়।

ত্রিস্থান—তিনটির (অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য, তার) প্রত্যেকটি স্থানে কণ্ঠের ব্যাপ্তি এবং চিত্তাকর্ষক।

সুখাবহ—যে আওয়াজ চিত্তকে আরাম প্রদান করে।

প্রচুর—স্থুল আওয়াজ।

কোমল—কোয়েলের মত আওয়াজ।

গাঢ়—প্রাণশক্তিযুক্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন আওয়াজ।

শ্রাবক—যে আওয়াজ দূরে পৌঁছোয় এবং উঁচু।

করুণ—যে আওয়াজ শুনলে করুণার ভাব উদয় হয়।

ঘন—ভরাট গলা যা দূরে পৌঁছায়।

স্নিগ্ধ—চর্বিযুক্ত কণ্ঠস্বর যা দূরপ্রসারী।

শ্লক্ষ্ন—যে কণ্ঠের ঘনত্ব ব্যাহত হয় না—একভাবে সুগ্রথিত অবস্থায় থাকে।

রক্তিযুক্ত—চিত্তাকর্ষক এবং জোরালো আওয়াজ।

---

[১] এটি "আজ" লিখিত হয়েছে।　[২] এটি "আস্থল" লিখিত হয়েছে।

[৩] রত্নাকরে এটি "ছবিমান" আছে।

অস্থমান—পরিষ্কার এবং দীপ্তিসম্পন্ন।

কণ্ঠের দোষ আট প্রকার—রুক্ষ, স্ফুটিত, নিঃসার, কাকোলী, কেটি, কেনি, কৃশ ও ভগ্ন।

রুক্ষ—যে কণ্ঠ শেষের দিকে ভেঙে যায় এবং শুষ্ক লাগে।

স্ফুটিত—যে আওয়াজ ছাড়া ছাড়া বোধ হয়।

নিঃসার—ঢিলে এবং ক্ষীণ আওয়াজ।

কাকোলী—কাকের মত আওয়াজ। কানে রূঢ় ঠেকে।

কেটি (কীৎ)—যে আওয়াজ মন্দ্র, মধ্য ও তার—এই তিন স্থানের কোনটিতে ঠিক পৌঁছোতে সমর্থ হয় না। এতে মাধুর্যগুণ থাকে না।

কেনি (কীন্)—মন্দ্র ও তারস্থানে আওয়াজ যেরকম হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

কৃশ—সৌন্দর্যহীন সূক্ষ্ম আওয়াজ।

ভগ্ন—গর্দভ বা উটের মত আওয়াজ।

অভ্যাস ছাড়াই স্বাভাবিক প্রতিভাবলে রাগ অভিব্যক্তির ক্ষমতাকে শারীর বলে।

দুর্বল, ঢিলে, শুষ্ক, চিত্তবিকর্ষক, বিশ্রী, কাকী, সুরভ্রষ্ট, মেধাহীন, কর্কশ, অমসৃণ ও হেঁড়ে আওয়াজকে কুশারীর বলে। বেশির ভাগ অপটু এবং অশিক্ষিত গায়ক এইরকম হয়।

অষ্টম অধ্যায়

যে সকল কর্তব্য অনুষ্ঠান করে গায়ক সাফল্য অর্জন করে এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। গানের বিধিপ্রণালী, লক্ষণ, প্রয়োগ, ব্যবহারিক শব্দ—এইগুলিকে "প্রকীর্ণ" বলে। বাক্যাংশকে বাণী ও মাৎ (মাতু) বলা হয়। সংগীতের অবয়বকে ধাৎ (ধাতু) বলা হয়। যে ব্যক্তি বাণী ও গীত—এই দুই সম্বন্ধে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ তাঁকে "বাগ্‌গেয়কার"—এই ব্যবহারিক শব্দে বোঝানো হয়। বাগ্‌গেয়কার তিন শ্রেণীর।

নিম্নলিখিত গুণগুলি যাঁর আছে তিনি উত্তম বাগ্‌গেয়কার :

বাণী ও গীতের নিয়মপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি, কোষগ্রন্থে অধিকার, আওয়াজের বৈষম্য সম্বন্ধে জ্ঞান, কাব্যে জ্ঞান, বাক্‌চাতুর্য, রসভাব ইত্যাদিতে জ্ঞান, বিবিধ দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচয়, শাস্ত্রে ও কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সংগীতরচনায় দক্ষতা, রাগ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, প্রকাশে বলিষ্ঠতা, অনুসন্ধিৎসা, সংগীতে অতিশয় উৎসাহ প্রবন্ধ-গীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, প্রাচীন মার্গসংগীতে স্মৃতিসম্পন্নতা ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীতে অভিজ্ঞতা; গীত, বাদ্য ও নৃত্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা, লয় ও তাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, রাগ ও তালের বৈচিত্র্য প্রদর্শনে সমর্থতা, প্রত্যুৎপন্নতা, কাকুতি (ধ্বনিবিচার) দক্ষতা, রাগমিশ্রণে দক্ষতা, আলাপে ও গমকে দক্ষতা, তিন স্থানে কণ্ঠবিস্তৃতিতে সমর্থতা।

মধ্যম শ্রেণীর বাগ্‌গেয়কার :—বাণীতে উত্তম নয়, গীতে দুর্বল কিন্তু ধাতু অর্থাৎ সংগীতের অবয়বের (বা টেক্‌নিক্) দিকে সার্থক।

অধম শ্রেণীর বাগ্‌গেয়কার :—এঁরা সংগীতের ধাতুকে প্রস্ফুটিত করতে তৎপর নন কিন্তু মাতু বা বাক্যাংশ ভালভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম।

সংগীতে পারদর্শীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক—যাঁরা প্রত্যুৎপন্নতার সঙ্গে তাজা সংগীত রচনায় সক্ষম; দ্বিতীয়—যাঁরা শব্দগুলি ভালভাবে গ্রথিত করতে পারেন কিন্তু

তাজা সঙ্গীত রচনায় অসমর্থ (অর্থাৎ, মুখে মুখে গান বাঁধতে পারেন না)। গুণকার পর্যায়ের গায়কদের মধ্যম বলা যায়। এ'রা প্রাচীন সঙ্গীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং রাগসমূহ ঠিক ঠিক দেখাতে পারেন। যাঁরা 'গান্ধর্ব' তাঁরা দেশী ও মার্গ—দুই বিষয়েই পারদর্শী। অপর একটি শ্রেণী আছে-সরাদ্ (স্বরাদি?): তাঁরা বিশুদ্ধ রাগ ও মার্গ জানেন কিন্তু দেশী জানেন না।

অষ্টম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ

এতে গায়কদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এ'দের আওয়াজ চিত্তাকর্ষক হবে, সঙ্গীতকালে রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে; গ্রহ-ন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে; রাগ-অঙ্গ, ভাষা-অঙ্গ, ক্রিয়া-অঙ্গ, আলাপ-অঙ্গ সম্বন্ধে জানা থাকবে; প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে জানা থাকবে; আলাপ ও গমকের রীতিগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকবে; তিনস্থানে কণ্ঠ পরিভ্রমণে সক্ষম হবে, পরিবর্তনের নিয়মগুলি জানা থাকবে; অলঙ্কার প্রভৃতিতে দখল থাকবে; কোনও নিয়মের বিচ্যুতি ঘটবে না; কণ্ঠ নিজের আয়ত্তে থাকবে; তাল সম্বন্ধে উত্তম ধারণা থাকবে; নিয়মানুসারে গান করবে; হুঁসিয়ার থাকবে; সঙ্গীতের তথ্যাদি জানা থাকবে; ওজস্বিতার সঙ্গে গান করতে পারবে; শুদ্ধ ও ছায়লগ—এই দুই প্রকার রাগ অবগত থাকিবে; কাকু বা ধ্বনিবিকারে অভ্যাসের জন্য কণ্ঠ বিভিন্ন পর্দায় পরিভ্রমণে সক্ষম হবে; স্থায়ী, সঞ্চারী প্রভৃতি অংশ নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে সমর্থ হবে; গায়কদের যে সমস্ত দোষের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে সেগুলি থাকবে না; লয়বিদ্ ও বিশেষ রঞ্জকতাগুণসম্পন্ন হবে; অক্লেশে গান করতে সমর্থ হবে; উত্তম স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট হবে; সঙ্গীতে চতুর ও ত্বরান্বিত হবে; সঙ্গীতে সৌন্দর্য-সম্পাদনে সক্ষম হবে; যথাযথভাবে রাগনির্ণয়ে সমর্থ হবে;- এইরকম ব্যক্তিকে প্রথম শ্রেণীর গায়ক বলা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী। এ'দের মধ্যম বলা হয়। উপরে কথিত গুণগুলি এ'দের অনেকের মধ্যে আছে; অনেকের মধ্যে কতকগুলি পূর্বোল্লিখিত দোষও বর্তমান।

তৃতীয় শ্রেণী। এ'দের অধম বলা হয়। এ'রা দুর্বল প্রকৃতির। এ'দের কয়েকজনের মধ্যে উপরের গুণগুলি থাকতে পারে। তবে, কিছু না কিছু দোষ এ'দের গানে থাকবেই।

এই তিন শ্রেণীর গায়ক ছাড়া আরও পাঁচ প্রকার গায়ক বর্তমান:—শিক্ষাকার (সেচ্ছাকার), আঙ্কার (আন্-কার?), রসিক, রঞ্জক ও ভাবক।

শিক্ষাকার হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা ওস্তাদের কাছে নানা প্রণালী শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষাদানে সমর্থ হন। আঙ্কারবর্গীয় ব্যক্তিগণ ওস্তাদের কাছে শিখে দস্তুর মত গাইতে পারেন কিন্তু নিজেরা কিছু রচনা করতে সমর্থ হন না। তবে, এ'রাও ওস্তাদের কাছ থেকে নিয়মপ্রণালী শিক্ষা করে সেগুলি শেখাতে পারেন। যাঁরা শীঘ্রই গানে পুলকসঞ্চার করতে পারেন তাঁরা রসিক। রঞ্জক হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা গানের সময় শ্রোতাদের বিশেষ সুখী করতে পারেন। ভাবক তাঁরা যাঁরা সব রাগ নিয়মানুসারে সুন্দরভাবে গাইতে পারেন এবং গানও বাঁধতে পারেন।

এই সর্বপ্রকারে শ্রেণী এবং বিভাগাদির মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী আছে,—একল, যমল এবং বৃন্দ।

একল—যখন গায়ক একাই রাগাভিব্যক্তিতে সমর্থ হন।

যমল—যখন গায়ক অপর একজনের সঙ্গে একত্রে গান করেন; কিন্তু একজনই রাগাভিব্যক্তি ও সঙ্গীতের রূপ প্রদান করেন।

বৃন্দ—যখন গায়কের সঙ্গে একটি গোষ্ঠী সুরসহযোগিতা করেন এবং বিধিসম্মত-ভাবে গান ও রূপ রক্ষা করেন। কিন্তু এই গোষ্ঠীর মধ্যে একজন অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবেন না। বৃন্দ স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়ে গঠিত হতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোক থাকলে সুন্দরী ও যুবতী হওয়া বিধেয়।

নবম অধ্যায়

এতে বৃন্দ এবং বৃন্দসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর আলোচনা হয়েছে। কয়েকজন গায়ক ও বাদকের একত্র সমাবেশে সম্পাদিত সঙ্গীতকে বৃন্দ বলা হয়। এই বৃন্দ তিন প্রকার;—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

উত্তম—এতে চারজন মূল গায়ক, আটজন সাধারণ গায়ক, বারোজন সুকণ্ঠী গায়িকা, চারজন বাঁশরীবাদক, চারজন মৃদঙ্গবাদক থাকবে।

মধ্যম—উপরে উক্ত গায়ক ও বাদকদের অর্ধেক সংখ্যা নিয়ে গঠিত হবে।

কনিষ্ঠ—একজন গায়ক, একজন বাদক, মাঝামাঝি (অর্থাৎ সহযোগী) গায়ক তিনজন, চারজন সুকণ্ঠী গায়িকা, দুজন বাঁশরীবাদক, দুজন মৃদঙ্গবাদক থাকবে।

কেবলমাত্র সুকণ্ঠী স্ত্রীলোকদের নিয়েও দুই প্রকার বৃন্দ প্রস্তুত হয়।

উত্তম—দুজন পারদর্শী গায়িকা, দশজন মধ্যম পর্যায়ের গায়িকা, দুজন বংশীবাদিকা ও দুজন মৃদঙ্গবাদিকা থাকবে।

মধ্যম—একজন পারদর্শী গায়িকা, চারজন মধ্যমশ্রেণীর গায়িকা ও চারজন বংশীবাদিকা থাকবে।

এর চেয়ে কম ব্যক্তি থাকলে তাকে হীন-বৃন্দ বলা হয়। বৃন্দ সম্পর্কে এইটি নির্দিষ্ট রীতি; এর বিচ্যুতি সমর্থনযোগ্য নয়। যদি উত্তমবৃন্দ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক গায়ক ও বাদক জমা হয় তাহলে তাকে "কোলাহল" অর্থাৎ "শোরগোল" বলা হয়।

বৃন্দর ছটি গুণ। এগুলি হচ্ছে—মুখ্যগায়কের উত্তম অনুসরণ গান; পরস্পরের কণ্ঠস্বরে মিলন; সকলে মিলে একযোগে তানের রীতি রক্ষণ; একজনের সুর অপর কর্তৃক যথাযথভাবে নির্বহন; তিন সপ্তকে পরিভ্রমণের সহায়তা সম্পাদন, দ্বিতীয় দলের (অর্থাৎ সহযোগিদের) কণ্ঠের দোষ প্রথমদলের কণ্ঠকর্তৃক আচ্ছাদন। (এর অর্থ এই যে একসঙ্গে গাইলে বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠের বৈসাদৃশ্য ঢাকা পড়ে যায়।)

এতদ্ব্যতীত আরও কিছু ব্যক্ত হবে সম্রাট আকবরের সময়ে লিপিবদ্ধ "রাগসাগর" গ্রন্থটি থেকে। এই গ্রন্থে তৎকালীন গায়কগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি লিখিত হয়েছে। মান কুতূহল ও রাগসাগর—এই দুই গ্রন্থের বর্ণনায় বেশ তফাৎ আছে। কেননা, সেই সময় (অর্থাৎ মানকুতূহলের সময়) নায়কগণ জীবিত ছিলেন। আকবরের সময় এমন ব্যক্তি খুব কম সংখ্যকই পাওয়া যেত যাঁরা বিদ্যায় রাজা মানের যুগের নায়কদের সমকক্ষতা দাবী করতে পারতেন। (গুয়েন্দ্‌হায়ে জমানে আকবরী হিচ্‌কুদাম্‌ দর্‌ এল্‌ম্‌ মিশল্‌ নায়েকান্‌ ওয়াক্‌তে রাজা মান্‌ শুদন্দ্‌।) এই সব নায়ক তাঁদের জ্ঞানের ও প্রয়োগশিল্পের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার প্রমাণ এই নিবন্ধ। অপরপক্ষে আকবরশাহী জমানায় গায়কগণ

আকছার আতায়ী হতেন। প্রয়োগের দিক থেকে যাঁদের কায়দা ওস্তাদের মত কিন্তু তা জ্ঞানসম্বন্ধ নয় তাঁদের আতায়ী বলা হয়। (গুয়েন্দ্ হায়ী জমানে আকবরশাহী আক্সর্ আতায়ী বুদন্দ্। কোয়ায়েদে উয়ো ওস্তাদান্ অনিস্ত্ হর্ কে এল্ম্ বে-এল্ম্ দাশ্তা বাশদ্। উয়েরা আতায়ী গুয়েন্দ্।) এই হিসাবমত এঁদের উল্লেখ করা হচ্ছে।

মিয়াঁ তান্সেন।

সুজান্ খাঁ নওহার।

সুরগিয়ান্ খাঁ।

ফতেপুরী চান্দ্ খাঁ, সুরয্ খাঁ—এই দুই ভাই।

মিয়াঁ চান্দ্—রশীদ্ মিয়াঁ তানসেনের শিষ্য।

তানতরঙ্গ, বিলাস খাঁ—মিয়াঁ তানসেনের এই দুই পুত্র।

রামদাস মুণ্ডিয়া।

দাউদ্ খাঁ ঢাঢ়ী।

মহম্মদ খাঁ ঢাঢ়ী।

মদন রায় ঢাঢ়ী।

মুল্লা আস্হাক্ ঢাঢ়ী।

অনুসন্ধান করে যাঁরা বিদ্যা অর্জন করেন তাঁদের "মুল্লা" বলা হয়। (চুঁ তালিব্ এল্মে কর্দা বুয়াদ্ বিনাবরান্ মুল্লা মীগুয়েন্দ্)।

খিজির্ ও তাঁর ভ্রাতা নবাৎ খাঁ।

হুসন্ খাঁ পটন্নী—আফ্ঘান জাতীয় একজন ওমরাহ।

ইউসুফ্ জয়ী—রাজা বীরবলের মৃত্যুর পর ইনি সিপঞ্জী জানের কাছে সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন। এঁরা সকলেই আতায়ী ছিলেন।

বাজ্ বাহাদুর—মালোয়ার শাসনকর্তা।

নায়ক চর্জু।

নায়ক ভগবান।

ধুধী।

সুরত সেন—তানসেনের প্রিয়পুত্র। (খলফ্-ই-অল্ সিদ্দিক মিয়াঁ তানসেন।)

লালা এবং দেবী—এঁরা বাকির্ খাঁর পুত্র বর্হমন্ আকিলের দুই ভ্রাতা।

সুন্ বাচ্ছী।

এঁরা পদস্থ গায়ক ছিলেন কিন্তু নায়ক ভানু, নায়ক পাণ্ডুয়ী ও নায়ক বখ্শুর মত শিক্ষিত ছিলেন না। কেননা, সঙ্গীতবিষয়ে নায়কদের জ্ঞান প্রশংসনীয় ছিল।

পুরানো আমলের নায়কগণ চেয়ারে (কুরসী) বসতেন: বীণা ও মৃদঙ্গবাদকগণ পিছন থেকে বাদ্যে তাঁদের অনুসরণ করতেন। তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতেন, সুর আবৃত্তি করতেন এবং তাল প্রভৃতি সবই অনুশীলন করতেন। তাঁরা যা গাইতেন তা শিষ্যদেরও শেখাতেন। এই সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আর যা আসত তাও দেখিয়ে দিতেন। এই বৈঠকে অল্পসংখ্যক গাইয়ে থাকতেন। এইভাবে বিদ্যা কাজে লাগত। গ্রন্থে যা বর্ণিত থাকত নায়ক তা বুঝিয়ে দিতেন যাতে সেগুলি শিক্ষার কাজে লাগে।

কেউ যদি কেবল পঠনপাঠনেই নায়কপদ প্রাপ্ত হন তাহলে যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁদের সবাইকেই নায়ক পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু উক্ত কারণে এই ব্যক্তিদের নায়ক বলা

হয় না পণ্ডিত বলা হয়ে থাকে।

এ'দের সবাইকেই সম্মানের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

রাগসাগর গ্রন্থে যা লিখিত হয়েছে তা সমর্থিত নয়। আমি "মানকুতূহল"-এর তর্জমাই দেখিয়েছি। (উঞ্চে দর্ রাগসাগর্ নুস্তা আন্দ্ মন্‌জুর্ ন-দাশতা। মান-কুতূহলরা তর্‌জমা নমুদম্।)

দশম অধ্যায়

আমার সময়ে যে সব গায়ক ও বাদক জীবিত ছিলেন ও আছেন তাঁদের সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে লেখা হয়েছে।

১। শেখ্ বহাউদ্দিন বর্‌নাওয়া।

শাজাহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার দুবছর পরে এ'র মৃত্যু হয়। ইনি অভিজাত-গৃহের সন্তান ছিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেন। ফকীরের মত থাকতেন। তিনি বন্দুকের গুলি থেকে একটি হরিণের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। হরিণটি তাকে বললে—"সাধারণ মানুষ এইসব কাজ করে তুমি অন্য কাজ করতে সক্ষম।" শেখ্ কে কথা বলছে বোঝবার জন্য ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। হরিণ দুকদম এগিয়ে এসে আবার স্পষ্টভাষায় সেই কথা বললে। তিনি আবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন কে কথা বলছে বোঝবার জন্য কিন্তু কোনও ব্যক্তি তাঁর নজরে পড়ল না। হরিণ তখন কয়েক পা এগিয়ে তাঁর সামনে এসে বললে—"আমি হরিণ, আমিই বলিছি।" সে হরিণ হলেও সব কথা নিজের মুখেই বলেছিল। অতঃপর তিনি বন্দুক ফেলে দিয়ে—তীর্থভ্রমণ করাই (সিয়াহৎ) মনস্থ করলেন।

(এইখানে জামীর একটি মসনবী উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর অনুবাদ দেওয়া হল না।)

পঁচিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন এবং অনবরত ফকীর-দের সঙ্গ করলেন। তিনি সঙ্গীতের রীতিনীতি শিখেছিলেন দক্ষিণ দেশে এবং বাদ্যশিক্ষাও করেছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি আবার বাড়ি ফিরলেন। তাঁর দেশ ছিল দোয়াবের অন্তবর্তী ঝিন্‌ঝিনা পরগণার বর্‌নাওয়া গ্রামে। দেশে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আশ্চর্যের বিষয় তিনি আবার শিকার আরম্ভ করলেন। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীসংসর্গ করেননি এবং সবই ত্যাগ করেছিলেন। প্রায়ই সবুজ রঙের বিশেষ পোশাক পরিধান করতেন এবং বলতেন যে এই পরিচ্ছদে আল্লার বাণী আমার কাছে পৌঁছায়।

মার্গসঙ্গীতে তাঁর মত জ্ঞান দক্ষিণে আর কারুর ছিল না। গীত, ধ্রুপদ ও খিয়াল তিনি সুন্দর রচনা করতে পারতেন। চুট্‌কলা গাওয়া কঠিন বলা হয় কিন্তু এসব রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি রবাব্, বীণ ও অমৃতী ভাল বাজাতে পারতেন। তিনি খিয়াল নামে একটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন; কিন্তু এই বাজনা একটি অসাধারণ বাদ্য হিসাবে পরিগণিত হয়নি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই বাজনায় দক্ষ দুজন লেখকের সঙ্গে ছিলেন। এর যে দোষ দেখা গেছে সে হচ্ছে এই যে বিশেষ শক্তিমান (শঙ্গি পাহ্‌লুয়ান্) ব্যতীত এই বাজনা বাজানো যেত না। এই যন্ত্র কারুর কারুর পছন্দ হতে পারে কিন্তু—গায়ক বা বাদকরা একে পছন্দ করবেন না। তিনি একশো সতেরো বৎসর বয়সে নিজের বাড়িতে

ফকীর পরিবেষ্টিত হয়ে পরলোকগমন করেন। এই সব সংবাদ আমি বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি।

২। শেখ্ শের মহম্মদ্

দেশী সঙ্গীতে নূতনত্ব প্রদর্শন করেন। তিনিও ফকীরত্ব অবলম্বন করে ধনদৌলত পরিত্যাগপূর্বক বহাউদ্দিনের সঙ্গে থাকতেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। শেখ্ নাসিরুদ্দিন রহমতুল্লার কাছে তিনি কাজ করতে থাকেন। সমস্ত কষ্ট সহ্য করে কালক্রমে তিনি তারুণ্যে উপস্থিত হলেন। তিনি নানা স্থানে তীর্থ উপলক্ষ্যে ভ্রমণ করেছিলেন। এই সময় লেখক তাঁকে দেখেন।

(এইখানে আত্তার্-এর একটি বয়েৎ আছে। এটির অনুবাদ দেওয়া হল না।)

শেখ্ নাসিরুদ্দিন তাঁকে সঙ্গীতে বিশেষ অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। এই কারণে কোন লোকই তাঁর চেয়ে অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে দাবী করতে পারত না। গায়নপদ্ধতিতে তিনি সুলতান হুসেন শর্কীর মত ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। চুটকলার পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং খিয়াল গানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ধ্রুপদ ও তারাণাও সৃষ্টি করতে পারতেন। সুলতান হুসেন শর্কী যেসব গানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন শেখ্ সেই সব রীতিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। পাটনায় ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে এর মৃত্যু হয়।

৩। মিয়াঁ ডালু ঢাঢ়ী

শেখ্ শের মহম্মদের মত তিনিও দেশী সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন। লেখক এঁকে আকবরাবাদে (আগ্রা) দেখেছিলেন। তিনি এর মত ধ্রুপদ আর কারুর কাছে শোনেন নি। এত সুন্দর উদার সঙ্গীত সে যুগের বড় বড় গায়কের মুখেও শোনা যেত না। আকবরাবাদে Pleurisy (জাতুল্ জম্ব্) রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪। লাল খাঁ কলাবন্ত

এঁর খেতাব ছিল গুণসমুদ্র খাঁ। ছেলেবেলা থেকে তানসেনের সঙ্গে থাকতেন। তানসেন এঁকে পছন্দ করতেন। তাঁর শিক্ষা হয়েছিল তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর তত্ত্বাবধানে। বিলাস খাঁর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিলাস খাঁর কাছে সঙ্গীতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং স্বয়ং বিলাস খাঁর শিষ্যত্ব অর্জন করেন। মোট কথা তিনি গাইয়েদের মধ্যে প্রধান পরিগণিত হন। আশী থেকে নব্বই বৎসরের মধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

৫। জগন্নাথ

এঁর খেতাব কবিরায়। মিয়াঁ তানসেনের পর সঙ্গীত রচনায় এত দক্ষতা আর কারুর ছিল না। ইনি বিধর্মী।[১] নটরাগে ধ্রুপদ গেয়ে ইনি মিয়াঁ তানসেনের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। তানসেন বলেছিলেন—এ যদি বেঁচে থাকে এবং এর এই সম্ভাবনা পরিণতি লাভ করে তাহলে সঙ্গীতে আমার পরে এ আমার মত হবে। ইনি প্রায় শত বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৬। মিসির্ মন্জান্ ঢাঢ়ী

মিয়াঁ বিলাস খাঁর শিষ্যদের অন্যতম। সুলতান শুজার সঙ্গে থাকতেন। বাংলায়

[১] "হিন্দু" শব্দটি প্রয়োগ না করে লেখক "দীন্ বেগানা" অর্থাৎ অপরিচিত বা অস্বীকৃত ধর্ম—এই কথাটি প্রয়োগ করেছেন।

এর সমকক্ষ কমই ছিলেন। প্রায় ছিয়াশী বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভাল গীতরচয়িতা ছিলেন।

৭। মীর সালে কাওয়াল

উচ্চশ্রেণীর গায়ক ছিলেন। দিল্লীতে বাস করতেন। প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে মারা যান। এ'র বিশেষ খ্যাতি ছিল।

৮। হুসেন্ খাঁ নওহার

গায়কদের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

৯। গুণসেন

খেতাব নায়ক আফজল্। নায়ক ভানুর নাতি। সংগীতে উত্তম অধিকার ছিল। গীত মন্দ গাইতেন না। মার্গসংগীতের তত্ত্বে সমসাময়িকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাট বৎসর বয়সে কাশ্মীরে মারা যান। রচনায় মন্দ ছিলেন না।

১০। শেখ্ কামাল

রশীদ্ মিয়াঁ ডালুর শিষ্য। ১০৭৬ হিজরীতে (১৬৬৬-গ্রন্থের সমাপ্তিকালে) ইনি জীবিত আছেন। সিপাহীর কাজ করেন। কিছুকাল লেখকের সঙ্গে কাটিয়েছেন। গায়কদের মধ্যে এ'র অনুসন্ধিৎসা আছে।

১১। বাখ্ৎ খাঁ

গুজরাটি কলাবন্ত। লেখক এ'কে দেখেছিলেন কিন্তু এ'র গান শোনেননি। তবে, বিশিষ্ট বন্ধুগণ এ'র বিশেষ প্রশংসা করতেন। ইনি বিলাস খাঁর শিষ্যদের অন্যতম। এ'র শিষ্যদের মধ্যে বাসন্তীনামক এক কলাবন্তের গান শুনেছি। এর গান উত্তম। এইসব দিক দিয়ে বিচার করে তুলনায় এ'র স্থান নির্ধারণ করতে পারি। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে এ'র মৃত্যু হয়।

১২। রঙ্গ খাঁ কলাবন্ত

উ'চুদরের গায়ক ছিলেন। শাজাহানের সময়ে গায়নসমাজের অল্প কয়েকজনের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয় এবং তাঁর নাম স্মরণ করা হয়। আশী থেকে নব্বই বৎসরের মধ্যে এ'র মৃত্যু হয়। ইনি বহু ফকীরের সঙ্গ করতেন এবং তাঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। ইনি আকবরের যুগের গায়কদের দেখেছিলেন।

১৩। খুশ্হাল্ খাঁ

লাল খাঁর পুত্র। পিতার খেতাব ইনিও অধিকার করেন। বর্তমান ১০৭৬ হিজরীতে (১৬৬৬) জীবিত আছে। কলাবন্তদের মধ্যে এ'র সমকক্ষ আর কেউ নেই। সম্রাটের কাছে তাঁর আদর ও প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল থাকবে।

১৪। ঘুলাম মহীউদ্দিন্

অভিজাত ঘরের সন্তান। সিপাহীবৃত্তি ছেড়ে দরবেশ হয়ে যান। বর্তমানে জীবিত আছেন। সংগীতরচনায় ভাল। বড়লোকরা আজকাল তাঁর প্রতি উদাসীন এবং তিনিও তাঁদের অপছন্দ করেন। বয়েৎ—তোমার ভয়ে তোমার দয়া ঘোষণা করেছি। তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি; এখন তোমার কথা ভাল করেই বলতে পারব।

১৫। সওয়াদ্ খাঁ ঢাঢ়ী

উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। ভাল সংগীতও রচনা করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ফতেপুর ঝুন্ঝুনওয়াতে। সেইখানেই তিনি মারা যান।

১৬। গুণ খাঁ কলাবন্ত

সুলতান শুজা শাজাহানের কাছে অনুরোধ করে এ'কে পেয়েছিলেন। বিবিধ সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা ছিল। বাংলায় তাঁর মৃত্যু হয়। মার্গসঙ্গীতে এর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

১৭। ওয়ালী ঢাঢ়ী

উত্তম গায়ক ছিলেন। আশী থেকে নব্বই বৎসরের মধ্যে আকবরাবাদে মারা যান।

১৮। সালিম্‌চান্দ্‌ ডাগর্‌

উত্তম গায়ক ছিলেন। নানারকম সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন।

১৯। শেখ্‌ সাদুল্লা লাহোরী

অনুসন্ধিৎসু এবং জ্ঞানসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ। মিষ্টি করে গাইতে পারেন। এখনও জীবিত আছেন। লেখকের সঙ্গে থেকেছেন। লোকের সঙ্গে না মিশে একা থাকেন। অধিক পরিমাণে আফিং সেবন করেন। বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। এই কারণে গানে দোষ এসে গেছে।

২০। মহম্মদ বাকী

জাতিতে মুঘল। উত্তম সঙ্গীত রচনা করেন। বর্তমানে জীবিত আছেন কিন্তু আফিং সেবন করে অন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ।

২১। পুজা

শেখ্‌ শের মহম্মদের ভাই। উত্তম গায়ক ছিলেন। তাঁর কিছু রচনা ভাল নয়। কিছু বিভিন্ন ধরনের রচনা আছে। ভগন্দর রোগ ছিল। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে রাজধানীতে মারা যান।

২২। বাজিদ্‌ খাঁ

নওছাওরী কলাবন্ত্‌। উত্তম গায়ক ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মারা যান।

২৩। রওরা কাওয়াল

উত্তম গায়ক। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মারা যান।

২৪। কবীর্‌ কাওয়াল

শেখ্‌ শের্‌ মহম্মদের শিষ্য। বর্তমানে জীবিত আছেন। সুন্দর গান করেন। বয়স হয়েছে। বিচারক হিসাবে সুনাম আছে।

২৫। মালতীরাম কলাবন্ত

বিধর্মী। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মৃত্যু হয়।

২৬। ধরমদাস কলাবন্ত

বিধর্মী। উত্তম গায়ক ছিলেন। পরিণত বয়সে মৃত্যু হয়। গায়ক সম্প্রদায়ে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। চাকরি ছেড়ে আকবরাবাদে সাধুর মত নিরালায় বাস করতেন। এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

২৭। রহীমদাদ ঢাঢ়ী

সুন্দর গীত রচনা করেন। মার্গসঙ্গীতে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে। বর্তমানে জীবিত তবে বার্ধক্যগ্রস্ত হয়েছেন।

২৮। কব্‌জুৎ ঢাঢ়ী (কবি খুবৎ ঢাঢ়ী?)

এ'র রচনাকে সম্মানপ্রদান করা হত। ফুলওয়ার-এ এ'র বাড়ি। আশী থেকে নব্বই-এর মধ্যে এ'র মৃত্যু হয়।

২৯। ঈদল সিং

রাজা রোজ আফ্‌জন্‌-এর পুত্র; রাজারাম সাহার পৌত্র। ইনি খড়্‌গপুরের[১] শাসন-কর্তা। এঁর খেতাব-দৌলত আফ্‌জন্‌। ইনি জ্ঞানে মীর খুস্‌রও বা সুলতান শর্কীর সমতুল্য। এখনও জীবিত আছেন। মাঝে মাঝে লেখককে গান শুনিয়ে খুশী করেন। এঁর তুলনা নেই। স্বাভাবিকভাবে বয়োপ্রাপ্ত হয়েছেন। এঁর রচনাগুলি মিষ্ট। খিয়াল এবং তরাণাও রচনা করেন।

৩০। মীর ইমাদ্‌

হিরাতের সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত। এঁর পিতা দেশ ছেড়ে এসেছিলেন। ভাল গান রচনা করতে পারেন। এখনও জীবিত আছেন।

৩১। হমীর সেন ও তাঁর পুত্র সবল সেন

কৃতী কলাবন্ত ছিলেন। এঁদের পিতৃপুরুষ আকবরের যুগের কলাবন্তদের দেখে-ছিলেন। হমীর প্রায় আশী বৎসর বয়সে মারা যান। ছেলের (সুবল) চল্লিশ বৎসর না পৌঁছোতেই দাঁত পড়ে যায় এবং সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩২। রসীদ্‌ খাঁ নওহার

সুজান্‌ খাঁর পৌত্র। দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন এবং এখনও জীবিত। গীত মন্দ গান না তবে ধ্রুপদেই পারদর্শী। জ্ঞানে মীর খুস্‌রও-এর তুল্য।

৩৩। সৈয়দ্‌ তবীব্‌ (তাখাল্লুস্‌ বা ছদ্মনাম-বুধ্‌)

ঝার্‌সা পরগনায় নিবাস। রাজধানীর গায়কদের মধ্যে এঁর বাণী (অর্থাৎ গানের উচ্চারণ) ভাল ছিল কিন্তু গলার আওয়াজ খোলা ছিল না। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে আকবরাবাদে এঁর বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

৩৪। সুন্দর ঘুন্‌

বিধর্মী। উত্তম সংগীত রচয়িতা। গায়কও মন্দ ছিলেন না। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে মারা যান।

বাদকগণের পরিচয় :

৩৫। সরস বীণ

বর্তমান ১০৭৬ (১৬৬৬) হিজরীতে জীবিত আছেন। সম্রাট এঁকে পছন্দ করেন। এঁর পিতামহ আকবরের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর পুত্রও এ যুগে তুলনাহীন। এঁর বয়স হয়েছে। মাঝে মাঝে ইনি লেখককে (বাজনা শুনিয়ে) খুশী করেন।

৩৬। বায়েজিদ্‌ রব্‌বাণী।

উঁচুদরের বাদক ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে সত্বর মৃত্যুবরণ করেন।

৩৭। সুখর সেন

বায়েজিদের প্রিয় শিষ্য। রবাব বাজান। এখনও জীবিত আছেন। সম্রাট তাঁর প্রতি অনুরক্ত। ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

৩৮। সালিহ্‌ রব্‌বাণী ঢাঢ়ী

[১] এই খড়্‌গপুর বিহারে অধিষ্ঠিত।

পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। মোলায়েম করে বাজাতে ইনি অদ্বিতীয়। লেখকের সঙ্গে ইনি ছিলেন। রাজধানীতে এ'র পসার বেশি। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে।

৩৯। মৃদঙ্গ রায়

এটি খেতাব। নাম কৃপারাী। বিধর্মী। সম্রাট তাঁর প্রতি অনুরক্ত। মার্গসঙ্গীতে এ'র জ্ঞান আছে। এখনও জীবিত। সমসাময়িক বাদকদের মধ্যে ক্ষমতাসম্পন্ন।

৪০। ফিরোজ ঢাঢ়ী

পাখাওয়াজী। এ'র বাদন নিখুঁত ছিল। লাহোরের অধিবাসী। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে এ'র মৃত্যু হয়।

৪১। তাহির্ দফ্নওয়াজ্ ঢাঢ়ী

এর সমকক্ষ আর কারুর বাজনা শোনা যায়নি। সত্তর থেকে আশীর মধ্যে মারা যান।

৪২। ইলাহ্দাদ্ ঢাঢ়ী

সারেঙ্গী বাজাতেন। আডমতর্ড্ থেকে এসেছিলেন এটি দো-আবাহ্ জালন্ধরের অন্তর্বর্তী গ্রাম। এর সমকক্ষ আর কাউকে শোনা যায় না। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মৃত্যু হয়।

৪৩। রসবীণ

এটি খেতাব। নাম মুহম্মদ। মোলায়েম করে বাজনা বাজাতেন। এখনো জীবিত আছেন।

৪৪। শউকী

তম্বুর[১] বাদক। অতুলনীয় ছিলেন। এ'র সমকক্ষ আর কাউকে শোনা যায়নি। হিন্দী এবং ফার্সী দুই ধরণেই বাজাতে পারতেন। কাশ্মীরে মারা যান।

৪৫। তারাচাঁদ কলাবন্ত

শউকীর প্রিয়শিষ্যদের অন্যতম। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে এ'র মৃত্যু হয়।

৪৬। আবু লুফা

ততার খাঁ সফ্রাচীর পুত্র। ভাল তম্বুর বাজাতে পারতেন। ষাট বৎসরে পেঁাছেছেন। রাজধানীতে এ'র যথেষ্ট পসার ছিল।

৪৭। সুরদাস

পাখাওয়াজী। বিধর্মী। আকবরের যুগের ব্যক্তি। মিয়াঁ তানসেনের সঙ্গে বাজিয়েছিলেন (বা মিয়াঁ তানসেন নওয়াখ্তা)। সম্প্রতি লেখক তাঁকে দেখেছিলেন। বহুদিন বেঁচে থাকার পর—তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বাজনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় শত বৎসরে পেঁাছেছিলেন।

শাজাহানের রাজত্বে একজন পুরুষ সুর্ণা (শানাই) বাদক ছিলেন। তিনি জোয়ান অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেন। লেখবার সময় তাঁর নাম মনে পড়ছে না। আর একজন অতুলনীয় সুর্ণাবাদক তাঁর পুত্রের সঙ্গে শাজাহানের সময়ে ছিলেন তাঁর নামটিও আমার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। আরও বাদক ও গায়ক ছিলেন যাঁদের ফকীর (লেখক) দেখেননি এবং তাঁরাও সম্রাট শাজাহানের সাক্ষাতে আসেননি। যাঁরা আমার বাদ্শার কাছে পেঁাছেছেন অথচ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের সম্বন্ধে জানতেন না এবং লেখকের সঙ্গেও সংযোগ

---

১ এটি আমাদের তানপুরা নয়, একটি পারসীক বাদ্য। আগে এর নাম ছিল 'দুম্বা-বরাহ্'।

ঘটেনি তাঁদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়নি।

রচনা যাতে স্ফীত না হয় সেই কারণে তাল সম্বন্ধে লেখা হয়নি। যাঁরা—এ সম্বন্ধে জানতে চান তাঁরা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন।

১০৭১ হিজরীতে লেখক যখন পবিত্র জন্মভূমিতে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন মন্ত্রী-পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁর সম্বন্ধে অহিতকর আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন যাতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তাঁকে শত্রু বলে ধারণা হয়। বাদশা বিরক্ত হয়ে লেখকের প্রতি বিরুদ্ধভাবে রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। লেখক নির্জনবাস অবলম্বন করলেন। কিছুকাল পরে তিনি বাদশার আনুকূল্য প্রার্থনা করলেন কিন্তু হুকুম মিলল না। চাকুরীহীন অবস্থায় তিনি কষ্টে পড়লেন। লেখা ছেড়ে সিপাহীগিরি করতে হল। তিনি সরহিন্দ-এ নির্জনবাস করতে লাগলেন। তখন তিনি এই কবিতাটি স্মরণ করলেন। নজম্—খিজির পথ দেখালেও সে পথে যেও না; নিজের বন্ধুর প্রদর্শিত পথে চল এবং কিছুমাত্র নালিশ কোরো না। মাথা ঘুরতে ঘুরতে জীবনই চলে যায় কিন্তু চাকার কল তার পথ থেকে সরে না।

সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়েই এই নিবন্ধ রচনার শুরু হল। সেই সব লেখা পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। কিছু নতুন বস্তুও লেখা হল। কিছু বাধা-বিপত্তিও ঘটল।

১০৭৩ হিজরীতে ফিরে যাবার হুকুম মিলল। লেখক তাড়াতাড়ি সম্রাটের[১] কাছে উপস্থিত হলেন। এই রচনা আর অগ্রসর হল না। ইতিমধ্যে সম্রাটের পতাকা কাশ্মীরের গুল্‌গস্তের[২] দিকে অগ্রসর হল। এটি একটি অতুলনীয় ঘটনা। এই সামান্য ভৃত্য এই বাহিনীর সঙ্গে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে বিজয়াভিযানের শেষ পর্যন্ত ছিল। হুকুম হল এই অভিযানকারিদের মধ্যে কয়েকজন প্রয়োজনের জন্য থাকবে এবং সম্রাটের সঙ্গে আরও কম লোক থাকবে। সম্রাটের কার্যনির্বাহের জন্য কেবলমাত্র লেখকের মত পরিচিতি লোকেরাই রইলেন এবং বাহিনীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দিবারাত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন। কাশ্মীরের রাস্তা-ঘাট এবং প্রস্তরময় স্থান সম্বন্ধে এইরকম বলা হয়:—বয়েৎ - চুলের চেয়ে সরু হচ্ছে এর রাস্তা। পথিকের কাছে তা কেশের মতই প্রতীয়মান হয়।

(রাহে বারীক্‌তর্ আজ্ মুয়ে চুনী। বরাইয়ে রাহে রওয়ান চুঁ মুয়ে বীণী)।

লেখককে বাধ্য হয়েই লাহোর ছেড়ে আগে থেকে কাশ্মীরে আসতে হল। প্রধানদের পতাকাসমূহ যখন অগ্রবর্তী দুটি আবাসিক শহরে (মন্‌জিল্-ই-শহর্) পেঁছাল তখন লেখক তাঁদের যথোচিত সৎকার এবং সম্মান প্রদর্শন করলেন। লেখক রীতি অনুসারে সুসজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। গণৎকারসমূহের কাছ থেকে পরের দিন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার শুভ মুহূর্তটি জেনে নিলেন। সেই শুভলগ্নে এই বিশ্বস্ত ভৃত্য সমাগত প্রভুদের প্রণতি জ্ঞাপন করল। পরের দিন কাশ্মীরের পথে সাধারণ ও বিশেষদের সঙ্গে সম্রাটের দর্শন (ঘুসুলখানা)[৩] কম হয়েছিল। বিজয়ী সৈন্যবাহিনী উপযুক্তভাবে শহরে প্রবেশ করল। সম্রাট সৈনিকদের সমাবেশে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রশংসায় এই বয়েৎটি উচ্চারণ করলেন—দগ্ধপ্রাণীও কাশ্মীর এলে প্রাণ পায়। যে পাখি কাবাবে রয়েছে সেও পাখা মেলে উড়ে যায়। (হর্ সুখ্‌তা জানী কে ব্-কাশ্মীর্ দরূ আয়েদ্। কে মুর্ঘ্ ও কাবাব্ অস্ত্ বা বাল্ ও পরায়েদ্॥)

১ আওরংজীব ২ গিলগিট্

৩ ঘুসুলখানা অর্থে স্নানাগার বোঝায় কিন্তু মুঘল-যুগের ইতিহাসে এটি সম্রাটের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শীতকালে যাতে হিন্দুস্তানে পৌঁছানো যায় এই রকম হুকুম দেওয়া হল। এই দীন ব্যক্তিকে এই স্থানের সুবেদার নিযুক্ত করা হল। আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল যাতে হুজুরের কৃপাদৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকি।

বাহিনীর প্রতিটি দলের তাঁবু ছিল এবং তাতে প্রার্থনাদি অনুষ্ঠিত হত। বায়েজিদ্ ও জুনায়িদ্ও আমার বাদ্শার সেবা করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করতেন। সম্রাট ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকতেন। তিনি আটবার প্রার্থনা সম্পাদন করতেন। বোধহয় এমন একটি ঘণ্টাও যেত না যে তিনি প্রার্থনার আবৃত্তি থেকে নিরস্ত থাকতেন। তিনি সব সময় প্রার্থনা ও ধর্মে নিযুক্ত থাকতেন।

বয়েৎ—তাঁর মুকুটের ওপর বিস্তৃত ছিল অনেকগুলি হাত। তাঁর সিংহাসন ছিল আইনে বাঁধা।

(বর্ তাজ্ ফিশান্দা আস্তিন্হা। বর্ তখ্ৎ কশীদা আজ্ আইন্হা॥)

ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি দেশের অবস্থার খবর নিয়ে থাকেন। তাঁর হাত কাজে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর প্রাণ বন্ধুদের প্রতি আসক্ত থাকে (দস্ত্ ব্-কার্ ও দিল্ বা ইয়ার্ অস্ত্)। রাজ্যের দায়িত্ব ও কর্তব্যাদি সত্ত্বেও বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন থেকেই কুরান প্রশংসনীয় ভাবে মুখস্থ করেন। তাঁর অভিষেকের (জলুস্) বৎসর থেকে ১০৭৬ হিজরী (১৬৬৬) পর্যন্ত এসেছে। সম্রাট যখন ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে পৌঁছান তখনই কুরাণ সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্মৃতিগত হয়েছে। পরবর্তীকালে সম্রাট এটি বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। এই সময় কেহই এমন একজন ব্যক্তি খুঁজে পাবেন না যিনি একাধারে সম্ভ্রান্তবংশীয় সম্রাট হয়েও নিজেকে অন্তরালে রাখেন, অধর্মাচরণ থেকে বিরত থাকেন, মুসলমানত্ব বজায় রাখেন ও ধর্মপালন করেন। আমীরদের প্রতি তিনি অমায়িক ব্যবহার করেন।

বিদায়কালে সম্রাট অধীনস্থদের বিশেষ পরিচ্ছদ, অশ্ব, ও তদীয় সাজসরঞ্জাম এবং হস্তী উপহার দিলেন। সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণপূর্বক কাতরচিত্তে অশ্রুপ্রবাহিত নেত্রে কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করে উক্ত দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হলাম। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদের শান্তিপূর্ণ কাজ দেওয়া হল। আইন অনুসারে কঠিন কাজগুলি বণ্টন করা হল।

এর মধ্যে অন্যসব স্থানও বাদশার শাসনে আনবার সিদ্ধান্ত করা হল। সেই সব স্থানে আলেক্জান্দারও যেতে সমর্থ হননি। সৈন্যগণ কয়েকটি স্থান মই লাগিয়ে পার হল; কয়েক স্থান পায়ে হেঁটে এবং উঁচু দড়ির সাহায্যে অতিক্রম করে তিব্বতে উপস্থিত হল। প্রতিদিন যুদ্ধ করে তারা একেবারে সরজমীনে এসে পৌঁছল। নদীর ঘূর্ণীজলও তাদের ধ্বংস করতে পারল না। ধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপন ছাড়া তাদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবানের ইচ্ছায় সেই দেশ জয় করা হল। স্ত্রীপুরুষ মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। সিন্ধুনদের ওপর (বর্ আব্-ই-নীলাব্) বিজয়ী সৈন্যদের তাঁবুর উচ্চ চূড়াগুলি ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল যেন সেই দিক থেকে জগতের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এর তুলনা দেখা যায় নি। সেই নদী চওড়ায় দুই বন্দুকের গুলির পরিধির[১] মত এবং তা সর্বত্রই সুগভীর। এর মধ্যে মূল্যবান প্রস্তরের খনি পাওয়া যায়। এইখানে কাফিরদের গ্রাম ছিল। সৈন্যেরা এইস্থানে তাদের বিজয়ী অভিযান সমাপ্ত করতে

[১] বন্দুকের গুলি যতটা যায় ততটা দূরত্বের মাপ হিসাবে ব্যবহৃত হত।

চাইল। ভগবানের কৃপায় সৈন্যরা দাঁড়ির সাহায্যে নদী অতিক্রম করল। ওই সকল স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হল। পরাজিত লোকসমূহকে সম্মানিত পোশাক প্রদান করা হল। তারা সেই পোশাক পরে পবিত্র কলমা পাঠ করল। সকলে আবার একত্র হয়ে আগের মত জমা হল। প্রত্যাবর্তনের পথে কোহিয়ান্, ছকার্, দুন্দু, তিজাল্, কাশিয়াল, পুন্চ্ ও ডুমিয়াল প্রভৃতির মত দানবাকৃতি জাতিদের পরাজিত করল। তারা সকলে বাদশাহের শাসনকে স্বীকার করল। বন্দুকধারী বাহিনীকে একত্র করা হল। ছোট তিব্বতের জমীদার মুরাদ্ খাঁ,—তস্খীর, গুল্গস্ত ও বর্শালের পথ দেখিয়ে এলেন। মুরাদ্ খাঁ দ্রুত-গতিতে এইসব শত্রুবেষ্টিত অঞ্চলে এসে তাদের অধম এবং অকর্মণ্য অবস্থা থেকে পবিত্র করে তুললেন। তিনি এইসব স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। বর্শালের হাকিম পালিয়ে গেলেন এবং কাশঘর্-এর রক্ষী আশ্রয় ভীক্ষা করলেন। এই দুটি দেশ এবং তস্খীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

শীতের দুই মাস বন্দোবস্তের জন্য কাশ্মীরের সুবেদার পুন্চ্-এ চলে এলেন। এইখান থেকে রাস্তাঘাট ভাল ছিল। বৃষ্টি এবং বরফের মধ্য দিয়ে কষ্টের সঙ্গে পরিচালিত অশ্বে (কুতল্) আরোহণ করে, সৌভাগ্যক্রমে পুলের ওপর দিয়ে পার হয়ে রাজধানীতে পেঁছে সকলে উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পথের সীমান্তে এসে বরফ এবং বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।

অবসর গ্রহণের কালে বিশেষ অশ্ব ও সোনার সাজসরঞ্জাম এবং বিশেষ পরিচ্ছদ (খেলাৎ) উপহার পাওয়া গেল। কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করে সবাইকার খুব আনন্দ হল কেননা তখন বসন্ত সমাগত হয়েছে। এই বয়েৎটি কাশ্মীর ব্যতীত আর কোথাও প্রযোজ্য নয়।

আগর্ ফির্দৌস্ বর্ রুয়ে জমীন্ অস্ত্।
হমীন্ অস্ত্ ও হমীন্ অস্ত্ হমীন্ অস্ত্॥

মাটির ওপরে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এইখানে, সে এইখানে, সে এইখানে।

দেশের অবস্থা বুঝে নিতে, এলাকা ও সীমানা নির্দেশের বন্দোবস্ত করতে দু মাস কেটে গেল। এই এলাকার দিকে চেয়েই কি লেখা হয়েছিল—

বয়েৎ—কৌতুকে ওরা সবাই বেহুঁস্ হয়ে চলেছে। আনন্দের বার্তা তাদের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দিয়েছে।

"নকে আজ্ জউক্ চুনান্ রফ্তার্ হোশ্।
কে কশান্দশ্ মঝ্হা দোশ্ ব্-দোশ্॥"

একখণ্ড জমীতে কত রকমের, কত রঙের ফুল ফোটে। তাদের গন্ধে স্থানটি আমোদিত হয়। এমন স্থানের পরিচয় কোনও লোকেরই জানা নেই, কেউ দেখেও নি। কত লোক আরব, ইরাক্, আরবীয় দেশ ব্যতীত অপর দেশ, খোরাসান, মাউরুন্নাহার্ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এখানে এসে বন্ধুভাবে বাস করেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এমন পুষ্পিত স্থান তাঁরা দেখেননি এবং এরকম যে আছে তাও শোনেননি। এই বিশ্বাসেই তাঁরা বলেছেন যে স্বর্গ যদি আসমানে থাকে তবে সে এই স্থানেরই ঊর্ধ্বে অবস্থিত; আর যদি ভূমির ওপরে থাকে তবে সে এইখানেই, আর যদি মাটির নীচে থাকে তবে সে এই মাটিরই নীচে।

বয়েৎ—বক্তার কথা ছিল রঙীন। আমার হাতে ছিল হেনার কলম।

আমার কলম সার্থক হবে যদি তা এই সৌন্দর্যের কিছুটাও ভাল করে প্রকাশ করতে পারে। যে কোহিস্তান্ পর্বতের উত্তুঙ্গতা এবং বিরাটত্বে মানুষের পা দুটো পেঁছোতে পারে না লেখনী তার সৌন্দর্য বর্ণনায় সক্ষম হয়। সেই স্থানের ঝর্ণা (চশ্মায়ে সার্) অমৃতধারা (আব্-ই-হৈওয়ান্) বর্ষণ করে। কথিত আছে সেকেন্দার (আলেক্জান্দার্) স্বয়ং এই ঝর্ণায় পেঁছোতে চেষ্টা করেও সমর্থ হননি।

এবার আবার মূলে বক্তব্যবিষয়ে ফিরে আসা যাক্। সর্হিন্দ্-এ থাকতে যা লেখা হয়েছিল তা লিখিতই ছিল। বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা কৌতুক হিসাবে সঙ্গীতচর্চা করে থাকেন তাঁদের কেউ কেউ এই লেখাটি নিয়ে নিলেন। কেউ কেউ বললেন লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে। কেউ লেখাটি নকল করে নিলেন। রচনা সম্পূর্ণ তথ্যসম্বলিত হয়ে সমাপ্ত হবার পূর্বেই এইসব ঘটল। ফকীর (লেখক) এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করছেন কেননা দু-তিন সাল যাবৎ এই নিবন্ধটি নানা জায়গায় প্রায়ই দেখা গেছে। প্রয়োজনবোধে এবং ফুর্সতের অভাবে ধৈর্যহীন ব্যক্তিগণ এই আস্থাতেই এটিকে অবলম্বন করেছেন।

নজ্ম্—আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, মন বেদনায় পূর্ণ, মাথায় বহন করছি প্রেম। যারা প্রেমাসক্ত তারা অধৈর্যতাকে পরিহার করতে পারে না। প্রেমে পূর্ণ মজ্নূ হুন্দুহিতা লায়লীকে গ্রহণ করতে ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১০৭৬ (১৬৬৬) হিজরী সনের শীতকালে এই রচনা সমাপ্ত হল। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাদ্শা খুৎবা পড়ে এই নিবন্ধের নাম ঘোষণা করছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না এই রচনা সম্রাট আলম্গীর্ আলম্বখ্শের কাছে পেঁছোচ্ছে এবং তিনি ভগবৎকৃপায় এটি গ্রহণ-যোগ্য বিবেচিত করছেন এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে করুণাবারী নিসৃত হচ্ছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বর্গীয় সভার মত সুবৃহৎ মজলিসে এটি গৃহীত হচ্ছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না দীন'দুনিয়ার বাদ্শা এটিকে উত্তম রচনা বলে স্বীকার করছেন; ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের কাছে এটি অসমাপ্ত বলেই গণ্য করা হবে এবং এটিকে দূরে রাখা হবে। যে সব বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কাছে এটি পড়বে তাঁরাও যেন এটি সমাপ্ত হয়েছে বলে মন্জুর্ না করেন।[১]

কাশ্মীরে হিন্দুস্তানের সঙ্গীত আদৌ প্রচলিত নেই। মাঝে মাঝে চতুর বাদকগণ ফার্সী দেশোৎপন্ন সঙ্গীত বাজিয়ে থাকেন। ফকীর (লেখক) ফার্সী সঙ্গীত কিছুই বোঝেন না। ফার্সী মোকামসমূহের যেগুলি হিন্দী রাগসমূহের সদৃশ ছিল সেগুলির নাম অভিজ্ঞ গায়ক ও বাদকদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছেন। এ পর্যন্ত একাদশ প্রকার গীত জানা গেছে যেগুলি হিন্দী গীতের অনুরূপ। এইগুলি লিপিবন্ধ করা হল। এর পরে আর যা আছে সেগুলি অনুসন্ধান করে জেনে নিয়ে ভগবৎকৃপায় সম্ভব হলে লেখবার ইচ্ছা রইল।

যেসব হিন্দী গীত ফার্সী ধরনের অনুরূপ সেগুলির তালিকা দেওয়া হল :

১। ঘজাল্ এবং খট্ একই রকম।

২। মুখালিফ্ রামকলীর অনুরূপ।

৩। নাইরীজ্ কল্যাণের কাছাকাছি।

৪। আশীরান্ এবং বড়হংস খুব কাছাকাছি।

---

[১] বস্তুতঃ এই গ্রন্থটি আওরংজীব প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ কেননা এই সময় থেকে তিনি সঙ্গীতকে পরিহার করতে থাকেন এবং কিছুকালের মধ্যে সঙ্গীতকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন।

৫। দোগাহ্ এবং শুধ্ তোড়ী পরস্পরের কাছাকাছি।

৬। নওয়া এবং সারঙ্গ পরস্পরের খুব নিকট।

৭। রাস্ত্ নাট-এর কাছাকাছি।

৮। আর্বান ও পুরিয়া ধনাশ্রী পরস্পরের বিশেষ কাছাকাছি।

৯। মুজাদাৎ ও বর্উয়াহ্-এর অন্তর্গত গীত গাওয়া হয়ে থাকে। বর্তমান ভাষায় একে বরোয়া (বারোঁয়া) বলা হয়। একে কেহ কেহ ঠুম্রী বলেন।

"বিল্ফেল্ জবান্-ই-রোজ্গার্ বেহ্ বরোয়া ও বাজে ঠুম্রী গুয়েন্দ্।"

১০। শাহ্নাজ্ শ্রীরাগের অনুরূপ।

১১। বর্তমানে মঘ্লুব্-এর মত একরকম সুর পাঞ্জাবে গাওয়া হয়। এটি বসন্ত্-এর নিকটবর্তী।

ইরাক্, খোরাসান্, মাওরুন্নাহার্ এবং হিন্দুস্তান থেকে যেসব সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ গায়ক-বাদক জমা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জুল্ফিকার হান্, করাহ্ মান্, লুপুর, জুল্ফিকার খাঁ, শাহ্ আব্বাস্ সফাবী—এঁদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কেউ আমার চোখে পড়েনি।

এই নিবন্ধ উপলক্ষ্যে লেখক পাঠকবর্গের কাছে এই আশা পোষণ করেন যে চিরজীবন এই রচনা পাঠ করে তাঁরা আনন্দিত হবেন। এই রচনা ফাতিহার[১] মত তাঁদের মনে থাকবে।

বয়েৎ—একটি কথাও অগোপন রাখার মত উত্তম কাজ আর নেই। বিদ্যা সম্পর্কে বিস্মৃত না ঘটার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।

"এক সুখুন্ নিস্ত্ কে খামোশী
আজ্ আন্ বেহ্তর্ নিস্ত্।
নিস্ত্ এল্ম্ কে ফরামোশী
আজ্ আন্ বেহ্তর্ নিস্ত্॥"

মূল ফার্সী থেকে অনুবাদ : **রাজ্যেশ্বর মিত্র**

[১] কুরাণের প্রথম অধ্যায়।

স্বর্গভ্রষ্ট

অমিয়ভূষণ মজুমদার

ভাড়াটে বাড়ি হিসাবে এ পাড়ায় প্রায় একক এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া দেয়ার জন্যই তৈরি হয় নি। পেন্সনপ্রাপ্ত কোন জেলা জজ শহরের সে সময়ের আধুনিকতম অঞ্চলে শেষজীবন প্রাগ্রসর আবহাওয়ায় কাটানোর জন্য এই বাড়িটা তুলেছিলো। দেয়ালের গেরুয়া রং বিবর্ণতার পলি ফেলে, ছোট লনটার উপরে ডাল-সার দুটো অ্যাকেশিয়ার চারাকে অবশিষ্ট রেখে তার পরে সময় ব'য়ে গিয়েছে, আধুনিকতাকে আরও প্রায় এক মাইল দক্ষিণে সরিয়ে দিয়ে এবং সেই জজের আয়ুর সবকটি বালুকণাকে গ্রাস করে। জজের বাতগ্রস্তা এনেমিক বিধবা বাড়ির নিচতলার দুখানা ঘর ভাড়া দিয়েছে। ঘর দুখানার ভিতরের দেয়ালের ডিস্টেম্পারের খসে পড়ছে। কোন এক সময়ের ভাঁড়ার ঘরটাই এখন ফ্ল্যাটের রান্নাঘর হয়েছে—ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার অব্যবস্থায় কয়লা জ্বালানোর পরে সে ধোঁয়া ফ্ল্যাটটার ঘর দুখানাতে ঢুকে পড়ে অনেকক্ষণ—দেয়ালের গায়ে এবং জজের আমলের ছিটের ঢাকনা দেয়া বার্ণিশ কালিয়ে আসা একটু বা নড়বড়ে সোপা আলমারি আলনার ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকে। বাথরুমটা তৈরি হয়েছে উপরে যাওয়ার সিঁড়ির নিচে রান্নাঘর দেয়াল লাগোয়া। একেবারে ছাদ ঘেষে যে একমাত্র জানলা তা দিয়ে আলো আসে না ফলে অষ্টপ্রহর ঘোলাটে বাল্বটাকে জেবলে রাখতে হয়। ফ্ল্যাটটার ভাড়া একশ টাকা।

নিজেদের উপার্জনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভাড়া দিয়ে এই ফ্ল্যাটে আপাতত সাঁপুই দম্পতী বাস করছে। বলীয়ান শরিকের নাম দ্বিজেন, আর কোমলতার বাড়ির নাম বেলা কিন্তু প্রকাশ্যে সে মৃণালিনী। দ্বিজেন এক মার্চেন্ট অফিসের কাস্টমস্ দপ্তরে কাজ করে। অর্থাৎ কাস্টমসের কর্মচারীদের কাছে অফিসের পক্ষ থেকে তদ্বিরতদারক করে থাকে। কালো গলাবন্ধ কোট এবং ইংলিশ প্যান্ট পরে সে অফিসে যায়। সরু লতানো গোঁফ, মাথার সামনে চুল উঠে গিয়ে একটা ছোট টাক দেখা দিচ্ছে। এছাড়া তার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আর কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন যদি না তার হলুদে গায়ের রঙের কথা বলতে হয়। এই রঙের সঙ্গে স্বাস্থ্যহীনতা জড়িত কিন্তু তার কতটুকু রক্তশূন্যতা এবং কতটুকু খোলা আকাশ বঞ্চিত হওয়ার ফল তা বলা শক্ত। কারণ এই শহরে সাঁপুইদের এখন তৃতীয় পুরুষ চলেছে।

দ্বিজেন নিজেও একথা বলে থাকে। তার পিতামহ এই শহরে ছাত্রাবস্থায় এসেছিলো এবং সে সময়ের জেনারেল এসেম্বি্ল কলেজে পড়েছিলো। তার পিতা এবং সে নিজে স্কটিশ-চার্চ কলেজে পড়েছে ঐতিহ্যের আকর্ষণে। এই ঐতিহ্যরক্ষা দ্বিজেনের গর্বের বিষয়। তেমন এটাও তাদের পারিবারিক গর্ব যে তাদের পরিবারের লোকেরা এই শহরের বাইরে এই তিন-পুরুষে কারো সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করে নি। দ্বিজেনের বাবা সারাজীবন স্কট লেনের ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে গিয়েছে। তার মামারবাড়ি অখিল মিস্ত্রি লেনে। দ্বিজেনের শৈশবস্মৃতির মধ্যে একটা স্মৃতি আছে যা বিশ্লেষণ করে এখন সে বুঝতে পারে তার বাবা অন্তত একটি বিষয়ে অযৌক্তিক রকমে রোমান্টিক ছিলো। মাঝে মাঝে বাড়ি তৈরির কথা বলতো সে এবং নজির দেখাতো দ্বিজেনের পিতামহ কাশিপুরে একটা বাড়ি তুলেছিলো একদা। দ্বিজেন এখন বাড়ি তৈরি করার কোন সংকল্প পোষণ করে না কিন্তু

তার পিতামহের সেই বর্তমানে অদৃশ্য বাড়িটাকে তার পারিবারিক আভিজাত্যের নিদর্শন মনে করে থাকে। তার কারণ এই যে সেই স্কট লেনের ভাড়াবাড়ির দুখানা ঘরে মানুষ হতে হতে সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং সুপরিসর একটা কাল্পনিক বাড়ির কথা তার বাবাকে সে কয়েকবার বলতে শুনেছে। সে যাই হোক, স্কট লেন অখিল মিস্ত্রি লেন এবং হ্যারিসন রোডকে দ্বিজেনের বাস্তবজীবনের শিক্ষাক্ষেত্র বলা যেতে পারে—কারণ হ্যারিসন রোড পেরিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে যে শিক্ষা সে পেয়েছে তা বাস্তবজীবনে তাকে কোন সাহায্য করে না। এখন, এই স্কটলেন-অখিলমিস্ত্রিলেন প্রভৃতি স্থানের একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন এই স্থানগুলির বাতাস কিম্বা গলির সঙ্গে সমান্তরাল এবং সমায়তনের আকাশের। বাইরে থেকে কেউ গেলে নিশ্বাস নেয়ার ব্যাপারটা তার চিন্তার বিষয় হতে পারে, কিন্তু দ্বিজেনদের তা হয় না। অবশ্য সে সংস্কৃতির মধ্যে যে একরকমের সংকীর্ণতা আছে তা দ্বিজেন অন্যের কাছে স্বীকার না করলেও নিজের কাছে করে। যথা দ্বিজেন তার বাবার মতো 'পোলপার' বলতে পৃথিবীর পশ্চিম সীমান্ত বোঝে না। সে বর্ধমানে একবার গিয়েছিলো এবং সে শহরের লোক যে এস্কিমো নয় সে বিষয়ে তার চাক্ষুষ জ্ঞান আছে।

কিন্তু তাই বলে তাদের অনগ্রসরতাকেও উল্লেখ করতে সে ভুল করে না। খবরকাগজ নিয়ে তারা যে রকম বাড়াবাড়ি করে সেটা আশ্চর্য বোধ হয়েছিলো দ্বিজেনের কাছে। সে সময়কার একজন রাজনৈতিক নেতার একটা ভাষণ নিয়েই তাদের উত্তেজনা। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করেছিলো তাকে—আজকের কাগজটা দেখেছেন। দ্বিজেন বলেছিলো,—না, মশাই, নষ্ট করার অত সময় কোথায়? সে মনে মনে হেসেছিলো ডালহৌসী স্কোয়ারে যাওয়ার ট্রামরাস্তার ধারে যা রোজ ঘটছে তাই নিয়েই কাগজ। বলতে গেলে চোখের সম্মুখেই ঘটছে তার। বস্তুত অফিস এবং বাজার ছাড়া অন্য কোন বিষয়কেই সে আলোচনার যোগ্য মনে করে না। তার সুনির্দিষ্ট ধারণা এই বাংলাদেশ যেমন পৃথিবীর কেন্দ্র, তেমন বাংলাদেশ বলতে এই শহরকেই বোঝায়। যেহেতু এই শহরের সব কিছু তার চোখের সম্মুখে ঘটছে এবং অফিসের কাজ করতে করতে পৃথিবীর সব খবর নিশ্চয়ই জানা হয়ে যায় ট্রামে আসতে যেতে যদি কোন খবর নেহাৎ অজানাই থাকে। সুতরাং কারো লেখা বা কথা থেকে জানার কিই বা আছে? সুতরাং পিতামহ কালোরঙের চাপকানের উপরে পাকানো উড়নি জড়িয়ে যেমন মার্চেন্ট অফিসে যেতো পিতা কালারঙের গলাবন্ধকোট এবং ধুতি পরে যেমন মার্চেন্ট অফিসে যেতো দ্বিজেন সাঁপুইও তেমনি কালোরঙের গলাবন্ধকোট ও ইংলিশ প্যান্ট পরে মার্চেন্ট অফিসে যায়। যেমন পর পর তারা জেনারেল এসেমব্লি ও স্কটিশচার্চ কলেজে পড়েছে এবং এভাবেই তার জীবনের ঐতিহ্য সে নতুনতর কোন সাঁপুই-এর হাতে সঁপে দিয়ে একদিন বিদায় নিতে পারতো যদি নতুনতর কোন সাঁপুই থাকতো।

দ্বিজেন সাঁপুই নিঃসন্তান। তার এই পনরো বৎসরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী বেলা একবারও অন্তঃসত্ত্বা হয় নি। সেটা বরং তাদের পক্ষে ভালোই হয়েছে। কারণ বেলাও চাকরি করে।

বেলার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ হলো। পনরো বছর আগে তখনকার অপরিচিতা বেলা ঠিক কি রকম দেখাতো তা এখন দ্বিজেন মনে করতে পারে না। ন্যায়শাস্ত্রকে অবলম্বন করলে বলা যায় অবিবাহিত বেলার ত্বকে তখনও শেষ যৌবনের ঔজ্জ্বল্য কিছু অবশিষ্ট ছিলো। তার ফলে এখনকার তুলনায় তার শরীরটাকে আঁটশাট মনে হতো, রংটাও এমন বাদামী বোধ হতো না। ট্রামেই আলাপ, তারপর একই সিটে পাশাপাশি বসা, তারপরে

বিবাহ। এই পাশাপাশি বসার জন্যই পরিচয়ের এক পর্যায়ে যেমন দ্বিজেন তেমন বেলা বেশ খানিকটা পথ হে'টে এসে বউবাজার ডিপোতে ট্রামে উঠতো। একেই প্রেম বলা যেতে পারে দ্বিজেনদের জীবনে।

প্রেম নিশ্চয়ই নতুবা দ্বিজেন এমন দুঃসাহসী হতে পারতো না। সে পরিচয়ের মাঝামাঝি সময়েই জানতে পেরেছিলো এই শহরের স্থায়ী আভিজাত্যের সঙ্গে বেলাদের কোন সম্বন্ধ নেই। পদ্মানদীর ওপারের এক জেলা থেকে কিছুদিন হলো তারা এসেছে এই শহরে।

এখনও তারা বেলা দশটাতেই ট্রাম ধরে। একই ট্রাম নয়। বেলা কিছুদিনের জন্য চাকরি ছেড়েছিলো বিয়ের পরে। এখন আবার উত্তর কোলকাতায় এক প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করে। দ্বিজেন পানের চৌকো জার্মান সিলভারের কৌটা নিয়ে ট্রামে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই উলের থলে হাতে ঝুলিয়ে কাঁটা চালাতে চালাতে বেলাও ট্রাম ধরতে এগিয়ে যায়।

দুজনের চাকরির টাকায় এই ফ্ল্যাটভাড়া নিয়েছে তারা। দুজনের উপার্জনের টাকাতে সংসারও মোটামুটি ভালোই চলছিলো।

কিন্তু কিছুদিন থেকে কিছু একটা ঘটছে। একটা অসামঞ্জস্য যা ঠিক কোন কোন বিষয়কে অবলম্বন করে আছে বলা না গেলেও এই ফ্ল্যাটে এলেই অনুভব করা যায়। এই অসামঞ্জস্য বোধ থেকেই যেন অসন্তোষ এবং অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছে। কিম্বা অন্য কথায় অসামঞ্জস্য বোধটার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তাদের মনে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে তারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। তাদের দৈনন্দিন কার্যসূচীর কোন অদলবদল হয় নি। দ্বিজেন সাঁপুই অফিস থেকে এসে যেমন সোফায় কাৎ হয়ে পড়ে থাকতো এখনও তেমনই থাকে। বেলা অফিস থেকে এসে চা জলখাবারের পর যেমন উলকাঁটা হাতে এবং চোখের সম্মুখে নভেল রেখে বসতো এখনও তাই বসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসন্তোষটাকে অস্বীকার করা যায় না। ইতিমধ্যে একদিন দ্বিজেন এমন একটা চিন্তাও করেছে—বেলাকে তেমন ভালো দেখায় না আর। এটাকে তার মানসিক অবস্থার নমুনা হিসেবে নেয়া যেতে পারে যে পনরো বছর আগে যাকে সে ভালোবেসে বিবাহ করেছিলো এখন তার মুখ অথবা তার দেহ তাকে প্রফুল্ল করে না বরং সেই মুখে সে ত্রুটি খুঁজে পায় এবং সেই দেহ তার কাছে অসুন্দর মনে হয়। এসবের অবশ্যই কারণ আছে। তাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এরকম আলোচনা হয় দ্বিজেন কুলপ্রথাকে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ শহরের পুরনো বাসিন্দাদের বাইরে গিয়ে স্ত্রী সংগ্রহ করে ভালো করে নি। কিন্তু এই অসন্তোষ তা থেকে হয়েছে বলা যায় না। কারণ দ্বিজেন তার পিতার জীবনের ঐতিহ্যের বাহক হলেও বেলাকে বিবাহ করে সে প্রমাণ করেছিলো সে ঐতিহ্যের বাইরে যাওয়ার সাহসই তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। শহরের এই অঞ্চলে ফ্ল্যাটভাড়া করার রুচি অবশ্য বেলার কিন্তু তাকে সমর্থন করাও দ্বিজেনের সাহসিকতার পরিচয়। বরং বলা যেতে পারে তার এই সাহস থাকার ফলেই অসন্তোষের দিকেও একটা প্রবণতা ছিলো তার। এই অসন্তুষ্টির প্রকৃত কারণ কিন্তু খুব সহজে বর্ণনা করা যায়—তারা কখনও অবসর ভোগ করে নি। গত পনরো বৎসরে দু'একবার মাত্র ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে আউটরামঘাটে কিম্বা ইডেনউদ্যানে গিয়ে তারা বসেছে বটে। এই অবসরভোগ করাটা প্রকৃতির অকৃত্রিমতার সঙ্গে তালিমণ্ডুকতার বাইরে সাময়িকভাবে সংযুক্ত হওয়া যে কত মূল্যবান তা তাদের জীবনে এখন প্রমাণিত হচ্ছে। দুপুরুষ ধরে যা চাপা

ছিলো সেটাই অসন্তোষের রোগ হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যায়াম করা, পরিশ্রম করা স্বাভাবিক, কিন্তু চাপা ক্ষয়রোগ তাতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দ্বিজেন সাঁপুই এ ফ্ল্যাটে আসবার সাহসিকতায় তেমন যেন এই অসামঞ্জস্য-অসন্তোষ।

গত তিনমাসে এটা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দ্বিজেন তার অফিসে বসে বসে একদিন যন্ত্রণাযুক্ত এই চিন্তা করে বসলো : বিবাহের সময়ে বেলার বুক এবং নিতম্ব সুগঠিত ছিলো বলেই তার লোভ হয়েছিলো নতুবা বেলার মতো মুখের গড়ন সে কিছুতেই পছন্দ করতো না। মানুষ যা ভাবে তার কিছুটা প্রকাশ পায়ই। কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকবে প্রত্যুত্তরে বেলা বলে বসেছে : অসুবিধা হয় তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে গিয়ে থাকতে পারো। আমার উপার্জনের টাকায় ফ্ল্যাটের ভাড়া হয় না, আমার একার খরচ চলবে।

দু'একদিন পরে আর এক সন্ধ্যায় সংসার নিয়ে আলাপ হচ্ছিলো। দ্বিজেন প্রায় প্রতিটি কথাতেই বিরক্তি প্রকাশ করেছে। বেলা টেবিলে নভেল রেখে তার উপরে চোখ দিয়েছে। তার হাত দুটো উলের কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় দ্বিজেন লক্ষ্য করলো বেলার চশমার লেন্সের নিচে নাকের পাশ গড়িয়ে চোখের জল দেখা দিয়েছে। দ্বিজেন যারপরনাই বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো কিন্তু পাশের ঘরের আলোর দিকে চোখ রাখতে রাখতে হঠাৎ তার চোখেও জল এলো।

একদিন দ্বিজেন বললো, চলো, বেলা, আমরা বেরিয়ে আসি।

বেলা বললো,—এই বয়সে ইডেনউদ্যানের কোন মাধুর্য নেই।

—তা নয়, আরও দূরে কোথাও।

বেলা বিরক্ত হয়ে উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো।

অন্য একদিন বেলাই বললো,—চলো না হয় অন্য কোথাও।

আরও প্রায় একমাস পরে বেলাই আবার বললো,—কোথাও গেলে হতো না?

ভাবছি।

আমাদের স্কুলের একজনের পরিচিত এক ভদ্রলোকের দেওগিরির কাছে একটা বাড়ি আছে। ছোট বাড়ি, সস্তাও। দু'এক মাসের জন্য ভাড়া নিলে হয়।

এরপর তারা কিছুদিন পরিকল্পনাটার জন্য কত টাকা দরকার হবে, অন্য কোথায় কোথায় তার জন্য ব্যয় সঙ্কোচ করতে হবে, কতদিনের ছুটি নেবে তারা এসব বিষয়ে আলোচনা করলো।

অবশেষে সত্যই তারা নভেম্বরের গোড়ায় বেরিয়ে পড়লো।

সাঁপুই দম্পতীর এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য আত্মাকে গ্লানিমুক্ত করা তাদের যাত্রাও অন্তত একদিক দিয়ে শাস্ত্রে বর্ণিত যাত্রার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠলো। বিলেতি ধর্মশাস্ত্রে পারগেটরির ব্যবস্থা দেয়া আছে যা পার হলে আত্মা বিমল হতে পারে। রেলের থার্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টেই তারা এই পারগেটরির সাক্ষাৎ পেলো। সকাল দশটায় গাড়ি ছেড়েছিলো হাওড়ায়। বিকেল তিনটেতেই দ্বিজেন ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করতে লাগলো। তার এই প্রথম দীর্ঘ রেলভ্রমণে প্রথম দিকে সে নিজের এবং বেলার জন্য অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি অন্য যাত্রীদের থেকে পৃথক করে রাখবার চেষ্টা করছিলো। পরে ভর্ৎসনা বিদ্রূপ এবং অনুযোগে সে নিজে গুটিয়ে নিয়েছে। বেলার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সে গাড়ির দেয়ালে মাথা রেখে নিঃশব্দে বসে আছে কিন্তু কোন দিন তাকে এত ক্লান্ত দেখায় না স্কুল

থেকে পরিশ্রম করে এলেও। সমস্তদিন ধরে যত যাত্রী নেমেছে তার চাইতে বেশী উঠেছে। দরজা থেকে বেঞ্চ পর্যন্ত মানুষ গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে, নিজেদের মোটঘাটের উপরে বসে চলেছে কেউ কেউ, এমনকি দুই বেঞ্চের মাঝেও বসেছে কয়েকজন। যাত্রীদের ওঠানামার বাক্‌বিতন্ডা চলছে আর তা প্রায়ই শালীনতাকে ভ্রূক্ষেপ করছে না, বিড়ির ধোঁয়া ময়লা কাপড়চোপরের গন্ধে এই শীতকালের বিকেলেও গুমোট এবং বাতাসেরও অপ্রাচুর্য। খাঁচায় আটকানো চালানী মুরগীগুলোর মধ্যে উপরের দিকে যারা ঠোঁট গলাতে পারে তাদের পক্ষে নিঃশ্বাস নেয়া কিছুটা সম্ভব হয়, ভাগ্যবলে তাদেরও মুখোমুখী আসন দুটো জানলা ঘেঁসে।

আলাপ করার চেষ্টায় দ্বিজেন বললো,—কি রকম বোধ করছো?

বেলা কিছু বলতে গিয়ে থামলো। ইতস্তত করলো। তার মুখে একটা বিবর্ণ হাসি ফুটলো। সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

বেলাই তার কষ্টের কারণ এরকম একটা অযুক্তির কথা তৈরি করতে গিয়ে নিজের মনে সমর্থন না পেয়ে বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করলো। বালি চিবানোর মতো সব কিছু নীরস বোধ হলো তার।

ছোট ধুলোঢাকা স্টেশনটার নাম দেওগিরি বটে। সারাদিন এবং সারারাত নরক-ভোগের পর আর কি আশা করা যাবে? স্টেশনে একটা কুলি পর্যন্ত নেই যে তাদের মাল-গুলো নিয়ে যাবে। ট্যাক্সি বাস দূরের কথা, ছোট স্টেশনটার বাইরে কোন রকমের যান-বাহনই দেখতে পেলো না দ্বিজেন। কার কাছে সংবাদ পাওয়া যাবে ঠিক করতে না-পেরে সে নিজেই চারিদিকটা ঘুরে এলো। ছোট স্টেশনের গায়ে রেলের সীমা শেষ। তারপরেই দুখানা ছোট দোকান। দোকান দুটোর সম্মুখ দিয়ে ধুলোর পথ চলে গেছে। উঁচু নিচু ভাঙাচোরা রাস্তাটার দু'পারে শালগাছ। ধুলোতে ঢাকা পাতা এবং কান্ড। দ্বিজেনের এমন আশংকাও হলো তারা ভুল স্টেশনে নেমে পড়েছে।

সে বিবর্ণ মুখে ফিরে এসে চিন্তা করার জন্য লটবহরের উপরে বসে পড়লো। কিন্তু আসলে পরিস্থিতিটাকে যত খারাপ মনে হয়েছিলো তাদের কাছে ততটা হতাশ হওয়ার মতো নয়। যাদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তারা তাদের মালিকে চিঠি লিখিয়ে খবর দিয়েছিলো বেলা। সেই মালি এলো। মালপত্রের পরিমাপ দেখে নিয়ে পাশের গ্রাম থেকে টাঙ্গা ডেকে আনলো সেই। সেই অসমান পথে টাঙ্গার ময়লা চাদর ঢাকা চটের গদিতে বসে চলতে চলতে দ্বিজেন নিজেকে সান্ত্বনা দিলো হয়তো তার মতো লোকেরা এমন দেশভ্রমণই করে থাকে।

দেওগিরি শহরটা শহর এবং গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছে। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা হাজারের কোঠায় কোনক্রমে পৌঁছুতে পারে। কিন্তু তার তিন চারটি রাস্তা অন্তত সুরকি দিয়ে বাঁধানো। সেই পাকা রাস্তা ধরে চললে কয়েকটি ইটের তৈরি বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছাড়াও দূরে দূরে ছোট ছোট টিলার মাথায় আরও কয়েকটি পাকা বাড়ি চোখে পড়ে। এই রাস্তা কয়েকটি এই পাকা বাড়িগুলো এবং এখানকার দৈনিক বাজার থেকে এটাকে শহর বলা যায় নতুবা সন্ধ্যার পরে পথের ধারের কেরোসিন আলোগুলো সত্ত্বেও চারিদিকের অন্য গ্রামগুলোর সঙ্গে একই অন্ধকারে ডুবে একাকার হয়ে যায়। সাঁপুই দম্পতী যে বাড়িটা ভাড়া করেছে সেটা এই শহরেরই পাকা রাস্তাগুলো ছেড়ে কিছুদূরে গিয়ে একটা টিলার উপরে কয়েক ধাপ উঠে একটা ছোট বাংলো। সস্তার জিনিস

অনেক সময়ে যেমন হয় এক্ষেত্রেও তা হয়েছে। বাংলোটির দুখানা শোয়ার ঘরের এবং বিশেষ করে রান্নাঘরের অবস্থা দেখে সাঁপুই দম্পতীর মনে হতাশাই দেখা দিয়েছিলো। শোয়ার ঘর দুটিরই মেঝে ফাটা। একটির জানলা দরজা বন্ধ করে রাখতে হয় নতুবা জানলা-দরজার পাল্লা খুলে আসে। রান্নাঘরের টালির ছাদে বড় একটা ফুটো। দ্বিজেন উষ্ণ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো ঘরদোরের অবস্থা দেখে। বেলার তখন কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিলো না। প্রথম ধাক্কার পরে তারা কাটিয়ে উঠেছে এখন। এতগুলো টাকা খরচ করে এসেছে এবং দু'মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, কাজেই সহনশীল না হয়ে লাভ নেই। একটা সুবিধার কথা এই এখানে দুধ এবং মাংস সস্তা।

তা ছাড়া এখানে শব্দ কম। মাঝে মাঝে কুয়াশাটা প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত মাটির কাছাকাছি লেগে থাকে যেমনটা কোলকাতায় দেখা যায় না। আপাতত এইটুকুই দ্বিজেন আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই কুয়াশাটা কেটে যাওয়ার পরে কোন কোনদিন সাঁপুই দম্পতী বেড়াতে যায়। সম্মুখে দ্বিজেন, তার কয়েক হাত পিছনে বেলা। দ্বিজেন সাঁই সাঁই করে তার হাতের ছড়িটাকে ঘোরায় আর বেলা যথারীতি তার উল বুনতে থাকে।

ইতিমধ্যে বেলা একদিন বলেছিলো : এখানে এসে লোকে কি কি দেখে তা কারো কাছে থেকে জেনে নিলে হতো।

—অর্থাৎ এখানে কি সুখ তা আমরা নিজেরা বুঝতে পারছি না।

তারপরে আর কথা হলো না।

এ শহরটাকে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বলা যায় না। যদিও এখানে ওখানে দু-তিনশ' ফিট উ'চু টিলা অনেকগুলো আছে। স্টেশন থেকে আসতে শালগাছ চোখে পড়েছিলো, কিন্তু ঠিক শালগাছের দেশও নয়। শহরের চারিদিকেই গ্রাম—কখনও শহরের লাগোয়া, কখনও শহর এবং গ্রামের মধ্যে একটা বন বা একটা টিলার ব্যবধান।

একদিন বেলা প্রস্তাব করলো, বনভোজন করলে হয়।

দ্বিজেন বললো, যে লোকটা সাজসরঞ্জাম টেনে নিয়ে যাবে তার খরচটা বইতে হবে।

—দুজনের খাবার আমরা নিজেরাই বইতে পারবো।

সেদিন তারা বনে ঢুকেছিলো। দুপুরবেলাটা বনে কাটিয়ে এসেছিলো। এখানে ওখানে দু'চারটে শালগাছ। মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা জমি। ঘাসগুলোর রং এখন শুকনো পাতার মতো। কোথাও ছোট ছোট ঝোপ।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে তারা বনে যেতো। দুপুর থাকতে বেরিয়ে পড়ে বিকেলের রোদ থাকতে থাকতে ফিরে আসতো। সঙ্গে তারা একটা কম্বল নিতো পেতে বসার কোন কোনদিন, আর এক ফ্লাস্ক চা।

হঠাৎ একদিন একটা বিপদ ঘটে গেলো।

দ্বিজেন বলেছিলো,—রোজই এক জায়গায় বসছি। গাছপাতাগুলোও যে মুখস্থ হয়ে গেলো। জাবরকাটার মতো বোধ হচ্ছে।

এরপরে তারা খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। তারা কিছুদূর যাওয়ার পরেই বনটা ঘন হয়ে উঠেছিলো। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তারা হে'টেছিলো বনের সরু সরু গলি ধরে। বসে বসে পুরনো গাছপালার জাবরকাটার চাইতে এ বরং ভালোই। কিন্তু তারা আলোর যে অস্পষ্টতাকে বনের ছায়া ভেবেছিলো আসলে সেটা ছিলো মেঘের ছায়া। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি থেকে আশ্রয় পাওয়ার জন্য তারা খানিকটা সময় ছুটোছুটি করলো

এবং তারই ফলে পথ হারিয়ে ফেললো। বৃষ্টি থামলো দু-তিন ঘণ্টা পরে, ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়েছে। এবং বনের পথে (তখনও গাছপালা থেকে টুপ্‌টুপ্‌ করে জল ঝরছে) ঘুরে ঘুরে পরিচিত পথের ধারে কাছেও যেতে পারলো না তারা। শীত, বৃষ্টির ফলে যা অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো, অন্ধকার, শহরবাসী এই দুটি প্রাণীর কাছে যা অজ্ঞাত জন্তুজানোয়ারের হিংস্রতায় পরিপূর্ণ, এবং ক্লান্তি যখন তাদের সব রকমেই হতাশ করেছে হঠাৎ তারা একটা কুটীর দেখতে পেয়েছিলো। কারণ হিসাবে এই বলা যায় বড়গাছের বনের বাইরে ছোটছোট ঝোপঝাড়ের দিকে থাকবার চেষ্টা করেছিলো তারা এবং ছোট ছোট গলি যতই গন্তব্যে পৌঁছনোর লোভ দেখাক তারা বরং অজানা সুদীর্ঘ বড় পথটা ধরেই চলেছিলো।

কুটীরটার মেঝে মাটির, দেয়াল কাঠের। দেশলাই জেবলে পরে শুকনো ডালপালার যা হ'ক একটা মশাল বানিয়ে ঘরটাকে পরীক্ষা করলো তারা। ঘরের মেঝেতে ঘাস গজিয়েছে, দেয়ালের কাঠের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকছে, দরজাটা তাদের প্রথম ধাক্কাতেই নড়বড় করে উঠেছিলো। তা সত্ত্বেও এটাকে একটা আশ্রয় বলেই মনে হলো।

এদিকে বৃষ্টি হয় নি। শুকনো ঘাস, কিছু ডালপালা সংগ্রহ করে আগুন জবালালো ন্বিজেন ঘরের মেঝেতে। সেই আলোয় দেখতে পেলো দেয়ালের একদিকে দেয়ালের সঙ্গে আটকানো একটা ছোট কাঠের বাক্স। এরকম পরিস্থিতিতে আগুন যে মস্ত একটা সহায় তা মনে করে তারা যথেষ্ট ডালপালা সংগ্রহ করে আগুন জবালিয়ে রাখলো। সেই বনের দারুণ শীতে একটিমাত্র কম্বলে নিজেদের দেহকে আবৃত করে সেই কাঠের বাক্সে রাতটা কাটালো তারা।

সকালের প্রথম আলোতে যখন তারা উঠে দাঁড়ালো তখন বেলা বললো,—কি আশ্চর্য! আলো দেখো।

ন্বিজেন বললো,—অনেকদিন মনে থাকবে কিন্তু।

পায়ে পায়ে কিছুদূরে গিয়ে তারা রাত্রিতে অত শীত করার কারণটা খুঁজে পেলো। কিছুদূরে একটা বেশ বড় জলাশয়। আর কিছুদূরে গিয়ে তার আরও আশ্চর্য হওয়ার কারণ খুঁজে পেলো। গত রাত্রিতে যেখানে এসে তারা কুটীরে আশ্রয় নিয়েছিলো তার আধ মাইলের মধ্যেই শহরের প্রান্ত। তাদের কাছে অপরিচিত কিন্তু শহরের প্রান্ত সে বিষয়ে কোন ভুলই নেই।

ঠাণ্ডা লেগে গলাটা একটু কষ্ট দিচ্ছিলো বেলার। সেটা কমতেই ন্বিজেনই প্রস্তাব করলো সেই কাঠের কুটীরে গিয়ে চড়াইভাতি করার এবং আর একটা রাত কাটানোর। বেলার গালে রং দেখা দিলো।

কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেলো সত্যি তারা সেই কুটীরে গিয়েছে। দুপুরে কুটীরের বাইরে শুকনো ঘাসে ঢাকা জমিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে আছে ন্বিজেন আর বেলা স্পিরিট ল্যাম্পে চা করছে কিছুদূরে একটা আসনে বসে।

শুয়ে থাকতে থাকতে ন্বিজেন ডাকলো,—শোন, শোন, বেলা।

বেলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে এলো।

ন্বিজেন বললো,—আমরা প্রায় এক মাস আরও আছি দেওগিরিতে। যে ক'দিন আছি রোজ এখানেই আসব। বলো তো রাতটাও এই ভাঙা কুটীরেই কাটানোর ব্যবস্থা করে নেই। অন্তত আমাদের দুখানা কম্বল আর স্টোভ ইত্যাদি এ-ঘরে থাক। দরজায় একটা তালা বরং দিয়ে যাবো।

বেলা হেসে বললো,—কিন্তু কুটীরটা যার—সে হয়তো এদিক থেকে শহরের প্রথম বাড়িটার মালিকই—আপত্তি করতে পারে।

দ্বিজেন বললো,—ভাড়া দিয়ে দেবো।

সেদিনই তারা আবিষ্কার করলো পৃথক পৃথক ভাবে। দ্বিজেন গিয়েছিলো জলাশয়ের দিকে আর বেলা ইতস্তত।

দ্বিজেনই হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলো,—দেখো, দেখে যাও।

বেলা কুই করে সাড়া দিলো।

কিন্তু দ্বিজেনকেই এগিয়ে আসতে হলো।

ডেকে ডেকে বেলার কুই শুনে শুনে দ্বিজেন এগিয়ে গিয়ে দেখলো একটা হেলানো গাছের গায়ে হাত দিয়ে বেলা দাঁড়িয়ে আছে।

—কি?

—দেখো।

—এটা দেখছি কুল গাছ।

—তাই নয়। এদিকের এই বনটা কারো বাগান ছিলো কোন সময়ে। ওদিকে অনেক আনারস গাছ দেখেছি।

বেলা লোভাতুরের মতো সেই হলুদ হয়ে আসা বড় বড় কুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলো। বললো,—গাছটা হেলানো দেখছো।

—তা দেখেছি।

—আঁচলটা কোমরে জড়ালো বেলা।

—পারবো?

—গাছে উঠে? দ্বিজেন হাসলো। বয়স চল্লিশ হলো।

—এখানে তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

দ্বিজেন হেসে কিছু বলতে গেলো কিন্তু তার আগেই বেলা হেলানো গুঁড়ি বেয়ে কিছুদূর উঠে গেলো গাছটায়। প্রথম ডালটায় যে কয়টি কুল ছিলো হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিলো। তারপরই বয়সের দরুন হাত-পা শির শির করে উঠলো। ভয়ে ভয়ে নেমে এলো সে।

দ্বিজেন উজ্জ্বল চোখে দেখছিলো। বেলা নামলে সে বললো, এবার আমার সঙ্গে এসো দেখো, কি তোমাকে দেখাতে চাই।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো দ্বিজেন।

বেলা দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলো।

বললো,—পদ্ম? আশ্চর্য!

দ্বিজেন হো হো করে হাসলো, হাততালি দিলো। আর বেলার সেই পদ্মগুলো কলরব করে উঠলো, চক্রাকারে আকাশে উঠে পড়লো, পাক খেয়ে খেয়ে আবার জলের দিকে নেমে এলো।

—ওমা, হাঁস! এত! এতো শুধু বই-এ পড়া যায়।

সেই জলাশয়ে হাসের পাল নেমেছে।

এরপরে সেই কুটীর যেন তাদের জাদু করলো। সত্যি আর একটা রাত কাটালো তারা সেই কুটীরে একই কম্বল গায়ে নিজের দেহের উত্তাপে অন্যকে শীত থেকে আড়াল করে।

এবং প্রায় প্রত্যেক দিনই তারা বেলা দশটা থেকে পাঁচটা কুটীরের কাছাকাছি অরণ্য আবিষ্কার করে বেড়াতে লাগলো। শুধু দ্বিজেনের ভয় হতে লাগলো একদিন যদি এসব আর ভালো না লাগে? কিম্বা কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়।

ইতিমধ্যে দ্বিজেন এবং বেলা আবিষ্কার করেছে জলাশয়টা কৃত্রিম। উপরের দিক থেকে যে ঝরনাটা বয়ে আসে তার পথে এদিক ওদিক বাঁধ দিয়ে খানিকটা নিচু জায়গাকে প্লাবিত করে এই জলাভূমিটাকে তৈরি করা হয়েছে। কোথাও হ্রদের মতো জল কোথাও হোগলা শর বনের মধ্যে শ্যাওলা-ঢাকা জলের চিহ্নমাত্র।

দ্বিজেন একদিন মন্তব্য করলো,—একেই স্বর্গ বলে, বেলা।

বেলা ছেলেমানুষের মতো বললো,—তা বলো। আমার সেই কুলগুলো কিন্তু এতদিনে লাল টক্‌টকে হয়ে পেকেছে।

দেখা গিয়েছে স্বর্গে প্রতিবন্ধক এসে দেখা দেয়।

সেদিন তারা বনের অন্যদিক দিয়ে তাদের প্রিয় এই কুটীরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলো বলেই পরে দেখতে পেয়েছিলো। কুটীরের সম্মুখে এসে তারা থমকে দাঁড়ালো। কুটীরের ছাদ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আর কুটীরের সম্মুখে একটা খাকি রঙের সুইস টেন্ট। স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ফিরে যাবে কিনা ভাবছে এমন সময়ে দেখতে পেলো তাঁবুর আড়ালে গাছটার নিচে একজন প্রৌঢ় বসে আছে। গায়ে তার সৈনিকের পোশাক, মুখের পাইপ থেকে অজস্র ধোঁয়া উঠছে, তার মাথাভরা লম্বা লম্বা চুলগুলো ধবধবে শাদা, কিন্তু তামাকের ধোঁয়ায় প্রকাণ্ড গোঁফগুলোতে পাটকিলে রং ধরেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ও চুলের রঙে বেশ বড় একটা পার্থক্য আছে।

বেলা বললো,—মালিক নাকি?

দ্বিজেন বললো,—আমাদের মতোই পথিকও হতে পারে।

দ্বিজেন সাহস করে এগোনোর আগেই সৈনিকই তাদের দেখতে পেলো এবং হাতের ইশারায় ডাকলো।

এই ভাবেই আলাপ শুরু। সুইস টেণ্ট থেকে চামড়া ঢাকা দুটো মোড়া এলো। কুটীর থেকে চা বিস্কিট এলো। সাঁপুই দম্পতী জানতে পারলো সৈনিক নিজেকে মেজর সিংহ বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। তার দুটো পা-ই হাঁটুর নিচে থেকে খোয়া গিয়েছে সেজন্যই বিশ্রামের সময়ে কম্বলে ঢাকা থাকে এই জঙ্গল, জলা, কুটীর, এবং দূরের ওই বাড়িটা তার। শীতকালে মাস দুয়েক এখানে থাকে সে। সুইস টেণ্টেই বাস করতে ভালোবাসে শীত হলেও। দ্বিজেন যখন তাকে জানালো এ কুটীরে এবং কুটীরের কাছে তারা কিছুদিন ধরে সময় কাটাচ্ছে ভালো লাগে বলে, তখন মেজর সিংহ বললো সে এসেছে বলে যদি তারা না আসে তবে সে মর্মান্তিক দুঃখিত হবে।

যেখানে দুজন ছিলো সেখানে তিনজন। আর তৃতীয় ব্যক্তি এমন যে দ্বিতীয়দিনের শেষে সাঁপুই দম্পতী চিন্তা করলো এতদিনে তাদের একটা অভাববোধ পূর্ণ হলো। যে অভাববোধটা থাকা এখন সঙ্গত বোধ হচ্ছে। কারণ মানুষকে এত সুখী আর কখনও যেন দেখা যায়নি, অথচ তার সুখের উপকরণ চা, তার তামাকের কৌটা আর পাইপ আর সুইস টেণ্ট। বন্ধুবান্ধব সন্তানসন্ততি নেই, আত্মীয়স্বজন থাকলেও অনুপস্থিত, বৃদ্ধ জাঠ-চাকর ভরসা এমন একজন খঞ্জ—অথচ গোঁফে চাড়া দিয়ে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, কোঁচকানো কোণ চোখদুটিতে হাসিভরা।

তৃতীয়দিনে বেলা মেজর সিংহের কাছ থেকে আদায় করে ফেললো ইতালীর কোন যুদ্ধে তার দেড়খানা পা উড়ে গিয়েছিলো আর ভূমধ্যসাগরের কোন জাহাজে আধখানা পা কেটে দিয়ে ডাক্তাররা তাকে দুপায়ে খোঁড়া বানিয়েছে।

সেদিন বাসায় ফিরতে ফিরতে বেলা বললো,—ছুটি কিছু বাড়িয়ে নিলে হয় না।

—এখনও একমাস আছে। ভালোই লাগছে কিন্তু। হাসিমুখে বললো দ্বিজেন।

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তিনদিন যায়নি সাঁপুই দম্পতী।

সেদিন অন্যান্যদিনের চাইতে আগে গিয়ে তারা একটু অবাক হলো। তাঁবুটা আছে কিন্তু মেজর সিংহ আর তার চেয়ার অনুপস্থিত, এমনকি কুটীরে তার চাকরও নেই। অনেকক্ষণ তারা অপেক্ষা করলো। অবশেষে চাকর এসে তাদের দেখতে পেয়ে খবর দিলো মেজর ঝর্ণাটার উজানে আছেন। ঝর্ণা ধরে প্রায় আধমাইল গিয়ে মেজর সিংহের দেখা পেলো তারা। চেয়ারটায় আজ চাকা লাগানো, কিম্বা এটা আর একটা চাকা লাগানো চেয়ার, তার উপরে মেজর হুইল বড়সি নিয়ে বসে আছে। এমন অদ্ভুতভাবে স্তব্ধভঙ্গি তার যেন মনে হচ্ছে জীবন্ত মানুষ নয়।

মেজর সিংহ হেসে বললো,—মাছ আমার হাতে ধরা পড়ে না। এই একটা ব্যাপারেই আমি ভাগ্যকে মানি।

বেলা বললো,—তা হলে বৃথা চেষ্টা কেন?

মেজর বললো,—এমন ঠাণ্ডা বিষয় আর নেই।

সেদিন বেলা তার কাছে আদায় করলো আর একটা গল্প—কি করে একরাতে মানুষের সব চুল সাদা হয়ে যেতে পারে। শেষমুহূর্তে মৃত্যুর হাতও মানুষ এড়াতে পারে যদিও তা কদাচিৎ ঘটে।

একটা দিনকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে তুললো বেলা। মেজর সিংহকে সে রেঁধে খাওয়াবে এই প্রস্তাবে সে তাকে রাজী করালো। কুটীরে সে গেলো রান্নার উদ্যোগ করতে আর তখন দ্বিজেন বসলো শিকারের গল্প শুনতে।

মেজরের কাছে সেদিন জানা গেলো মাঝে মাঝে তার চাকর পাখী শিকার করে। হরিণও পাওয়া যায় জঙ্গলে।

এর পরে দ্বিজেন, যে বন্দুক কোনদিন হাতে করেনি, সেও মেজর সিংহের চাকরকে সঙ্গে করে শিকারে যেতে লাগলো। কোনদিন হাঁস, কোনদিন হরিতাল, বেশীর ভাগ দিনই হাঁস শিকার করতো মেজরের চাকর। প্রথম যেদিন দ্বিজেন একটা হাঁসকে বন্দুকে বিঁধলো সেদিন তাকে দাম্ভিক বলে বোধ হলো।

সেদিন রাত্রিতে নিজেদের বাসায় ফিরে বেলা বললো,—কিছুই বাদ দেবে না?

দ্বিজেন হাসিমুখে বললো,—কোলকাতায় কেউ বিশ্বাস করবে? একটু থেমে বললো আবার, আয়নায় ইদানীং নিজের মুখ দেখেছো? বয়স পনরো বছর কমে গেছে।

একদিন দ্বিজেনকে লজ্জায় পড়তে হলো। মেজর সিংহ বললো,—দ্বিজেনবাবু আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন।

মেজর সিংহ হাসতে হাসতে বলেছিলো কথাটা কিন্তু দ্বিজেন নিজেই স্মরণ করলো গত একটা সপ্তাহ সে এসে দশ মিনিটও দাঁড়ায়নি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে চাকরকে সঙ্গে করে। ফিরতে দু-একদিন বেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।

দ্বিজেন বললো,—আজ আর যাচ্ছিনে।

—ভারি লজ্জায় পড়বো যদি না যান। বললো মেজর সিংহ।

কিন্তু দ্বিজেন সেদিন প্রথম দিনের মতো মোড়া চেপে বসলো।

ঘরোয়া কথা হলো। মেজর জানতে পারলো সাঁপুই দম্পতীর সন্তানসন্ততি নেই। সে বললো,—বোধ হয় দু-একটি থাকা ভালো। লোকে তাই বলে।

বেলার গালে লজ্জার চিহ্ন দেখা দিলো যখন সৈনিকজনোচিত খোলাখুলিভাবে মেজর বললো,—এখনও সময় যায়নি।

মেজর সেদিন বললো আলাপের এক জায়গায় কথার পিঠে : বাঁচাটা এত ভালো পৃথিবী এত ভালো যে কল্পনাও করতে পারা যায় না। আর পৃথিবীটা এখন ক্রমেই ভালো হয়ে উঠছে। যুদ্ধ হবে না আর এই পৃথিবীতে। যুদ্ধ করার মতো লোভী দস্যু আর নীতি-অন্ধ গোঁড়া বদমাস দু-চার জাত আছে বটে কিন্তু সমাজে তাদের স্থান নেই।

সে যখন কথা বলছিলো তখন একটা স্নিগ্ধতাও যেন চারিদিকে দেখা দিলো। শুকনো বাদামী ঘাস থেকে একটা যেন সুগন্ধ উঠছে। ওদিকে কয়েকটা পাখি হঠাৎ কি একটা মৃদু আনন্দে খুশী হয়ে ডেকে উঠলো।

দ্বিজেন এবং বেলার সেদিন বাড়িতে ফিরে মনে হলো তারা যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে।

কিন্তু ছুটি একদিন শেষ হলো এবং কোলকাতার গাড়িতে উঠে বসলো তারা। শুরুতেই ভিড়। বসবার জায়গা পাওয়া গেলো এই ভাগ্য।

কিন্তু দ্বিজেন হাসলো, ঠেলাঠেলি করে মালপত্র আর বেলাকে নিয়ে সে দু-মিনিটে উঠতে পরে সে যেন একটা খেলায় জিতেছে—এমন খুশী হয়ে উঠলো।

বেলা বললো,—এবারও রাত জাগতে হবে।

দ্বিজেন হাসিমুখেই বললো,—বাড়ি গিয়ে ঘুমাবো। একরাত বইতো নয়।

একটু পরে সে বললো,—সেই বৃষ্টির রাতে কুটীরে মনে আছে।

গাড়ি ছাড়তে দ্বিজেন বললো,—ওই যা ভুল হয়ে গেলো।

—কি?

—মেজর সিংহের ঠিকানাটা আনা হয় নি।

—আমি এনেছি। কেয়ার অব পোস্টমাস্টার দেওগিরি লিখলেই পাবেন।

—বাস্তবিক তোমার এত বুদ্ধি।

অফিসের এবং স্কুলের লোকরা স্বীকার করলো চেঞ্জটা সত্যি কাজের হয়েছে। দুধ মাছ সস্তা বুঝি! সাঁপুই দম্পতী তাই বললো তাদের। কিন্তু মেজর সিংহের কথা অথবা সেই সুইস টেণ্ট এবং কুটীরের কথা তারা কাউকে বললো না।

দ্বিজেন বললো,—তুমিও বলো নি?

—না। আমাদের মনে থাক।

—এ বিষয়ে আমরা কৃপণ।

কিম্বা সঞ্চয়ী বলো। এই বলে হাসলো বেলা।

তারা যেন নতুন মানুষ হয়েছে।

দ্বিজেন বললো,—পৃথিবীটা সত্যি ভালো, স্বর্গই বলা যেতে পারে।

সময় যেন লঘুপক্ষ পারাবত, তার পাখার কম্পনই দিনরাত্রি। স্বর্গ থেকে এসেছে

তারা সঙ্গে এনেছে মন্দারের মালা। তার সুগন্ধ পেলো তারা। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। স্ত্রীর চালচলনে পরিবর্তন স্বামীর চোখে ধরা পড়ে তা সামান্য হলেও।

দ্বিজেন খানিকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতেই বললো,—কি হলো, বলো তো? ব্যাপার কি?

বেলা লজ্জায় মুখ রাঙা করে মুখ নামালো।

দ্বিজেনের মনে হলো সুখে তার দমবন্ধ হয়ে যাবে।

দু-একদিন পরে দ্বিজেন বললো,—ক্লিনিকে যেতে হয়।

—আর দুদিন যাক।

কিন্তু আরও একমাস পরে তারা ক্লিনিকের মতামত নেয়াই উচিত বোধ করলো। কারণ বেলার বয়স হয়েছে।

শনিবারের দুপুরে তারা ক্লিনিকে যাবে স্থির করেছিলো। বেলা ট্যাক্সিতে গিয়ে বসেছে দ্বিজেন ড্রাইভারকে পথ বাতলে দিচ্ছে যদিও তার দরকার থাকে না কোলকাতার ট্যাক্সিচালকদের কাছে এমন সময়ে পোস্ট অফিসের পিওনকে দেখা গেলো।

—কি?

—রেজিস্টারি আছে।

—সই করে চিঠি নিলো দ্বিজেন। ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

খামটা লম্বা মোটা কাগজের।

—আরে এ যে দেখছি মেজর সিংহের কাছে থেকে আসছে। দ্বিজেন বিস্মিত হলো।

—কই দেখি দেখি। বেলা বললো।

—দাঁড়াও, খুলি খাম।

—তুমি তাঁকে চিঠি দিয়েছিলে তা তো বলো নি। এ কথাও লিখেছিলে নাকি।

—নিশ্চয়। খাম খুলে মোটা কাগজে লেখা চিঠিটা বার করলো দ্বিজেন।

বিস্ময়ে সে প্রায় চিৎকার করে উঠলো। 'আরে, এ কি! কি অদ্ভুত!'

চিঠিটাতে জড়ানো একটা এনুয়িটি পলিসিও ছিলো। চিঠিতে দু-চার লাইনে যা লেখা আছে সাঁপুই দম্পতীর সন্তানের শিক্ষার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটা এনুয়িটি পলিসি দিতে পেরে মেজর সিংহ নিজেকে সার্থক মনে করছে।

দ্বিজেন বলতে গেলো এই তো স্বর্গ। কিন্তু তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেলো। মনের এই গভীর কালো খাদের মধ্যে পড়ে যেতে যেতে সে ভাবলো—এই অপরিসীম বদান্যতা কি অকারণ? তার মনের কালো ট্যাক্সির চারিদিকে কোলকাতার গলিগুলোকেও আবৃত করে দিতে লাগলো।

বেলা সিটের পিঠে মাথা রেখে নিঃশব্দে বসে রইলো।

আধুনিক সাহিত্য

জীবনের বার-মহলে একালে যতো বদলই ঘটে থাকুক, ভেতরে অনেক ক্ষেত্রেই পুরোনো দিনের রেশ রয়ে গেছে। পূর্ব-বাংলার 'আধুনিক' কবিতা পড়তে পড়তে এ-চিন্তা মনে জাগবেই। বহিরঙ্গে আধুনিক, কিন্তু মজ্জায় সনাতনী! কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

উনিশ শ তের-তে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, উনিশ শ তেষট্টিতে তাঁরা পঞ্চাশে পৌঁছলেন। বাংলায় ইতিমধ্যে রাজ্যসীমার পুনর্বিন্যাস বা পুনর্বিভাগ ঘটে গেছে। পূর্ববঙ্গ এখন পূর্ব-পাকিস্তান। পশ্চিমবঙ্গ এখন ভিন্ন এক রাষ্ট্রনাম। রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হবার বছর-ছয়েকের মধ্যে এই দুই অঞ্চলের সাহিত্য-সাধনার অভিমুখিতা খুবই দ্রুত গতিতে বদলে গেছে। তবু তাকে ঠিক রাষ্ট্র-বিভেদের ফলে স্বভাব-ভেদ ঘটবার উদাহরণ বলা চলে না। কিছু কিছু প্রকৃতিভেদ আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ভেদের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি। আধুনিক মনের পক্ষে যেসব আধুনিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করা স্বাভাবিক, একই ভাষা-ভাষী এই দুই অঞ্চলের নবীন কবিমন বর্তমানে সেই সাধারণ আধুনিকতাতেই বিদ্যমান; যেমন, ব্যক্তি আর সামাজিক সম্পর্ক,—সমাজের নানা বৈষম্য,—আর্থিক সম্পন্নতার স্তরভেদ,—একালের আশা আর নৈরাশ্য,—যন্ত্রবিস্তার ও অবকাশহ্রাস ইত্যাদি অবস্থা এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত একালের মনে নিত্যই দেখা দিচ্ছে। তারই মধ্যে মানুষের সনাতন আত্মরক্ষার চিন্তা আছে, প্রেমের অনুভূতি আছে, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে বিস্ময়, বিষাদ এবং জিজ্ঞাসা তিন-ই আছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ কবিদের যৎসামান্য যে-পরিচয় এপারে আমাদের অধিগম্য, সেটুকুমাত্র অবলম্বন করেও একথা বলা যায় যে, কবিতার ভাষায়, এ'রা আর 'করিনু' বা 'উচ্ছ্বাসি' ওঠে' ধরনের কাব্যিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে আগ্রহী নন। যাঁরা পঞ্চাশে পৌঁছেছেন, সেইসব কবিদের সঙ্গে তরুণতরদের প্রভেদ এখানে সুনিশ্চিত।

প্রবীণতর কবি ইমাউল হক ঐসব প্রয়োগে বিমুখ নন, কিন্তু আতাউর রহমান [১৯২৪] বা আবদুর রশীদ খান [১৯২৭] বা শামসুর রাহমান [১৯২৯] বা এ'দেরই মতন কবিত্বশক্তির অধিকারী অন্য কেউ-ই এই পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যেতে রাজী নন। আহসান হাবীবও [১৯১৭] এই দলের। 'সিতারার মত লায়লি তোমার নাম'—এ লাইন ফররুখ আহমদের [১৯১৮]। এই ধরনের প্রয়োগ,—'জুলেখা' বা ঈদের চাঁদ, বা 'মেহ্‌দী পাতার রঙ',—কিংবা লোকগীতির ঢঙে 'লাইলী কালা, মজনু কালা'-র উল্লেখ, এ-সবই ইস্‌লামী ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সনাতন মানবমনই এই রকম আঞ্চলিক ভাষায়, আত্ম-প্রকাশ করতে চেয়েছে। পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে 'কন্যা' শব্দটিকে যেমন 'কইনা' বল্‌লে একরকম মাধুর্য দেখা দেয়, কবিদের কাছে এবং অনুরাগী পাঠকের কাছে এসবও সেই রকম। রওশন ইজদানী [১৯১৬] সেই 'কোকিল-বরণ রূপের কইনা'র বিষয়ে ভাবতে ভাবতে লাইলী-মজনুর নাম করে গেছেন। আহসান হাবীবেরও সে-ক্ষমতা চোখে পড়বার মতন। তবে, আরবী-ফার্শি শব্দের প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ'দের এই আগ্রহ হয়তো একটু বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। সেই অধিক-মাত্রার প্রসঙ্গটি শান্তভাবে বিবেচ্য। রাষ্ট্র-

ভেদের ফলে ভাষাভেদ ইতিহাসে নতুন নয়। পোর্তুগীজ সংস্পর্শের আমলে বাংলায় অজস্র পোর্তুগীজ শব্দ এসেছিল,—ইংরেজ আমলে লাট, কার্ড, টেবিল, চেয়ার, গেলাস, ডিশ, থিয়েটার, বায়োস্কোপ অনেক কিছুই এসে গেছে। সংসারের বার-মহল, ভেতর-মহল সব ক্ষেত্রেই যখন এইরকম প্রবেশ স্বাভাবিক, তখন কবিদের অন্তর্লোকেও যে এ-পরিবর্তন ধীরে-ধীরে, দিনে দিনে গিয়ে পৌঁছোবে, তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কবিতায় জীবন-বীক্ষাগত আধুনিকতার তুলনায় এই ভাষাগত নতুনত্বের চিহ্নই বোধ হয় বেশি দেখা যাচ্ছে। আগেই বলেছি, প্রেম বা ঐ ধরনের অন্য কোনো বিষয়-বন্ধনে নির্বাচিত কবিতা-সংগ্রহের মধ্যে চিন্তার বিচিত্রতা বা অভিমুখিতার বিভিন্নতা ততো ধরা পড়ে না, যতোটা তা দেখা যেতে পারে পৃথক এক-একজন কবির পূর্ণতর কবিতা-সংগ্রহে। আহসান হাবীবের "ছায়াহরিণ"* সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্প্রতি পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছেন। তাঁর পঁচিশটি কবিতার সংগ্রহ এই "ছায়াহরিণ"। মা, প্রেয়সী আর দেশ,—এই তিন বাঞ্ছিত তাঁর বোধে এক হয়ে অন্বিত।

মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।
লিখেছি আপন মনে একা আমি আমার দিনের
সারা পথে; মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে
আমি ভালোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ
নানা রঙে
এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে।

এই অন্বয়ের অনুভূতিই ব্যক্ত হয়েছে সুন্দর কয়েকটি কথায়—

আছো তুমি সমগ্র সত্তায়;
তুমি আছো আত্মা থেকে অধরে বিস্তৃত।

এই আবেগ তাঁর সহজাত। চিত্রল রীতিই তাঁর রীতি। সোনামুখী নারকেল, দুধ-সুপুরির বন, শপ্ শপ্ বৈঠার আওয়াজ, মোরগ-ভোর ইত্যাদি অনুভূতির শব্দ তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে চোখে পড়ে। শীতের সকালের ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে কয়েকটি মাত্র শব্দের সংকেতে—

রাত্রিশেষ!
কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল—
পাতার ঝরোকা খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল!

এই রকম খণ্ডচিত্রেই তাঁর স্বভাবের ঝোঁক। তবু মাঝে মাঝে ইতিহাসের দীর্ঘ ধারায় বর্তমান কালের হৃৎস্পন্দন অনুভব করবার অন্যতর খেয়ালও তাঁর এই কবিতাগুলির কোনো কোনো জায়গায় ধরা দিয়েছে। আঠারো শ সাতান্ন'র ঝড় স্মরণ করে, 'ইতিহাস-বিন্যাসের পথে' কবিতাটিতে তিনি কিন্তু আরো আধুনিক কালের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারা-বর্ণনায় এগিয়ে যান নি, বরং নিকট কালের মুক্ত দিগন্তের অনির্দিষ্ট এক কাব্যোচ্ছ্বাসে পৌঁছেছেন। সেখানে,—তাঁর বোধে ধরা দিয়েছে—

বন্দরে নিঃশেষ রাত; এখন সকাল,
ক্লান্তমুখে সকালের সূর্যের মহিমা।

এখন হৃদয়ে ডাক বসন্তের—
স্তব্ধবাক্ পাখিরা মুখর।

অর্থাৎ—এ-কথা বল্‌লে অন্যায় হবে না যে, আহসান হাবীবের কবিতায় জীবনের সেই ঋতুর চিহ্ন কম, যাতে মন নিজের গভীরে নিমগ্ন হয়ে সম্যক্‌ভাবে ইতিহাসের ধারা উপলব্ধি করবার সুযোগ পায়! বাইরে যে রূপ ব্যস্ত, সে-রূপ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আধুনিক মননের সঙ্গে সনাতন রূপসম্ভোগের অন্বয় অন্য ব্যাপার। আধুনিক মেজাজ ঠিক এ মেজাজ নয়। 'চরিতাখ্যান ঃ নববর্ষ' কবিতাটিতে তিনি যাওয়া, আসা, পরিবর্তন বা গতিধারার বোধ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রকাশের মধ্যে স্পষ্টতার জায়গায় ভাব-কুহেলিকাই বেশি অনুভব করা যায়। শেষ লাইনে তিনি বলেছেন—'দুয়ারে প্রশ্নের ঢেউ ভেঙে পড়ে আবেগে উচ্ছাসে।' একদিকে তাঁর এই রূপানুভূতির আবেগ-উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে মৌখিক আটপৌরে কথার ছন্দ-অনুসৃতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু বেশি পরিমাণে আরবী-ফার্শি-উর্দু শব্দের ব্যবহার—এই বিশেষত্বই তাঁর কবিতায় প্রধানতঃ চোখে পড়ে। যেমন, 'হক নাম ভরসা'য় তিনি লিখেছেন—

আসলে হুজুর বড় বেদেরেগ দিল
চিল
কিম্বা বাজপাখি কিছু হলে পর
তাই বেহ্‌তর
হোতো। জানি গোস্বা করিবেন।

আবার, 'ছহি জঙ্গেনামা'তে—

জি হুজুর, আমি সেই হুজ্জত সরদার
জান নিয়ে বেঁচে আছি পাক-পরওয়ার
খোদাওন্দ করিমের করম ফজলে।
তবে কি না এলাহীর লানতের ফলে
হয়েছে এমন হাল। হাড়-মাংসহীন
আমি সেই খাক্‌ছার হুজ্জত্ কমিন।

কিন্তু এ তাঁর আসল কাজও নয়, সহজ স্বভাবও নয়। নিজের স্বভাবের কথা তিনি তাঁর 'যখন বিরতি' কবিতাটিতেই বোধ হয় সত্যিই ঠিক ঠিক বলেছেন। সাজঘরে অভিনেতাকে সাজতে হয়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিখুঁৎ অভিনয় করতে হয় তাঁকে। তারপর বিরতির সময় এলে রাজা কিংবা উজীরের পোষাক খুলে ফেলে,—এই কবি-অভিনেতা ঘাসের শিশিরে নিপুণ হাতে মুখের সমস্ত রঙ তুলে ফেলেন! তখন পুরোনো নদীতেই তিনি পা ডুবিয়ে বসেন,—সেই নিত্যকালের স্থায়িভাবের নদীতে!

হঠাৎ কখনো
গোধূলির নিমন্ত্রণে সাজঘরের আলো নিবে যায়।
কখনো সন্ধ্যায়
বকুল শিউলির কুঁড়ি গন্ধ দেয়।
কখনো পাখির
প্রসন্ন কণ্ঠের সুধা ঢেউ তোলে।
জানি না কখন

পুরোনো নদীর স্রোতে পা ডুবিয়ে বসেছি নির্জনে।

এবং এই নির্জনতায় তিনি জীবনের গভীর লক্ষ্যটি যেভাবে উপলব্ধি করেন, নশ্বর এবং ক্ষণভঙ্গুর অর্থে তাঁর সেই ভঙ্গী 'আধুনিক' নয় বটে, কিন্তু তা সত্যিই সমাদরের যোগ্য। তাতে আভাসে-ইঙ্গিতে দেশ-কালের আধুনিক পরিস্থিতির কথাও আছে, আবার কবির নিজস্ব জীবনানুভূতির বিশিষ্ট সুরটিও বেজে উঠেছে। বাংলা ভাষা সেখানে বিশুদ্ধ বাংলা থাকতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। 'আত্মার সুধা', 'পদ্মকলি ভোরের পাখিরা', 'অপার বিশ্বাস' ইত্যাদি শব্দ-সমাবেশ সেখানে সত্যিই অকুণ্ঠিত। আহসান হাবীব যে এক বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে জীবিত,—এবং ইতিহাসের দিগ্‌দিগন্তবিস্তীর্ণ পথে রোম্যাণ্টিক দৃষ্টিতে তিনি যে মিশর, ব্যাবিলন, কর্ডোভা, গ্রানাডার প্রতিও আগ্রহী, তার চিহ্ন আছে 'পারাপার' কবিতায়। অভিজ্ঞতা তাঁকে বিষণ্ণ করেছে, কিন্তু তাঁর আশা অটুট। 'শুক্লপক্ষের গান' কবিতায় তিনি সেই কথাই বলেছেন—

মনে হয়, আমি এই পৃথিবীর এক
সহিষ্ণু সন্তান
যার
আশৈশব পিপাসার প্রতিমার এই অবক্ষয়
এই নিত্য শেষ হওয়া, মুছে যাওয়া এই অপমান
একদা সার্থক হবে পৃথিবীতে।
আসন্ন আগামী কাল
জন্ম দেবে সে অমর্ত্য অটল মহৎ প্রতিভার
আর
নতুন সূর্যের তাপে উষ্ণ হবে পৃথিবীর বুক...।

হরপ্রসাদ মিত্র

* ছায়াহরিণ—আহসান হাবীব। কথাবিতান। ঢাকা, ১। মূল্য ২·৭৫।

সমালোচনা

The Prime of Life. *By* Simone de Beauvoir. André Deutsch Ltd. London. 36*s*.

সিমন দ্য বোভোয়ারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নানা কারণে পাঠকদের মনে কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁর আত্মচরিতের দুটি খণ্ড থেকে এই কৌতূহল অনেকটা মিটবে। "দি প্রাইম অব লাইফ" আত্মচরিতের দ্বিতীয় খণ্ড। এখানে আছে লেখিকার ১৯২৯ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত জীবনাংশের কথা।

আত্মচরিত কেন লেখা হয়েছে? ভূমিকায় লেখিকা তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। কোনো মানুষের জীবনই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; প্রত্যেকের জীবনেই বৃহত্তর জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং একজনের জীবনের ইঙ্গিত থেকে সমকালীন সমাজজীবন আলোকিত হয়ে ওঠে। আত্মচরিত লেখার এটি প্রধান প্রেরণা। এ ছাড়া লেখিকা হিসাবে তাঁর আত্মচরিতের বিশেষ মূল্য আছে। লেখিকার জীবনের পটভূমিকার সঙ্গে পরিচয় থাকলে পাঠক-পাঠিকা তাঁর রচনার মর্ম সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন।

বই আরম্ভ হয়েছে শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারের পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তির আনন্দের মধ্যে; শেষ হয়েছে আর এক মুক্তির উল্লাসের পরিবেশে—নাৎসী শাসন থেকে মুক্তি। প্যারিসে পৃথকভাবে জীবনযাত্রা শুরু করেছেন শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার। মা-বাবার নির্দেশ-উপদেশ আর নেই। কিন্তু জাঁ-পল সার্ত্র বলেছেন, এবার থেকে আমি তোমার ভার নিলাম।

সার্ত্র প্রায় সমবয়সী, মাত্র তিন বছরের বড়। অনেক পড়াশুনা, বুদ্ধির আশ্চর্য দীপ্তি, আর প্রখর ব্যক্তিত্ব। শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার সানন্দে সার্ত্র-এর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলেন। দুজনে পড়াশুনা করেন এক সঙ্গে। দর্শন, সমাজনীতি, সাহিত্য—কোনো বিষয়ই বাদ নেই। লেখবার জন্যই বেঁচে থাকা—এই ছিল সার্ত্র-এর আদর্শ। শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারকেও তিনি লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন। কিন্তু লেখার আগে জীবনের ঐশ্বর্যকে দেখতে হবে দু'চোখ ভরে। তার জন্য তাঁরা দুজন ঘুরে বেড়াতেন সর্বত্র; আলাপ জমাতেন সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে। তাঁদের অবাধ মেলামেশা ফ্রান্সের মতো দেশেও নিন্দার কারণ হয়ে উঠেছিল। একদিন লেখিকার বাবা এসে সার্ত্রকে অনুরোধ করলেন দ্য বোভোয়ারকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে; তা না হলে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। বলা বাহুল্য, সার্ত্র এ অনুরোধ রক্ষা করেননি।

অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে—এই ছিল ও'দের মূলমন্ত্র। সংস্কার নয়, একমাত্র যুক্তি হবে জীবনের পথ। বুদ্ধিজীবীর মনের আকাঙ্ক্ষা যদি যুক্তিসম্মত হয় তাহলে তাকে পূর্ণ করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় কোনো অগৌরব নেই,—সেই আকাঙ্ক্ষা সামাজিক সমর্থন না পেলেও। কোনো মতবাদ কিংবা গোষ্ঠীর দাসত্ব করবেন না,—এই ছিল তাঁদের সঙ্কল্প।

সার্ত্র-কে গভীরভাবে ভালোবাসলেও লেখিকা বিয়ের কথা ভাবেননি। প্রেমকে প্রথার গন্ডীর মধ্যে আবন্ধ করতে চাননি তাঁরা। তাঁদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে পরস্পরের নিকট কিছুই তাঁরা লুকোবেন না। শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার ঈশ্বরের পরে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেন সার্ত্র-এর উপরে। এই নির্ভরশীলতা এসেছে প্রতিদিনের পরিচয় থেকে। সার্ত্র যদি বলেন, বাইশ মাস পরে অমুক জায়গায় বেলা পাঁচটার সময় দেখা হবে, তাহলে কোনো কারণেই সে কথার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

সার্ত্র একটি দ্বার খোলা রেখে অভিজ্ঞতার অন্য সবগুলি দ্বার বন্ধ করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না। অনেক মেয়ের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারকে তিনি বলতেন : 'What we have is an essential love; but it is a good idea for us also to experience contingent love affairs.'

সার্ত্র-এর উপর নির্ভরশীলতা সত্ত্বেও শ্রীমতী বোভোয়ার তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। জীবন ও সাহিত্যকে উপলব্ধি করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। সার্ত্র সৌন্দর্যকে স্থান দিয়েছেন সকলের উপরে; তাঁর নিকট শিল্প ও সৌন্দর্য অবিচ্ছেদ্য। কিন্তুর সুন্দর ও অ-সুন্দর মিলিয়ে যে জীবন, সেই জীবনই শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারের নিকট বরণীয়। সার্ত্র বিশ্বাস করেন সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়িত্ব আছে; শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার সে দায়িত্ব স্বীকার করেন না। অন্ততঃ দায়িত্বের কথা মনে রেখে লিখতে হবে, একথা স্বীকার করে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সার্ত্র-এর সঙ্গে লেখিকার সম্পর্কের বিশ্লেষণ এই আত্মচরিতের একটি প্রধান আকর্ষণ। এখন তাঁরা দুজনেই বার্ধক্যের সীমানায় এসে পৌঁছেছেন। সুতরাং বলা যায় যে নর-নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিনব আদর্শ তাঁদের জীবনে সফল হয়েছে।

প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠার বইয়ে সার্ত্র সর্বত্রই উপস্থিত। যখন তিনি ফ্রান্সের বাইরে তখনও লেখিকার ভাবনার মধ্যে তিনি উপস্থিত। শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারের উপর সার্ত্র-এর প্রভাব যে কত গভীর তা এ থেকেই বোঝা যায়। তাঁর লেখার গুরু ছিলেন সার্ত্র। সার্ত্র-এর সস্নেহ উপদেশ শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারকে লিখতে প্রেরণা দিয়েছে। নতুন লেখকের মনের দ্বন্দ্ব, বাধা-বিঘ্ন, দুর্বলতা, অপটুতা, আশা-নিরাশার সুন্দর আলোচনা করেছেন শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার। একে একে তিনি লিখেছেন অনেক বইঃ সি কেম টু স্টে; ব্লাড অব আদার্স; অল মেন আর মর্টালস্; দি লঙ্ মার্চ; দি মান্ডারিন্স; দি সেকেন্ড সেক্স। 'শি কেইম টু স্টে'-র প্লট ও চরিত্র সম্বন্ধে লেখিকা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঠকদের আকৃষ্ট করবে বইটির শেষাংশ। এই ভাগে লেখিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের অবস্থার কথা বলেছেন। যুদ্ধ ঘোষণা করবার পরদিনই সার্ত্র সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন; কবিতা বা নাটক লেখার জন্য কোনো ফরাসী লেখকই রেহাই পান নি। প্রত্যেককেই সক্রিয়ভাবে যুদ্ধের কাজে যোগ দিতে হয়েছে। তারপর প্যারিসের পতন হল; একে একে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তৃত হতে লাগল ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে। সার্ত্র কাছে নেই; পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরাও কে কোথায় চলে গেছে। সর্বত্র যুদ্ধের বিভীষিকা। খাদ্যের অভাব; যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা। প্যারিস প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছে। শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে প্যারিসের বাইরে চলে যেতে হল। প্যারিস থেকে অনেক দূরে গ্রামাঞ্চলে জার্মান হানাদারদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। জার্মান সৈন্যরা কোনো

খারাপ ব্যবহার করেনি। চীনাদের মতো তাদেরও ছিল 'পীস অফেনসিভে'র কৌশল। ওদের গুলীতে ফরাসীরা মারা পড়লে জার্মানরা ক্ষমা চেয়ে বলত, কামান থেকে অকস্মাৎ গোলাটা ফস্‌কে গেছে, ইচ্ছা করে কাউকে মারিনি আমরা।

জার্মান অধিকৃত প্যারিসে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবার পর শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার আবার রাজধানীতে এলেন। জার্মান বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এসেছেন সার্ত্র। তারপর দুজনে প্রতিরোধ আন্দোলনের কাজ আরম্ভ করলেন। শুধু প্যারিসে নয়, বহু দূর-দূর অঞ্চলে ঘুরেছেন তাঁরা এই উদ্দেশ্যে। প্রতিরোধ আন্দোলন কেন্দ্র করে শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারের পরিচয় হয়েছে জিদ, ম্যালর, পিকাসো, ককতো, কাম্যু প্রভৃতি লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে।

জার্মান আক্রমণের মুখে ফরাসী জনসাধারণ যে দৃঢ় প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল তার পরিচয় শ্রীমতী দ্য বোভোয়ারের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় না। ডাক্তার রোগীদের ছেড়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্ত সেখানেও আছে। ফ্রান্সের জনসাধারণ এবং বুদ্ধিজীবীরা আশা করেছে ব্রিটেন ও আমেরিকা তাদের উদ্ধার করবে। বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে অনেক পরে, এবং তা-ও কখনো সর্বাত্মক হতে পারেনি।

এই ক'বছরের অভিজ্ঞতা এমনই ভয়ঙ্কর যে, শ্রীমতী দ্য বোভোয়ার বলেছেন জার্মান অধিকৃত প্যারিসের জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট কোনো ছবি তাঁর মনে নেই। তবে যুদ্ধ তাঁর একটি বড় উপকার করেছে। নিজের জীবনের সীমাবদ্ধ পরিবেশ নিয়েই এতদিন তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন; যুদ্ধের সংঘাত তাঁকে একেবারে দেশের মধ্যে বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করেছে। জীবনকে দূর থেকে না দেখে, জীবনধারার মধ্যে অবগাহনের শিক্ষা পেয়েছেন।

সাহিত্যগুণ বিচার করতে গেলে এই আত্মচরিতের কতকগুলি ত্রুটি চোখে পড়বে। বক্তব্যের তুলনায় বইয়ের আয়তন অনাবশ্যকরূপে বড়। অনেক স্থলে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে: তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিবরণে অনেক জায়গা জুড়েছে। এমন বহু চরিত্র অনাবশ্যকরূপে ভীড় করেছে যারা লেখিকার জীবনে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। "মেময়র্‌স্‌ অব এ ডিউটিফুল ডটার"-এর পরিচ্ছন্ন সাবলীল বর্ণনাভঙ্গী পাঠককে শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখে। এ বই তেমন জমাট নয়; স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব অনুভব করা যায়; মনে হয় যেন লেখিকা ভেবে ভেবে বিচার বিশ্লেষণ করে সতর্কতার সঙ্গে বইটি লিখেছেন। তবে লেখিকা যে সততা ও সাহসের সঙ্গে নিজের জীবনকে উন্মোচন করেছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তিনি পাঠকের প্রশংসা লাভ করবেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনাটা—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। বসুধারা প্রকাশনী। কলিকাতা ৬। মূল্য দুই টাকা।

আমার ধারণা কবিতায় রোমান্টিকতার মৃত্যু নেই। বাংলা কবিতায় বিহারীলালে যে রোমান্টিকতার সুরু তার সুর আজও শেষ হয়নি। মাত্র গত বছরে প্রকাশিত "সোনাটা" কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত পুরোপুরি রোমান্টিক।

রোমান্টিকরা নিজের মনকেই ঈশ্বরের আসনে স্থাপন করে থাকেন। কল্যাণকুমারও বলছেন : 'মন আছে, তাই সব; নতুবা জীবন নিরর্থক।' এই মনের খেলা আর উড্ডীনতাই রোমান্টিক কবিতার সম্পদ। এ মন নিয়ে কল্যাণকুমার যে স্বপ্ন দেখছেন তা এমন—

একটি গানের স্বপ্ন দেখে সে সমস্ত রাত ধরে,
খোলা জানালার ফাঁকে বাসমতী সখী হাওয়া তার
মুখ থেকে মুছে নেয় দিবসের অবসন্নতার
ক্লান্তির করুণ চিহ্ন, জ্যোৎস্না এসে আত্মীয় আদরে
অস্পর্শ চুমোয় তার প্রসন্ন ললাট দেয় ভরে,
দিনের রুক্ষতা শেষে হৃদয়ের আর্দ্র আকাঙ্ক্ষার
নীল ঘুমে থই-থই করে দুই চোখের কিনার,
সে যেন নিজেই স্বপ্ন ধ্যানশুভ্র তুলির আঁচড়ে।

(স্বপ্নের জন্ম ঃ জন্মের স্বপ্ন)

রোমান্টিক কবিতা ছাড়া এমন একটি সুন্দর স্তবক অন্য কোন ভঙ্গীর কবিতায় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

কল্যাণকুমার রোমান্টিক হলেও তাঁর মন জীবনের আর পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে যেতে নারাজ। অমর্ত্যের সঙ্গে যে তার বিচ্ছেদ তিনি তা স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন—

যে কণ্ঠ সংগীত আনে, স্বপ্ন আনে, আনে স্নিগ্ধ পিপাসার জল
অমর্ত্য সে কণ্ঠ জানি কোনোদিন শুধোবে না আমাকে কুশল।

(অমর্ত্য কণ্ঠ)

কিন্তু তা হলেও তাঁর সংগীত আছে, স্বপ্ন আছে এবং তা সব জীবনেরই বৃত্ত ঘিরে। ছবির রং আর গানের সুর যদি তাঁর কবিতায় না থাকত তবে বই-এর নাম "সোনাটা"-ই ব্যর্থ হয়ে যেত। 'সোনাটা'-কবিতায় ছবি আর গান এমনি ধরা পড়েছে—

বাউল চোখে দাঁড়িয়ে আছি
একলা জানালায়,
অশ্রু জমে ঘুমহারা দুই
চোখের কিনারায়,
এমন সময় জ্যোৎস্না এসে
শূন্য বিছানায়
দীর্ঘ রাতের কান্না যেন
বিছিয়ে চলে যায়।

(সোনাটা)

আজকের দিনের বুদ্ধি-জর্জর কবিতা পাঠের পর কল্যাণকুমারের অনুভবস্নিগ্ধ কবিতাগুলো পড়লে অনেকটা মুক্তির আনন্দ পাওয়া যায়। কল্যাণকুমার নিজেও বলেছেন—

এমনও মুহূর্ত আসে এক একদিন
বুদ্ধির দরোজা খুলে বোধির গহনে
ঢুকে পড়ি...

(আছে)

তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। কবিতার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক যাঁরা পাতাতে চান তাঁরা কবিতাকে নিশ্চয়ই স্বধর্মচ্যুত করেন। কল্যাণকুমারের কোনো কবিতাই স্বধর্মচ্যুত নয়—এই মস্ত আশার কথা।

দিনান্তের রঙ—আশাপূর্ণা দেবী। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। মূল্য ৬·৫০।

বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী একটা ব্যতিক্রম। অন্যদের মতো ইনি শুধু জীবনের কথা বলেই দায়িত্ব স্খালন করেন না, জীবনের বিষয়েও কিছু বলার চেষ্টা করেন। প্রয়াসগত এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আশাপূর্ণা দেবীকে কখনও একই মানসাবর্তে পুনঃ পুনঃ পরিক্রমণশীল হতে দেখা যায় না। একটা ন্যূনতম বিষয়গৌরব বা বক্তব্য-সচেতনতা যে লেখকের থাকে তিনি কখনো নিজের মনোগত 'বাধে' রুদ্ধগতি হন না। এই 'বাধ' বা ইনহিবিশন এই কারণেই লেখকের শত্রু যে জীবনের মুক্তচিত্ত অধ্যয়নের পথে এ সকল সময়েই একটা পিছুটান সৃষ্টি করে। এ পিছুটানে পুনঃ পুনঃ একই কবিতা লিখে ক্লান্ত করা হয়তো চলে, কিন্তু উপন্যাসে এ পিছুটান শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসে সর্বৈব মিথ্যা ব্যাখ্যা। কেননা উপাত্ত বা data সংগ্রহ থেকেই যেখানে মনোলৌল্যের প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ে—স্বভাবতই সিদ্ধান্তসমূহও সেখানে শিল্পাতিরিক্ত। ছক মাত্রেই এই বেহিসাবী জীবন ব্যাখ্যার স্রষ্টা। তাই ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যাত দুই সেখানে কুশিল্প। আশাপূর্ণা এই মানসিক আবদ্ধতার শিকার নন।

মেয়েদের চোখে দেখা পুরুষ-প্রধান বর্তমান সমাজের চেহারা অথবা তাঁদের অনুভূতিতে লব্ধ জীবনের ছায়াকেই মহিলা ঔপন্যাসিকদের লেখায় আমরা পেতে চাই—এর সঙ্গে বিষয়-গৌরবহীন মেয়েলী সীমাবদ্ধতার বাস্তবিক কোন যোগ নেই। যে মানবিক সম্পর্কগুলির ওপর আলোক-সম্পাতের অভিনবত্বে একজন ঔপন্যাসিকের সফলতা, একজন মহিলা ঔপন্যাসিকের সার্থকতাও তার থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। তিনি শুধু সেই সম্পর্ক-গুলিকে সহস্র সম্পর্কসূত্রে জটিল নারীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করেন, তার আবেগগত রূপ অপেক্ষা দেখতে চান তার অন্তর্গত স্বরূপকে। যেখানে এই সম্পর্কগত জটিলতার পাঠে ব্যত্যয় সেখানেই সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশের নিজস্ব সামাজিক বিন্যাসে একান্নবর্তী পরিবার জীবন এই শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত মোটামুটি অক্ষত ছিল। স্বভাবতই এই একান্নবর্তী পরিবার জীবন মহিলা ঔপন্যাসিকদের কাছে একটা আগ্রহোদ্দীপক উপাদান বলে বিবেচিত হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় তা হয়নি। দুই শতাব্দীর অধিকাংশ মহিলা ঔপন্যাসিকই শেষ পর্যন্ত নারী-জীবনের প্রবক্তা হয়েছেন, বা হওয়া লোভনীয় মনে করেছেন। মেয়েদের সততা, তিতিক্ষা, সুখ দুঃখ, দুর্ভোগ প্রভৃতির মনোজ্ঞ ছবি তাঁরা এঁকেছেন। কিন্তু সম্পর্কসূত্রগুলির প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক প্রতিঘাত তাঁদের হাতে সকল সময়েই এড়িয়ে গেছে। এ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মহিলা ঔপন্যাসিকদের দীর্ঘ প্রয়াসেও এ দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত হয়নি। আর সামাজিক চলিষ্ণুতার বর্তমান পর্যায়ে জীবিকার ক্ষেত্রে মেয়েদের

যোগদানের ফলে তাঁদের দুঃখ-দুর্ভোগের রকমফের হয়েছে বটে—কিন্তু এই ব্যাপারটা মহিলা ঔপন্যাসিকদের তেমন স্পর্শ করেনি। বোধ হয় এই কারণে যে দুঃখ-দুর্ভোগের এই রূপান্তরিত অবস্থায় তাঁদের পক্ষে পূর্বের মতো নারীজীবনের প্রবক্তা হওয়ার প্রয়োজন কম। কম বলেই, একটা ব্যাপার নজরে পড়ে, মহিলা ঔপন্যাসিকদের সংখ্যা আগের মত স্ফীত নয়। এ'দের মধ্যেও যাঁরা লিখছেন, তাঁরা অন্যান্য অধিকাংশ বাঙালী পুরুষ ঔপন্যাসিকদের মতোই মেয়েদের জন্য লেখেন মাত্র। মহিলা ঔপন্যাসিকদের কাছে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আমরা আশা করি তা এ'দের কাছে বাহুল্য।

আশাপূর্ণা দেবী আমাদের সে অভাব পূর্ণ করেন নি। তৎসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে একটা গুরুত্ব-গম্ভীরতা সদাই বিদ্যমান যা তাঁকে মহিলা ঔপন্যাসিকদের তো বটেই অন্যান্যদের মধ্যেও বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস "মিত্তিরবাড়ী", অথবা হালের উপন্যাসগুলির যে কোনোটি এবিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। "দিনান্তের রঙ" তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এখানেও আশাপূর্ণা দেবীর সাহসিক বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট।

সুচিন্তা সদ্যবিধবা প্রৌঢ়া। স্বামী অভিজাত পাড়ায় নতুন হালফ্যাসানের বাড়ি তৈরী করতে করতে মারা গেছেন। তিন দেদীপ্যমান যুবক পুত্রকে নিয়ে সুচিন্তার স্বচ্ছল অপরাহ্ণ ভালোই কেটে যাবার কথা। যাচ্ছিলও। আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে উদাসীন, অমিশুক এবং আত্মকেন্দ্রিক এই পরিবারটি নিজেদের নিথর জগত নিয়ে সুখেই ছিল। এমন সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল নীতা ও নীতার বাবা সুশোভন। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত সুশোভনের ভাইয়েরা কলকাতা থাকা সত্ত্বেও নীতা এসে উঠল এই কারণে যে তার বাবার মানসিক অসুস্থতায় এমন একজনকে দরকার—'যার মধ্যে রোগীর মনের সমস্ত শূন্যতার পরিপূর্ণতা।' সুচিন্তার তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ সত্ত্বেও উপন্যাস এগুতে এগুতেই বোঝা গেল যে নীতার অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ আছে। সুশোভন এবং সুচিন্তার একটা অতীত ছিল, যে অতীত তাদের দুজনেরই নিজস্ব মাত্র। সুচিন্তার বর্তমান জগতে সুশোভন কোন্ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল লেখিকার সেটাই ছিল উপন্যাসে উন্মোচনের বিষয়। সুশোভনকে ঘিরে সুচিন্তার যে অনুভূতি পুনরুজ্জীবিত হল তাকে লক্ষ্য করেই "দিনান্তের রঙ" নামকরণ। উপন্যাসের এই মূল ধারার অনুবর্তী হয়ে বয়ে চলেছে নীতার অন্তর্গভীর উচ্ছলতা। সুচিন্তার তিন ছেলেই কমবেশী করে নীতার সম্পর্কে এসেছে এবং তার তিন রকম প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করেছি। নীতার প্রবাসী বাগদত্তের কথাও সে সূত্রে স্থানলাভ করেছে। সুশোভনের কলকাতাবাসী অন্য দুভায়ের পারিবারিক জীবনের কথাও ন্যায্যতঃই বলা হয়েছে। সুচিন্তার ছোট ছেলে ইন্দ্রনীলের প্রেম এবং বিবাহও উপন্যাসের আর একটি শাখা-কাহিনী। সুচিন্তার দিক থেকে ভাবলে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে আশাপূর্ণা দেবীর অভিনবত্বের স্বাক্ষরকে চেনা যায়। এবং উপন্যাসের কাঠামোকে একনজরে দেখলে এই বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে সুচিন্তা এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সুচিন্তাকে ঘিরে এ উপন্যাসের সকল বৃত্ত ও বৃত্তাংশ রচিত। সুতরাং উপন্যাসের নিজস্ব ন্যায়ক্রমেই একথা স্পষ্ট যে সুচিন্তাকে যদি ঠিকমতো দাঁড় করানো যায় তাহলে সুচিন্তার সঙ্গে প্রসঙ্গবদ্ধ হয়ে অন্যেরাও সত্য হয়ে উঠবে। নতুবা সবই এ রচনায় উদ্দেশ্যহীনতায় পর্যবসিত হবে।

একথা বলতে বাধ্য যে আলোচ্য উপন্যাসে তাই হয়েছে। সুচিন্তার দিক থেকে সমস্যাটার স্বরূপ কী প্রথম থেকেই সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। সুশোভনের অকস্মাৎ আবির্ভাবে সুচিন্তার জীবনের ছক প্রচণ্ডভাবে ঘা খেয়েছে। কিন্তু কেন সেটা কোথাও

স্পষ্ট হল না। সুচিন্তা একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে, কেননা সুশোভনের উপস্থিতিটা সে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। আর সুশোভনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুচিন্তার সুশোভনকে জড়িয়ে যে অতীত কথাগুলি মনে পড়েছে এ বোঝা গেল। কিন্তু সে তো শুধু শৈশব-সুখ-স্মৃতি। সুচিন্তার সমগ্র জীবনে এর মূল্য কতটুকু ছিল? কাজেই সুশোভনকে ঘিরে সুচিন্তার যে বর্তমান প্রতিক্রিয়া তা একটি নতুন অধ্যায় না পুরোনো অধ্যায়ের জের তা স্পষ্ট হল না। নতুন অধ্যায় হলে সুচিন্তার অনুভূতি কেবল আর্তসেবার পর্যায়েই থাকে কেন? উপন্যাসে প্রথমাবধি সুচিন্তার সুশোভন-সংক্রান্ত মনোভাব একটা বিন্দুতেই বন্ধ রইল। না এগিয়েছে, না পেছিয়েছে। আর, যদি পুরোনো অধ্যায়ের জের হয়, তাহলে সুচিন্তার মধ্যবর্তী জীবনের মসৃণতা কোথাও না কোথাও ক্ষুণ্ণ হবার কথা। এবং সেই জের ধরে সাম্প্রতিক অধ্যায়ের গ্রন্থন হবে। তার কোনো প্রমাণ এ বইয়ে নেই—একমাত্র সুশোভনের ছবি সুচিন্তাকে নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল এই সামান্য ঘটনাটুকু ছাড়া। কাজেই সুচিন্তা সুশোভন সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কী ভাবছে সে কথা বোধ হয় সেও ভয়ে ভয়ে ভাবেনি। আশাপূর্ণাও ভয়ে ভয়ে বলেন নি। সুশোভনের কাণ্ডজ্ঞান-হীন উদ্দাম সারল্য ও সুচিন্তা-নির্ভরতা সুচিন্তাকে বিচলিত করছে বোঝা যায়। কিন্তু তার মূল্য কতটুকু? একটা মাতৃহৃদয়সম্পন্ন প্রৌঢ়া মহিলা যে কোনো এ জাতীয় দুঃস্থের প্রতি ক্ষমাশীল, তাকে কী হল? সুচিন্তা কেবলমাত্র পুরানো স্মৃতির জন্যেই মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছে—এইটুকুই যা জটিলতা, নইলে? কাজেই বইয়ের শেষে সুশোভনকে নিয়ে সকল স্বজন-পরিত্যক্ত সুচিন্তা যখন 'এই পাগলটাকে নিয়েই আমায় সারাজীবন জ্বলতে হবে' বলে 'অনুপম কুটিরে' ফিরে এল তখন সুচিন্তার আত্মত্যাগের বেশী অন্য কোনো তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। এবং সারাজীবন বলতে যদি অতীতকে ধরে ভাবা হয় তাহলে সে অতীতে সুশোভন বস্তুতঃ সামান্যই ছিল।

অথচ বাইরের দিক থেকে বিষয়টিকে জটিল করে তোলার জন্য প্রচুর উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে। পুত্রদের সঙ্গে সুচিন্তার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, সুশোভনের ভ্রাতৃবধূর কাছে তার অপমান, নিজের পুত্রবধূ ও তার মা-বাবার সুচিন্তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার একের পর এক এসেছে। কিন্তু পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত কারণগুলির জন্যই তারা কেউ দাঁড়াবার জায়গা পেল না। তাছাড়া সুচিন্তার জীবনের ছক প্রথম থেকে এমন ভাবে পরিকল্পিত যে ঐ সব সম্পর্কের হেরফের সুচিন্তাকে বেশী স্পর্শ করারও কথা নয়। ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক যার নিরাবেগ, প্রতিবেশীদের বেলায় যে অসামাজিক, আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে যে উদাসীন তার সম্পর্কের জগতে ভাঙাচোরা তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে না। এই কারণে, শাখা-কাহিনীগুলির কেউ কেউ একক সফলতা লাভ করলেও সমগ্রের পটে তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে অকিঞ্চিৎকর। আর, মেজ ছেলে নিরঞ্জনের সঙ্গে সুচিন্তার যে বিরোধ তার মূল প্রকৃতপক্ষে সুশোভন নয়। নীতার ব্যাপারে হতাশাই তাকে গৃহত্যাগী করিয়েছে। সুতরাং তার জন্য সুচিন্তার দুঃখ থাকলেও দায়িত্ব কম। সুচিন্তা দায়িত্বটা নিজ কাঁধে টেনে নিয়েছে, কেবল ব্যাপারটার মূল কোথায় বুঝতে পারেনি বলে।

সুশোভন যদি সুচিন্তার ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ্যের অবলম্বন হয়ে উঠত তা হলে এ উপন্যাস সম্ভাবিত মুক্তিপথ খুঁজে পেত। লেখিকা সে বিষয়ে কখনো কখনো অবহিত হয়েছেন। কিন্তু সে অবধানতা সর্বত্র স্বচ্ছন্দ নয়। তাই উপন্যাসের ছন্দেও ব্যত্যয় ঘটেছে। ইন্দ্রনীলের শ্বশুড়বাড়ি-প্রসঙ্গ এই কারণেই পরিমিতি ছাড়িয়ে উপন্যাসে

ছন্দোপাত ঘটিয়েছে। নীতার কথায় এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে তার গল্পও এ উপন্যাসে হয়েছে তার বাবার গল্প এবং তার প্রেমের গল্প। কিন্তু এই দুই গল্প নীতার জীবনের গল্প হবে তখনই যখন নীতা জীবনবিষয়ক কোনো ব্যাখ্যা বা তাৎপর্যের সন্ধান আমাদের দেবে। নীতা এবং নীতা কেন কেউই এ উপন্যাসে তা আমাদের দিতে পারেনি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

The Key. *By* Junichiro Tanizaki. Signet Book. New York. 50*c*.

অবশ্যই যযাতি উপাখ্যান পৃথিবীর অন্যত্র অপরিজ্ঞাত। আমরা জানি, তাই বয়সের এক বিশেষ পরিণতির সময় আমাদের বানপ্রস্থে মানসিক সুস্থিতির অন্বিষ্টা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু অন্যত্র, বয়সভেদে ভিন্ন কর্মের শিক্ষা অনুপস্থিত। সেখানে মানুষ তখনও সম্ভোগে অক্লান্ত। যযাতির যৌবন প্রার্থনা তখনও তাঁদের মনে। যদিও আমাদের দেশে বানপ্রস্থের স্বর্গদ্বার কতজনের প্রার্থিত, তা সন্দেহের বস্তু। এবং এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী কোনো প্রৌঢ় *The Key* উপন্যাসের নায়কের মতই হৃত যৌবন ফিরে পাবার উৎকট প্রয়াসে মত্ত। তবু ভয়ে, সম্ভবত লোকভয়ে, আধৃত মনের এই অন্ধকারে তাঁরা আধিক্লিষ্ট থাকার পথকেই শ্রেয় মনে করেছেন। অনুমান করা কঠিন নয়, বয়সে দিনান্তেও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নির্মোহ হওয়া অসম্ভব। তাই যদি কেউ চারিত্রোব ভারতীয় ব্যাখ্যায় অবিশ্বাস পোষণ করেন তা এমন কি দোষণীয়?

জুনিচিরো তানিজাকি মোক্ষলাভের এই ভারতীয় নির্দেশ অমান্য করেছেন। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় উপনীত এক অধ্যাপকের মনোভঙ্গীকে তিনি তাঁর *The Key* উপন্যাসে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী। বস্তুত, এই মানসিকতা এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষের নয়। স্বাভাবিক নিয়মেই তা সকল মানুষে ব্যাপক। তানিজাকি মোক্ষলাভের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছেন।

The Key উপন্যাস বস্তুত এক দুঃসাহসীক সাহিত্যকর্ম। আমাদের জীবনের বহু সত্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কখনও তা নারকীয় কদর্যতায় বিপন্ন। পরিচ্ছন্ন মননকে আমরা আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করি, তার কারণ, সবসময়ে আমরা সত্যের সম্মুখীন হতে অক্ষম। কিন্তু বর্তমান জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এই সত্যকে বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। মধ্যবয়সী কোনো মানুষের অসাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়নি। এর আপাতদৃষ্ট অস্বাভাবিকতা, একটু গভীরে প্রবেশ করলেই, মোহভঙ্গের কারণ। স্ত্রী সম্ভোগের অপরিসীম ইচ্ছায় এক প্রৌঢ় অধ্যাপকের বহু পিচ্ছিল কুটিল পথ পরিক্রমাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তাঁর স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসা সকল সন্দেহের অতীত। তাই যখন অধ্যাপক প্রথম অনুভব করতে আরম্ভ করলেন, তার যৌবন প্রায় অতিক্রান্ত, তখন তাঁর বিবাহিত জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়কে দীর্ঘতর করার প্রয়াস অবশ্যই করুণার উদ্রেক করে। সেই সময়েই তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন, যৌন সম্ভোগের জন্য সে সময় তাঁর যে প্রবল তৃষ্ণা, তা সহজভাবে স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনে কখনই পরিতৃপ্ত হয়নি। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত অধ্যাপক, হঠাৎ এক নতুন প্রক্রিয়ার সন্ধান পেলেন। যার ফলে তাঁর শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের গভীরতা সঞ্চারিত হল। আর এই প্রেম আরো গভীর

হল, তাঁর মনে অপরিসীম ঈর্ষার ফলেই। অথচ এই ঈর্ষা কোনোক্রমেই প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয় সাপেক্ষ নয়। বিষয়ীর সৃষ্টি।

এই হঠাৎ নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার তাদের দুজনকেই অন্ধকার কদর্য পথে টেনে আনল। এমনকি ইকুকো, যাকে অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন, দেহ সম্পর্কে সংকুচিত মনে হয়,—সেও এই নতুন ভোগের স্বেচ্ছা শিকার। এই কাজে অধ্যাপক ব্যবহার করলেন কিমুরাকে। তাঁর ভাবী জামাতা। কারণ ইকুকু তার অজ্ঞান, অসংযত মনোবিকারে বারে বারে কিমুরাকেই কামনা করেছে। প্রার্থনা করেছে তার শরীর সান্নিধ্য। স্বভাবতই এ ঘটনা অধ্যাপকের ঈর্ষার কারণ। তিনি অনুভব করেছেন, এই ঈর্ষা তাঁকে ইকুকোর আরো ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করে।

স্বামী এবং স্ত্রী, তাদের দুজনের দুই ভিন্ন ডায়েরী থেকে এই ঘটনাগুলি সংগৃহীত। আর এরই মাধ্যমে তানিজাকি দুই ভিন্ন জীবনের, গতায়ু যৌবনের অক্ষম পঙ্কিলতা আবিষ্কার করেছেন।

গ্রন্থের শুরুতেই অধ্যাপকের ডায়েরীতে লেখা :

This Year I intend to begin writing freely about a topic which, in the past, I have hesitated even to mention here. I have laways avoided commenting on my sexual relations with Ikuko, for fear she might surreptitiously read my diary and be offended.

তার পরেই ইকুকোকে উদ্দেশ্য করে তাঁর খেদোক্তি : You dont love me half as much as I love you.

কিন্তু এর পরেই যখন পড়ি,

Moreover, I replenish my vitality by male hormones once a month, as prescribed by Dr Nomo at my request তখন স্বভাবতই মনে হয়, যযাতি উপাখ্যান অন্তত এই ভদ্রলোকের জানা উচিত। এ সম্পর্কে তাঁর অপনেয় অজ্ঞতাই তার যন্ত্রণার কারণ। অথচ অবাক লাগে ভাবতে ৮ই জানুয়ারীর ডায়েরীতে ইকুকো তার স্বামীর সকল কুটৈষণা জানার পরেও লিখেছে, I violently dislike my husband, and just as violently love him. No matter how he disgusts me I shall never give myself to another man. এটুকু পড়ার পরেই মনে হয়, জাপানের এই অধ্যাপক অতঃপর মোক্ষলাভ করলেন। শুধু তাই নয়, এই মোক্ষ তার মহানির্বানেরও কারণ।

ইকুকোর স্বীকারোক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

..I'd told myself I was behaving like a devoted wife, even from an old-fashioned moral point of view. But then I threw off the mask of self-deception and frankly admitted I was in love with Kimura.

আর তারপর তোসিকোর সমর্থনে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হল তা সত্যি বিস্ময়কর। ইকুকো লিখেছে : According to Kimura's plan, he'll marry Toshiko when the mourning period is over. She'll make the sacrifice for the sake of appearences ; and the three of us will live here together. That is what he tells me.

এতদসত্ত্বেও মা ও কিমুরার ঘনিষ্ঠতার প্রতি তোসিকোর সমর্থন এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নানা অর্থে আমাদের বিচলিত করে। বস্তুত নানা প্রশ্নেরও কারণ।

অনস্বীকার্য, তানিজাকি এক নিপুণ কারিগর। এমন একটি দুর্বহ ঘটনাও তাঁর রচনার গুণে সুন্দর হয়েছে। অপরিসীম জীবন-বিকার সত্ত্বেও আমরা গ্রন্থটিকে অপরিশীলিত বলে অভিহিত করতে পারি না। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্ন আসে, মানুষের জীবনের বহু জটিল যন্ত্রণার কারণ পরিহার করে এমন একটি পটভূমি নির্বাচন গ্রন্থকার করলেন কেন? এই গ্রন্থ যদি বর্তমান জাপানের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি হয়, তবে স্বভাবতই আমরা হতাশা বোধ করব। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি কোনোক্রমেই সমাজজীবন নিরপেক্ষ নয়। আর তাছাড়াও জাপানেব সমাজজীবনে এখনও তো গত যুদ্ধের ক্ষতের দাগ!

নৃপেন্দ্র সান্যাল

৪৯ বছর কাজ করছেন···গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি

ভারতের কলকারখানায় দুর্ঘটনার হার ১৯৩৮ সালে প্রতি হাজার কর্মীপিছু ২৪ জন থেকে বেড়ে ১৯৫৯ সালে হাজারে প্রায় ৪৪ জন দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর দুর্ঘটনায় গড়ে ৯৩০০০ কর্মী জখম হন এবং তার মধ্যে প্রায় ২৫০ জন মারা যান। দুর্ঘটনার দরুণ বছরে প্রায় দশ লক্ষ ঘণ্টার কাজ নষ্ট হয়। এই নষ্ট সময় কাজে লাগালে ভারতীয় রেলওয়ের জন্যে ১৭০টি ব্রডগেজের ইঞ্জিন বা ৭০০টি রেলের কামরা তৈরী করা যায়।

টাটা স্টীল নিরাপত্তার দিকে সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখে, কারণ তা না হ'লে কোনো কর্মীই পুরোপুরি শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন না। বছরে নিয়মিত 'নো অ্যাক্সিডেন্ট মাস', নিরাপত্তা প্রদর্শনী, নিরাপত্তা সম্বন্ধে শিক্ষাদান, নিরাপত্তা পুরস্কার, নিরাপদে কাজ করবার সুযোগ-সুবিধে, নিরাপত্তাকে অভ্যাসে দাঁড় করানোর জন্যে যুক্ত পরিষদের পরিচালনায় টানা অভিযান চালানো···জামশেদপুর কারখানায় দুর্ঘটনা দূর করার জন্যে এইসব উপায় অবলম্বন করা হয়।

কাজে নিরাপত্তা কিন্তু কর্মীর নিজের ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে, কারণ দেখা যায়, প্রায় ৭৫ ভাগ দুর্ঘটনা মানুষের অসাবধানতার জন্যে ঘটে। কিন্তু এরই আর একটি দিক হল টাটা স্টীলের আজকের সবচেয়ে পুরোনো কর্মী ফকুনা দুবে। ৪৯ বছর ধরে দুবে টাটা স্টীলের কারখানায় কাজ করছেন অথচ আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো আঘাত লাগেনি, এমন কি একটা আঁচড় পর্যন্ত না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ইস্পাত নগরী জামশেদপুরে এসে দুবে যে জিনিষগুলি প্রথমেই শেখেন তার মধ্যে প্রধান হ'ল হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা···জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

জামশেদপুর

ইস্পাত নগরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 6098

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন
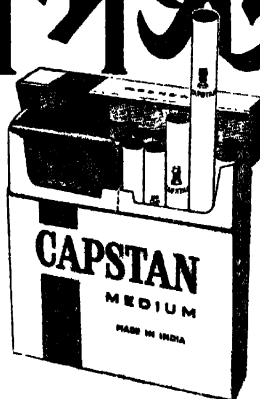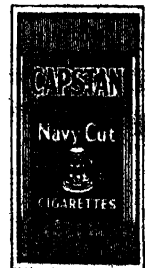
গৃহসীমান্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার জন্য ভারতের প্রতিটি নারীর পক্ষে বর্ত্তমানে অনেক কিছু করার রয়েছে। স্থানীয় নারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করুন। করার মতো বহু কাজ রয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা. তহবিলে দান করুন, অন্যকেও দান করতে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনুন। শৃঙ্খলা রক্ষায়, ব্যবহার গঠনে, মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদিতে আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে পারেন :

* অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন; অযথা জিনিষপত্র কেনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন।
* সোনা কিনবেন না। দেশের জন্য সোনা দিন।
* যে কাজই হোক্ না কেন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তা পালন করুন, কারণ, সুচারুভাবে সম্পন্ন প্রতিটি কাজ জাতীয় প্রস্তুতিতে সাহায্য করে—ভারতকে শক্তিশালী করে।
* নিরুৎসাহিতা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের কর্ত্তব্যে অংশ গ্রহণ করুন।

সদা সতর্ক থাকুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন।

DA-[illegible]/71 (Bengali)
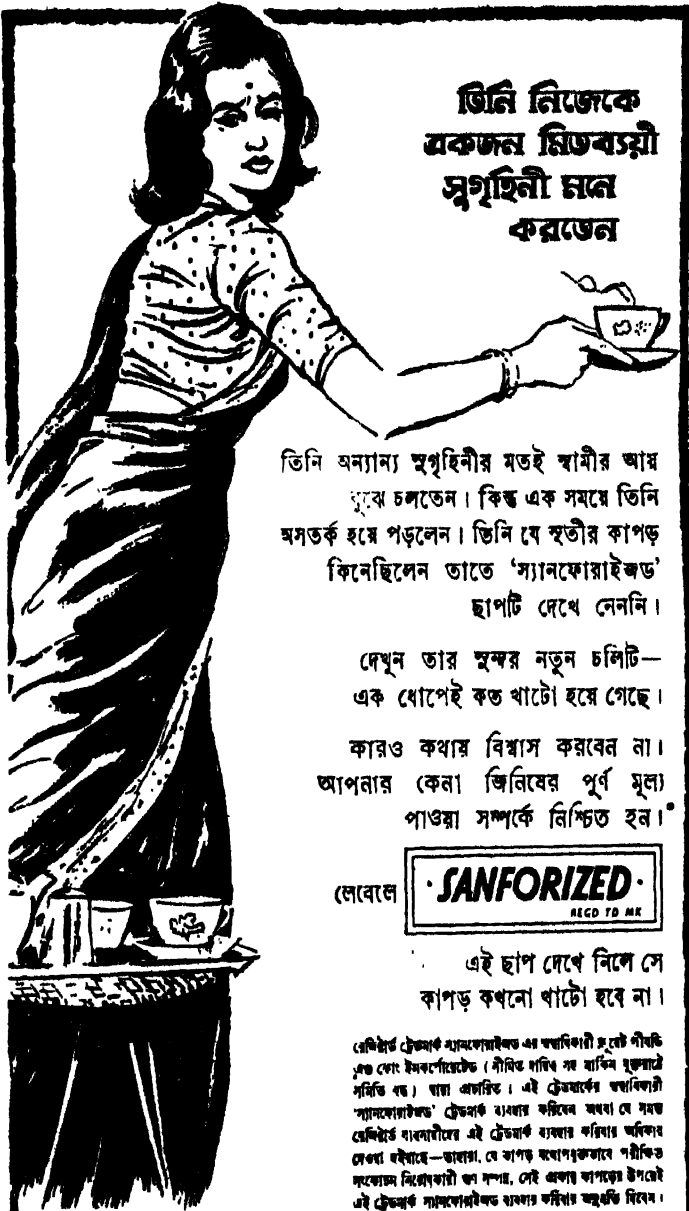
তিনি নিজেকে
একজন মিতব্যয়ী
সুগৃহিনী মনে
করতেন
তিনি অন্যান্য সুগৃহিনীর মতই স্বামীর আয় বুঝে চলতেন। কিন্তু এক সময়ে তিনি অসতর্ক হয়ে পড়লেন। তিনি যে সূতীর কাপড় কিনেছিলেন তাতে 'স্যানফোরাইজড' ছাপটি দেখে নেননি।
দেখুন তার সুন্দর নতুন চলিটি—এক ধোপেই কত খাটো হয়ে গেছে।
কারও কথায় বিশ্বাস করবেন না। আপনার কেনা জিনিষের পূর্ণ মূল্য পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হন।
লেবেলে
·SANFORIZED·
REGD TD MK
এই ছাপ দেখে নিলে সে কাপড় কখনো খাটো হবে না।
সবিশেষ খবরের জন্য: 'স্যানফোরাইজড' সার্ভিস,
৭৫, মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই—২
স্যানফোরাইজড্ ছাপ ১২৯টি দেশে রেজেষ্ট্রীকৃত ও নির্ভরযোগ্য—ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর অন্যতম সহায়।
SAN-277 A BEN.

কিছুটা মনস্তত্ত্বমূলক .:.

মনস্তাত্ত্বিকগণ আমাদের, অন্যের ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজেদের ছেলেমেয়ের তুলনা করতে নিষেধ করেন। ওঁরা বলেন যে এতে শিশুদের স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হয়। মেট্রিক ওজনের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি খাটে।

শিশুদের (এবং মেট্রিক ওজনের) সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ওদের স্বাভাবিক দোষত্রুটিগুলি মেনে নিন।

সের বা মণের সমতুল হিসেবে মেট্রিক ভগ্নাংশ ব্যবহার করবেন না।

এতে আপনার সময়ের অপব্যয় হবে এবং হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা ও ন্যায্য লেনদেনের জন্য

পূর্ণ সংখ্যার মেট্রিক এককগুলি

ব্যবহার করুন

MARGO
TOILET SOAP

রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

কাব্যপরিক্রমা ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা রাজা ডাকঘর জীবনস্মৃতি ছিন্নপত্র গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য সম্বন্ধে আলোচনা। মূল্য ২·২৫ টাকা

ব্রহ্মবিদ্যালয় ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রারম্ভ-যুগের ইতিহাস ও আদর্শ। মূল্য ১·৮০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী
রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম রীতিমত সমালোচনা। মূল্য ২·০০ টাকা

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ-রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। মূল্য ৫·০০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা বলা হয় দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা। মূল্য ১·০০ টাকা

রবীন্দ্রস্মৃতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী। মূল্য ২·০০ টাকা

নির্বাণ ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী
কবি-জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে। মূল্য ১·০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
সুন্দর গদ্যে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সনাথ শান্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ। মূল্য ৪·০০ টাকা

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ
জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথাবার্তা-আলোচনাদি করেছেন তার আংশিক সংকলন। মূল্য ৩·৫০ টাকা

গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ
রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। মূল্য ৫·০০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ৭·০০ টাকা

আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
সরল স্বচ্ছ সশ্রদ্ধ এবং মাঝে মৃদু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শান্তিনিকেতনের কাহিনী। মূল্য ৫·০০ টাকা

আমাদের গুরুদেব ॥ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা কেন্দ্র সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ ও সসম্ভ্রম আলোচনা। মূল্য ৩·৫০ টাকা

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

৪নং ফর্ম

[রুল ৮]

১। প্রকাশ স্থান : ৫৪ গনেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

২। প্রকাশের সময় : প্রতি দিন মাসে

৩। মুদ্রাকর : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গনেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

৪। প্রকাশক : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গনেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

৫। সম্পাদক : হুমায়ুন কবির
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গনেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩

৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা : শ্রীমতী শান্তি কবির, জয়তী লায়লা কবির, ২ মতিলাল নেহেরু প্লেস, নয়াদিল্লী; ডঃ পি. কে. কবির; আতাউর রহমান, ৫৪ গনেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা, ১৩।

আমি, আতাউর রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ ২৮. ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

আতাউর রহমান
প্রকাশক

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

তিন জওয়ানের মা
নির্ভয় মায়ের তিন ছেলে। একজন সীমান্তের সৈনিক। অন্যজন কারখানার শ্রমিক। আর
তৃতীয়জন ক্ষেতের কৃষক। লক্ষ্য তাঁদের এক। স্বাধীন দেশের স্বাধীন আবহাওয়ায়
তাঁরা মানুষ। সেই স্বাধীনতা রক্ষার কর্তব্যে এখন তাঁরা ব্রতী। তাই প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত
উৎপাদন। তিনবাহু একত্রে প্রচণ্ড শক্তি। তাকে পরাভূত করে এমন ক্ষমতা পৃথিবীতে নেই।
Bata

চতুর্বিংশতিতম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯

বিনিয়োগ, ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার

অশোক মিত্র

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষায় যে-সব দেশকে বলা চলে অনগ্রসর, তাদের ঔৎপাদিক সংস্থার চারিত্র্য নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি কৃষিকর্ম থেকে সঞ্জাত হচ্ছে, এবং সেজন্যই দেশগুলি এতটা গরীব। কৃষিকলার মান স্তিমিত: এমন হয়তো যে দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোকই চাষবাস থেকে জীবিকা উপায় ক'রে থাকেন, ফলত ভীষণ ঠাসাঠাসি। এই পরম্পরার ফলে গড়পড়তা আয়ের মাত্রা নিচু থেকেই চলে। আরো দেখা যায়, কৃষিকর্মের বাইরে যা গড়পড়তা উপার্জন, কৃষি-কর্মে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র, কখনো-কখনো অনুপাত কষলে অঙ্ক দাঁড়ায় গিয়ে ৫ : ১।

সুতরাং বলতেই হয় আর্থিক প্রগতি এসব দেশের পক্ষে তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল: (ক) কৃষিকর্ম থেকে জীবীকান্বেষীদের আনুপাতিক সংখ্যাহ্রাস, (খ) কৃষি-কলার প্রাকরণিক প্রসার, এবং, সবশেষে, (গ) শিল্প-বাণিজ্য-বিনিময় প্রভৃতির দ্রুততর ব্যাপ্তি। এরকম ব্যাপ্তি ছাড়া যে-সব লোক কৃষিকর্ম পরিত্যাগ ক'রে শহরে-গঞ্জে চ'লে আসছে তাদের কাজ-জোগানো অসম্ভব।

সমস্যা হলো যে এ-সমস্তের জন্যই প্রয়োজন মূলধনের। বিনিয়োগের সারাৎসারের অভাব হ'লে কোনো-কিছুই সম্ভব হবে না: কৃষিকলার মানও বাড়ানো যাবে না, অন্যদিকে কলকারখানায় কিংবা বন্দরে-ঘাটে লোকনিয়োগের পরিমাপ সীমিত থেকে যাবে। এটা প্রায় সর্বস্বীকৃত যে জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা দশ থেকে পনেরো অংশের সমপরিমাণ বিনিয়োগে ব্যাপৃত না করতে পারলে প্রগতি ব্যাহত হবে। কখনো-কখনো অবশ্য বিনিয়োগের খানিকটা বৈদেশিক মূলধন দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে; কিন্তু জাতির স্বকীয় সঞ্চয় থেকেই তার প্রধান দায়িত্ব মেটাতে হবে। বিদেশী সাহায্য বড়ো জোর পরিপূরক হ'তে পারে, কিন্তু জাতীয় প্রগতি প্রধানতই নির্ভর ক'রে দেশের লোকদের সঞ্চয়প্রবৃত্তির উপর, ত্যাগস্বীকারের ইচ্ছার উপর। এই ত্যাগের বেশি বহর কারা বহন করবেন? বিনিয়োগের প্রয়োজন কৃষিতেও যেমন, শিল্প-বাণিজ্যেও তেমনি। কিন্তু সঞ্চয়ের জন্যও কি আমরা দেশের সবশ্রেণীর, সব জীবিকার লোকদের দিকে তাকাবো, না কি বলবো এ'রা-এ'রা শুধু সঞ্চয় করবেন, ও'রা-ও'রা

অসমর্থ, ও'দের উপর দায়িত্ব চাপানো ঠিক হবে না?

চারপাশে তাকালেই হালের একটা লক্ষণ প্রতীয়মান হয়, প্রায়-সব গরিব দেশেই জাতীয় সরকার বিনিয়োগের মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আর্থিক প্রগতির পরিপোষক যে-ধরনের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন আবশ্যিক, নানা কারণে সরকার সে-সবকিছুর মাথাব্যথা মাথা পেতে নিয়েছেন। সুতরাং কি কৃষিতে কি শিল্পে কি বাণিজ্যে, সঞ্চয় যেখানেই হোক না, তার এক মস্ত অংশ করনিয়োগ ক'রে কিংবা সরকারি লগ্নির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সরকারের হাতে পোঁছুতে হবেই। যেহেতু লগ্নির কারুকলা এসব দেশে এখনো খুব-একটা সুগঠিত নয়, এখানে-ওখানে গ'ড়ে-ওঠা জাতীয় সঞ্চয়কে সরকারের হাতে অর্পণের জন্য করপ্রথাই আপাতত মহত্তম পন্থা। করের সাহায্যে প্রথম দফায় সঞ্চয় সরকারের খাতে জমা হয়, তার-পরে অবশ্য সরকারের নানা ব্যয়ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সঞ্চয়ই দেশের লোকের হাতে ফিরে আসতে থাকে।

একটু আগে বলা হয়েছে যে কৃষি থেকে গড়পড়তা আয় তুলনায় অত্যন্ত কম, জাতির সামগ্রিক যা গড়পড়তা উপার্জন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেকটাই কম। এই তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে মাঝে-মাঝে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, কৃষিক্ষেত্রে যে-বিনিয়োগের প্রয়োজন, তার জন্য যাবতীয় মূলধন অন্যত্র থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অধিকাংশ কৃষি-জীবিই কোনোক্রমে ধুঁকে-পুকে বেঁচে আছে, জাতীয় প্রগতির জন্য করনির্ধারণ অবশ্যই দরকার, কিন্তু এদের বাদ দেওয়া হোক, দেওয়ার ক্ষমতাই যে নেই এদের; শিল্পবাণিজ্যে যাঁরা আছেন, তাঁরা তুলনায় সমৃদ্ধ, তাঁদেরই তো কর্তব্য কৃষিতে বিনিয়োগের প্রয়োজনানুগ মূল-ধন জোগানো।

ইতিহাসের নজির টানলে অবশ্য বিপদ, কারণ দেখা যায় ঘটনাক্রম উল্টোরকম। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের দ্রুত আর্থিক প্রগতি দেড়শো-বছর-আগেকার শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত, এবং শিল্পবিপ্লব-সাফল্যের জন্য দায়ী সম্ভ্রান্ত-সম্পন্ন কৃষিপতিদের উদ্বৃত্ত সঞ্চয়। নতুন যন্ত্রপাতির পেটেন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কারখানা বসানো, তৈজস কেনা-বেচা: কৃষিজাত সঞ্চয় ছাড়া এর কিছুই সম্ভব হতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তেমনি, কার্পাস উৎপাদন থেকে জর্জিয়া আলাবামা প্রভৃতি দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলিতে যে-সঞ্চয়ের সঞ্চার, গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে তার ভিত্তিতেই নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলে শিল্পব্যবস্থার গোড়াপত্তন। সাম্প্রতিক কালে চ'লে এলে, সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের ক্ষিপ্র প্রগতির মূলেও আসলে সেই পুরোনো ব্যাপার: কৃষিজাত সঞ্চয়।

অবশ্য তর্ক উত্থাপন করা যেতে পারে, অতীতে হয়েছে ব'লেই বর্তমানেও যে ঠিক তেমনটিই হ'তে হবে এমন-কোনো কথা নেই। হাজার হ'লেও প্রায় প্রত্যেকটি অনুন্নত দেশেই অপেক্ষাকৃত-সমৃদ্ধ এক শিল্পব্যবস্থার বনিয়াদ গাঁথা হয়ে গিয়েছে, এবং এই শিল্পের ক্ষেত্রে গড়পড়তা আয় ইতিমধ্যেই কৃষিকর্মে-নিরতদের গড়পড়তা উপার্জনের চেয়ে যথেষ্ট বেশি। তা-ই যদি হয়, যেমন ধনী দেশ থেকে হালে গরিব দেশগুলিতে অর্থসাহায্য যাচ্ছে, শিল্প-বাণিজ্যের অঞ্চল থেকেই বা কেন কৃষির উন্নতির জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে না?

একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে যুক্তিটি আরো-একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক এক অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের তিন-চতুর্থাংশ কৃষিকর্ম থেকে সঞ্জাত হচ্ছে: জাতীয় আয় যদি ধরা হয় একহাজার কোটি টাকা, কৃষি থেকে তাহ'লে পাওয়া যাচ্ছে সাড়ে

সাতশো কোটি। দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যা ৫,৩৩,৩৩৩৩, এবং যেহেতু শিল্পের পরিমাণ সীমিত, পুরো পাঁচ কোটি লোক কৃষিকর্মের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। অতএব, সামান্য ভাগ করলেই দেখা যাবে, কৃষিক্ষেত্রে গড়পড়তা উপার্জন মাত্র দেড়শো টাকা; অন্যপক্ষে কৃষিকর্মের বাইরে শিল্পে-বাণিজ্যে আয়ের পরিমাণ গড়পড়তা সাড়ে সাতশো টাকা। আরো ধরা যাক, উপস্থিত করের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা ছয়, অর্থাৎ সব-মিলিয়ে ষাট কোটি টাকা। কিন্তু এরই মধ্যে তফাৎ আছে, কৃষিক্ষেত্রে করের পরিমাণ আয়ের মাত্র শতকরা তিন, একুনে সাড়ে বাইশ কোটি টাকা; সুতরাং কৃষিকর্মের বাইরে যে-যে উৎপাদনক্ষেত্র, তাদের উপর করের পরিমাণ সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি টাকা। যেহেতু শিল্পে-বাণিজ্যে পুরো আয় আড়াইশো কোটি টাকা, এই কর তাহ'লে অনুপাতে দাঁড়ায় গিয়ে শতকরা পনেরোতে। অতএব দেখা গেলো সামগ্রিক জাতীয় আয়ের উপর শতকরা ছয় কর দুটো ভগ্নাংশের সমষ্টি : কৃষিক্ষেত্রে শতকরা তিন, এবং কৃষিকর্মের বাইরে শতকরা পনেরো। একদিকে যেমন শিল্পবাণিজ্যে গড়পড়তা আয় কৃষিকর্মজাত আয়ের পাঁচগুণ, আনুপাতিক করের ভারও পাঁচগুণ। জাতীয় প্রগতির জন্য যে-বাড়তি করের প্রয়োজন, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকেই তা শুধু আসবে, কৃষি থেকে আদৌ নয়, এই যুক্তির ধৃতি এ-অবস্থায় ঠিক ততটা মন আঁকড়ায় না।

তবে এখনো বিতর্ক প্রলম্বিত ক'রে বলা চলে, উপার্জনের ক্রমক্ষয়িষ্ণু-উপযোগিতার প্রসঙ্গ ভুললে চলবে কেন? এটা তো ধনবিজ্ঞানের অন্যতম প্রথম সূত্র, যদি শ্রীযুক্ত 'ক' শ্রীযুক্ত 'খ'-র তুলনায় পাঁচগুণ উপার্জন করেন, তাহ'লে 'খ'-র কাছে উপার্জিত-শেষতম মুদ্রার যে-উপযোগিতা, 'ক'-র সবশেষের উপার্জিত মুদ্রার উপযোগিতা তার তুলনায় আত্যন্তিম কম। সুতরাং 'খ' যা কর দিয়ে থাকেন 'ক' তার পাঁচগুণেরও বেশি দিলেই ন্যায়নিষ্ঠা হয়। আমাদের উদাহরণে, কৃষিজীবিরা যদি আয়ের শতকরা তিন সরকারকে কর দিয়ে থাকেন, শিল্পে-বাণিজ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা তাহ'লে কর দেবেন শতকরা পনেরো নয়, তারো কিছু বেশি।

তর্কের খাতিরে যুক্তিটি যদি মানাও যায়, কতগুলি ব্যবহারিক সমস্যার হাত এড়ানো সম্ভব নয়। ধরা যাক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে করভার জাতীয় আয়ের শতকরা ছয় থেকে শতকরা বারো-তে উত্তীর্ণ করতে হবে, এবং এই বৃদ্ধির পুরোটাই অ-কৃষিজীবিদের উপর চাপাতে হবে। পুরো করের পরিমাণ তাহলে ষাট কোটি থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো একশো কুড়ি কোটি টাকা; যেহেতু কৃষিক্ষেত্রে করবৃদ্ধি অমঙ্গুর, সেখানে করের পরিমাণ সাড়ে বাইশ কোটিই থেকে যাবে, অন্য পক্ষে শিল্পে-বাণিজ্যে বেড়ে গিয়ে হবে সাড়ে সাতানব্বুই কোটি, অর্থাৎ শিল্পে-বাণিজ্যে সঞ্জাত আয়ের প্রায় শতকরা চল্লিশ। শিবঠাকুরের আজব দেশ ছাড়া অন্য-কোথাও এত গুরু করভার চাপানো সম্ভব নয়, দেশে বিপ্লব দেখা দেবে।

অবশ্য উপরের উদাহরণটি কাল্পনিক, এবং অঙ্কের হিশেব-নিকেশগুলি তেমন সাংঘাতিক সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য, আশা করা যায়, এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়েছে : পৃথিবীর অন্য-সব ক্ষেত্রে যেমন, সম্ভাব্যতার একটা গণ্ডি প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক-ব্যবহারিক নিয়মে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সে-গণ্ডির বাইরে পা বাড়ালেই বিপদ। শুধু শিল্প-বাণিজ্য-বিনিময়ে নিযুক্ত লোকদের উপরই কর বসিয়ে যাবো, কৃষিজীবিদের কৃষের জীব বিবেচনা ক'রে কেবলই সম্মান ক'রে যাবো : এ-উক্তি সর্বনেশে। শিল্প-বাণিজ্যের উপর চড়া

হারে কর বসিয়ে যেতে থাকলে হঠাৎ একদিন দেখা যাবে যে উদ্যমে নিরাশ্বাস এসে গেছে, কর ফাঁকি দেওয়ার পালা শুরু হয়েছে, শিল্পব্যবস্থায় এলোমেলো বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এরকম হ'তে থাকলে বাড়তি বিনিয়োগ তো সুদূরপরাহত, অন্যপক্ষে হয়তো দেখবো উৎপাদন কমেছে, সঞ্চয় কমেছে, এবং সব-কিছুই আগের তুলনায় ম্রিয়মাণ।

আরেকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যাক। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের একটি আশ্চর্য আচরণ, যাকে এক তরুণ ভারতীয় ধনবিজ্ঞানী আখ্যা দিয়েছেন 'একাকিত্ব হেঁয়ালি', লক্ষ্য করা যায়। একা-একা যে-ত্যাগস্বীকার বা দুঃখবহনে মানুষ গররাজি, দলে প'ড়ে তা করতে তার সামান্যতম আপত্তি নেই। একা ডুবতে রাজি নই, কিন্তু পড়শিরা যদি রাজি থাকে, তাহ'লে আমিও সম্মত। শিল্পে বা বাণিজ্যে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁরা এমনিতে হয়তো অতিরিক্ত কর দিতে আদৌ উৎসাহিত হবেন না; কিন্তু যদি তাঁদের বলা যায় যে করভার কৃষিজীবিদের উপরও বৃদ্ধি পাবে, তাহ'লে তাঁরাও সঙ্গে-সঙ্গে বোধহয় সম্মতিজ্ঞাপন করবেন। যদি প্রমাণ কিংবা প্রমাণের ভাণ ক'রে দেখানো যায় যে অতিরিক্ত ত্যাগের বহর সর্বক্ষেত্রেই সমান, কারো পক্ষেই বেশি-কম নয়, তাহ'লে শিল্পবাণিজ্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কর দিচ্ছেন, তাঁদের কাছ থেকেও আরো-কিছু টাকা বের ক'রে আনা সম্ভব। অতএব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষিক্ষেত্রে করের মাত্রা কিছু বাড়ানো গেলে সামগ্রিক করের পরিমাণ চক্রাবর্ত হারে বৃদ্ধি পাবে।

উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এর পরেই প্রশ্ন আসবে, কৃষির উপর কর কতটা বাড়ানো সমীচীন? এটা প্রায় ধ'রেই নেওয়া চলে যে সমস্ত-অনুন্নত দেশেই বর্তমানে কৃষিকর্ম অন্যমুখাপেক্ষী: কৃষি থেকে যে-পরিমাণ ধন-অর্থ অন্যান্য অঞ্চলের খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, অন্যত্র থেকে কৃষিকর্মের-প্রসারে-প্রবাহিত ধন-অর্থে তার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। এ-অবস্থার পরিবর্তন সাধনই কৃষিক্ষেত্রে করব্যবস্থা পালটানোর প্রধান উদ্দেশ্য হিশেবে ধ'রে নেওয়া উচিত। অন্তত এটুকু নির্দিষ্ট লক্ষ্যরূপে মেনে নিতে পারি যে কৃষিকর্মের উন্নতির জন্য যত মূলধন প্রয়োজন, তার পুরোপুরি আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বিদেশ থেকে অবশ্য ঈষৎ সাহায্য সব-সময়েই আসবে, কিন্তু স্বদেশী মূলধনের প্রয়োজনের কিছুটাও যেন অন্য ক্ষেত্র থেকে না আসে, সম্পূর্ণই যেন কৃষিজীবিদের সঞ্চয়সঞ্জাত হয়। এটা অসম্ভব কোনো প্রস্তাব নয়: সামান্য গবেষণার সাহায্যে এমন পরিকল্পনার খসড়া সম্ভব যাতে মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই কৃষিগত করের পরিমাণ দ্বিগুণ করা চলে, এবং সেটা করতে পারলেই কৃষির উন্নতির জন্য আর অন্যত্র মূলধনের খোঁজে যেতে হয় না।

কেউ-কেউ মন্তব্য করবেন, বলা সোজা, করা কঠিন; ধনবিজ্ঞানগত যুক্তি যা-ই হোক না কেন, অধিকাংশ কৃষিজীবিদের আয়ের পরিমাপ এমন যে করবৃদ্ধির প্রসঙ্গ বাতুলের প্রস্তাব। কৃষিতে উদ্বৃত্তি থাকলে তবে কর বাড়ানো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু সে-উদ্বৃত্তি আদৌ নেই, সুতরাং অতিরিক্ত কর দেবে কারা? যারা কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে, তাদের উপর চাপ দিতে গেলে তারা না খেয়ে মারা যাবে। উদ্বৃত্তি যেখানে অনুপস্থিত, বিনিয়োগের মূলধন সেখানে আর কী ক'রে সংগ্রহ করা সম্ভব?

কৃষিতে উদ্বৃত্তি আছে কি নেই সেটাই তাহ'লে উপস্থিত সমস্যা। এ নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। গড়পড়তা হিশেব বড়ো লোকঠকানো জিনিশ। আমরা যখন কোনো দেশের বা অঞ্চলের লোকসংখ্যার গড় আয়ের কথা বলি, একদিকে সম্ভ্রান্ত-সম্পন্ন, অন্যদিকে দরিদ্র-ক্লিষ্ট সর্বশ্রেণীর লোকের আয়ের যোগফলের ভাগফলের কথাই বলি। কৃষিক্ষেত্রে গড়

আয় সুতরাং জমিদার, রায়তদার, ভাগচাষী, দিনমজুর সকলের আয়ের সমষ্টির গড় ছাড়া অন্য-কিছু নয়। গড়হিসেব তাই যতটা ব্যক্ত করে, গুপ্ত করে প্রায় ততটাই। কৃষিকর্মে গড় আয় যত কমই হোক না কেন, অন্তত কতিপয় কৃষিজীবীর আয় এই গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। অধিকাংশ অনুন্নত দেশে কৃষকশ্রেণীর গড় উপার্জন অতি নিম্ন, কিন্তু এটাও ঠিক যে ভূমিব্যবস্থায় প্রবল অসাম্যহেতু বিত্তবান, সম্পন্ন কৃষিজীবীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, এবং এদের কারো-কারো উপার্জন শিল্পে-বাণিজ্যে নিয়োজিত লোকদের উপার্জনের চেয়ে কম তো নয়ই, অনেকক্ষেত্রে বহুগুণ বেশি।

এমন-অনেক গরিব দেশ আছে, সমাজবিপ্লব যেখানে এখনো অনারব্ধ, ধনবণ্টনে অতএব গভীর অসাম্য বর্তমান। এই অসাম্যের প্রধান কারণই হলো কৃষিভূমির অসমান বণ্টনব্যবস্থা। ভারতবর্ষে যেমন, অন্যান্য আরো দেশেও হয়তো ঠিক সেরকম, কৃষিজীবিদের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার মাত্র শতকরা দশ দেশের অর্ধেক কৃষিভূমি দখল ক'রে ব'সে আছেন। কৃষিভূমির অর্ধেক যাঁদের হাতে, সাধারণত কৃষিজাত আয়ের অর্ধেক উপার্জনও তাঁদের : সুতরাং অসাম্য।

তা-ই যদি হয়, সমৃদ্ধতর কৃষিজীবিদের ভোগ্য উদ্বৃত্তের অন্তত কিছুটা অংশও যাতে দেশের বৃহত্তর কাজে লাগে, সেজন্যই করব্যবস্থার সংশোধন প্রয়োজন। যতই রাজনৈতিক গলাবাজি করা হোক না কেন, এ-সত্য এড়াবার উপায় নেই যে, কি আমাদের দেশে, কি শ্যামে কিম্বা পাকিস্তানে, সচ্ছল উদ্বৃত্ত নিয়ে বর্ধিষ্ণু অবস্থায় এখনো একশ্রেণীর জমিদারপ্রতিম লোক বিরাজ করছেন। তাঁদের বিত্ত চোখে দেখা যায়, খরচের বহর থেকে ধরা পড়ে, তাঁদের জীবনযাত্রার মান কোনো-কোনো মাঝারি শিল্পপতিদের মানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই শ্রেণীর সঙ্গে কোমল আলাপের ভূমিকা অযৌক্তিক : দেশের আর্থিক প্রগতির জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন, বিনিয়োগের উপায় এখান-ওখান থেকে বাড়তি উদ্বৃত্ত,*যা নয়তো শিথিল সম্ভোগে ব্যবহৃত হবে, সরকারি কোষখানায় গ্রেপ্তার করা, সুতরাং উচ্চশ্রেণীর চাষী-দের উদ্বৃত্তই বা পাকড়ানো হবে না কেন? দরিদ্রতর কৃষিজীবিদের উপর শিথিল কর-আরোপ, তারপর আস্তে-আস্তে সমৃদ্ধতর কৃষিজীবীদের সম্পত্তি ও উপার্জনের উপর প্রাগ্রসর হারে করের মাত্রা বাড়িয়ে-বাড়িয়ে চলা : এরকম ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে অনেক দেশেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রিক সঞ্চয় প্রভূত বাড়ানো সম্ভব।

তাছাড়া, যেসব দেশে মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে আর্থিক-প্রগতির-জন্য-প্রয়োজন বিনি-য়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, উচ্চতর চাষীদের সেসব ক্ষেত্রে আরো সুবিধে হয়েছে। মুদ্রা-স্ফীতির একটি প্রকট ফল হলো তুলনাগতভাবে কৃষিজাত তৈজসের মূল্যবৃদ্ধি। যেহেতু মজুরখাটা কৃষকদের যৌথবদ্ধতা এখনো আদৌ সুষ্ঠু নয়, এই মূল্য বিনিময়ের প্রকারফের থেকে যা লাভ, তার সম্পূর্ণই ধনী চাষীদের করায়ত্ত হয়েছে। কর ধার্য ক'রে রাষ্ট্র কর্তৃক এই লাভের কিছুটা আয়ত্তে নিয়ে এসে দেশের বিনিয়োগে খাটানো খুবই যুক্তিসহ প্রস্তাব।

কৃষিক্ষেত্রে কর ব্যবস্থা, এবং ভূমি ব্যবস্থা, সংস্কারের সপক্ষে এবার অন্য-এক যুক্তি উত্থাপন করা যাক। প্রায় সব-ক'টি অনুন্নত দেশেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত, সংখ্যায় সহস্র, গৃহস্থ চাষীরা কৃষিকর্মের বৃহত্তম দায়িত্ব বহন করছেন। কৃষি-উৎপাদন, এবং বৃহৎভাবে দেখতে গেলে উৎপাদনের প্রযোজনা, তাই তেমন সুষ্ঠু নিয়মে হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া, যেহেতু জমি তৈরি করা এবং বীজ বোনা থেকে শুরু ক'রে ফসল ঘরে তোলার মধ্যে বেশ-কয়েক মাসের ব্যবধান, এই প্রযোজনা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, রাতারাতি ফসলের পরিমাপ

বাড়ানো-কমানো সম্ভব হয়। সুতরাং এমন প্রায়ই দেখা যায়, যে-যে তথ্য বা বিচারের বিশ্লেষণে কয়েকমাস আগে উৎপাদন প্রসারণ কিংবা সংকুচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ফসল তৈরি হ'তে-হ'তে সে-সমস্ত তথ্য বা বিচারের প্রকৃতি খোল-নলচে বদলে গেছে। আরো যা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক যোগাযোগ হিসেবের গরমিল বেড়েই চলে।

কৃষিকর্মের উদ্যোগে এরকম বহুবিধ অনিশ্চয়তা : একসঙ্গে সহস্র-লক্ষ কৃষিজীবী আলাদা-আলাদা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কোন্ বীজ বপণ করা হবে কি হবে না, কোন্-কোন্ ফসল বাড়ানো কি কমানো হবে, কতটা বাড়ানো বা কমানো হবে ইত্যাদি। এ-অবস্থায় সম্মিলিত, সুচিন্তিত, সুনিয়ন্ত্রিত কৃষি-কল্পনা দুরূহ ব্যাপার। ঘর-পোড়া গোরুর সিঁদুরে মেঘের আতঙ্ক। আমাদের দেশে, এবং আমাদের মতো কৃষিব্যবস্থা যেসব দেশে, গৃহস্থ চাষীকে পরিকল্পনার মূলসূত্র শেখানো, বিশেষ করে কৃষিকর্মের সম্প্রসারণে উৎসাহিত করা, গলদ্-ঘর্ম ব্যাপার। তার কারণ আছে। গৃহস্থ চাষী, তাঁর মনে বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে আতঙ্ক : চিরাচরিত যে-পরিমাণে চাষাবাদ ক'রে আসছেন, তার একটা সুষ্ঠু হিসেব তাঁর মনে কষা আছে—তিরিশ মণ চাল ঘরের জন্য, দশ মণ চাল বাইরের মজুর বাবদ, তেরো মণ কার্পাস গ্রামের হাটে বিক্রি হবে, মোট খরচ এই, অতএব মুনাফার বহর এত। কিন্তু যে-মুহূর্তে চাষাবাদের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হলো, বাড়তি খরচের একটা হিশেব যদিও সঙ্গে-সঙ্গে করা সম্ভব, বাড়তি মুনাফার একেবারেই না। খরচটা সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় করতে হয়, কিন্তু লাভ ভবিষ্যতের গর্ভে : যদি ফসল ভালো হয়, যদি বাজার না মন্দা হয়, যদি বাড়তি ফসলের চাহিদা বজায় থাকে, তাহ'লেই খরচ পোষাবে, অন্যথা নয়। কিন্তু আজ থেকে ছ'মাস বা ন'মাস বাদে দাম কী হবে তা গৃহস্থ চাষীর পক্ষে সঠিক অনুমান করা অসম্ভব, তাই তাঁর ফসল বাড়ানোতে বীতস্পৃহা। দাম বাড়বে এই প্রত্যয়ে নির্ভর ক'রে যদি সব গৃহস্থচাষীই ফসল বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেন, ছ'মাস বাদে ফসল এতটাই বাড়ে যে মূল্যবৃদ্ধির বদলে বাজারে মূল্যহ্রাসের সূত্রপাত হয়।

আরো-এক কারণে কৃষি উৎপাদনে তেমন প্রসার নেই। যন্ত্রপাতি কলকব্জা ব্যবহার না-ক'রে ফেলে রাখলে জঙ্ ধরে বিগড়ে যায়, কিন্তু ভূষিভূমির ক্ষেত্রে সেরকম আশঙ্কা নেই। জমি পতিত রাখলে একমাত্র ফসলের বহর কম হয়, অন্য-কোনো ক্ষতি নেই। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় বিত্তশালী ভূস্বামীরা নিজেদের বিপুল জমিজমার মাত্র ভগ্নাংশ কোনো-এক বছর আবাদ করেন, বাকিটা ফেলে রাখেন। ফেলে রাখেন এজন্য যে পুরো জমি আবাদ করলে ফসল বেশি হবে, তুলনায় দাম নিচে নেমে আসবে, সব-মিলিয়ে হয়তো বাড়তি আবাদের খরচ পোষাবে না। অতএব চাষের প্রসার ব্যাহত থাকে, যার মানে কিনা জাতির সামগ্রিক প্রগতি ব্যাহত থাকে।

কৃষি উৎপাদনে যাতে উদ্যম আসে, কৃষিজীবীরা যাতে উৎপাদন-সম্প্রসারণে আগ্রহ দেখান, সেজন্য ইদানীং অনেকধরনের চেষ্টা আমাদের দেশে এবং অন্যত্র করা হচ্ছে। পূর্ব-নির্ধারিত মূল্যে ফসল কেনার জন্য রাষ্ট্র থেকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ফসল বিক্রয়ের সুবিধের জন্য মার্কেটিং বোর্ড খোলা হয়েছে, ফসলবীমার সূত্রপাত করা হয়েছে, ফসল তোলবার জন্য দেশের সর্বত্র গোলাঘর তৈরির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, চাষীদের অজ্ঞতার জন্যই হোক, অন্ধতার জন্যই হোক, এখন পর্যন্ত কোনো দেশেই এসব ব্যবস্থায় আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। হালে একটা প্রস্তাব প্রায়ই শোনা গিয়ে

থাকে, চাষাবাদ বাড়ানো আশু প্রয়োজন, সুতরাং চাষীদের নামমাত্র মূল্যে কিংবা বিনামূল্যে সেচনের জল, সার, ভালো বীজশস্য, উন্নত প্রকরণে শিক্ষা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক। ইত্যাকার ব্যবস্থাদি ক'রে দিলে আর দেখতে হবে না, যেহেতু আবাদ-বাড়ানোর খরচের বহর অনেকটাই ক'মে আসবে, অধিকাংশ চাষীই সম্প্রসারণে উৎসাহী হবেন, দেশের সমস্যা ঘুচে যাবে। কিন্তু যা মনে হয় আসলে অনেক ক্ষেত্রেই তা ঘটে না। সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধে জুগিয়ে দিয়েও দেখা গেছে যে তেমন-কিছু অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না, উদ্দীপনা আসছে না। তাছাড়া মস্ত প্রশ্ন থেকে যায়, এই-যে চাষীদের জন্য নানা সুবিধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এর খরচের টাকা আসবে কোত্থেকে। সুতরাং পুরোনো সমস্যায় ফিরতে হয় : কৃষিউন্নতির জন্য যে-বিনিয়োগ প্রয়োজন, যেনতেন প্রকারে তার প্রয়োজনানুগ উদ্বৃত্তও কৃষিক্ষেত্র থেকেই আহরণ করতে হবে।

তাহ'লে ভাবতে হয়, চাষাবাদের খরচের একটা ভাগ রাষ্ট্র থেকে বহন করা হবে, সে-আশ্বাসেও যদি চাষীদের চেতনায় বিপ্লবের ছোপ না ধরানো যেতে পারে, বিপরীত পন্থা অনুসরণ করলে কি ফল হবার সম্ভাবনা আছে? কম খরচের ঝলকানিতে যদি কাজ না-হয়, বেশি খরচের পীড়নের চাপেই কি তবে ফসল বাড়বে? প্রস্তাবটি হেঁয়ালির মতো শোনাতে পারে, সুতরাং বিশদ ক'রে বলা যাক। ধরা যাক, এক কৃষিজীবী, যাঁর তিনশো বিঘা জমি, আপাতত দুশো বিঘা আবাদ করা হচ্ছে, বাকি একশো বিঘা এমনি পড়ে আছে: নয়তো অন্য-এক কৃষিজীবী যাঁর মাত্র তিরিশ বিঘা জমি, পুরো তিরিশ বিঘাই আবাদ করা হচ্ছে, কিন্তু চাষীর সেচনের জল নিতে আগ্রহ নেই, উন্নত বীজশস্যে উৎসাহ নেই, সার কিনতে তাঁকে কোনোদিন দেখা যায় না। এই দুই ক্ষেত্রেই যদি ভূমিকর কিছুটা উঁচু হারে হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া যায়, চাষীর খরচ সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে, উপার্জন না বাড়লে লাভের পরিমাণে সুতরাং টান পড়বেই। লোকচরিত্র বোঝা মুস্কিল, তবে এমন অবস্থায় মনে হয় প্রথম চাষী বাধ্য হবেন দুশো বিঘার উপর আরো-কিছু জমি আবাদ করতে, এবং দ্বিতীয় চাষী বাধ্য হবেন চাষের প্রকরণে কিছু উন্নতিসাধনে, কিছু-পরিমাণে সেচনের জল, ভালো বীজ, উন্নত সার ইত্যাদির দিকে নজর দিতে। ফলে সামগ্রিক কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি পাবে : তোয়াজে যা সম্ভব হয়নি, চোখরাঙানিতে তা হবে।

বলা হয়ে থাকে, কৃষিউৎপাদনে উপলগতি আসছে না কারণ অধিকাংশ কৃষিজীবী রক্ষণশীল, ভয়ভীত, সীমিত গণ্ডিতে তাঁদের আশাআকাঙ্ক্ষা হিশেবনিকেষের পরিক্রমা; ছোটো গণিতের ভূমণ্ডলে সাধারণ কৃষকের প্রব্রজ্যা, রোমাঞ্চকর অভিযানে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। যদি তা-ই হয়, তাহ'লে হয়তো উপরের প্রস্তাব-অনুযায়ী কর চাপিয়ে ব্যয়ের মাত্রাধিক্য ঘটালেই তবে প্রয়াসের ব্যাপ্তি আশা করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে বিত্তবান উচ্চচাষীর কাছে বর্তমান অবস্থায় জমি এবং মজুর দুই-ই অপেক্ষাকৃত সুলভ : ভূমিকর নামমাত্র, দিনমজুরিও সামান্য। এ অবস্থায় কৃষিকর্মের হিশেবের অঙ্কে শিথিলতা আসতে বাধ্য। বেশি ভূমি আবাদ ক'রে পর্যাপ্ত শস্যোৎপাদনে আশঙ্কা যে সরকারের শ্যেন দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, অন্যপক্ষে বেশি মজুর খাটাতে গেলেও আশঙ্কা যে মজুরচাষী হঠাৎ একদিন বেশি মজুরি দাবি ক'রে বসবে। সুতরাং ঢিলে দাও, অল্প-কিছু আবাদ করে সন্তুষ্ট থাকো, কী দরকার বেশি লাভের স্বপ্ন দেখে। ব্যয়ের বহর বাড়বে, ঝুঁকি বাড়বে, পরিশ্রম বাড়বে, কিন্তু লাভের পরিমাণ বাড়বে কিনা সেটা আগে থেকে নিশ্চয় ক'রে বলা চলে না।

এধরনের ভীরু পাটিগণিতে যুক্তি আছে, অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরও আছে। যুক্তির যা স্খলন, তা এই যে স্থির ভূমিতে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কষা হচ্ছে। যে-মুহূর্তে বাড়তি ভূমিরাজস্ব বসিয়ে চাষের ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হবে, এই যুক্তির সারবত্তা শেষ হয়ে যাবে। কারণ যদি সঙ্গে-সঙ্গে উৎপাদন বাড়ানো না-হয়, ব্যয়বৃদ্ধিহেতু উদ্বৃত্তের পরিমাণ আগের তুলনায় হ্রাস পেতে বাধ্য। যদি প্রাক্তন উদ্বৃত্তে ফিরতে হয়, তাহ'লে আবাদের পরিমাপ বাড়িয়েই হোক, কি উন্নত প্রকরণ প্রয়োগ করেই হোক, চাষীকে উৎপাদন বাড়াতেই হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে-আলোচনা হলো, তার মুখ্য প্রস্তাব তাহ'লে এই যে কৃষিকর্মের উন্নতি সম্ভব একমাত্র কৃষিভূমি, এবং কৃষিশ্রম, দুর্মূল্যায়নে। ভূমিমূল্য বাড়াতে গেলে প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ভূমিরাজস্বের নয় ভূমিসংস্কারের। ভূমিসংস্কারের ফলে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পন্ন কৃষকদের কিছু-কিছু জমি কেড়ে নেওয়া হবে, সুতরাং আওতায়-থাকা ভূমির পরিমাণ কমবে, অতএব ভূমির নিহিত মূল্য বাড়বে। অন্যপক্ষে যা করা যেতে পারে, তা গ্রামাঞ্চলে দিনমজুরির হার বাড়িয়ে দেওয়া, ফলত সঙ্গে-সঙ্গে কৃষিকর্মের ব্যয়বৃদ্ধি। কিন্তু যতদিন আমাদের দেশে, এবং অন্যত্র, কৃষক-আন্দোলন দানা না-বাঁধছে, গ্রামে দিনমজুরি বাড়ানো ততদিন সম্ভব নয়। সুতরাং ভূমিকরবৃদ্ধি ও ভূমিসংস্কারের উপরই আপাতত প্রধান জোর দিতে হবে।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি যার শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ নেই। আমার বর্তমান মতামতও তাই সমালোচনাসাপেক্ষ, এবং নিশ্চয়ই মনীষী ও পণ্ডিতব্যক্তিরা অনেক আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। তবে, যেহেতু কৃষির প্রগতি না-হ'লে সর্বপ্রকার প্রগতির গতিই রুদ্ধ থাকবে, বিষয়টি নিয়ে নিষ্ঠাশীল চিন্তা প্রয়োজন। সে-চিন্তা যত বাড়ে দেশের পক্ষে তত মঙ্গল : সেজন্যই এই প্রবন্ধের ভূমিকা।
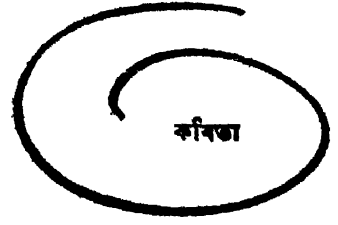
দু'টি কবিতা

অরুণ মিত্র

কেন এই সান্ত্বনা

ফলের ছবিতে দুরন্ত রং
শূন্যঘটে উৎসব আঁকা রয়েছে।
এখানে এমনিই হয়
এখানে কোনো শোভাই মঞ্জরিত হয় না,
ঘনিষ্ঠতার দান এমনি উদ্যত
এই বালির উপরে;
অথচ আমি বনভূমি দেখেছি, শস্য দেখেছি
আমি জলে প্রিয় মুখের প্রতিবিম্ব দেখেছি,
তুমি বৃষ্টির ঝলক নিয়ে এসেছিলে,
ফুলপাতা ঝ'রে যাওয়ার পর
একটা রাত নিয়ে এসেছিলে কুঁড়ি ধরাবার।
তবে কেন এই সান্ত্বনা
কেন এই কাগজের ফুল?

আরও কত প্রস্ফুটন

আমি মৃত্যুর কথা বলিনি,
তাকে আমার অন্তরের অন্তস্থলে রেখেছিলাম,
তারই উৎসে আমার প্রেম
আমার উজ্জীবনের আবেগ।

দ্বারের প্রান্তে আমাদের বিদায়ের পথ
আর এক গৌরবের অভিমুখে ছিল;
জ্যোৎস্নায় মৃত ফুলদের দেখে
আমি হৃদয়ের স্রোতে চমৎকৃত হয়েছি :
আরও কত প্রস্ফুটন
আরও কত রক্তবিন্দুর মাধুর্য!
সব আরম্ভ এখনো আমাদের ধমনীতে সঞ্চিত আছে,
তুমি থামতে চেও না
আমরা মুক্তির আভায় আবার আপ্লুত হব।

মৃত্যুরাগ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জীবনের অনুজ্জ্বল বিকেল এখন
সন্ধ্যায় শরীর প্রসারিত।
সংরাগ-বিরাগ রক্তে যে প্রেম, বঞ্চনা, ঘৃণা দিত
তারা আজ ফুটিয়েছে প্রশান্ত গোলাপ।
হৃদয়ের গাঢ় পাপতাপ
নিশ্চিহ্ন, সেখানে আজ সোনার লেখন
আকাশেরই মতো।
কী দরিদ্র ছিলাম অতীতে!
পাবার বাসনা যেন রক্তমুখ ক্ষত
নিরন্তর ব্যথাই ঝরাত।
আজ দেখিনা ত
ব্যবধান আছে কিছু লাভ ও ক্ষতিতে,
না পেয়েও মনে হয় সব পাওয়া গেছে।
মৃত্যু ওঠে বেঁচে,
ঘোচায় হয়ত সব দায়,
বলে : আমিই ত আছি গোলাপী সন্ধ্যায়॥

কোনো কোনো অনুভূতি

হরপ্রসাদ মিত্র

কোনো কোনো অনুভূতি মেঘলোকে সূর্যাস্তরশ্মিরা
যেমন অস্থায়ী, তেমনি।
ভুলে গেছি অস্থায়ীর দাম।
স্বপ্নে মাঝে-মাঝে আসে প্রাণাবেগে মরণের নাম।
তা বলে বিভ্রান্ত নই,—ভাগ্যান্বেষু,—অদৃষ্টাবিন্বেষী,-
নই নিন্দাপরায়ণ, তর্কবাজ,—স্বদেশী-বিদেশী।
কিংবা সম্প্রদায়বাদী অন্য কোনো শ্রেণীতে বা নামে
যূথবন্ধ; মদমত্ত অন্ধকারে দক্ষিণে বা বামে
আজো শিরোপার লোভে বসিনি ফরাসে।
আছি—'তুমি আছ', এই,—মাত্র এই অখণ্ড বিশ্বাসে।

তুমি আছ,
—আর, এই তপ্ত রোদ মধ্যাহ্নক্ষণের!
দেখি শোভাযাত্রা চলে শিশু, বৃদ্ধ, নবযৌবনের।
আর, স্বর্ণচাঁপাগাছে দুপুরের নগরের কাক
হা-ক'রে জানায় তৃষ্ণা
দৃশ্যে যেন বাজে জয়ঢাক।

এ-দৃশ্যও যাবে যাবে—জানি তাও,—সামনের শ্রাবণে
আশা করি বর্ষা এসে আবার এ-ধরণীর কোণে
আনবে পূবের হাওয়া, ভেজাবেই, ওড়াবেই, আর
পর্দার ওপারে থাকবে নেই চির-অবসান যার—
গাঢ় এক সুবিস্তীর্ণ, চিরায়তন, অদ্ভুত আকাশ।
এই তপ্ত রোদে আজো নিহিত সে মেঘেরই নিশ্বাস।

কোনো কোনো অনুভূতি মেঘলোকে সূর্যাস্তরশ্মিরা
যেমন অস্থায়ী, তেমনি।

যেমন এ বিশুষ্ক বৈশাখ।

মন্দ্র

সুশীল রায়

জীবন

জ্যোৎস্নার উল্লাস নিয়ে রৌদ্রের তপস্যা ক'রে বাঁচি--
তাই বুঝি আছি, তাই আছি॥
আমাদের চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে আবর্জনা,
অনেক ইঁটের স্তূপে চাপা আছে বিষধর ফণা;
ইমারত-গড়া বন্ধ করে তাই বৈরাগ্যবিলাসে
হাওয়ার ফানুস হয়ে আকাশে-আকাশে
নিরুদ্দেশের দেশে
যাব ভেসে ভেসে
উদ্দেশ্যবিহীন হাহাকারে?
—যারা পারে তারা তাই পারে।
আমার অক্ষম আত্মা জ্যোৎস্না নিয়ে বাঁচে
আমার রক্তের মধ্যে রৌদ্রময় উপাসনা আছে॥

যৌবন

ইচ্ছে হয় তো, যাও, দেখে এসো গিয়ে—
সুদূর মেঘের বর্ণে বর্ণ নাই।
সেদিন আমিও লালমেঘ একমুঠো--লোভনীয় লালমেঘ—
আকাশের কোণ থেকে কেড়ে এনে অতি সন্তর্পণে
ঘরে এসে সেই মুঠি খুলে হেসে মরি,
দেখি, সে মুঠিটা আসলে ফাঁপা ও ফাঁকা।
কবিসূর্যের সুন্দর অনুরাগে
নিছক বাষ্প হেসে উঠেছিল লালে ঝলমল ক'রে।
যত্নে যে-টিপ গোল করে পরো রুপোর কৌটো থেকে,
সিঁথির সীমায় যে-রেখাটি এঁকে তোলো—
আসলে ওটাও অভ্রের গুঁড়ো ছাড়া আর কিছু নয়।
এই দু চোখের যে-আলো বিচ্ছুরিত হল দিকে দিকে
সে-আলোক থেকে পেয়ে অপরূপ বর্ণের গৌরব
সেজেছে এমন সুন্দর সজ্জায়॥

জোনাকি ও আলেয়ার গ্রাম

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জোনাকি ও আলেয়ায় জ্বলা
এই গ্রাম পথ। ওই আটচালা।
সকালের রথে
পায়ে-চলা ধুলো-মাখা পথে
কিছু ভেবে হয়তো বা দাঁড়াবে সামনে
অতীতের হাত ধরে কিছু আনমনে।

জোনাকি ও আলেয়া আলোয়
কাউকে চেনাই যায় না
অন্ধকারে ওৎ পেতে রয়েছে হায়না?
বোবা প্রেম কথাই কয় না।

জোনাকি ও আলেয়ার গ্রাম
তোমাকে প্রণাম।
ধূমকেতু জ্বালা করে, তারা কক্ষছাড়া
হৃদয় উধাও হয়। পিছনে পাহারা॥

ঈহা

মজুমদার

জ্যাঠামশায়ের জন্মদিন করার কথা শুনেই নীতা দারুন রেগে গেল।

জন্মদিন? ছিয়াশী বছর বয়সে কেউ জন্মদিন করে নাকি? ষোল বছর আগে ওঁর মৃত্যুদিন করা উচিত ছিল।

মৃত্যুদিন? কত বছর বয়সে মানুষ মৃত্যুদিন করে? মোহনের মা মরেছিলেন ছাব্বিশ বছর বয়সে। বটিতে আঙ্গুল কেটে বিষিয়ে মরেছিলেন। ভারী সুন্দরী ছিলেন নাকি, পাৎলা ছিপছিপে গড়ন, এক ঢাল কালো চুল, পদ্মফুলের মতো গায়ের রং। ছোটপিসির কাছে শোনা ঘাটের লোকদের পর্যন্ত পোড়াতে মায়া লাগছিল। তারপরে বাবা বিলেত চলে গেলেন, সেখানে আবার বিয়ে-থা করে মেম নিয়ে আর একঘর ছেলেমেয়ে নিয়ে পঁচিশ বছরেরো বেশি বেঁচেছিলেন। তবে মোহনকে আর দেখেন নি; প্রতি বছর পুজোর সময় নিজের বাপমাকে একটি চিঠিতে সব খবর দিতেন। তাঁরা চোখ বোঁজার আগেই তা' গেল বন্ধ হয়ে, কারণ মোহনের বাবাও গেলেন স্বর্গে। তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন। পঞ্চান্ন বছর বয়সেই কি মৃত্যুদিন করতে হয় নাকি?

নীতা বললে, বুড়োর যদি কোনো আক্কেল থাকে, এই আমাদের দল বেঁধে মোটরে বেরুবার কথা হচ্ছে, এখন সব বন্ধ! অথচ না গেলেও নয়। তুমিই যখন একমাত্র ওয়ারিস, তখন আর পাঁচজনে মিলে জন্মদিন করবে আর আমরা থাকব না, তাই বা কি করে হয়? মাঝখান থেকে শেষটা যদি—

মোহনের কানে বাকি কথাগুলো যায় না। একমাত্র ওয়ারিস সে নয়। সত্যি কথা বলতে কি ওয়ারিসই নয়। ত্রিশ বছর বয়স থেকে শুরু করে এই দশ বছর আগে অবধি সমানে পয়সা কামিয়েছেন জ্যাঠামশাই, লক্ষ লক্ষ টাকা। দুতিনটে বাড়ি করেছেন, দুতিনটে গাড়ি কিনেছেন, মধ্যমগ্রামে বাগান করেছেন, সখ করে যে মণিমুক্তো সংগ্রহ করেছেন, লোকে বলে তারি দাম নাকি আট-দশ লাখের কম নয়। ঐ দামেই ইন্‌সিওর করে নাকি একাধিক-বার সেগুলোকে বিলেত আমেরিকা পাঠানো হয়েছে, প্রদর্শনী করার জন্য। কিন্তু মোহন তাঁর উত্তরাধিকারী নয়।

তবে কে ভোগ করবে এসব? নীতা তো মণিমুক্তাগুলোকে চোখেও দেখে নি কখনো। নাকি গাঁথাও নয়, সেট্ করাও নয়, এমনি আন্‌কোরা মুঠো মুঠো রত্ন। এসব সখকে বে-আইনী করে দেওয়া উচিত। একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নীতা বললে, তাহলে আমাদেরি গিয়ে ব্যবস্থার ভার নিতে হয়। ওঁর নিজের লোক আর কে-ই বা আছে, সব তো আসবে খেতে আর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপহার পাবার আশায়। কাউকে আমার চিনতে বাকি নেই।

কে কাকে চিনতে পারে? মোহন নীতার দিকে চেয়ে থাকে। সর্বনাশী চল্লিশের কোঠাকে অস্বীকার করেছে। হাল্কা শরীরটাকে কঠোর সংযমে রেখেছে, খেতে দেয় না, আরাম করতে দেয় না, শান্তি দেয় না। চারদিক দিয়ে এঁটে তাকে শৈথিল্যের এতটুকু অব-কাশ দেয় না। হাত কাটা জামা, চুল ছাঁটা মাথা, মাসে মাসে মাদাম ওনোর বাড়ি থেকে সর্বাঙ্গ

তার নতুন হয়ে আসে, চেহারার একটা ফলক যেই চেনা হয়ে গেছে মনে হয়, অমনি ফ্যাসানও যায় পাল্টে, নীতা ধরে অন্য রূপ। নীতাকেই কি খুব বেশি চেনে মোহন? বাইশ বছর ওর সঙ্গে ঘর করলে কি হবে?

নীতা হাতের মুঠোর মধ্যে ফিকে সবুজের উপরে বড় বড় গোলাপি ফুলের তোড়ার নক্সা করা সাড়িটার আঁচল ধরে বারে বারে পাকাতে থাকে। মোহন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে সত্যিই এতটুকু কুঁচ্‌কোয় না। নাকি কার্পাস কি রেশমি পোকার সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই, কাঠের গুঁড়ো না কাঁচের দড়ি না কি দিয়ে যেন তৈরি, তাই আসল জিনিসের তুলনা হয় না। নীতা ঠিকই বলে।

তবে মোহন সব সময় আসল-নকলের তফাৎটা বুঝে ওঠে না। এমন কি কোনটা যে একেবারে সবচাইতে আধুনিক হাল ফ্যাসানের চুলের বাহার আর কোন্‌টা মুখ্যুদের চুল বানাবার আনাড়িপনা, তাই সব সময় বুঝতে পারে না, দুটোকেই একরকম লাগে। এরকম লোককে নিয়ে ঘর করতে হয় নীতাকে। নীতার ঠোঁটদুটো লাল রঙের ওপর দিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে। তার নিজের জীবনে যত ব্যর্থতাই এসে থাকুক তারা আর পার্থের জীবন সে অন্য-ভাবে গড়ে তুলবে। তুলবে কেন, তুলছে; এমন কি তুলেছেও বলা চলে। তারার এবার উনিশ আর পার্থের আঠারো। আসলে অবিশ্যি তারার একুশ আর পার্থের কুড়ি, তবে অনেক বুদ্ধি করে কালের হাত থেকে দুটো বছর চুরি করে যে নীতা লুকিয়ে রেখেছে, সেজন্য এদের সকলেরি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কান্না পায় না নীতার, রাগ হয়। রাগ শুধু জ্যাঠামশায়ের ওপরে নয়, মোহনের ওপরেও, মোহনের ওপরেই বেশি। এইরকম একটা ব্যর্থতায় ভরা পুরুষমানুষের বিয়ে করা উচিত ছিল কখনো? বিশেষ করে নীতার মতো মেয়েকে? কত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ছিল নীতার, নাম করা ব্যারিষ্টারের একমাত্র সন্তান, দেখতেও যেমন, পড়াশুনো গান-বাজনা-তেও তেমনি, দেখাক্ তো কেউ কোন্‌টাতে নীতা চৌধুরী কম ছিল! লোকে বলত লোরো-টোর রত্ন, 'মাদার'রা বলতেন, কোন রাজার ঘরে যাবে তুমি নীটা? দু-কানের সবুজ কাঁচের ফুলদুটোকে ওরা ভাবত সত্যিকার পান্না, বলত, তোমার সোনালী রঙে কি মানিয়েছে বলি-হারি, কবে আসবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র, তোমার সর্বাঙ্গ হীরে-পান্নায় মুড়ে দেবে!

হাসি পেত নীতার, পদ্মকলির মতো দুটি আঙ্গুল নকল মণির গায়ে বুলিয়ে দিত। এমন টলটলে সবুজ এমন নিটোল গড়ন হয় কখনো সত্যিকার পান্নার? আর দুনিয়া ঢুঁড়ে সত্যি অমন পাওয়াও যদি যেত, নীতার বড়লোক ব্যারিষ্টার বাপকে বেচলেও তার দাম উঠত না!

বাবার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফর্সা, কাটাকাটা নাকচোখ, কোঁকড়া একমাথা চুল, হাতে একটা পাইপ, মাথায় খুব লম্বা নয়, কিন্তু নিখুঁৎ গড়ন। দেখতে ভালোই ছিলেন বাবা। তবে শেষটা অমন বীভৎস কাণ্ডটা না করলেই পারতেন। ছি, ছি, লোকেই বা কি মনে করল। 'মাদার'রাতো সক্‌ড্! বি-এ পাশ করা আর হল না নীতার, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে, ভেঙ্গে-পড়া মার সঙ্গে এসে মামার বাড়িতে উঠতে হল।

উঃ! সেদিনের কথা কি ভোলা যায়? হাউমাউ করে বুড়ো নাথুসিংহ ড্রাইভার কলেজে এসে উপস্থিত, কেঁদেকেটে চেঁচিয়ে মেচিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে নীতার বাবা স্পেকুলেশন করে সর্বস্ব খুইএ নিজের বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছেন। মিসিবাবাকে তাই এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে। বাড়ি ফেরার পথে খুব বকে

দিয়েছিল নীতা নাথ্‌সিংহকে। কোনো আক্কেল যদি থাকে। সবার সামনে সীন ক্রিয়েট করা!

মামা এসেছিলেন খবর পেয়েই, দেখতে দেখতে চাকর ছাড়িয়ে, গাড়ি বেচে, জিনিষপত্র বাড়িবাগান আয়না গালচে দামী দামী আসবাব সব নিলামে তুলে দিয়েছিলেন। নীতার আন্টি মেরি তাকে অবিশ্যি সিমলা নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন, এসব কিছুই চোখে দেখতে হয়নি, তবে পরে মা মাসিদের কাছে যথেষ্ট শুনতে হয়েছিল।

আশ্চর্য, বাবা যে অত মন্দ এর আগে নীতা কখনো সন্দেহও করেনি, এখন মা মাসিদের কাছ সব শুনে তো তার চক্ষুস্থির! বাবাকে তার বরঞ্চ বরাবর খুব ভালোই লাগত, তিনি যে তাদের এমন সর্বনাশটি করে যাবেন কে ভেবেছিল! উঃ মা তো এক বছরের ওপর কোনো পার্টিতে যাওয়া দূরে থাকুক, কারো বাড়িতে কল্ করতে পর্যন্ত যান নি! এ ভাবা যায় না!

সব গেছিল। খালি তিন লাখ টাকার গয়নাগাটি মা এমনি লুকিয়ে রেখেছিলেন, যে হাজার জেরা করেও যখন মামা সেগুলো বের করতে পারেন নি, তখন তিনি সত্যি সত্যি ভেবেছিলেন, গুলি দিয়ে মাথার খুলি ওড়াবার আগে রাস্কেলটাই নিশ্চয় গয়নাগাটিগুলোকেও উড়িয়ে দিয়েছিল। তার বেশির ভাগ নিজেরি দেওয়া হলেও, ব্যারিষ্টার মানুষ, সে নিশ্চয়ই জানত মেয়েদের যা কিছু উপহার দেওয়া যায় তা' স্ত্রীধন হয়ে যায়। পাওনাদাররা সেগুলো নিতে পারত না, দাতাও না। কিন্তু মা মেয়েদের যে ভরণপোষণের ভারটা মামাকে নিতে হচ্ছে, তাঁর তো কিছুটা সাহায্য হত! মা কিন্তু সেই যে বালিশে মুখ গুজড়ে পড়ে রইলেন, মামাকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হল। আর শুধু মামা কেন, নীতার নিজেরো অনেকদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে গয়নাগুলো সবই গেছে। পরে যখন মামির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে, ব্যারাকপুরে দাদামশায়ের দেওয়া ছোট বাড়িটাতে মা নীতাকে নিয়ে উঠে গেলেন, তখন গয়নাগুলোকে আবার দেখে নীতা তো অবাক। বহু বছর ধরে সেইসব বেচে মা খেয়েছিলেন, অবিশ্যি সবচেয়ে ভালো গুটিকতক নীতার বিয়ের সময়ে দিয়েছিলেন। অথচ একরকম বলতে গেলে সবগুলোই নীতারি প্রাপ্য, যেহেতু বেশির ভাগ তারি বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাক গে, পুরোনো দুঃখ নাড়াচাড়া করে তো কোনো লাভ নেই, বর্তমানটাই যখন এমন কিছু সুখের নয়। কিন্তু কি জানি, আজকাল বড় দুঃস্বপ্ন দেখে নীতা, কাউকে বলাও যায় না, মোহনকে তো নয়ই, এত কথার অর্ধেকও সে জানে না।

প্রায় রোজই আজকাল ঘুমটা যেই গাঢ় হয়ে আসে নীতার মনে হয় বাবা যেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে; নীতার সেই সুন্দর বাবা, যাকে নিয়ে নীতার এত গর্ব ছিল; নীতার সেই ছোটবেলাকার ভালোবাসার বাবা, যিনি মাঝে মাঝে নীতা শুয়ে পড়লে পর চকোলেট এনে নীতার বালিশের নিচে গুঁজে দিয়ে যেতেন, গালচের ওপর ভালো সুট্ পরেই ঘোড়া হতেন, নীতা তাঁর পিঠে চড়ত। কি জানি, পায়ের ওপর বাবার খস্‌খসে কোটের স্পর্শটাও যেন আবার লাগে, অমনি নীতার ঘুম ভেঙ্গে যায়, মনটা কেমন করে ওঠে। কোথায় বাবা? তেইশ বছর আগে যে মরে গেছে, সে হয়তো এতদিনে আবার জন্মেছে, বড় হয়ে গেছে, কত তার ভালোবাসার লোক হয়েছে, নীতার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? কত কি বলে নিজের মনকে শান্ত করে নীতা। এদিকে মোহন কখন তার বলার কথা শেষ করে নিচে চলে গেছে, নীতা টেরও পায় নি।

রাতে খাবার সময়ে আবার জ্যাঠামশায়ের জন্মদিনের কথা ওঠে। তারা আর পার্থ তো

হেসেই খুন। তবে খুসিও খুব, খানিকটা হৈ-চৈ তো হবে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে ভারি খাওয়া-দাওয়ার ধুম। পার্থ বললে, ব্যাচেলার হবার ঐ তো সুবিধে। মোহন বললে, অবিশ্যি ব্যাচেলর ঠিক নন্, অল্প বয়সে বিয়েও হয়েছিল, একটা মেয়েও হয়েছিল।

তারা তো অবাক! ওমা সে কি! সব মরে গেল? অন্যমনস্কভাবে মোহন বললে, সব মরবে কেন? জ্যাঠাইমা বলতে গেলে অকালেই গেলেন, কিন্তু সোমাদিদি হয়তো এখনো বেঁচে আছে। এসব সম্পত্তির সেই একমাত্র ওয়ারিস্।

কথাটা শুনে চমকে উঠল নীতা, তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। জোর করে বললে, আহা, ওয়ারিস্ আবার কি? বত্রিশ বছর ধরে যার নাম মুখে আনেন নি, কানে তোলেন নি জ্যাঠামশাই, সে আবার ওয়ারিস কিসের? মেয়ে যে একটা ছিল তাই হয়তো ভুলে গেছেন। খুব মনোযোগ দিয়ে একটা লুচি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মোহন বললে, ওয়ারিস্ বই কি। যতক্ষণ না জ্যাঠামশাই একটা উইল লিখে তাকে বঞ্চিত করছেন ততক্ষণ সেই একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমরা কেউ কিছু নই।

পার্থ জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সোমাপিসি যদি মরে গিয়ে থাকে তবে তো তুমি সব পাবে। নীতা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, গেছে নিশ্চয় মরে, থাকলে কি আর অমনি অমনি এত সম্পত্তির লোভ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও বসে থাকত! আর ওরকম কর্তব্যজ্ঞান শূন্য মেয়ের মরাই উচিত।

মোহন হঠাৎ খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ে।

মা মরে গেলে শুনেছি সোমাদিদি রোজ রাত্রে আমার পাশে ঘুমোত। মার শাড়ি পড়ে, মার মতো গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াত। আমার অবিশ্যি সে কথা মনে নেই, তবে আমাকে যে পড়াত, সে কথা খুব মনে আছে। ঠিক উত্তর দিলে মুখে একটা বড় লজেঞ্চুশ পুরে দিত আর গালে একটা চুমু খেত। ভুল উত্তর দিলে, খালি লজেঞ্চুশ দিত, চুমু খেত না। আমি তো কেঁদেকেটে সারা হতাম।

নীতা আশ্চর্য হয়ে যায়। কই, এত কথা তো মোহন আগে কখনো বলেনি। ব্যস্ত হয়ে বলে, তাহলে এই সুযোগে জ্যাঠামশাইকে দিয়ে সব লিখিয়ে নিতে হয়। সারাজীবন তুমি দেখাশুনো করলে, আর মলে পর তুমি না পেয়ে নেপোয় দই খাবে!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মোহন বলে, সারাজীবন আমি জ্যাঠামশায়ের দেখাশুনো করলাম, না কি উনি আমার করলেন সেই হল কথা। যদ্দুর মনে পড়ে, বাবা কখনো এক পয়সাও পাঠান নি, জ্যাঠামশাই-ই আমাকে মানুষ করেছেন। সোমাদিদি চলে যাবার পর অবিশ্যি সেই যে বোর্ডিংএ পুরে দিলেন, আর বাড়িতে আনেন নি। ছুটিতেও ভালো ভালো জায়গায় এর কাছে ওর কাছে পাঠিয়েছেন। সমস্ত খরচ দিয়েছেন। এখন মনে হয় নিশ্চয় তার চেয়েও বেশি দিয়েছেন, নইলে অমন করে আমাকে সবাই মাথায় তুলে রাখত কেন? চলেই যাচ্ছিল মোহন, নীতা উঠে এসে তার কনুই ধরে নাড়া দিয়ে বলে, তবে বিলেত পাঠান নি কেন? একটা লেবরেটরির সাধারণ রিসার্চের কাজ করে জীবনটাকে নষ্ট করতে দিয়েছেন কেন? সারাজীবন ভাড়াবাড়ীতে থাকতে হচ্ছে কেন আমাদের? তবে তুমি দেখে নিও, তুমি যাই কর না কেন, আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাব, মেয়েকে দস্তুরমতো ভালো বিয়ে দেব, আমাদের মতো-ওদের জীবনটাকে নষ্ট হতে দেব না। জ্যাঠামশাইকে দিয়ে তুমি না পারো, আমি সব লিখিয়ে নেব।

তাই শুনে তারা আর পার্থ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। এমন মজার কথা কেউ

কখনো শুনেছে নাকি? মার যত কান্ড, একটা সীন্ ক্রিয়েট্ করতে পারলে আর কিছু চায় না! তুমি কান দিও না বাবা।

কিন্তু বাবা তার অনেক আগেই কখন নিচে চলে গেছেন, সদর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হয়, বাবার লড়ঝড়ে পুরোনো গাড়িটার শব্দও দূরে মিলিয়ে যায়।

দুই

সত্যিই জ্যাঠামশায়ের জন্মদিনে এসেছিল প্রায় সবাই যে যার ভালো কাপড়চোপড় পরে। যারা আসতে পারে নি তারাও চিঠি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। একটা গোটা পরিবারের মাথা, এটুকু তো সকলেরি কর্তব্য বই আর কিছু নয়। বিরাট বাড়িটা গমগম করতে লাগল, বহুদিনের বন্ধ ঘর সব খোলা হল, সুন্দর সুন্দর পুরোনো পর্দা আবার দিনের আলো দেখল, যেসব ঝাড়বাতি কখনো জ্বলত না সে সবও জ্বালান হল। নীতাকে কোনো কষ্ট করতে হয় নি, জ্যাঠামশাইয়ের ঘর ভরা মাইনে করা লোক, তারা সব এমন নিখুঁৎভাবে কাজ করে যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। নীতা বলে বেশি মাইনে দিয়ে জ্যাঠামশাই রেট খারাপ করে দিচ্ছেন। রবিবার রবিবার চাকরগুলো মাথাপিছু পোয়াটাক মাংস পায়। করবে না নিখুঁৎ কাজ? এখানকার চাকরি ঘুচলে কে অমন করে পুষবে ওদের শুনি?

এসেই তারা একবার বিদ্যুৎবেগে দেখে নিয়েছিল অনীকেন্দ্র এসেছে কি না। তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যাওয়াতে, নিশ্চিন্তমনে সে বড়দাদুর জন্মদিনের উৎসব উপভোগ করতে লেগে গেল। কিছুই নীতার দৃষ্টি এড়োল না। পার্থও যেই শুনল বড়দাদুর বহু আলোচিত সেই অদ্বিতীয় রত্ন সংগ্রহের সিন্দুকের চাবিখোলা হবে, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর, যারা দেখতে চায় তারা যেন বড়দাদুর শোবারঘরে জড়ো হয়, অমনি সে আহ্লাদে আটখানা। ভূ-তত্ত্বের ছাত্র সে, মাণিক দেখবার এমন সুযোগ কজন ছাত্র পায়? খাতার পাতার মতো তার মনের কথা নীতা পড়তে পারে। কিন্তু পার্থকে বড়লোক হতে হবে। পিছনে নীতা না থাকলে, বড়লোক হওয়া দূরে থাকুক, বড়লোক হবার ইচ্ছাটাও তার যে হবে না, এ কথা নীতা বেশ জানে। তাই অহরহ পার্থর কানে টাকার মন্ত্র দিতে হয়।

নিচের বড় হল ঘরে খাওয়া হল। লম্বা ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত টানা শ্বেতপাথরের টেবিল, তার দুধারে লাল মখমলের গদি আঁটা সেকেলে চেয়ার, যেমনি দেখতে সুন্দর, তেমনি দামী আর তেমনি শক্ত। হোটেল থেকে খাবার এল, উর্দিপরা বেয়ারারা পরিবেশন করল। কিন্তু কাঁটাচামচ বাসনকোসন বড় বড় রুপোর থালা সব জ্যাঠামশায়ের নিজের। এর আগে এ সব কখনো দেখে নি নীতা। সত্যি দেখে নি বুঝি! বুকের ভিতর কোথায় একটা পুরোনো ব্যথা টনটন করে ওঠে। এ কথা কি করে ভুলে যেতে পেরেছিল নীতা যে নীতার বাবার জিনিসপত্র যখন বিক্রি হয়ে গেল, মোহনের জ্যাঠামশাই-ই এক থোকে সব কিনে রেখে দিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ সেই বড় চেনা রুপোর বাসন দেখে নীতার বুক ফেটে যেতে চায়। তার উপর মোহনের আত্মীয়স্বজনদের বেশির ভাগই এ জিনিস চোখেই দেখে নি কখনো, তার ব্যবহার জানবে কোত্থেকে।

মা বলতেন কার কত শিক্ষা, তাদের চা তৈরী করার রকম দেখেই বোঝা যায়। যারা চা কি করে করতে হয় জানে, তারা চামচ দিয়ে চাদানি ঘোটে না। দুধ ঢালে আগে, চা ঢালে

পরে। সাহেবদের কাছে শিখতে হয়।

আর মোহন বলে, আশ্চর্য, আমাদের দেশের গাছে চা হবে আর ওদের কাছে চা খেতে শিখতে হবে? কাকে কি বলবে নীতা? তবে কোত্থেকে শিখবে হালচাল মোহন, শিখিয়েছিল কেউ কোনোদিনো? শেখাবার মধ্যে ছিল শুধু বাড়ির মাষ্টার; আধময়লা ধুতি পরে নিশ্চয় দুবেলা দুঘণ্টা করে পড়িয়ে যেত মোহনকে, এই বাড়িরই একতলার কোনো একটা ছোট ঘরে। মা-মরা বাপে-ফেলে-দেওয়া পয়সাকড়ি-শূন্য ছেলেটার জন্যে আবার কত ব্যবস্থা হবে। তাতেই আত্মীয়স্বজনরা বলত সবটাতেই জ্যাঠামশায়ের আদিখ্যেতা!

কি যে খায় নীতা নিজেই কোনো স্বাদ পায় না। বাবা যদি থাকতেন এসব জিনিস নীতার হত। মোহনের সঙ্গে কক্ষনো তার বিয়ে হত না। জীবনের শেষ দশটা বছর মাকে আর মোহনের ভাড়াবাড়িতে কাটাতে হত না। মার বোধ হয় আশা ছিল জ্যাঠামশায়ের এই মস্ত বাড়ির কোনো একটা শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো খিলান দেওয়া ঘরে চোখ বুজবেন। শেষে গেলেন তো মোহনের ভাড়াবাড়ির ছোট স্নানের ঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে। যার যেমন কপাল। কিন্তু দরকার হলে নীতা নিজের হাতে ভাগ্যদেবীর থুতনি ধরে জোর করে মুখ ফিরিয়ে দেবে। দেখা যাবে তিনি কি করতে পারেন। আইসক্রীমটা কি নিমপাতা দিয়ে রং করেছে? চোখ তুলে নীতা দেখে টেবিলের অন্য প্রান্তে অনীকেন্দ্রের পাশে বসেছে তারা। দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় নীতার। লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে হুঁস নেই, অনীকেন্দ্রের মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। যদি কোনো লজ্জা, সরম থাকে! একে আত্মীয়, নিকট আত্মীয়ই বলতে গেলে, নিজের ঠাকুরদার পিস্তুতো বোনের নাতি, আত্মীয় নয় তো কি, তুই তার মাসি হোস্! দেখতে ভালো অনীকেন্দ্র তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবি? বাজে একটা বখা ছেলে, কোন একটা বাংলা খবরের কাগজে নাকি পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি করে। তাতেই তার গুমোর কত, নইলে তারার মতো মেয়ের দিকে তাকাতে সাহস পায়?

অনীকেন্দ্রর ফর্সা কপালের ওপর এক গোছা কালো চুল ঝুলে পড়ে, হাত দিয়ে সেটিকে সরাতে গিয়ে, নীতার চোখের দিকে সে চায়। এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টি কাটে, যেন দুটি ইস্পাতের তলোয়ার। তারপর সামান্য একটু হেসে অনীকেন্দ্র চোখ ফিরিয়ে নেয়। নীতাও চোখ নামিয়ে দেখে তার হাতের রূপোর চামচে বাবার নামের অদ্যাক্ষর খোদাই করা; অমনি চামচ নামিয়ে রাখে। অনীকেন্দ্র সম্বন্ধে একটা কিছু করা দরকার।

চেয়ে দেখে চামচের ওপর মোহনেরো দৃষ্টি পড়েছে। টেবিলের মাথায় উঁচু পিঠের চেয়ারে, কুসনে ঠেস দিয়ে বসে ঐ কাগজের মতো হাল্কা মানুষটার হাতের মুঠি খোলা কি এতই শক্ত? কিন্তু এতটুকু চেষ্টাও হয়তো করবে না মোহন। কে আবার সোমাদিদি? নিশ্চয় কোনকালে সে মরে গেছে। বত্রিশ বছর কি কম সময়? একটা ছোট মেয়ে বত্রিশ বছরে আধবুড়ো হয়ে যায়। সারা জীবনের স্বপ্নগুলো বত্রিশ বছরে হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। পার্থ কেন দিনরাত বই পড়ে? উঃ! জীবনের কত অমূল্য মুহূর্ত বৃথা কেটে যায়, মনের সাধ হাতের নাগালের এতটুকুও কাছে আসে না। বত্রিশ বছর কি নিদারুণ দীর্ঘ সময়। এই বত্রিশ বছরে মৃত্যু কত কাছে এসেছে, বত্রিশ বছরের পথ পার হয়ে এত কাছে এসেছে যে একবার সেদিকে তাকালে জ্যাঠামশাই তার মুখচোখ দেখতে পাবেন।

কিন্তু তাকান না জ্যাঠামশাই। পাখির মতো দুটো একটা পদ একটু খুঁটে খেয়ে,

একটু নাড়াচাড়া করে, মখমলের খাপে ঢাকা রুপোর গেলাস থেকে এক চুমুক জল খেয়ে, লেসের পাড় দেওয়া মিহি একটা ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁটের কোনা মুছে, খাস বেয়ারা দিনুর মুখের দিকে তাকান। সে অমনি কাছে এসে সাহেবের ভারি কেদারা টেনে দেয়, চাকার উপর গড়িয়ে কেদারা সরে যায়, জ্যাঠামশাই নেমে পড়েন।

এককালে প্রবল পৌরুষের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, যেমনি মাথায় লম্বা, তেমনি প্রকাণ্ড বুকের ছাতি, দেখলে হঠাৎ কেউ গলা তুলে কথা কইতে সাহস পেত না। এখন শুকিয়ে নুইয়ে পড়ে এতটুকু হয়ে গেছেন, কিন্তু তবু চোখের তীব্র দৃষ্টির সামনে গলা তুলে কথা কইতে এখনো কেউ সাহস পায় না। আড়ালে, গোপনে, অন্তরালে, মনের কোণে সবাই বোধ করি টাকার ঝন্‌ঝনানি শুনে কালা বোবা হয়ে থাকে। অন্ততঃ নীতার সেইরকম মনে হয়।

সিঁড়ি ভাঙেন না জ্যাঠামশাই আজকাল আর। একতলাতেই তাঁর শোবার ঘর। দামী আসবাবে ঠাসা দোতলার বড় বড় ঘরগুলো বারোমাস চাবি বন্ধই থাকে। মাসে একবার খুলে দীনুর তদারকে ঝাড়পোঁছ হয়। দীনুর উপর জ্যাঠামশায়ের ভারি বিশ্বাস। বলতে গেলে বাড়ির গিন্নিই সে। কবেই বা নীতার সঙ্গে জ্যাঠামশাই ঘর গেরস্থালির পরামর্শ করলেন। অথচ নীতার কোনো দোষ নেই, সে তো সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু না ডাকলে কাছে যায় কি করে? তবে এবার যাবে, নইলে দীনুকেই যদি সব লিখে দিয়ে যান, তাই বা আটকাচ্ছে কে? নীতার ইচ্ছা ওরা চারজন আজ রাত্রে এ বাড়িতেই থাকবে। জ্যাঠাইমার নিজের ঘর খুলিয়ে দিয়েছেন জ্যাঠামশাই। এর আগে কেউ ও ঘর ব্যবহার করতে পায় নি। হয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়ের। নিজেও নিশ্চয় সেটা টের পাচ্ছেন, তাই টানগুলোও সব কমে আসছে। কাল সকালেই একটা এসপার ওস্পার করে ফেলতে হবে।

খাবার পর জ্যাঠামশাই-এর শোবার ঘরে লোকের ভিড়। মোড়ার উপরে পা দুটি তুলে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী আর শান্তিপুরে থান ধুতি পরে জ্যাঠামশাই বসে, যেন কতই নিরীহ, কিন্তু নীতা জানে নীল শিরা বের করা ঐ ক্ষীণ হাত দুটির ক্ষমতা কত! সোনার জলের কাজ করা লাল চামড়ার খাপ থেকে চাবিগোছা বের করে একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে অনীকেন্দ্রকে বললেন, নে, খোল্। নীতার গা জ্বালা করে, কেন, অনীকেন্দ্র কেন? পার্থ হল নিজের ছোট ভাইয়ের নাতি, উত্তরাধিকারী। কারণ সোমাদিদি কবে মরে গেছে। মরে গেছে মরে গেছে, তাই যেন হয়, ভগবান।

ইতালিয়ান ঝিলমিলি দিয়ে বন্ধ করা সিন্দুক। চাবি খুলতেই খটাং করে সামনেটা উপরে উঠে যায়। ভিতরে সারি সারি স্টিলের টানা, এরকম দেখে নি কখনো এরা কেউ। নীতাও না। তাই যদি বলা যায়, একমাত্র ভাইয়ের একমাত্র পুত্রবধূ হয়েও কবে কোন জিনিসটে পেয়েছে নীতা? আজ সিন্দুক খুলল অনীকেন্দ্র, পার্থ নয়। অনীকেন্দ্রের পাশে তারা। চোখদুটো বন্ধ হয়ে আসে, দেখতে ইচ্ছা করে না।

উপরের টানাগুলো সরু, নিচেরগুলো ক্রমে চওড়া, একসঙ্গে সব টেনে খুলে দিলে এক সঙ্গে সব দেখা যায়। সিন্দুকের দাম নাকি পঁচিশ হাজার টাকা, অ্যামেরিকা থেকে এসেছিল। পঁচিশ হাজার টাকায় পার্থর বিলেতের খরচ উঠে যায়।

সব টানা খুলে দেয় অনীকেন্দ্র। কারো মুখে কথা সরে না। উপর থেকে সেকেলে ঝাড় বাতিতে বসানো বিজলির আলো টানাগুলোর উপরে পড়ে, মণিগুলোর ভিতর থেকেও যেন আলো বেরোয়। বেগনি, তুঁতে, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল, সাদা। না, সাদা

নয়, বর্ণালীর সব কটি রং একসঙ্গে জড়ো করে ঐ সাদা পাথর তৈরি। নীতার মা-র গা ভরা হীরের গয়না ছিল। একটি একটি করে বেচে খেয়েছিলেন। তবু পেট ভরেনি। সব শেষ হয়ে গেলে মোহনের ভাড়া বাড়িতে এসে উঠেছিলেন, এইতো ক'বছর হল চোখ বুজেছেন। মা-র খিদে মেটানো কি সোজা কথা ছিল। লাখ লাখ টাকার গয়না কর্পূরের মতো উড়িয়ে দিলেন। মাসিদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বিলেত পর্যন্ত ঘুরে এলেন। এখন তার কিছু বাকি নেই, আছে শুধু নীতার বিয়ের সময় দেওয়া হীরের নেকলেস আর কানের ফুল। সে নীতা মরে গেলেও কাউকে দেবে না।

টানাগুলোর উপরে চোখ, কিন্তু মণি দেখে না নীতা। সারা জীবনের ব্যর্থতার রাশি লাল নীল হলদে সবুজ পাথর হয়ে নীতাকে টিটকিরি দেয়। কিন্তু এ আবার কেমন কথা জ্যাঠামশায়ের। এখানে পাঁচশো বাছাই করা রত্ন আছে, শোনো মোহন, এর দাম দশ লক্ষ টাকা। ঐ দামে সব ইন্সিওর করা আছে, তলার টানায় কাগজপত্র আছে, অ্যামেরিকা থেকে দশ লক্ষ টাকা অফার দিয়েছে, ওদের সংগ্রহ-শালার জন্য কিনতে চায়। অত দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন মোহন, কাছে এসো। চোখে যেন কম দেখছি।

মোহন পাশে এসে দাঁড়াল। জ্যাঠামশাই বলতে লাগলেন, আমার নৌকো বোধ হয় এল এবার মোহন। উইল করি নি, বুঝলে মোহন। চাকরবাকরদের যাকে যা দেবার আজ সকালে দিয়ে দিয়েছি, বাকি সব আমার মেয়ে সোমার জন্যে রইল। তুমি তাকে খুঁজে বের করতে যদি পারো, তার জন্যে যা খরচ হয় নিও, বাকি যা থাকে সব তাকে দিও। পারবে? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহনের দিকে তাকান জ্যাঠামশাই।

মোহন দৃঢ়কণ্ঠে বললে, পারব। কিন্তু কোথায় খুঁজব তাকে বলে দাও।

জ্যাঠামশায়ের গলা একটু গাঢ় শোনায়, তাই কি আমি জানি, মোহন? বত্রিশ বছর তার খবর জানি না, আছে কি নেই তাও জানি না। আইনের চোখে সে মরে গেছে, তুমিই উত্তরাধিকারী। পাঁচ বছর খুঁজেও যদি না পাও, তবে আর আমার কিছু বলার থাকে না।

জ্যাঠামশাই মোহনের মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরভরা মানুষগুলিকে একবার দেখে নেন। অনেকটা কোমল গলায় বলেন, বড় আশা করে সবাই এসেছে, না? হয়তো অনেক অসুবিধাও হয়েছে অনেকের। তলার টানায় দলিলে লেখাপড়া করা আছে, দশ লক্ষ টাকায় অ্যামেরিকার সংগ্রহ-শালা আমার রত্ন-সংগ্রহ কিনে নেবে। সে টাকা আমার বাবার যেখানে যত বংশধর আছে, ছেলেই হক মেয়েই হক, ছেলের দিকেই হক আর মেয়ের দিকেই হক, সবাই সমান অংশে পাবে। এ ব্যবস্থার ভারও মোহনকে দিয়েছি।

নীতার সমস্ত অন্তঃকরণ বিষ হয়ে ওঠে। জ্যাঠামশায়ের বাবার বংশধর ছেলেমেয়ে সুদ্ধ গুণলে কত হবে জ্যাঠামশায়ের নিজেরো কোনো ধারণা নেই। কম করে একশো তো হবেই। দশ লক্ষকে একশো ভাগ করলে প্রত্যেকে পাবে দশ হাজার। মোহন, তারা, পার্থ প্রত্যেকে বংশধর, প্রত্যেকে পাবে দশ হাজার। অনীকেন্দ্রও পাবে দশ হাজার। অনীকেন্দ্রের মাসির অসভ্য নাতিদুটোও পাবে দশ হাজার করে; সরলা পিসিমা, বিমলা পিসিমা, আর তাঁদের পাঁচ-সাতটি করে ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে পাবে দশ হাজার। পিসিদের এক একজনার ঘরে ষাট-সত্তর হাজার করে উঠবে আর মোহন করবে সব ব্যবস্থা, তার ঘরে উঠবে ত্রিশ হাজার! বাঃ! খুব ভালো!

হাসি পায় নীতার, হাসির চোটে দম বন্ধ হয়ে আসে, কোনো রকমে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে হাসি বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মোহন যখন রাত্রে শুতে আসে অবাক হয়ে

দেখে নীতা ঘুমে অচেতন। কিন্তু অমন করে বালিশ আঁকড়ে ঘুমোয় কেউ কখনো?

সেই রাত্রেই নির্জনে নিঃশব্দে জ্যাঠামশাইকে নিতে নৌকো এল। সকালে সবাই শুনল ঘুমের মধ্যে জ্যাঠামশাই স্বর্গে গেছেন, কোনো কষ্ট পাননি।

তিন

বাস্তবিকই কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, সবাই তাই বললেও। মোহনের বাবা বিলেতে গিয়ে যা কামিয়েছিলেন সে সবই তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের মেম পরিবারকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পৈত্রিক যেটুকু ছিল সে তো আর সঙ্গে করে নিয়ে যান নি। দেশের বাড়ি জমি-জমা সব যখন বিক্রী হয়ে গেল, মোহনের তখন আঠারো বছর বয়স, যেমন যেমন বলা হয়েছিল সই করে দিয়েছিল। খরচপত্রও যেমন সবই জ্যাঠামশাই দিতেন, তেমনি মোহনও কোনোদিন সম্পত্তির হিসেবটাও চায় নি। এখন মরবার সময় 'সব আমার মেয়ে সোমাকে দিও' বললেই তো আর হল না।

সবাই বোঝে এসব কথা, বোঝে না শুধু মোহন। অথচ পয়সাকড়ি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সন্ন্যাসী তো আর তাকে বলা যায় না। নিজের আরামটুকু সম্বন্ধে তো দিব্যি সচেতন, অবিশ্যি স্বার্থপরও সে নয়, তাকে স্বার্থপর বললে নীতার পাপ হবে। কিছুই রাখে না নিজের জন্যে, পয়সাকড়ি, কাগজপত্র, সিন্দুকের আলমারির চাবির গোছা সব থাকে নীতার হাতে। থাকে না শুধু মোহনের মনের চাবিটি। বাইরে থেকে সবাই জানে মোহন ভারি বাধ্য স্বামীটি, স্ত্রীর কোনো ব্যবস্থায় উচ্চবাচ্য করে ন। কেন করবে? সাংসারিক কোন ব্যবস্থাকে সে এতটুকু প্রাধান্য দেয় যে তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি করবে? আসলে এসবই তার কাছে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর; তাই নীতা যা করে সমস্তই সে নির্বিবাদে মেনে নেয়। তর্ক পর্যন্ত করে না; হয়তো তর্ক করার যোগ্যই মনে করে না বোঝে না কি আর নীতা? কিন্তু বোঝাবে কাকে?

যে স্বামী কখনো জন্মদিন ভোলে না, বিয়ের বাৎসরিক ভোলে না, যেখানেই যায় মনে করে স্ত্রী-ছেলেমেয়ের জন্যে উপহার কিনে আনে, খরচপত্র নিয়ে অশান্তি করে না, রাগমাগ করে না—মাঝে মাঝে একটু রাগমাগ করলেও তো নীতার একটা সান্ত্বনা থাকত যে মোহনের বর্মে ফাটল আছে। কেমন করে মামাতো মাস্তুতো পিস্তুতো বোনদের বোঝাবে নীতা যে ওর স্বামী সর্বদা হাসিমুখে সব কথা শুনে যায় বটে, কিন্তু কোনো কথাই তার মনের উপরে এতটুকু আঁচড় কাটে না। তারা আর পার্থ যে মোহনের হৃদয়ের কতটুকু জুড়ে থাকে সে বিষয়ে নীতার সন্দেহ আছে।

তবু না বলেও পারে না। শ্রাদ্ধশান্তি হওয়া পর্যন্ত চুপ করেই থাকতে হয়, ওদিকে আত্মীয়স্বজনদের প্রশ্নে প্রশ্নে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। মরবার সময়ে মানুষে কত ভুল বকে, তাই বলে সত্যি সত্যি যেন মোহন আবার সোমাকে খুঁজতে না বেরোয়। ত্রিশ বছর ধরে যে নিখোঁজ তাকে আবার কেউ পায় নাকি? সে কি আর আছে যে পাবে? তা হলে এখন মোহনদের কি করা ঠিক হল, ভাড়া বাড়িতে গুচ্ছের টাকা না ঢেলে এ বাড়িতেই উঠে আসবে, নাকি চাকর-বাকরদের ছুটি দিয়ে দরজায় তালা দেওয়া হবে? নাকি এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাসা বাড়িতেই থাকবে?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। জ্যাঠামশায়ের উকীল সারদাবাবু এসে

দেখা করেছিলেন। তাঁকে মোহন স্পষ্ট করে বলে দিল, ইংরিজি বাংলা সব কাগজে সোমাদিদির সংবাদ চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিতে। তাতেই একরাশি টাকা খরচ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য বিজ্ঞাপনের কোনো উত্তর আসে নি। নীতা জানত যে আসবে না, মোহনও জানত। দামী জিনিস সব ব্যাঙ্কের ভল্টে জমা হল, বুড়ো নীলমণির উপর বাড়ি পাহারা দেবার ভার রইল, বাকি সকলের ছুটি হয়ে গেল। মোটা টাকা দিয়েছেন জ্যাঠামশাই সবাইকে, তারা যে যার দেশগাঁয়ে গিয়ে জমিজমা কিনতে লেগে গেল।

ভাড়া বাড়িতে ফিরে এসে কিন্তু পুরোনো ছন্দে জীবনযাত্রা সুরু হল না। তারা পার্থ কলেজের বইখাতা তুলে নিল, যেন কিছুই হয়নি। নীতার বিশ্বাস এম্‌-এ পড়ার নাম করে তারা এখানে-ওখানে অনীকেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে। নইলে ওর চোখদুটি কিসের আশায় অমন উজ্জ্বল হয়ে থাকে? ও কি সত্যি বোঝে না যে ওদের দুজনার মধ্যে কিছু হতে পারে না, কিছু হতে নীতা দেবে না? ওর ঐ ক্ষীণ হাতের কতটুকুই বা শক্তি যে নীতার সঙ্গে লাগতে আসে? অনেক দিন ধরে নীতার মুখ দিয়ে একটা ভালোবাসার কথা বেরোয় নি, তাও কি তারা লক্ষ্য করে নি? নাকি লক্ষ্য করেও গ্রাহ্য করে নি?

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে মোহন বললে, অনেক ছুটি জমে গিয়েছিল, নীতা, একেবারে একসঙ্গে অনেক দিনের ছুটি নিয়ে নিলাম। বিবর্ণ মুখে নীতা চেয়ে থাকে। এই শুরু, এই তবে শুরু, সর্বনাশের শুরু তাহলে এই মুহূর্ত থেকে। মোহন জোর করে হেসে পার্থকে বললে, কেমন মজা বল্‌ তো ব্যাটা, তোরা পড়াশুনো করবি আর আমি ঘুরে বেড়াব। ঘুরে বেড়াবে? কেন? কঠিন স্বরে নীতা বললে, মরা মানুষকে খুঁজে বেড়াবে। একবার বলা হয়ে গেছে আর তাকে ফেরাবার উপায় নেই। ঐ চারটি কথার মধ্যে মনের সব জ্বালা রূপ ধরে। মোহন বললে, সোমাদিদির কথা বলছ? কি করে জানলে সে মরে গেছে? তুমি তাকে দেখ নি তাই জানো না সে কিরকম জীবন্ত ছিল। একবার আমাকে একনাগাড়ে ছ'মাস ধরে রোজ একটা করে গল্প বলেছিল।

নীতা বললে, আমার বাবাও তো বেজায় জীবন্ত ছিলেন, এত জীবন্ত যে নিজের মাথার খুলি নিজের হাতে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এ বাড়ির চায়ের আসরে এ ধরনের কথা কেউ কখনো শোনে নি। ঘরের পুরোনো চেনা আবহাওয়াটাই যেন ফেটে খান খান হয়ে গেল। কখন থামতে হয় নীতা জানে না, বলে, কুড়ি বছরের বেশি কেউ নিখোঁজ হলে সে বেঁচে থাকলেও আইনের চোখে সে মৃত। কিছু বলে না মোহন, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নীতা জানে রোজ সে কোথায় যায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেঁটে পোয়াটাক পথ পেরিয়ে বাস্‌ ধরে জ্যাঠামশাইদের মোড়ের মাথায় নামে। নীলমণি দরজা খুলে দেয়, আলো জেলে দেয়, এক পেয়ালা চা-ও নিশ্চয়ই করে দেয়।

জ্যাঠামশায়ের বড় ডেস্কের সারি সারি খোপ, টানা, কুঠরির মধ্যে রাখা, ষাট বছরের জমানো কাগজপত্রে মোহন ডুবে যায়। এতটুকু একটুখানি নিশানা যদি মোহন কোথাও থেকে পেয়ে যায় আর তাকে ধরে রাখা যাবে না। নীতার পায়ের তলা থেকে পুরোনো নিরাপত্তার আশাটুকু কেটে নিতে মোহনের এতটুকু বাধবে না।

পুরোনো নিরাপত্তা আবার কি? বাবা গিয়ে অবধি কবেই বা জীবনে নিশ্চিন্ত নিরাপদ হতে পেরেছে নীতা? লোরেটোতে যারা পায়ে হেঁটে ক্লাশ করতে আসত নীতা তাদের কৃপার চোখে দেখত। কত সময়ে ট্রামের রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিত। তাদের সঙ্গে এক-

দিনের জন্যেও এতটুকু তর্কাতর্কি বা কথা কাটাকাটি হত না। তাদের সঙ্গ নীতার কি? যাদের সঙ্গে হত, তাদের মধ্যে ছিল স্যার অমরনাথের মেয়ে শীলা।

উঃ, এখনো চোখ বুজলেই ছোট করে চুল ছাঁটা কপালের উপর ঝালরকাটা শীলাকে দেখতে পায় নীতা। ত্রিশ বছর আগেকার সেই এগারো বছরের শীলা, অসহ্য তার দেমাক। চারদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবে নীতা ছোটবেলাটা হঠাৎ এত কাছে চলে এল কি করে? নিরাপদ সুখের দিনগুলোতে কত বিষই না ভরা ছিল।

ক্লাশের প্রত্যেকের জন্মদিনে প্রত্যেকের চা পার্টিতে নেমন্তন্ন হত, এখনো মনে পড়ে যারা পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করত, তারা বড় একটা সে সব পার্টিতে যেত না। হয়তো ক্লাশের মধ্যেই সরু লাল রেশমি ফিতেয় বাঁধা একটা বই, কি দুটি রঙ্গীন রুমাল, কি এক শিশি অগরু দিয়ে বলত নাকি অন্য জায়গায় নেমন্তন্ন আছে, তাই আসতে পারবে না। সেগুলো নীতা তার নেপালী আয়াকে উপহার দিত।

তারা বুঝত সবই, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, ঐ দ্যাখ পাছে ফিরে ডাকতে হয়, সেই ভয়ে এল না। হাসাহাসিও করত তাই নিয়ে। নন্দিতাকেও মনে পড়ে। ক্লাশে বরাবর প্রথম হত, মাদাররা খুব প্রশংসা করতেন, তবে সেরকম ভালোবাসতেন না বোধ হয়। ওর বাবা নাকি কোথাকার স্কুলমাস্টার, মেয়েকে ভালো ইংরিজি শেখাবার সখ। শিখেও-ছিল ভালো ইংরিজি, পরে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়ে এম্-এ পাশ করে, কে এক সহপাঠীকে বিয়ে করে বিলেত অবধি ঘুরে এসেছিল। এখন বইটই লেখে, নন্দিতা মল্লিককে কে না চেনে।

কখন রাত বেড়েছে, বালিগঞ্জের ছোট রাস্তা, গাড়িচলাচল কমে এসেছে, অন্ধকার ঘরে পথের আলো বাঁকা হয়ে পড়ছে। বিনুমাসিমা রাগে ফুলতে ফুলতে এসে উপস্থিত হলেন। শুনেছিস্ তোর ছেলে পার্থর কান্ডটা? আমার অমিতের সর্বনাশটি করা কেন, সে তোদের কি করেছে? বেশ তো আছিস্, জ্যাঠার পয়সায় বড়মানুষি কচ্ছিস্, সে তোদের খেতেও চায় না, পড়তেও চায় না, বাপ-মা মরা ছেলেটাকে কত কষ্টে মানুষ কচ্ছি সে তো তোদের অজানা নেই। একই কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে একশো বার করে বলেন বিনুমাসিমা। নালিশটা যে কি তা টেনে বার করতে হয়।

পার্থ তার ঐ পেয়ারের বন্ধু ইয়েনের সঙ্গে নাকি অমিতের ভাব করিয়ে দিয়েছে। ব্যাস্, এইটুকু? কি এমন দোষ করেছে পার্থ? লোকজনের সঙ্গে আলাপ থাকা ভবিষ্যতের পক্ষে তো ভালো। আর ইয়েন তো হল গিয়ে মোহনের অমলাপিসির ভাসুর পো, একরকম আত্মীয়ই বলতে গেলে।

বিনুমাসিমা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। আদিখ্যেতা রাখ্ দিকিনি। ঐ হতভাগাটা বুঝি হল তোর লোকজন আত্মীয়? তোর ছেলে না হয় বড়লোক, আমার নাতিকে করে খেতে হবে—নাকি বাঙ্গালীর ছেলে ইয়েন, সমাজে ফিরিঙ্গি, মুখ দিয়ে বাংলা বেরোচ্ছে না, এক মুখ দাড়ি, জঘন্য নোংরা—তুই থাম্ দিকিনি।

নীতা বাধা দিয়ে বলে, বেশতো আপনার নাতিকে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশতে দেবেন না, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ব্যাকুল হয়ে ওঠেন বিনুমাসিমা, শোনে না রে, নীতা, আমার কোনো কথাই শোনে না। আমাকে শত্রু ঠাওরায়। মদ খেয়ে বাপটি মল, তার আগে আমার মেয়ের কি হাল করেছিল দেখেছিলি তো, মাজাটা তার ভেঙ্গে দিয়েছিল, তাই অমন টপ করে একটু অসুখ হল কি না হল, অমনি চোখ বুজল। আর আমার ঘাড়ে চাপাল ছোঁড়াটার ভার। আমার কি এখন বাঁদর তাড়ানোর বয়স আছে, তুই-ই বল্ না!

এখন দ্যাখ্, দিন নেই, রাত নেই, কাজ নেই, পড়া নেই, তিনটিতে খালি ধেই ধেই করে বেড়াচ্ছে, কি নাকি ইংরিজি বলার ক্লাব খুলছে। আর নাগাল পাইনে ওর রে নীতা, অথচ পিসির বাড়িতে কি অবহেলায় অচ্ছেন্দায় দিন কাটছিল সবই তো জানিস, তখন একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল আমাকে। একমাত্র ভয় বুঝি বাপ-মার মতো আমিও ওকে ছেড়ে চলে যাব। আর সে জো কি আছে আমার, না খেয়ে মরে যাবি যে! কোথায় যেন লাগে নীতার। একদিন সেও মাকে ঐরকম করে অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল, মা কিন্তু মাঝখান থেকে কেঁদেকেটে পিছলে বেরিয়ে যেতেন, কিছুতেই আর জোর করে আঁকড়ে ধরা যেত না। বিনুমাসিকে বলে, অত ভাববেন না মাসিমা, দেখি পার্থটাকে বলে দেখি। বিনুমাসিমা উঠে পড়েন, যাই, চাকরটা আবার দেশে গেছে, মাংস চাপাই গিয়ে। করি তো সবই, তবু মন পাইনে। কত সময় বাইরে থেকেই খেয়ে আসে। আরে, হ্যাঁরে নীতা, সন্ধ্যে লেগেছে, ঘর অন্ধকার করে বসে আছিস্ যে বড়? ওতে ভারি অকল্যাণ হয়।

আলোটা জেবলে দিয়ে বিনুমাসিমা চলে গেলেন। মানুষ কি সাংঘাতিক একা। খালি বাড়িতে বিনুমাসিমা নাতির জন্য রাঁধাবাড়া করবেন, সে হতভাগা কখন বাড়ি ফিরবে তারই ঠিক নেই। আর নীতা?

শোনে না কোনো কথা পার্থও। পার্থর মনেরি বা কত নাগালে পাচ্ছে নীতা? ঐ ইয়েনটাই যে পার্থেরো জীবনের শনি তাকি নীতা জানে না?

চার

ষাট বছরের কাগজপত্র ঘেঁটে গুছোনো কি চারটি খানিক কথা। শেষের দিকে জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিপত্র যা কিছু আসত সব বোধকরি ময়লা কাগজের টুকরিতে ফেলে দিতেন। তবে ইদানিংকার ঘটনাতে তো আর মোহনের মন নেই, সে খুঁজে বেড়াচ্ছে ত্রিশ বছরের পুরোনো নিশানা। যেখান দিয়েই মানুষ যায় পায়ের ছাপ রেখে যায়, সবই কি তার মুছে যায়?

শেষের দিকের কাগজপত্রে অনেক ফাঁক, কিন্তু আগেরগুলি এককালে গুছিয়ে রাখা হত বোঝা যাচ্ছে। তারপর ত্রিশ বছর আগেকার এক দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে গেছিল। আশ্চর্য, সোমাদিদি কি কোথাও এতটুকু পায়ের চিহ্ন রেখে যায় নি? শুনেছিল রেগেমেগে জ্যাঠামশাই সমস্ত বাড়ি খুঁজে তার প্রত্যেকটি ছবি প্রত্যেকটি চিঠি ছিঁড়ে-খুঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। আনুপিসির কাছে শোনা, কাশীর দিদিরা সে সময় কলকাতায় এসে জ্যাঠামশায়ের বাড়িতেই ছিলেন। তাঁরা নাকি সাহায্য করার নাম করে সোমাদিদির সব কাপড়জামা ভালো ভালো জিনিষপত্র সমস্ত রাতারাতি পাচার করে দিয়েছিলেন। সেজন্য আনুপিসি মানুপিসিদের সেকি রাগ! এত কাছের সম্মর্কের তাঁরা দুবোন থাকা সত্ত্বেও জিনিষগুলো সব বাগিয়ে নিল দুদিনের জন্যে কাশী থেকে এসে ঐ ওরা! কি ভালো ভালো সব গরম আলোয়ান, জামদানি ঢাকাই সাড়ি ছিল সোমাদিদির। রেশমি জিনিস সে ছুঁত না, তবু তার সখ কত, আজকাল ওসব জংলা, হাজার বুটিদার কাপড় তো কেউ চোখেও দেখতে পায় না। আছে হয়তো কাশীর দিদির নাতনিদের সিন্দুকে তার কতক-কতক।

গয়নাগাঁটি কিছুই নাকি নেয় নি। আনুপিসিরা বিশ্বাস করেন না, নাকি সোমাদিদি তার মার হাতের দুগাছি সোনার রুলি আর গলায় পলা দিয়ে গাঁথা একছড়া ছোট হার ছাড়া

কোনো গয়নাই পরত না। ডাক্তারি পড়তে গেল যখন সেও খুলে রেখেছিল। খালি হাত করে রাখত, কেউ কিছু বললে হাসত।

সোমাদিদির হাসিটি মোহন কখনো ভুলবে না। মার কথা মোহনের একটুও মনে নেই, বাবার কথাও ভালো করে মনে পড়ে না। তবে এক একদিন রাত্রে চোখ যখন ঘুমে ভারি হয়ে আসত, একজন লম্বা চৌওড়া গম্ভীর গলার লোকের জোরে জোরে হাসির কথা মোহনের মনে হত। সেই হয় তো বাবা।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মোহন বাবাকে মনে করতে চেষ্টা করে। আশ্চর্য, বাবা কি তাকে একটুও ভালোবাসতেন না! সোমাদিদির কত কথাই যে মনে পড়ে। কবে যেন জ্যাঠা-মশাই মোহনকে নিয়ে এসেছিলেন, খুব মন কেমন করত মোহনের, সারাদিন চুপ করে থাকত আর রাতে পাছে কেউ শুনতে পায়, তাই বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদত। আশ্চর্য কান্নাটার কথা মনে পড়ে, অথচ যাদের জন্যে কান্না, তাদের ভুলে গেছে।

রোজ কোনো এক সময়ে একটা খসখস শব্দ হত, ঘরটা কিরকম একটা সুন্দর গন্ধে ভরে যেত আর সোমাদিদি এসে মোহনকে ঠেলেঠুলে খানিকটা জায়গা করে নিয়ে, তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ত। কানে কানে বলত, দূর যা গেছে তা গেছে, আয় তোকে গল্প বলি। গল্প বলতে পারত সোমাদিদি। বালিশ থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে সোমা-দিদির মুখের দিকে চেয়ে গল্প শুনত মোহন। সোমাদিদির মুখটা মনে হয়, শামলা রং, সোজা সোজা কালো চুল কানের ওপর দিয়ে টেনে বিনুনি করে হাতে জড়িয়ে এত বড় খোঁপা বাঁধা। তাতে না থাকত কাঁটা না থাকত ফুল। নিরাভরণ সোমাদিদির মুখের মতো সুন্দর মুখ জন্মে দেখে নি মোহন। আহা, অমন কালো চোখ আর দেখল না মোহন।

ডাক্তারি পড়তে পড়তে কে এক পাহাড়ী সহপাঠীর সঙ্গে বড় বেশি ভাব হল সোমা-দিদির, জ্যাঠামশাইয়ের কানে কথাটা কে তুলে দিল, সোমাদিদি কারো উপদেশ শুনল না, এক কথায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আর তাকে কেউ দেখে নি। কয়েক বছর পরেই সে ডাক্তারি পাশ করে বেরুত, তারো তর সইল না। মোহনের সঙ্গে শেষ দেখাটাও হয় নি। মোহন ম্যাট্রিক দেবে বলে সে বছর জ্যাঠামশাই ওকে হস্টেলে রেখেছিলেন।

ওপরের ছোট খোপ থেকে ত্রিশ বছরের পুরোনো কাগজ পেল মোহন। অমলাপিসি ইংরিজিতে লিখেছেন জ্যাঠামশাইকে যে কাজটা তিনি ভালো করছেন না। ঐটুকু মাত্র। এই নাকি নিশানা? কোথাও একটা পাতা নড়ে, অমনি তীর গিয়ে লাগে ঠিক সেইখানে। মোহন উঠে পড়ে ডেস্ক বন্ধ করে অমলাপিসির বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। লেকের কাছে পিসেমশাই যখন এ বাড়ি করেছিলেন, এ অঞ্চলটা একেবারে ফাঁকা ছিল, বাড়িতে বসেই নাকি লেক কাটা হচ্ছে দেখা যেত।

অমলাপিসির বাড়িটার একটা বিশেষত্ব আছে, যত দরজা-জানলা সব খোলা, কোথাও একটা পর্দার বালাই নেই, সব ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটু নজর করে দেখলেই কোন ঘরে কি হচ্ছে যে কেউ বুঝতে পারবে। বসবার ঘরে টুং-টাং করে পিয়ানো বাজছে, ঘসঘস শব্দ করে কারা বিলিতী নাচ নাচছে, দোতলায় পুরোদমে রেডিও চলছে, একটা রেকর্ডপ্লেয়ারো যেন খোলা হয়েছে, খিলখিল হাসি, ঘেউঘেউ বিলাতী কুকুরের ডাক, জোরে জোরে ইংরিজি কথা, ধুপধাপ সিঁড়ি দিয়ে নামা, দুমদাম দরজা বন্ধ করা; রান্না-ঘরও দেখা যাচ্ছে, কেমন একটা তাড়াহুড়ো ছুটোছুটি, ছ্যাঁকছ্যাঁক ঝনঝন, আজ বাড়িতে বোধহয় বহু অতিথি।

সদর দরজা হাট করে খোলা, কড়া ঘণ্টার বলাই নেই, মোহন নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করল। নিভৃতে কিছু করার জো নেই, অমনি বাড়িময় সোরগোল পড়ে গেল, ও মোহনদা কদ্দিন পরে এলে, একদম ভুলে গেলে আমাদের ওল্ড বয়, কেউ কারো সঙ্গে এমন ব্যবহার করে কখনো? সিঁড়ির নিচের ধাপগুলোতে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে থাকে অমলাপিসির তিনটে আধবুড়ো ছেলে—মামি! দ্যাখ কে এসেছে, মোটা বাছুর মারা হক, আজ ওকে না খাইয়ে ছাড়া হবে না!

মনটা ভালো না হয়ে যায় না। ওদের গার্লফ্রেন্ডদের গুটি পাঁচসাতও যোগ দেয়, নো, নো, তোমার ওপরে যাবার হুকুম নেই, এ ঘরে এসো, যেমন আমাদের নাচ বন্ধ করেছ, তার শাস্তি ভোগো, আমাদের সঙ্গে নাচো!

বড়ছেলের নাম তার দিদিমা রেখেছিলেন ব্যোমকেশ, তাই অন্য দুটোকে ডাকা হয় সুটকেস্ আর হোল্ডল বলে! এরকম কেউ শুনেছে কখনো! ওপরেও একটা খড়খড় শব্দ হয়, চেয়ে দেখে মোহন, একমাথা বেঁটে বেঁটে কোঁকড়া পাকাচুল নিয়ে পাৎলা ছোট্ট অমলা-পিসি ষোলো বছরের মেয়ের মতো তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। ও ডার্লিং ডার্লিং তোমাকে দেখে আমার বয়সটা কুড়ি বছর কমে যাচ্ছে! ছুটে আসেন অমলাপিসি, সিঁড়ির মাঝখানে মোহনকে জড়িয়ে ধরে তার কনুইয়ে, সার্টের বোতামে, চুমুটুমু খেয়ে একা-কার! তাঁর ছেলেদেরো এ আচরণে পুরো সমর্থন থাকে—আর কথা নয় মোহনদা, বিরিয়ানির সঙ্গে বর্স্ খেয়ে যেতে হবে। বিরিয়ানির সঙ্গে কেউ বর্স্ খায় নাকি? কিন্তু উপরে গিয়ে নিজের বইএ ঘরখানিতে মোহনকে বসিয়ে অমলাপিসি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ও ডার্লিং, কত দুঃখ হয়েছে আমার, যতীনদাও মারা গেল! আমার ভাইদের আর কেউ রইল না! বাবারা পাঁচ ভাই, প্রত্যেকের চারটি করে ছেলে আর মেয়ে একটি কি দুটি, কুড়িটা ভাই-ই গেল চলে! অমলাপিসির কটা চোখ সত্যি সত্যি জলে ভরে আসে, স্থির হয়ে বসতে পারেন না, খুরখুর করে চড়াই পাখির মতো ঘরময় ঘুরে বেড়ান, এটা টানেন, ওটা খোলেন, ছবি সরান, চিঠি তোলেন, হাত পা কিছু স্থির থাকে না। মোহনের পাশে বসে বলেন, একটা খবরো দিলে না, একবার গিয়ে মুখখানি দেখে আসতাম, আমার বড়জ্যাঠার বড় ছেলে, কত রূপ কত গুণ, ছোটবেলায় ও-ই আমাদের হীরো ছিল, সহপাঠীরা আমাদের বোনদের কি হিংসাটাই না করত! বিয়েও করেছিল আমার বুজুম-ফ্রেন্ড আরতিকে, মনে আছে একদিন—

বাধা দিয়ে মোহন বলে, অমলাপিসি, সোমাদিদির সম্বন্ধে কি জানো? মাঝপথে অমলাপিসি থেমে যান—সোমা? কতকাল পরে নামটি শুনলাম। সোমা! আমার প্রথমে একটি মেয়ে হয়েছিল, তার নাম ছিল রুমা। সোমা আর রুমা। একদিনে জন্মেছিল তারা একঘণ্টা আগে পরে। দশ বছর বয়সে আমার রুমা চলে গেল রে মোহন, শুধু সোমা থাকল। ত্রিশ বছর সোমাকেও দেখি নি।

মোহন বলে, আমি স্কুলের হোস্টেলে ছিলাম তখন। আনুপিসির কাছে শুনেছিলাম সিমলার না কোঠগড়ের ওদিকে কোথাকার এক পাহাড়ী ছেলেকে বিয়ে করে সোমাদিদি চলে গেছে, কিন্তু আমাকে কখনো একটা চিঠি পর্যন্ত লিখবে না এ আমি ভাবতেও পারি নি।

একটু চুপ করে থেকে মোহন আরো বলে, জ্যাঠামশাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সোমাদিদিকে দিতে বলেছেন। আমাকে বলে গেছেন তাকে খুঁজে বার করতে। তুমি এসব কথা শোন নি? অবাক হয়ে অমলাপিসি মোহনের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, নারে, জানিস্ তো সেই কবে আমার বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগটা

ক্রমে বন্ধ হয়ে এসেছে। এখন আর কিছুই নেই। কিন্তু তুই খুঁজবি কি করে, তোর কাজ-কর্ম নেই! তোকে কিছু দিয়ে গেলনা সে? আমরাও তো কয়েক হাজার টাকা পেয়ে গেলাম, তাই নিয়েই আজ বৌমারা সেলিব্রেট করছে। সোমাদির কথা বলসেন অমলাপিসি, ভারি নাকি অহঙ্কারী ছিল ছোটবেলায়, কারো হাতে খাবে না, কারো কোলে বসবে না, কারো কথা শুনবে না। বাদ তার মা আর তার বাবা। ভারি মুখরাও ছিল; ঐটুকু মেয়ে তাঁর ঝাঁজ কত! রুমা তার কাছে একটা ন্যাকড়ার পুতুল ছিল। কিন্তু ভারি ভালোবাসত রুমাকে। অমলাপিসি খৃস্টান বিয়ে করলেন—থাক্‌না তার যশমান পয়সাকড়ি—অমনি দিলে সব আত্মীয় স্বজনরা দূর করে।

সব বলতে অবিশ্যি সবাই নয়, কারণ তোর জ্যাঠাইমা আসত সোমাকে নিয়ে, আমার মা-ও আসত লুকিয়ে লুকিয়ে, বাবা জানতে পারলে আর আস্ত রাখতেন না। বাজারের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এটা-ওটা কখনো একটা কাঁচের বাসন, কখনো একটা জামা কি কাপড় কি বই, কি ছবি, পরে সর্বদা নাতি-নাতনিদের জন্য খেলনা কিনে আনতেন, খালিহাতে কখনো আসতেন না। তোর জ্যাঠাইমা-ই নিয়ে আসত, একা চলাফেরা মার অভ্যাস ছিল না। বিলিতী দোকান থেকে চুল কুঁকড়ে ছোট্ট সোমাকে নিয়ে আসত। পরে মা অসুস্থ হয়ে পড়লে আমিই যেতাম। তোর পিসেমশাই কখনো বাধা দেননি। ততদিনে রুমাও গেছে, তোর জ্যাঠাইমাও গেছে। তাই সোমা বলতে প্রাণটা কেমন করে উঠত।

বললেন, সেই পাহাড়ী ছেলেকে সোমা রাজা বলে ডাকত নাকি, একসঙ্গে মেডিকেল কলেজে পড়ত। একদিন এনেছিল অমলাপিসির বাড়িতে। ভেবেছিল সহানুভূতি পাবে। অমলাপিসিমা তাকে বাপের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে বলেছিলেন, আবার বাপকেও চিঠি লিখেছিলেন। সে কথা সোমা জানত না নিশ্চয়ই, তাহলে যাবার আগে একবার আসত নিশ্চয়। ছোট একটা রুমাল দিয়ে অমলাপিসি চোখের কোণদুটি মুছে ফেলেন।

একটু হেসে বলেন, বলেছিনা ভারি অহঙ্কারী ছিল, কারো দয়ামায়া নেবে না, কিছু দিলে তো নিলে, না দিলে তো সোমার ভারি বয়ে গেল। সবাইকে কলা দেখিয়ে কেমন নিখোঁজ হয়ে গেল দেখলি তো? তবু মোহন বলে, কিছুই জানো না বলতে চাও? তাই কখনো হয়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে উঠেছিল নিশ্চয়, বিয়ে করেছিল নিশ্চয় রেজিষ্ট্রি করে, কেউ নিশ্চয়ই সাক্ষী ছিল—

ঝপ করে উঠে দাঁড়ায় মোহন। তারিখটা বল অমলাপিসি, রেজিস্ট্রারের খাতা থেকে বের করব। কি নাম ছিল ঐ পাহাড়ী ছেলের?

কি যেন, রাজারাম না কি একটা। পাবি কিছু এদ্দিন পরেও? সে তো যুদ্ধেরো কত আগে, ১৯৩০ সালে, দেশে তখন সে কি স্বদেশী আন্দোলন—চললি?

মোহন উঠে পড়েছে। নিচের তলা অন্ধকার ভোঁ ভোঁ, শুধু রান্নাঘরে হট্টগোল, অমলা-পিসির আধবুড়ো ছেলেরা তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে লেকের ধারে গেছে, বেয়ারাকে বারবার বলে গেছে মোহনকে যেন ধরে রাখা হয়, ফুচ্‌কা কিনে আনতে গেছে নাকি সব। তাকে বুঝিয়ে মোহন বিদায় নেয়।

নীতার পিস্‌তুতো বোনরা রাতে খাবে, দেরি করলে অসৌজন্য হবে।

পাঁচ

সাতদিন লেগেছিল রেজিস্ট্রারের খাতা থেকে সোমাদিদি আর রাজারামের নাম বের করতে। শেষে পেল সবই, রাজারামের দেশের ঠিকানা ছাড়া। সাক্ষীরা সবাই বোধ হয় রাজারামের বন্ধুবান্ধব। ডাক্তার মহলে তাদের কারো নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু একজন, নিশ্চয়ই সোমাদিদির বন্ধু। তার নাম ললিতা রায়, ঠিকানাও রয়েছে একটা রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের। বোঝা গেল পুরুষরা সবাই কলেজের হোস্টেলে থাকত, একমাত্র সেই ঠিকানাই দিয়েছিল। খুব আশা ছিল না মোহনের, তবু গেল রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ঠিকানায়। আর পাঁচটা বাড়ির মতো দুপাশের দুই বাড়ির গা ঘেঁষে, রং জ্বলা, ছ্যাৎলা পড়া, পুরোনো একটা বাড়ি, গায়ের একশো জায়গায় ভাঙ্গন ধরেছে, কার্ণিশে কত যে অশ্বত্থগাছ তার ঠিক নেই। কয়েকটা প্রায় এক মানুষ উঁচু হয়ে উঠেছে। এই নাকি সোমাদিদির বন্ধু ললিতা রায়ের বাড়ি?

সামনে এক সারি দোকান ঘর, পাশ দিয়ে ঢুকতে হয়। সেখানকার স্যাঁৎস্যাতে গলিতে দাঁড়িয়ে খিড়কিদোরের কড়া নাড়ে মোহন। সন্ধ্যে লেগেছে, চারদিকে রান্নার ধোঁয়া, শাঁখের আওয়াজ। দোতলা থেকে আধময়লা ছেঁড়া সাড়ি ঝুলছে। আরেকবার কড়া নাড়তেই, খিড়কিদোর খুলে একজন খিটখিটে চেহারার প্রৌঢ়া বিধবা দরজা খুলেই জিজ্ঞাসা করলেন কাকে চান? ললিতা রায়ের নাম করতেই তিনি পড়ে যান আর কি। চোখের সামনে সারা মুখখানি সাদা হয়ে গেল, ঠোঁটদুটো দুবার কেঁপে উঠল, কথা বেরুল না। মোহন কোমল কণ্ঠে বলল, তিনি থাকেন এখানে? ভদ্রমহিলার গলা ঠেলে কর্কশ একটা স্বর বেরিয়ে এল, কোনকালে সে মরেছে, এখানে থাকবে আবার কি? আমি তার যমজ বোন। কিসের জন্য তার খোঁজ করছেন আপনি, আমরা কেউ তার নাম করি না।

মোহন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আঁচলে মুখ মুছে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলেন, আসুন, আসুন আমার ঘরে, আমি এ বাড়ির মেয়ে, ঝি, বাঁদী যা বলেন। ললিতার খবরে আপনার কি দরকার? সে বিষ খেয়ে মরেছিল জানেন? বাবাকে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল, মাকে সাক্ষী দিতে হয়েছিল, তার ফলে তাঁরা বেঁচে থাকতে আর আমার শ্বশুর আমাকে বাপের বাড়ি আসতে দেন নি। পাড়ায় দাদা মুখ দেখাতে পারত না, চাকরি নিয়ে বোম্বাই চলে গেছিল। বাবা মা মরার সময়ে এসেছিল, সেই ইস্তক পরিবার নিয়ে এখানেই আছে আর পাকিস্তান হবার পর আমিও এসে জুটেছি। সর্বনাশ ললিতার জন্য। কেউ তার নাম করে না। কেন এসেছেন আপনি?

ছোট ছোট দ্বীপ আমাদের হৃদয়, কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। নিজের দ্বীপে নিজেই রাজা, নিজের সুখ দুঃখ আকাশ জুড়ে থাকে, পাশের দ্বীপের কোনো খবর এখানে পৌঁছয় না। পৌঁছলেও গায়ে লাগে না, পুরোনো বানানো গল্পের মতো মনে হয়। মোহন বসে পড়ে বলে, সোমা বলে কাউকে জানতেন? ললিতা রায়ের বন্ধু সোমা।

ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে আর জল বেরোয় না, কিন্তু মনে হয় সমস্ত দেহটা দিয়ে কাঁদেন। কপালে একটা শিরা ফুলে ওঠে, ঠোঁটের পাশে একটা স্নায়ু নাচে, থুতনি কাঁপে, গলা দিয়ে ঢোক গেলেন, হাড় জিরজিরে একটা হাত দিয়ে আরেকটা হাত চেপে ধরেন। বলেন, এখানে তার নামও করবেন না। কোথায় সে? আমাদের গোটা পরিবারের সর্বনাশ করে দিয়ে কোথায় সে এখন সুখে আছে? যত সর্বনাশ ঐ সোমাই তো তার মাথায় ঢুকিয়ে

ছিল। তাইতেই তার কাল হল।

নাকি দুটি পাহাড়ী ছেলে ছিল, রাজারাম বিয়ে করল সোমাকে আর সোনারামের সঙ্গে ললিতার ভালোবাসা হল। ললিতার যমজ বোন বললে, আমি এখানে ছিলাম না, আমার ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গেছিল। ললিতার কপালে টাকার মতো গোল একটা সাদা দাগ ছিল, সেইজন্যে ওর বিয়েই হল না—ডাক্তারি পড়তে গেল। তারপরে ঐ কান্ড।

এতক্ষণে ললিতার যমজ বোন প্রকৃতিস্থ হয়েছে, ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা যেন মুহূর্তের জন্যে মন জুড়ে বসে আবার ত্রিশ বছর দূরে সরে গেছে। গলা পরিষ্কার করে পুরোনো দিনের কথা বলতে থাকেন, মোহন উদ্গত অধৈর্য দমন করে শোনে, কোথাও যদি একটুখানি পথের নির্দেশ পাওয়া যায়। ললিতারা কুলীন বামুন নাকি, সোনারামরা ভারি বড়লোক কিন্তু জাতে কামিন, এদের নাকি মহাজনী ব্যবসা ছিল। বামুনের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয় না। সোমা দিব্যি রাজারামকে বিয়ে করে ফেলল, কিন্তু ললিতার বাবা সোনা-রামকে ডেকে একদিন এমনি অপমান করলেন যে সে তো চলেই গেল, আর ললিতা রাত্রে ঠাকুমার মালিসের আপিম খেয়ে শুয়ে রইল। আর উঠল না। তারপর চারদিকে তিলকে তাল হয়ে কথাটা ছড়াতে কতক্ষণ, কি না বললে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা, পুলিস এল, সাক্ষী আদালত, সোনারামকে সুদ্ধু ধরে আনা হল, শুধু সোমা আর তার রাজারামের নাগাল পাওয়া গেল না। সমস্ত পরিবারটার মাথা কাটা গেল।

মোহন বললে, সোনারামদের বাড়ি কোথায়? কি জানি বাছা, হরিদ্বার হয়ে যেতে হয় শুনেছিলাম, মস্ত বড় মহাজনী ব্যবসা ওদের ছিল, এখনো আছে হয়তো। বেল পাকলে কাগের কি? ঐ সোমাটি আসত এ বাড়িতে, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে বসত, কত গল্প করত, বাবা-মার পায়ের ধুলো নিত, তাঁরা তো সোমা বলতে অজ্ঞান! বড়লোকের মেয়ে মটরে চেপে গরীবের বাড়িতে এসে খেয়ে যায়, তাতেই তাঁরা কেতাত্থ! তার চরিত্রের বিষয়ে খোঁজ করার কথাটা আর মনেই এল না।

বুকের মধ্যে কি একটা অসহ্য ব্যথা টনটন করে। এগারো বছর বয়সে স্কুলের সিঁড়ি থেকে পড়ে হাঁটুর ছাল ছাড়িয়ে গিয়েছিল মোহনের। খুব কেঁদেছিল বলে ড্রিলের স্যার তাকে টিটকিরি দিয়েছিলেন, ছুটি দেননি। বাড়ি আসতেই সোমাদিদি গরম জল দিয়ে পা ধুয়ে ভ্যাসেলিনের মতো কি একটা জিনিস দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল, এক মিনিটে সব জ্বালা জুড়িয়ে গিয়েছিল। ভিজে চোখের পাতায় চুমু খেয়ে সোমাদিদি বলেছিল, শিখে রাখ্, কাটা ঘায়ে কখনো তুলো লাগাতে হয় না, তলায় একটু গজ্ দিয়ে তবে তুলো দিবি, নইলে ঘায়ে তুলোর সুঁয়ো আটকে পচে ওঠে। সোমাদিদির গলার আওয়াজটাও হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

ললিতা রায়ের বোনের নাম অমিতা। সেই নাকি কুড়ি মিনিটের বড়। মাগো, কি ধুলোই দিয়েছিল সোমা বাড়িসুদ্ধু সবার চোখে। ললিতার সঙ্গে পরীক্ষার পড়া তৈরি করত, ওর খাতায় কত রোগের জীবাণুর ছবি এঁকে দিত ললিতা, নিজের কাজ বোধহয় গরীবের মেয়েকে দিয়ে করিয়ে নিত—

কি একটা বলতে গিয়ে মোহনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। সোমাদিদি পড়ায় ভালো ছিল বলেই জানত মোহন, নাকি প্রাইজ পেত, মেডেল পেত। জিজ্ঞাসা করে, পুরোনো চিঠি কিম্বা কাগজপত্র কিছু নেই কি তাঁর? পুরোনো বইখাতার মধ্যেও তো কত সময় থাকে, কিছুই কি নেই?

নাকি ললিতা গেলে পর তার জিনিসপত্র মা চোখে দেখতে পারতেন না, সব সের দরে বেচে দেওয়া হয়েছিল। তবে একটা নোটখাতা দেরাজের নিচে পড়েছিল, দাদার নাতি সেদিন টেনে বের করেছে। তাতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কি হবে এত খবর দিয়ে? খানিকটা খানিকটা বলতে হয়। ললিতার বোন অমিতা শুনে একেবারে হাঁ!—বাবা, কি সাংঘাতিক মেয়ে গো, এ বাড়ির সর্বনাশ করেও মন উঠল না, আবার নিজের বাড়িসুদ্ধু জ্বালিয়ে দিলে! কই, বিয়েটা যে বাপের অমতে হয়েছিল, সে কথা তো ললিতা কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি! ঐ সোমাই নিশ্চয়ই শিখিয়ে দিয়েছিল, নইলে ললিতা ছিল ভালোমানুষ, ব্যাপারটা চেপে যাবার কথা তার মনেও হত না।

এক গাল হেসে অমিতাদেবী বলেন, নির্ঘাৎ মরেছে সে, নইলে ঐ অত সম্পত্তির লোভে কবে ছুটে আসত। নিজের স্বার্থটি খুব বুঝত ঐ মেয়ে! বাবা! একবার ওর একটা গল্পের বই ললিতা এনেছিল, পাড়ার কে আবার সেটাকে নিয়ে দিলে হারিয়ে। তাই নিয়ে সে কি খোঁজাখুঁজি, নাকি লেখকের নামসই করা বই না কি যেন। ঐ সামান্য জিনিস নিয়ে ললিতা বাড়ি মাথায় করেছিল, সোমার রাগকে তার এতই ভয়! শেষটা কোন আঘাটায় মল কে জানে! ভারি খুসি হয়ে নোটবই এনে দেন, নিয়ে যান, শেষের দিকে দুটো নাম ঠিকানা আছে, বোধ হয় বন্ধের সময় লিখে রেখেছিল——একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, ললিতার নামটা অবধি ভুলতে বসেছিলাম, অথচ যমজ বোন আমরা, সর্বদা একসঙ্গে মারামারি আদিখ্যে হত! আচ্ছা, আসুন তবে।

খবরের কাগজে জড়িয়ে যত্ন করে খাপখানিকে জ্যাঠামশায়ের বাড়ি নিয়ে যায় মোহন। সেখানে সকাল সন্ধ্যে তার যেন আপিস বসেছে। নীতা ভেবে কুল পায় না। অসুখবিসুখ করবে না তো আবার মোহনের? পাগলটাগল হয়ে যাবে নাকি? কিন্তু তারো তো কোনো লক্ষণ দেখা যায় না, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ এত স্বাভাবিক মনে হয় যে তারা আর পার্থ কিছু লক্ষ্যই করে না। কিন্তু নীতা জানে এই সংসার থেকে মোহনের মন বহু দূরে চলে গেছে।

সে কথা একবার একটু তুলতেই, আকুল হয়ে ওঠে মোহন। নিষ্ঠুর ব্যবহার জীবনে কখনো কারো সঙ্গে করেনি মোহন। বলে, কেন অত উতলা হচ্ছ, নীতা, এ যে আমাকে করতেই হবে, বুঝতে পারছ না? জ্যাঠামশায়ের কথাটার একটা নিষ্পত্তি না হলে আমার ছুটি নেই বুঝতে পারছ না? নীতা বসে পড়ে বলে, আর যদি নিষ্পত্তি না-ই হয়? সেটারি তো সম্ভাবনা বেশি? ত্রিশ বছরের হারানো জিনিস কেউ কখনো খুঁজে পায় বলে তো শুনি নি।

এই ত্রিশ বছরের মধ্যে খোঁজেও নি তো কেউ, নীতা। দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়েছি, তার মধ্যে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, বাকি সময়টার মধ্যে আমার খোঁজা শেষ করতে হবে, নীতা, এটা বোঝ তো? তাতে তো তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

ক্ষতি? না, ক্ষতি হবে কেন, যেই মোহন বুঝতে পারবে সোমাদিদি ইহলোকে নেই, অমনি জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তিতে অধিকার নিতে তার আর কোনো বাধা থাকবে না। আসলে বাধা এখনো নেই, সে কথাই বলছে, বাধাটা শুধু মোহনের মনের মধ্যে। কিন্তু পার্থিব বাধার চেয়ে যে মনগড়া বাধা ঘোচানো কত বেশি শক্ত তা কি নীতা জানে না?

মামার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে মা যখন গিয়ে ব্যারাকপুরের ছোটবাড়িতে গুছিয়ে বসলেন, প্রথমটা মা বাড়ির বার হতেন না, তাঁর ধারণা পয়সাকড়ি গেছে বলে বন্ধুবান্ধবরা

তাঁকে অসম্মান করবে। কথাটাতে যে এক বিন্দু সত্যি নেই এ আর মাকে কে বোঝায়! আসলে বন্ধুদের একদল মা-র অধঃপতনে খুব খুশি হয়েছিল, এখন তারা তাঁকে অনুকম্পা দেখাবার সুযোগ খুঁজছিল। আরেক দল সহানুভূতিতে গলে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইছিল। কিন্তু চার বছর মা কারো সঙ্গে মেশেন নি।

যদি মিশতেন তাহলে নীতার কোনো ফ্যাসানেবল্ ঘরে বিয়ে হতে পারত। এ বিয়ের সঙ্গে মোহন বা নীতার কোনো সম্পর্কই ছিল না বলতে গেলে। নিলেমের জিনিস কিনতে গিয়ে, উকীলের কাছে নীতা আর তার মার দুর্দশার কথা শুনে, দয়া করেই না মোহনের সঙ্গে নীতার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন জ্যাঠামশাই। মোহন রাজী হয়েছিল, কারণ জ্যাঠামশায়ের কোনো কথার সে কখনো অবাধ্যতা করে নি। আর নীতা? নীতা রাজী হয়েছিল ব্যারাকপুরের ঐ দম বন্ধ করা বাড়ি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। তা ছাড়া, ততদিনে মামার সঙ্গে মার মিটমাট হয়ে গেছে, তিনি বারবার বলেছিলেন, একদিন জ্যাঠামশায়ের উত্তরাধিকারী হবে মোহন ছাড়া আর কেউ নয়। ও বাড়ির পুরুষ বংশধর বলতে ঐ মোহনই আছে। সোমাদিদির কথা নীতা শুনেছিল অনেক পরে মহাগল্পে অনুপিসির কাছে।

এ বাড়ির কেউ তার নামও করত না, কিন্তু মোহনের মুখ যখন একবার খুলল, মনে হতে লাগল সে যেন আর থামতেই পারছে না। আশ্চর্য লেগেছিল নীতার, পনেরো বছর বয়সের পর যে সোমাদিদিকে দেখা দূরে থাকুক, তার নামও শোনে নি মোহন, তার কথা বলে বলে যেন শেষ করতে পারছিল না। শেষটা বিরক্ত হয়ে নীতাই তাকে থামিয়েছিল। আর কোনোদিন সোমাদিদির কথা মোহন বলে নি, তবে আনুপিসির কাছ থেকে ঝুড়িঝুড়ি খবর পাওয়া গিয়েছিল। অবিশ্যি সামনে কোনো আলোচনাই চলত না।

সোমাদিদিদের উপরে বোধহয় আনুপিসিদের ভারি রাগ ছিল। সে নাকি বড় বেশি নিজের ইচ্ছায় চলত। মা মরা মেয়ে, অথচ বাপের আপন খুড়তুতো পিসতুতো বোনদের উপরে এতটুকু টান নেই! জোর করে কেউ আদর করতে গেলে মেয়ে শক্ত একেবারে কাঠ হয়ে যেত! যাক্ গে বাবা, ঐ মেয়ের আলোচনা করে আর বড়দাকে চটিয়ে কাজ কি। আমরা বলি কি গেছে, আপদ গেছে, বাপের জন্যে যার এতটুকু টান নেই, অমন মেয়ে না থাকাই ভালো!

ছয়

সোমাদিদির চোখে জল শুধু একজন এক-আধবার দেখেছিল, সে হল মোহন। পুজোর সময় বিলেত থেকে বাবা ঠাকুমাকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি চেয়ে নিয়ে, গোপনে নিজের ঘরে বসে মোহন পড়েছিল, আস্তে আস্তে চিঠির উপরে হাত বুলিয়েছিল, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে সোমাদিদিও ঘরে এসে ঢুকেছিল। এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, মোহনের পাশে বসে পড়ে, মোহনের সঙ্গে কেঁদেছিল। এ কথা কি ভোলা যায়?

ললিতা রায়ের নোটবইটা বোধহয় দেরাজের টানার পিছন দিক দিয়ে গলে ভিতরে পড়ে গিয়েছিল, তাই কেউ এতকাল লক্ষ্য করে নি। ধুলোয় ধূসর খাতাখানির কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নি, যদিও পাতাগুলো সব হলুদ হয়ে গেছে, কোণা মুড়লেই ভেঙে যাচ্ছে।

সার্জারির লেক্‌চার শুনে নিজে নোট তুলেছিল ললিতা রায়, খুব পাকা পড়ুয়া বলে মনে হল না। মাঝে মাঝে অন্য কারো হাতের লেখা নোট, তারিখের বালাই নেই, তবে বিষয় দেখেই বোঝা যায় যে শেষ বছরেরি নোট হবে। অন্য লেখাটা কি তবে সোমাদিদির? সেগুলি অনেক বেশি দক্ষ হাতের লেখা। আশ্চর্য সোমাদিদির হাতের লেখার খুব বেশি নমুনা দেখেনি মোহন। দুখানি বই আছে যত্নে তোলা, "মুকুট" আর "কজ্জলী", সোমাদিদির দেওয়া, প্রথম পাতায় খুদে অক্ষরে লেখা 'মোহনকে', শেষ পাতায় আরো খুদে অক্ষরে লেখা 'সোমাদিদি', ঐটুকুমাত্র। তাই থেকে কি আর এই ইংরিজিতে লেখা হস্তাক্ষর সোমাদিদির বলে চেনা যায়? ডাক্তারি পড়ার সময় সোমাদিদির লেখা নোট পেলে মোহনের কত সুবিধা হত।

ত্রিশ বছর কি খুব বেশি সময়? ত্রিশ বছর আগেকার কত কথার জ্বালাই এখনো মন থেকে মুছে যায়নি, আর স্নিগ্ধ মধুর মুহূর্তগুলো কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে? এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ত্রিশটি বছর গুটিয়ে এত ছোট হয়ে গেছে যে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা যাচ্ছে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে পরদিন সকালে বসে এক নিশ্বাসে মোহন নোটবই-এর প্রথম পাতা থেকে শেষ অবধি পড়ে ফেলে। শেষের পাতার পর অনেকগুলি সাদা পাতা, তারপরে দুটি নাম আর ঠিকানা। একটি সোমাদিদির নাম, দ্বারভাঙ্গার অমর কাকার ঠিকানা। তারপরে আরেকটি নাম। এই কি তবে নিশানা? একটি মহিলার নাম, সুদক্ষিণা দেবী, ঠিকানা তার হরিদ্বার, কণখল।

মোহন হরিদ্বার যাবে শুনে নীতা একবার বলেছিল, যেতেই হবে? চিঠি লিখলে হয় না? তা হয় না, খোঁজাখুঁজি করতে হয়, মিছিমিছি সময় নষ্ট হয়। নীতা কি যেতে চায় সঙ্গে? রেগে ওঠে নীতা। মোহনের কি মাথা খারাপ? এক কাঁড়ি অতিরিক্ত পয়সা খরচ, তাছাড়া যে মুহূর্তে নীতা মুখ ফেরাবে পার্থ গিয়ে উঠবে ইয়েনদের বাড়িতে আর অনীকেন্দ্র এসে এ বাড়িতে দিন কাটাবে!

অবাক হয়ে মোহন নীতার দিকে চেয়ে থাকে। ইয়েন? ইয়েন কে?

নীতার ধৈর্য থাকে না, ইয়েন কে, মোহন কি তা জানে না? অমলাপিসির ভাসুরের ছেলে ইয়েন, পার্থর ফিরিঙ্গিপানা বন্ধু। মোহন মৃদুস্বরে বলে, ফিরিঙ্গি হবে কেন নীতা? ওরা বাঙ্গালী খৃস্টান, ভারি পড়াশুনার চর্চা ওদের বাড়িতে। অমলাপিসির ঘর তো বই দিয়ে ঠাসা, এই বয়সেও রাজ্যের নতুন বই আনিয়ে দিনরাত পড়েন। অথচ নাকি বিয়ের আগে একটা বই কখনো খুলতেন না। নীতা বলে, যত সব ইংরিজি বই আর জর্মান ফরাসী বই-এর ইংরিজি অনুবাদ বোধ হয়, বাংলা বই নিশ্চয়ই একটাও নেই?

তা থাকবে না কেন? অবিশ্যি অতটা আমি লক্ষ্য করি নি, তবে একেবারেই কি আর নেই? তোমার ইয়েনকে অত ভয় কেন?

তেরিয়া হয়ে ওঠে নীতা, ইয়েনকে আবার ভয় কিসের? ঐ একটা হাফবেকড্ কুড়ি বছরের ছেলে, জানেই বা কি আর বোঝেই বা কি? পার্থকে ছোটবেলা থেকে কত যত্নে মানুষ করেছে নীতা, সে ঐ ছোঁড়াটাকে ভয় করবে কেন, পছন্দ করে না এইটুকুমাত্র। সাজ দেখলে গা ঘিনঘিন করে, সরু ঠ্যাঙ্গের কমলা রঙ্গের পেন্টেলুন, পায়ের কব্জি অবধি পৌঁছয় না, তার ওপরে এত বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের ছোপ দেওয়া ঢল্‌কো কুর্তা, আর ছুঁচলো মুখের হলুদ জুতো—মাগো, এই নাকি ব্যাটা ছেলের সাজ! মাথার চুল তো প্রায় ছেঁটে ফেলে দিয়েছে, অথচ একমুখ দাড়ি। বাবাকে মনে পড়ে—হঠাৎ গলা বন্ধ হয়ে আসে।

কি যেন হয়েছে আজকাল নীতার, চুপ করে সে।

মোহন সান্ত্বনা দেয়, ওসব দুদিনের খেয়াল নীতা, যেই পালক গজাবে ওসব ছাড়বে? তাছাড়া তোমার পার্থ তো ওরকম সাজে না।

সাজে না সত্যি, কিন্তু সে নীতা দেয় না বলে। তারার টিটকিরি আর নীতার বাধার জন্যে পারে না। নইলে কি সঙ সাজত কে বলতে পারে!

তাহলে অন্ততঃ তারার মাথাটি তো ঠিক আছে, তাকে নিয়ে তো তোমার কোনো ভাবনা নেই।

নেই ভাবনা? অনীকেন্দ্র? কিন্তু অনীকেন্দ্রের কথা বলা যায় না, নীতার মনের ভয়টাকে কথায় প্রকাশ করা যায় না। তা হলেই যা ছিল শুধুমাত্র মনের সন্দেহ, সেই যে বিষম শত্রুর রূপে নিয়ে দাঁড়াবে। একবার তাকে স্বীকৃতি দিলেই যে তার সম্মুখীন হতে হবে। তার চেয়ে এই ভালো, অনীকেন্দ্রকে নীতা মনের মাঝে ঠাঁই দেবে না। ঠাঁই না দিলেও সে কিন্তু একেবারে মনের দোরগোড়ায় এসে ঠেলাঠেলি করে।

মোহন বললে, কি যেন বললে অনীকেন্দ্রের কথা? ভারি স্মার্ট ছেলে কিন্তু অনীকেন্দ্র, ওদের বাড়ির ভাগ্য ও কেমন ফিরিয়ে দেয়, দেখো।

আশ্চর্য, কিছুই কি দেখতে পায় না মোহন? নাকি তার কপালে ভালোবাসার তৃতীয় নেত্র আজো ফোটে নি, যা দিয়ে সর্বনাশ আসবার বহু আগেই তার ছায়াখানি দেখতে পাওয়া যায়। আর অমনি চোখ থেকে ঘুমও বিদায় নেয়। কি করে যায় নীতা? অনীকেন্দ্রের সুন্দর মুখের প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকুক যথেষ্ট প্রতিবন্ধক তো থাকবে।

একলাই যায় মোহন। নীতার কেমন গা শিশির করতে থাকে, জ্বরজ্বর মনে হয়, তবু সব গোছগাছ করে দেয়। কোথায় গেলে কি নিতে হয় কোনো ধারণাই নেই মোহনের। কোনোদিনই ছিল না। বিয়ের আগে মোহনের সঙ্গে প্রথম দেখার কথা মনে পড়ে। ভালো দেখতে ছিল মোহন; ছিল কেন, এখনি বা মন্দ কি? মামীদের সব নেমন্তন্ন করেছিলেন মা, হীরের গয়নাগুলো বের করেছিলেন, মোহন হয়তো খেয়ালই করে নি। গয়নার জন্য মোহনের চোখ তৈরী নয়। এই বাইশ বছরের মধ্যে কটা গয়না কিনে দিয়েছে সে নীতাকে? পয়সাকড়ি অবিশ্যি সব দিয়ে দেয়, কিন্তু তাই দিয়ে খরচপত্র করে গয়না গড়াবার জন্যে কটা টাকা বাকি থাকে?

নিজের জন্যে চায় না গয়না নীতা। তারার জন্যে চায়। যে কখানি আছে তারার জন্যেই তোলা আছে। নকল গয়না পরে জীবন কাটাল নীতা, তিব্বতী পেতলের গয়না, পুরোনো ছাঁদের রূপোর গয়না তাতে পলা বসানো পাথর বসানো, দাম খুব বেশি নয়, তবে খুঁজে খুঁজে পছন্দসই দেখে আনতে হয়। যা দেখে লোকে নীতার রুচিবোধের এত প্রশংসা করবে যে দামের কথা ভুলে যাবে। পয়সার অভাবে সখ মেটাতে পারছে না একথা কেউ যেন না বলে, আর নীতা নিজের কাছেও তো তা স্বীকার করে না; বাস্তবিক কথাটার মধ্যে এক বিন্দুও সত্যি নেই; এই রকম গয়নাই নীতা ভালোবাসে, তাই পরে। অভাবের জন্যে নয়। ইচ্ছা করলেই কি আর কোনো একটা উপায় করে গয়না গড়াতে পারত না সে? আসলে আধুনিক রুচি অন্য রকম, এক গা গয়না পরা একেবারে অচল। কত কি বলে নীতা মনকে; দীনতার মধ্যে ভারি একটা হীনতা আছে তা কি সে জানে না? তারার ধার কাছে সেরকম হীনতাকে আসতে দেবে না নীতা।

কিন্তু যদি তারা অনীকেন্দ্রকে—জোর করে চিন্তাটাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেয় নীতা।

তারা যদি অনীকেন্দ্রকে বিয়ে করে নীতা তাকে ত্যাগ করবে, কিছু দেবে না, লুকিয়ে রাখা হীরের গয়না পার্থর বৌ পরবে। তারার জন্যে মনে মনে নীতার পাত্র পছন্দ করা হয়ে গেছে। সেই লোরেটোর সহপাঠিনী শীলার ছেলে টোগো। টোগো কোন একটা বিলিতী কোম্পানিতে চাকরি করে, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দেখা হয়। পার্থ তারার সঙ্গে যথেষ্ট চেনা-জানাও আছে, দেখতেও মন্দ না। ওর কাছে অনীকেন্দ্র?

রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে তারা? শুধু রূপ নিয়ে কি কোনো বিয়ে সুখের হয়? যে যাই বলুক, যথেষ্ট পয়সাকড়ি না থাকলে সুখী হওয়া বড় শক্ত। বেজায় বড়লোক হওয়ার কথা নয়, তার আবার অন্য রকমের ঝামেলা, কিন্তু আত্মসম্মান রাখতে পারা যায় এতখানি বড়লোক।

কেশব কাকার কথা মনে পড়ে গেল। নীতার বাবার পেয়ারের কর্মচারী কেশব মিত্তির। ওদের বাগানের কোণায় ছোট দোতলা বাড়িতে ওরা থাকত। নাকি এককালে কৃষ্ণনগরের নামকরা বড়লোক ছিল ওরা। রেস্ খেলে স্পেকুলেশন করে কেশব কাকার বাবা তাদের ঐ হাল করেছিলেন। নামে কেরাণী, আসলে বাজার সরকার, কেনাকাটা ফাই-ফরমায়েস সব করত কেশব কাকা। ওদের বাড়িতে কোনো দিন পা দেয় নি নীতা, বারো বছর ছিল ওরা ঐ দোতলা বাড়িতে। ওর ছেলেমেয়ের সঙ্গে নীতা কখনো খেলা করেনি। মা-ও পছন্দ করতেন না। গরীবদের সঙ্গে মেলামেশা করলে মন বড় ছোট হয়ে যায়, ভারি বৈষয়িক হয় ওরা।

তাই বলে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করা হত না এমন নয়। নীতার ছোট হওয়া জামা রং জ্বলা সোয়েটার ওরাই তো সর্বদা পড়েছে। নীতার আয়া তাই নিয়ে কত রাগমাগ করেছে। শেষটা বাবা ঐরকম বিশ্রী কান্ড করবার পর কেশবকাকা কাঁদতে কাঁদতে এসে মাকে আর নীতাকে ওদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ওর আস্পর্ধা দেখে মা খানিকটা অবাক হয়ে চেয়েছিলেন, মামা একচোট ধমকে দিয়েছিলেন—যাও, এখন বিরক্ত কর না, ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না। মাথা নিচু করে কেশব কাকা চলে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ তার দীনহীন মুখটা মনে পড়ল।

সাত

হরিদ্বারে যাবে মোহন শুনে আনুপিসি মানুপিসি কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না, কার কাছ থেকে যেন গাড়ি চেয়ে নিয়ে মোহনের যাবার দিন বিকেলের দিকে এসে উপস্থিত হন। পিঠোপিঠি দুটি বোন, মোহনের বাবার নিজের জ্যাঠার মেয়ে তাঁরা। দুজনার মধ্যে চেহারার বা স্বভাবের কোনো সাদৃশ্যই নেই, বাদে তাঁদের সব বিষয়ে অদম্য কৌতূহল। খুরখুর তুরতুর করে আনুপিসি আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান, কার বিয়ে হল, কার ছেলে বয়ে গেল, কে চাকরি পেল, কার চাকরি গেল, কার রোগ, কার শোক, কার সৌভাগ্য, কার সর্বনাশ, নির্লিপ্ত নিষ্কামভাবে এসব সংবাদ আজ বহু বছর ধরে সরবরাহ করে আসছেন। সঙ্গে সর্বদা তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোট বোন মানুপিসি মোটা শরীর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছেন। এক বছর আগে দিদি জন্মে নিয়ে অনেক রোমাঞ্চ থেকেই তাঁকে নিঃসন্দেহে বঞ্চিত করেছে, এখন আর এক ঘণ্টার জন্যেও তাকে ছাড়তে রাজী নন।

মোহন ডেস্কের একধারে পয়সাকড়ি বুঝে নিচ্ছে, নীতা অন্যধারে ছোট হাতবাক্সে যাত্রার টুকিটাকি গুছিয়ে দিচ্ছে, মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর। সেই ঘরে ফেটে পড়েন দুই বোন—

আমাদের সঙ্গে চালাকি করিস নারে মোহন। বেড়াতে যাচ্ছিস্ না আরো কিছু, যায় কেউ হরিদ্বারে এই পৌষের শীতে! ঠিক করে বল দিকিনি কিসের খোঁজে যাচ্ছিস্? মানুপিসি পৌষের হাওয়াতেও ঘামেন, গলা ঘাড় মুছে বলেন, কিসের খোঁজে আবার কি, কার খোঁজে বল। মোহন যে সোমার সন্ধানে যাচ্ছে সে কি আমরা বুঝি নি ভেবেছ?

আনুপিসি অবাক হয়ে মোহনকে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে, তুই কি সত্যি পাগল হয়ে গেলি নাকি? আমাদের গুষ্ঠিতে তো পাগল ছিল না কখনো, এক রক্ষামাসি বাদে, তা তাঁকে তো আর কোনো মতেই আমাদের গুষ্ঠির মধ্যে ধরা যায় না। কিন্তু কি পাগলই ছিল রে বাবা! শ্বশুরকে চোপা করত, শাশুড়িকে চোখ রাঙাত, আগে নাকি মাটির মানুষ ছিল, সাত চড়ে রা নেই, কোলের ছেলেটা শাশুড়ির কোল থেকে পড়ে মল, আর রক্ষামাসিরো ভোল বদলে গেল। বাবা, কত যে খেল্ দেখলাম দুনিয়াতে!

মানুপিসি বলেন, কি যে বাজে বকছ, দিদি, রক্ষামাসি কবে মরে ঠাণ্ডা হয়েছে, বাস্, তুমি একটা বিষয় বলতে শুরু করলে আর যেন থামতে পারো না।

আনুপিসি চটে লাল, তুই বড়দের কথায় নাক গলাতে আসিস্ না তো মানু। মোট কথা সোমা আর যেখানেই থাকুক, হরিদ্বারে যে নেই এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি।

মোহন হেসে বলে, কি করে জানলে, আনুপিসি?

তা জানব না, ধর্মে যাদের মতি তারাই যায় হরিদ্বারে। সোমা ঠাকুর দেবতা মানত না, জোর গলায় সবার সামনে দেমাক করে বলত, যার কোনো যুক্তি নেই, এসব আমি মানি না।

মানুপিসিও অমনি বললেন, ঠিক বলেছ, স্রেফ একটি নাস্তিক ছিল সোমা। বাবা! সেবার আই-এস্-সি পরীক্ষা দিল, সকালে পরীক্ষা, ভালো মনে করে ভোরে কপালে দইএর ফোঁটা দিতে গেছি, কি রাগ মেয়ের, অমনি ঝট্কা মেরে আমার হাত সরিয়ে দিল। ও সব দইএর ফোঁটার কর্ম নয়, যদি ভালো লিখি ভালো ফল হবে আর যদি ভালো না লিখি তো পাঁচ শো দইএর ফোঁটাতেও কিছু হবে না। উঃফ্, আমি তো হাঁ!

এগারো বছর বয়স ছিল মোহনের তখন, একটু একটু মনে পড়ে ঘটনাটা। তবে নাস্তিক ছিল না সোমাদিদি। রাত্রে শুতে এসে মোহন বলেছিল, কেন দইএর ফোঁটা মুছে ফেললে? মানুপিসির দুঃখ হয়েছিল, কেঁদেছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সোমাদিদি তারপর বলেছিল, সত্যি মুছে ফেলাটা উচিত হয় নি রে। কেমন যেন রাগ হয়ে গেল, পড়াশুনো করব না আর পরীক্ষা দেবার সময় ফোঁটা কেটে ভাগ্যকে ভোলাব নাকি?

হাতবাক্সে চাবি দিতে দিতে নীতা বললে, কে বলেছে সোমাদিদির খোঁজে উনি যাচ্ছেন? এমনি বেড়াতে যাচ্ছেন; ছুটি নিয়েছেন এত দিন বাদে, সে কি ঘরে বসে কাটাবার জন্যে?

আনুপিসির চোখ চকচক করতে থাকে, বেড়াতে যাচ্ছে তো তুই সঙ্গে যাচ্ছিস না কেন?

আমি যাব কি করে, যেমন আপনার কথা, ছেলেমেয়ের কলেজ নেই?

মানুপিসি মুচকি হাসেন, কাকে ভোগা দিচ্ছিস্ নীতা? তুই যাবি নে কেন, তাও জানি। স্রেফ অনিকিনের ভয়ে, এতো সবাই জানে।

সবাই জানে, শুধু মোহন জানে না। কেন, অনীকেন্দ্রের ভয়ে কেন? অনীকেন্দ্র তো খুব ভালো ছেলে। আমি সর্বদাই বলি—

আনুপিসি বলেন, খুব ভালো ছেলে মানে কি জামাই করবার মতো ভালো ছেলে?

মোহন আকাশ থেকে পড়ে। সে আবার কি? অনীকেন্দ্র হল নতুন দাদার নাতি, জামাই আবার কিসের?

পিসিরা বিজ্ঞের হাসি হাসেন। কোথায় থাকিস্ রে মোহন, ওসব আজকাল আইন-টাইনেও বাধে না। তাছাড়া প্রেমের কাছে আবার মাসিপিসি কি!

নীতার মুখের দিকে চায় মোহন। সাদা পাতার মতো দেখায় মুখখানি, হাতবাক্সে তালা লাগাতে গিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলি কাঁপতে থাকে। পিসিদের দিকে ফিরে বলে, তাহলে এবার তোমরা এসো, কেমন? আমাকে এখন তৈরী হতে হবে, নীতা আমার টিফিন গুছিয়ে দেবে। যাবার আগে আমার আবার পেটের মধ্যে প্রজাপতি ফরফর করে, কিছু খেতে পারি নে। আর দেখ, যার যেখানে বিয়ে হবার সেখানেই হবে, সে তোমরাও ঠেকাতে পারবে না আমরাও পারব না।

শুকনো কণ্ঠে নীতা বলে, খুব ভালো ছেলে অনীকেন্দ্র, এ বাড়িতে আসে যায়, তারো একটা অন্য অর্থ করেন আপনারা, আশ্চর্য!

পিসিদের মুখ একটু রাঙ্গা হয়ে ওঠে, তবু মুখ টিপে হেসে বলেন, আমাদের আর কি দোষ, সবাই যা বলে তাই বললাম। না হয় এবার থেকে বলে দেব তোমাদের ওতে আপত্তি আছে। কিন্তু মন রেখে বড়দা আপত্তি করেছিল বলে সোমার কি হয়েছিল।

এই বলে পিসিরা বিদায় নেন, মোহন নিচে গিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসে। ফিরে এসে দেখে নীতা রান্নাঘরে একটু অস্বাভাবিক উষ্মার সহিত ঠাকুরের সঙ্গে বকাবকি করছে। এর মধ্যে ছেলেমেয়েরা বাড়ি এসে যায় আর কথা হয় না। তবু মনের মধ্যে কথাটা খচ্খচ্ করতে থাকে, একটা সমস্যার মধ্যে নীতাকে একা ফেলে যাওয়া হচ্ছে না তো? কিন্তু কিছু বলার সুযোগ দেয় না নীতা, নিজের চারদিকে একটা অদৃশ্য পাথরের বেড়া দিয়ে রাখে। তবু কিছু না বলেও পারে না, যাবার মুখে বলে, খুব দেরি করব না নীতা, তুমি বেশি ভাবনাচিন্তা কর না যেন ঐ ব্যাপারটা নিয়ে।

নীতা বললে, আমার কর্তব্য করবার মতো আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে? তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও।

ছেলেমেয়ে যাবে স্টেশনে, তাদের তর সয় না। রওনা হতে হয়; যতটা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে ভেবেছিল মোহন ততটা হয় না। মেয়েকে কিছু বলতেও পারে না, হয়তো নীতা পছন্দ করবে না। দুজনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ে, চিঠি লিখো, বাপি, টেলিগ্রাম এসে পেঁছয় না, গিয়েই চিঠি লিখো! গাড়ি ছেড়ে দেয়, ভীড়ের মধ্যে দুটি ছেলেমানুষ মিলিয়ে যায়।

সোমাদিদি। সোমাদিদি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, তারার চেয়ে কতটুকু বড় ছিল? আর কোনো সন্তান ছিল না জ্যাঠামশায়ের, অথচ কেমন অনায়াসে জীবন থেকে তাকে ছেঁটে ফেলে দিলেন! ত্রিশ বছর ধরে তার নামটিও করলেন না, খোঁজও নিলেন না। কেমন ছেলে ছিল রাজারাম? মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিল। পাশ করেছিল। সোমাদিদির সঙ্গে পড়ত না, এক ক্লাশ উঁচুতে পড়ত। সেই বছর পাশ করেছিল। কলেজের খাতাপত্র দেখে এসেছে মোহন। নিজেরি কলেজ, বেশি অসুবিধা হয় নি। ভালো ছাত্র ছিল রাজারাম,

একটা সোনার মেডেল পেয়েছিল। অবাঙ্গালী বলেই কি শুধু জ্যাঠামশায়ের আপত্তি? রাজারামকে নিশ্চয়ই বাড়িতেও একাধবার এনেছিল সোমাদিদি, অমলাপিসির কাছে যখন নিয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই হয়তো প্রথমদিন ভদ্রতা করেছিলেন। তারপর সোমাদিদি নিশ্চয় মনের কথাটা বলেছিল তাঁকে, গোপন করা তো তার স্বভাব ছিল না। কিন্তু নিজেকে এমন গোপন করতে শিখল কোথেকে? ত্রিশ বছর ধরে একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল! যে মোহনের তাকে নইলে একটি দিনো চলত না তার কাছ থেকেও নিজেকে বেমালুম মুছে ফেলল!

দুহাতে কপাল ধরে ভাবে মোহন, সোমাদিদির চলে যাবার কথা। বোর্ডিংএ তাকে খবর দেওয়া হয় নি। সে একটু টের পায় নি সোমাদিদি চিরদিনের মতো হারিয়ে যাচ্ছে। যদি এতটুকু বুঝতে পারত, তাহলে—কি হত তা হলে, একটা বাপ মা-মরা পনেরো বছরের স্কুলের ছেলে কি-ই বা করতে পারত? কিছু পারত না, তবু বলতে পারত, তুমি চলে গেলে আমার জীবনটা অন্ধকার হয়ে যাবে, কোথায় যাচ্ছ বলে যাও।

পারত না বলতে। আহ্লাদের কথা বলা যেত না সোমাদিদিকে। কত আদর করত সোমাদিদি তাকে, কিন্তু মুখে কখনো সোহাগের কথা বলত না। কেমন অনায়াসে মা বাপ মরা ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল সোমাদিদি। আর সে-ও তাকে ত্রিশ বছর ধরে দিব্যি ভুলে রইল। কি রকম পোষ মানিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই মোহনকে যে এতদিনের মধ্যে একবারো সোমাদিদিকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করল না।

কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে নয়, রাজারামের জন্যে মোহন ত্রিশ বছর চুপ করে ছিল। একবারটি যদি সোমাদিদি একছত্র লিখে বলত তুই আয়। অমনি জ্যাঠামশাইকে ফেলে, পড়াশুনো ভবিষ্যৎ সব ফেলে, ফাঁকি দিয়ে, চুরি করে টাকা জোগাড় করে সোমাদিদির কাছে চলে যেত মোহন। কিন্তু সে ডাকে নি।

রাজারাম লোকটি কি এতই অসাধারণ? বুকের মধ্যে খচ্ করে ওঠে, অনীকেন্দ্রের মতো কি রাজারাম? অনীকেন্দ্রের জন্যেও যদি তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়, নীতা তাকে কখনো ক্ষমা করবে না। কিন্তু মোহন? শীতের রাত্রে রেলের শূন্য কামরায় চোখ বুঁজে আধবুড়ো মোহন মনে মনে বলে, কেউ যেন তার ভালোবাসার মানুষকে না হারায়, ভগবান, কারো যেন মা বাবা না যায়, সোমাদিদি না যায়, সব তারারা তাদের অনীকেন্দ্রদের যেন পায়—চমকে ওঠে মোহন, এ কি পাগলের মতো কথা, ভালোবাসার অভাবে কারো জীবন যেন মরুভূমি হয়ে না যায়, ভগবান—এ পাগলের কথা নয় তো ক?

আট

ভোরে হরিদ্বারে নেমে ছোট একটা এক্কার মতো গাড়ি ভাড়া করে কণখলে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়ে উঠল মোহন। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে এঁদের বড় প্রীতির সম্পর্ক ছিল, মোহনো যেন ওঁদের ঘরের ছেলে। বিকেলের দিকে খোঁজ খবর নিয়ে সুদক্ষিণা দেবীর ত্রিশ বছরের পুরোনো ঠিকানায় উপস্থিত হয় মোহন। একজন বয়স্কা মহিলা এগিয়ে আসেন। বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে ওঠে। এই কি তবে সোমাদিদিদের বন্ধু সুদক্ষিণা দেবী, চুলে পাক ধরে গেছে, থুতনির নিচের চামড়া ঝুলে পড়েছে!

সুদক্ষিণা দেবীর নাম করতে তিনি খুসি হয়ে গেলেন। ভারি সম্মান করে বসবার

ঘরে এনে বসালেন, হিন্দীঘেঁষা বাঙলায় বললেন, না তিনি সুদক্ষিণা দেবী নন, সুদক্ষিণা দেবী তাঁর ননদ। তবে কপালজোরে এমন সময় এসে গেছে মোহন যে সুদক্ষিণা দেবী এদেশেই আছেন। বাড়িঘর বিক্রীর ব্যবস্থা করে দিয়ে অবিশ্যি দিন পনেরোর মধ্যেই আবার অ্যামেরিকা ফিরে যাবেন। মোহন একটু বসলেই দেখা হবে, সুদক্ষিণা দেবী একটু বেরিয়েছেন।

সব কথা বুঝিয়ে বলতে হয় মোহনকে। সুদক্ষিণা দেবীর ভাজের নাম রমাদেবী। এবাড়িতেই এতকাল বাস করেছেন, সেই সুদক্ষিণা অ্যামেরিকা গিয়ে অবধি, সেও প্রায় পঁচিশ বছর হবে। বাড়ি আগলাতে এসেছিলেন ওঁরা স্বামীস্ত্রীতে, আসলে দিদিমার বাড়ি, ওয়ারিস তার সুদক্ষিণা দেবী, ভাইয়ের কোনো অংশ নেই।

ভারি প্রগল্ভা রমাদেবী; এখানেই জীবন কাটিয়েছেন, হয় তো কথা বলবার লোকের অভাব বোধ করেছেন। স্বামীটি নাকি স্কুলে মাষ্টারি করতেন, এখন বয়স হয়েছে আর পেরে ওঠেন না। তাছাড়া সুদক্ষিণা দেবী বাড়ি যখন রাখবেন না, সব জিনিষপত্রসুদ্ধ বেচেবুচে দিচ্ছেন, তখন কাশীবাসী হওয়া ছাড়া এঁদের গত্যন্তর নেই। স্বামী নাকি ভারি ক্ষুণ্ণ কিন্তু রমাদেবীর বাপের বাড়ি কাশীতে, বাবা মা এখনো আছেন, মেয়ের নামে গঙ্গার ধারে একটা ছোট দোতলা বাড়ি করে রেখেছেন, তার উপর তলাটাতে ভাড়াটেও এসে গেছে, সেই টাকাতে আর যৎসামান্য যা জমাতে পেরেছেন তাইতেই এঁদের চলে যাবে, ছেলেপুলে যাদের নেই তাদের আবার ভাবনা কিসের। গুষ্ঠীর খবর বলে যান ভদ্রমহিলা, যেন কতই না অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়েছেন। মাথায় কাপড় নেই, মুখে খিল নেই। ভালো লাগে মোহনের।

এরি মধ্যে বাইরে মোটর গাড়ির শব্দ হয়, রমাদেবী কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যান। ব্যস্ত হয়ে চেয়ার কৌচ সোজা করতে লেগে যান, হাত দিয়ে কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল ঠিক করতে থাকেন। আগন্তুককে বোধকরি সমীহও করেন, ভয়ও করেন। সুদক্ষিণা দেবী মোহনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। মোহনও যে অবাক হয়ে যায় বলাই বাহুল্য।

এ সুদক্ষিণা দেবীই তো, মেমটেম নয় তো? গায়ের রং অস্বাভাবিক রকমের ফর্সা, নখে রং, ঠোঁটে রং, ভুরুতে রং, খাটো করে চুল ছাঁটা, তার চকচকে পাটকিলে রং, মাথাময় আঁটো আঁটো কোঁকড়া করা; পরনে ছাই রঙের নাইলন সাড়ি, তাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া আঁকা; সরু খোঁচার মতো উঁচু গোড়ালির জুতো; নাকের উপরে বেড়ালচোখের মতো বাঁকা কালো চশমা তার সাদা ফ্রেম, হাতে একটা ছোটখাটো সুটকেসের মাপের গোসাপের চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ। পাঁচ ছ'টী দাঁতে সোনার কারুকার্য। মোহন স্বপ্ন দেখছে নাতো?

সামান্য নাকি সুরে চোস্ত ইংরিজিতে কথা বললেন ভদ্রমহিলা, আমি ডক্টর মিস্ ত্রিবেদী, কিছু করতে পারি আপনার জন্যে?

গলা শুকিয়ে গেল মোহনের, যে কথা বলার জন্য এতদূর আসা, তার চেয়েও বহুগুণ দূর থেকে আগত এই মহিলাকে যেন কিছুই বলা যায় না। একটু অসহিষ্ণু হয়ে তিনি আবার বললেন কিছু ভুল করেন নি তো? কাকে চান আপনি?

রমাদেবী টুপ করে সরে গিয়ে ডক্টর মিস্ ত্রিবেদীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মোহনকে নিঃশব্দে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করেন। মোহনের মনের জড়তা খানিকটা ভাঙ্গে।

হঠাৎ তাকিয়ে রমাদেবীর ভুরুর ওঠানামা আর হাতের ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, একটু চা আনো না, ও রকমভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে। খরগোসের মতো

ছুটে পালালেন রমাদেবী।

মোহন বললে, আপনি কি সুদক্ষিণা দেবী, ত্রিশ বছর আগে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তেন? চমকে উঠলেন ডক্টর মিস্ ত্রিবেদী। হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়তাম, কেন বলুন তো! লেকচার টেকচার দেবার আমার কিন্তু সময় নেই; এই ট্রিপে যাবই না কলকাতায়। বাড়ি বিক্রীর দলীলপত্র তৈরী হলেই নিজের ঘরে ফিরে যাব শিকাগোতে। যেখানকার যা। মাইগড, এ কদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি! কি করে লোকে থাকে এদেশে ভেবে পাই নে। স্বাধীন হয়ে—ইফ্ এনিথিং—আরো শতগুণে খারাপ হয়ে গেছে দেশটা—হ্যাঁ, তা কি করতে পারি আপনার জন্যে তাতো বললেন না।

বলেই ফেলে মোহন, হুড়মুড় করে মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরুবার সময়ই কেমন যেন অবান্তর শোনায়। সোমা? সোমা চৌধুরী? কই মনে পড়ে নাতো। পাশও করে নি বলছেন, মনে পড়াই শক্ত। তাছাড়া আমি তো পাশ করেই সেই যে গেলাম অ্যামেরিকাতে, এই ত্রিশ বছরের মধ্যে আর আসি নি। দেশ বলতে আমার শিকাগোই মনে হয়।

কেমন হতাশ মনে হয় মোহনের। বলে, রাজারাম বলে কারো কথাও মনে নেই?

সোজা হয়ে উঠে বসেন ডক্টর মিস্ ত্রিবেদী, সমস্ত শরীর থেকে মার্কিণী সংস্কৃতির খোলসটা মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ে। গলার স্বর কর্কশ শোনায়। কে আপনি? ও নাম দিয়ে আপনার কি হবে? আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করলে অনুতাপ করতে হবে বলে রাখলাম। এখন আর আমি সেই কাঁচা আনকোরা মেডিকেল স্টুডেণ্ট সুদক্ষিণা নই, যাকে ইচ্ছামতো মাথায় তোলা, ইচ্ছামতো পায়ের তলায় ফেলা যেত। রাজারাম! সোমা? এতক্ষণে মনে পড়েছে সোমার কথা। যে ছিল আমার নিদ্রাহীন রাতের অভিশাপের পাত্রী—তার নামটি অবধি ভুলে গিয়েছিলাম! উঃ!

হাসতে থাকেন ডক্টর মিস্ ত্রিবেদী, জোরে জোরে হাসেন, সে যে কি কষ্টের হাসি,—কান্নার মতো শোনায়। বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে মোহন। এ কোন মেয়ে? এই কি একটু আগে উঁচু গোড়ালির জুতো পায়ে, কালো চশমা পরে ঘরে ঢুকেছিল? না কি আর কেউ?

মোহনের মুখের উপরে চোখ পড়াতে হাসি বন্ধ হয়ে যায়।

আমাকে ক্ষমা করুন, বড় একটা কোমল জায়গায় হাত পড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম ভুলে গেছি, বর্তমান সাফল্য দিয়ে পুরোনো ব্যথাগুলোকে চেপে মেরে ফেলেছি। কিন্তু তা কি হয়? পোড়াদাগের মতো সেগুলো মনের মধ্যে বসে যায়, একটুখানি শীতের হাওয়া লাগলেই আবার টনটন করে। বলুন কি জানতে চান, যথাসাধ্য উত্তর দেব।

মোহন সংক্ষেপে বললে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন সুদক্ষিণা দেবী। তারপরে বললেন, বাস্তবিকই সোমা চৌধুরীকে দেখেছিলাম কিন্তু বেশি আলাপ ছিল না। আমাদের এক বছরের জুনিয়র ছিল সে। রাজারামের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল, বন্ধুত্ব কেন, তার চেয়েও বেশি ছিল। একসঙ্গে কাজ করতাম, একসঙ্গে পড়তাম, ভাবতাম একসঙ্গে জীবনটাও কাটাব। তার পরে সোমার সঙ্গে রাজারামের ভাব হল। একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন সুদক্ষিণা দেবী। বললেন, পৃথিবীর ট্র্যাজেডিগুলো সব কি রকম এক ঘেয়ে আর কমেডিগুলো কি বিচিত্র। এটা কখনো লক্ষ্য করেছেন কি? সোমা এল, আমি গেলাম। এই তো কাহিনী। পরীক্ষার ফল যেদিন বেরুল, রাজারাম বললে সোমাকে সে বিয়ে করবে। আর কিছু জানি না। সেই সোমা একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল, কি আশ্চর্য! সোনারাম বলে রাজার একজন বন্ধু ছিল, দুচক্ষে দেখতে পারতাম না তাকে, বড়লোকের ছেলে,

কিছু পড়াশুনো করত না, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ওড়াত। ওরি সঙ্গে সোমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল, রাজারামকে ছিনিয়ে নেবার কি দরকার ছিল? অনেকটা ঈগল পাখির মতো ছিল সোমা, ঐ রকম উদ্ধত, ঐ রকম জোরালো, ঐ রকম যেটি চাইবে সেটি ছিনিয়ে নেবে!

হাত পা কেমন অবশ হয়ে আসে মোহনের। ইচ্ছা করে চেঁচিয়ে বলে, না, না, না, ঈগল পাখির মতো ছিল না সে, নদীর মতো ছিল, ঠাণ্ডা, গভীর, প্রবল কিন্তু একবার বলতে শুরু করে আর কোনো কথা মনের মধ্যে বন্ধ রাখেন না সুদক্ষিণা দেবী।

সোনারামদের কাঠগুদোম ছিল, তেজারতি ব্যবসা ছিল এইসব অঞ্চলে, কি যেন নাম ছিল রামসিং এণ্ড সন্স না কি যেন। মনে করতে পারেন না সুদক্ষিণা দেবী, রমাদেবীকে ডেকে আনেন, তিনি গিয়ে তাঁর স্বামী গোবিন্দলালকে ডেকে আনেন। রামসিং এণ্ড সন্স এতদিনে উঠে গেছে; ছেলেগুলো তো আর মানুষ ছিল না, বাপঠাকুরদার অত কষ্ট করে গড়ে তোলা সোনার খনির মতো ব্যবসাটি কয়েক বছরের মধ্যে একেবারে ফুঁকে দিল! তারপর কে কোথায় এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল, তখনি মেজোটা ডাক্তারি পাশ করে, দেরাদুনে প্র্যাক্টিস্ করে, বিয়ে থা করে নি, চুপচাপ মানুষটি, অতি সাধারণ অবস্থা। একরকম গরীবই বলা চলে।

একটু চেষ্টা করতে তার ঠিকানাও পাওয়া গেল, রাজপুরের পাহাড়তলিতে, নাকি লোক বড় ভালো। কণখলে ফিরতে মোহনের রাত হয়ে যায়, স্বামীজিরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মোহনের বুকের মধ্যে যে ঝড় উঠেছিল, তাঁদের কোমল স্নেহের সেবায় সে ঝড় আবার শান্ত হয়। আসবার আগে নীতা একবার বলেছিল, দেখো, কেঁচো খুঁড়তে না সাপ বেরোয়? এ কি তারি সূচনা?

নয়

রাতে চোখে ঘুম আসে না। ত্রিশ বছর আগেকার কথা ভাবতে চেষ্টা করে। এ মোহন তো সেই মোহনই। সেই নিঃসঙ্গ মোহন, সেই একলা মোহন, সেই মোহন যার একাকিত্ব এক মাত্র সোমাদিদি এক মুহূর্তে ঘুচিয়ে দিতে পারত। হঠাৎ এসে হাত বাড়িয়ে টুপ করে মোহনের মনের সব চেয়ে লুকোনো কথাটি বের করে আনতে পারত। মা-মরা মোহন মা না থাকার দুঃখ ভুলে যেত, বাপে-ফেলে-দেওয়া মোহন আহ্লাদে ভরপুর হয়ে উঠত। ত্রিশ বছর যার নাম বড় একটা মুখে আনে নি, সেই সোমাদিদি।

ভাবতে চেষ্টা করে মোহন, কোথায় কোন পার্বত্য নগরে নিজেদের জন্য পরিপূর্ণ একটি স্বর্গ রচনা করে অনবদ্য সুখে সোমাদিদি ত্রিশ বছর বাস করছে। হয়তো ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, নাতিনাতনিতে ঘর ভরে গেছে। বুকটা কেমন ভরে ওঠে মোহনের, আহা সুখী হক সোমাদিদি, সুখে শান্তিতে জীবন ওর ভরে উঠুক। উঠেছেও নিশ্চয়ই, ও—ও যে কত একলা সে কি মোহনের জানতে বাকি ছিল? আর কখনো একলা না হক সোমাদিদি। মোহনকে ভুলে যাক, যাক আর কি গেছেই হয় তো ভুলে। কিন্তু তাই কি? সোমাদিদি আবার কাউকে ভুলে যায় নাকি?

হিসাব করতে থাকে মোহন। সোমাদিদি ওর চাইতে আট নয় বছরের বড়। তখন মনে হত বুঝি জ্যাঠামশায়েরি কাছাকাছি বয়স, এখন মাত্র আট বছরের তফাৎ ভেবে আশ্চর্য লাগে। কি করে কাটাল মোহন এই ত্রিশটা বছর? সুদক্ষিণা দেবীও ঐ কথাই বলেছিলেন।

কি করে কেটে গেল ত্রিশটা বছর? ভেবেছিলাম পুরোনো আমি মরে গিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ নতুন আমি হয়ে গেছি। তখন নিরামিষ খেতাম, জানেন আমার মা বাঙলাদেশে মানুষ হয়েছিলেন, আমরা কলকাতায় থাকতাম, রমা বাঙালীর মেয়ে। মার সই ছিল রমার মা, দুজনায় মিলে বিয়েটা দিয়েছিল। ত্রিশ মিনিটে তো আর ত্রিশ বছরের ঘটনা বলা যায় না। এইটুকু বুঝল মোহন, রাজারামের কাছে আঘাত পেয়ে, বাপের কোনো বন্ধুর সাহায্যে স্কলারশিপ জোগাড় করে সুদক্ষিণা অ্যামেরিকা চলে গিয়ে নবজন্ম লাভ করেছিল।

নিজের হাতের রুমালটা কুচিকুচি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে যাচ্ছিলেন সুদক্ষিণা দেবী, বুঝলেন এ আবেগ একেবারে সাময়িক; এতকাল বাদে এই বাড়ি এই ঘর—কত যে ইস্কুলের ছুটি অফুরন্ত সুখে কেটেছে এখানে আমার দিদিমার কাছে—নিজের জন্মস্থানে, নিজের আত্মীয়স্বজন দেখে মনটা একটু দুর্বল হয়ে গেছে, আবার ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ রাজারামের নাম শুনে কেমন চমকে উঠেছিলাম। আসলে এখন আর আমার কোনো দুঃখ নেই। সুখে থাকুক রাজারাম সোমার সঙ্গে।

মোহন বললে, সেখানে একা লাগে না? হাসলেন সুদক্ষিণা দেবী।

একা আবার কি? বলি নি বুঝি তিনটে ছোট ছোট নিগ্রো মেয়ে পুষ্যি নিয়েছি যে। কেউ নেই তাদের। ঘরে আনতেই গাছ উপড়ে, কাঁচের বাসন ভেঙে, দেয়ালে পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কেটে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, দুধের জাগ উল্টে ফেলে, আমাকে আর একা থাকতে দিল কই? এখন তারা তিনজনেই ডাক্তারি পড়ে, পাশ করেই নাকি আফ্রিকায় চলে যাবে বলে।

আর আপনি? তখন আপনি একলা পড়বেন না? একটু আশ্চর্য হয়ে যান সুদক্ষিণা দেবী, সেকি, আমার হাসপাতাল আছে না, সেখানে দঙ্গলে দঙ্গলে নিগ্রো রুগী এসে বসে থাকে যে, একলা পড়বার সময় কোথায় আমার।

বিদায় দেবার সময় ছোট একটি নমস্কার করল মোহন, কি জানি, মুখ দিয়ে বেশি কথা বেরুচ্ছিল না। সুলক্ষণা দেবী বললেন, গুড্ বাই, গুড্ লাক্, সোমাকে খুঁজে পেও, আমার কথা বল।

রাজপুরের রাস্তার শেষে যেখানে মুসৌরি যাবার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে, সেইখানে বাঁ হাত দিয়ে সরু একটি রাস্তা বেরিয়েছে। ঘুরে আবার পাহাড়ের কাছেই এসেছে সে পথ, সেইখানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট একটি বাড়ি। গোলাপ বাগানের ভিতরে, লাল্ টিনের ছাদ, ছোট একটি সাদা বাড়ি। সেই বাড়িতে সোনারামকে পাওয়া গেল।

স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়ে বয়স যেন অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। বেশি মিশুকে বলেও মনে হল না, কথা বের করা বড়ই শক্ত ব্যাপার। মোহন ছাড়ে না। একটু একটু করে কলকাতার কথা পাড়ে, সোমাদিদির কথা পাড়ে, শেষে রাজারামের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে। শুকনো কাঠ কাঠ গলার স্বর সোনারামের। কাষ্ঠ হেসে বলে কি করবে তার ঠিকানা দিয়ে? সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।

পাথর হয়ে বসে থাকে মোহন। মনে হয় হৃৎপিণ্ড থেকে সমস্ত রক্ত নিঃশেষে কোন্ অতল পাতালে নেমে যাচ্ছে। ভগ্নকণ্ঠে বলে, আর সোমাদিদি?

হাসে সোনারাম। সে মেয়েটার খবর আমি রাখি না। এতদিনে সেও মরে গেছে হয়তো। মোহন বলে, আপনি যখন বেঁচে আছেন সেই বা নিশ্চয় মরে যাবে কেন? বলুন

কোথায় তার খবর পাব।

সোনারাম অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ললিতা বলে একটি মেয়ে ছিল, সোমার বন্ধু। সে মরে যাবার পর থেকে আর আমি কোনো বাঙালী মেয়ের খবর রাখি না। উঠে পড়ে সোনারাম। কোটের বোতাম লাগায়, গলায় কম্ফর্টার জড়ায়। এখন আমার রুগীদের আসবার সময় হয়ে গেল। আর কিছু জানবার আছে আপনার?

ব্যাকুল হয়ে ওঠে মোহন। এতদিন তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোথাও না কোথাও সোমাদিদি সুখে বেঁচে আছে, সেই বিশ্বাসে হঠাৎ কেমন নাড়া লাগল। রাজারাম কবে মারা গেল?

খুব হাসল সোনারাম। এতদিন আগে মরেছে যে সাল-তারিখ মনে নেই। তবে বছর আটাস-ঊনত্রিশ তো হবেই। কি করে মল? রেলের অ্যাক্সিডেন্টে। সোমা? না, সোমা ছিল না সঙ্গে। তার অনেক আগেই ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তাহলে এখন আসুন, আমার কাজ আছে।

নড়তে পারে না মোহন। এইখানে তো গল্পের শেষ নয়; সোমাদিদিকে খুঁজে বের করা যে আরো দরকারি হয়ে পড়ল। একটুখানি পথ বলে না দিলে কি করে হবে? চেয়ে দেখে মোহন সত্যিই একটি দুটি করে লোক আসতে শুরু করেছে। হতাশভাবে চেয়ে দেখে গোলাপ গাছে কুঁড়ি ধরেছে, কি কোমল হাতে সোনারাম ডাক্তার কুঁড়ির পাশ থেকে মাকড়সার জাল ছাড়াচ্ছে। বলে, কোথায় যাব একটু বলে দিন। কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সোনারাম। কোথায় যাবেন আমার পক্ষে বলা শক্ত। রাজারামের বৌ হয়তো বলতে পারে। আর কোনো আঘাতে ব্যথা লাগে না মোহনের। তিনি কোথায় থাকেন? স্টেশনের কাছে যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন হরিদ্বার হোটেল কোথায়, সেই বলে দেবে। ওর ছেলে সারাজীবন খেয়ে না খেয়ে হোটেল করে, দেখুন গিয়ে মাকে কেমন সুখে রেখেছে। তবে সোমার কথা আবার যেন ওখানে গিয়ে ফাঁস করে দেবেন না, সোমাকে তারা চেনে না। রাজার বুড়ি মা বেঁচে আছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করুন। আচ্ছা, গুড্ নাইট।

এই বলে সোনারাম সত্যি সত্যি পিছন ফিরে আবার গিয়ে বারান্দায় উঠল। গেট দিয়ে বেরিয়ে যখন বড় রাস্তায় পৌঁছল মোহন তখন তার পা কাঁপছে। ছোটবেলাতেও এমনি হত, যখন সব চাইতে বলের দরকার তখনি হাত পা কাঁপতে শুরু করত। সত্যি কাঁপত না, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যেত না, কিন্তু মোহনের সর্বাঙ্গে শিহরণ লেগে যেত, খানিকক্ষণ বসে থাকতে হত।

চারদিকে চেয়ে দেখে সবুজ পাহাড়ের সারি, দূরে মুসৌরির কাছে নীল পাহাড়, রোদ পড়ে মুসৌরির বাড়ির জানলার কাঁচ ঝক্‌ঝক্ করছে। কি শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর বিকেল বেলাটি। যেখানকার যা সেইখানে সেটি গুছিয়ে রাখা। মাটির নিচে গাছের কচি সন্ধানী শিকড়টির কোমল প্রান্তে পাছে ব্যথা লাগে তাই একটি ছোট টুপি পরানো থাকে। সব ব্যবস্থা আগে থাকতেই করা থাকে। মা মরে গেলে, বাবা চলে গেলে, জ্যাঠামশাই বাড়ি নিয়ে এসে মানুষ করেন। একা লাগলে সোমাদিদি ঠেলেঠুলে পাশে শুয়ে চুলের মধ্যে আঙুল বুলোয়। বুকের মধ্যে একটু ব্যথা করে মোহনের।

যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয়, স্টেশন তো খুব কাছেপিঠেও নয়। সেখানে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যায়। ছোট সুটকেশটি জমা দেওয়া ছিল, সেটি ছাড়িয়ে নিয়ে হরিদ্বার হোটেলে গিয়ে ওঠে।

হোটেলের জন্য তৈরী হয়নি বাড়িটা, পাহাড়ের কিনারায়, নিচে রাস্তা দেখা যায়, ঢলের উপরে ফলগাছের সারি। দোতলা বাড়িখানি পরিষ্কার তক্ তক্ করছে। হোটেলের মালিকের বয়স ত্রিশবত্রিশ হবে, হাসিখুসি ফর্সা চেহারা, মাথায় বেশ লম্বা। বড় আপ্যায়ন করে মোহনকে ডেকে বসাল; দোতলার ঘর তো একটিও খালি নেই, তবে একতলার পূবের ঘরখানি ভালো, সামনে বারান্দা, অনেক দূর অবধি ভিউ পাওয়া যায়। সেইখানে নিয়ে গিয়ে তোলে মোহনকে। হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা চমৎকার, চা স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়ে দেয়।

এবার তাহলে মোহন কি করবে? এই কি তবে রাজারামের ছেলে? ভালো লাগে ছেলেটিকে। কাছে এসে বসে, রাতে খাবার কথা জিজ্ঞাসা করে। মা-ই গৃহস্থালীর ভার নিয়েছেন বলে। না, বিয়ে-থা করে নি, তবে—একটু সলজ্জ হাসে ছেলেটি। সুন্দর মুখখানিকে আরো সুন্দর লাগে। আর কে আছে বাড়িতে? বুড়ি ঠাকুমা আছে, তবে তিনি বড় একটা ঘর ছেড়ে বেরোন না। বারান্দায় এসে একটু যা বসেন। বয়স বলতে সেরকম কিছুই নয়, বায়াত্তর তিয়াত্তর হবে বড়জোর, কিন্তু দুঃখে কষ্টে ভেঙ্গে পড়েছেন।

একটা সিগারেট ধরায় মোহন, তাকেও দেয়, নাম তার শিবশঙ্কর, দাদামশায়ের দেওয়া নাম নাকি। বারান্দার রেলিং-এ বসে গল্প করতে থাকে শিবশঙ্কর। এই সময়টা তার অবসর থাকে। না, বাবা নেই, সে যখন ছ' বছরের বাবা রেল দুর্ঘটনায় মারা যান। দাদামশায়ের কাছে মানুষ, বড় ভালো লোক, কিন্তু বড় গরীব, পড়াশুনো কিছু হল না, ঐ স্কুল ফাইনাল অবধি দৌড়। অথচ বাবা কলকাতার মেডিকেল কলেজের পাশ করা ডাক্তার ছিলেন। সিমলার কাছে তাদের বাড়ি ছিল। মা? এই হোটেল তো মার জন্যেই এত সাফল্যলাভ করেছে, নইলে শিবশঙ্করের কতটুকু ক্ষমতা? কিচ্ছু লেখাপড়া জানত না, বাবা নাকি ভারি রাগ করতেন, বলতেন দাদামশাই নিজে পণ্ডিত হয়ে, বাবার ঘাড়ে মুখ্যু মেয়ে চাপিয়েছেন! পরে বাবা মারা যাবার পর দাদামশাই মেয়েকে খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, বেশ ইংরিজি বলে মা আজকাল।

হাসে ছেলেটি, দেখবেন আমার মাকে রাতে খাবার সময়। এখানে খাবার দেবে না কি খাবার ঘরে যাবেন? বেশ এখানেই দেবে।

দশ

পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যা নামে, ছায়াগুলো ধীরে ধীরে সমস্ত সহরটাকে একটা কোমল আবরণে মুড়ে দেয়। এইখানে এই বারান্দায় বসে সমস্ত পৃথিবীকে বড় সুন্দর, অনাত্মীয় মনে হয়। কি একটা বিদেশী লতার গাছ বারান্দার রেলিং বেয়ে ছাদে উঠেছে, তার বেগুনি ফুলের থোকা থেকে মৃদু একটা সুগন্ধ নাকে আসে। অনেকদিন পরে নীতা, তারা, পার্থর কথা মনে পড়ে। প্রত্যেক মানুষের প্রাণের মধ্যে এমন একটা জায়গা থাকে যেখানে প্রিয়তম সঙ্গীও প্রবেশ করতে পারে না। চোখ বুঁজে মোহন ভাবে, কিন্তু সে জায়গাটা দুঃসহ নির্জন।

অনীকেন্দ্র কি ঘন ঘন আসা ধরেছে? না, নীতা মাঝখানে পড়ে তার ঠাণ্ডা কঠিন সৌজন্য দিয়ে বিপদকে ঠেকিয়ে রাখবে। বিপদ আবার কিসের? অনীকেন্দ্রকে মোহনের ভালো লাগে। বাপ নেই, গরীব বলে অনেক অনাদর পেয়েছে। এখন নাম করছে, জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, কি সুন্দর চেহারা, কি ভালো ব্যবহার। তারার সঙ্গে নাকি বড় বেশি ভাব। কিন্তু মোহনের রাগ হয় না কেন, ভাবনা হয় না কেন? পার্থটা হয়তো রোজ ইয়েনদের বাড়ি যায়। হাসি পায়

মোহনের, ইয়েন হতভাগা যদি দাড়ি কামাত, চুলটা অত খোঁচা করে না ছাঁটত আর লাল-নীল জামাগুলো কাউকে দিয়ে দিত, কি এমন মন্দ হত? পড়াশুনো করে যথেষ্ট, একটু ধেই ধেইও করে অবিশ্যি, তাতে কারই বা কি ক্ষতি হয়? পার্থ ওর বন্ধু, দুজনায় এখানে ওখানে বক্তৃতা শুনতে যায়, প্রদর্শনী দেখতে যায়, অন্যায়টা কি করে? বেশ লাগে ইয়েনকেও।

তবে নীতার কেন অত রাগ তা মোহন জানে। রাগ নয়, ভয়। পাছে পার্থর মনটি ইয়েন ভঙিগয়ে নেয়, তাই ভয়। দুর্বলের ভয়। নীতার সপ্রতিভ প্রত্যক্ষ সবলতার পিছনে যে ভীরু, বঞ্চিত, আহত, ডানাভাঙ্গা পাখিটা আছে, সে ভয়ে কাঁপে। অধিকার করতে চায়, অথচ অধিকার করার কিছু পায় না, কাউকে পায় না। ভেবেছিল মোহনকে বিয়ে করে ফেলে সব পেয়ে যাবে, তারপর খালিহাতেই বুঝি বাইশ বছর কাটিয়েছে। বেচারি নীতা।

পাঁচরকমের কথা ভেবে আসল কথাটাকে, সোমাদিদির কথাটাকে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে রাখে মোহন। সোমাদিদি কি সত্যি মরে গেছে? দু'হাতে মুখ ঢেকে মোহন ভাবে, বাপ ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, এক কাপড়ে যার সঙ্গে চলে গেল, দেশে তার বৌ ছিল, ছেলে ছিল। রেজিষ্ট্রি আপিশের আইনসম্মত বিয়েটাও তাহলে বে-আইনী ছিল। এক বছরের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল, বললে সোনারাম, কার কাছে গেল সোমাদিদি? কে ছিল তার? মোহনের তবু সোমাদিদি ছিল, কিন্তু সোমাদিদি কোথায়, আরেকটা সোমাদিদিকে কি পাবে?

পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখে সাদা কাপড় পরনে, মাথাভরা সাদা চুল হাতির দাঁতে খোদাই করা মূর্তির মতো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এক মহিলা, এই কি তবে রাজারামের মা? হিন্দীতে কথা বলেন রাজারামের মা। মোহন একসময়ে রিসার্চের কাজ নিয়ে দীর্ঘকাল এলাহাবাদে ছিল, তখন প্রথম বিয়ে হয়েছে, তারা পার্থ খুব ছোট। এক নাগাড়ে ছিল সেখানে সাত বছর, হিন্দী মোহনের মাতৃভাষার মতো। মোহন উঠে দাঁড়াল, রাজারামের মা একটা পালকের মতো যেন উড়ে এসে মোহনের পাশে বসে এক নিঃশ্বাসে বলেন, সোনারামের কাছে যে জন্যে গিয়েছিলে সে কথা এদের বল না। সে দুঃখ থেকে এদের নিষ্কৃতি দাও। বড় কষ্টে এরা সুখের মুখ দেখেছে। বলে, চেয়ে থাকেন: মোহনের মুখের দিকে নিতান্ত প্রার্থীর মতো চেয়ে থাকেন। দুঃখের বলীরেখায় জীর্ণ সে মুখ বর্ণনার অতীত। চোখ দুটি যেন ব্যথার অতল কালো দিঘি। ছোট দুটি সাদা পাখির মতো নিরাভরণ ফর্সা হাত দিয়ে মোহনের হাত চেপে ধরেন।

আমি জানি তুমি সোমার খোঁজে এসেছ, সোনারাম বলেছে। শিব কিম্বা তার মা সোমার কথা জানে না, সোমা বলে কেউ যে আছে তাই জানে না। শুধু আমি জানি। বুকের মধ্যে থেকে ফিকে হয়ে যাওয়া পুরোনো একটা ফোটো বের করে বলেন, এই না তোমার সোমাদিদি? বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে মোহন নড়বার চড়বার কথা বলবার ক্ষমতা হারায়। আহা এই তো সোমাদিদি, ত্রিশ বছর আগে যেমনটি মোহন দেখেছিল ঠিক সেই সোমাদিদি, শুধু এমন প্রসন্ন হাসি মোহন কখনো দেখে নি। মোহন যে হাসি দেখেছিল সে অন্যরকম, তার পিছনে ছিল রাশিকৃত দুঃখ, খুব কম বয়সে মোহন সেটা বুঝেছিল। মা মরা সোমাদিদি মা মরা মোহনকে দেখেই হাসত, সে হাসি আবার কি রকম হবে?

সোমাদিদির পাশের সুন্দর মানুষটি যে রাজারাম সে আর বলে দিতে হবে না, শিবশঙ্করের সঙ্গে তার আশ্চর্য আদল। তার পাশে ঐ নাকি সোনারাম। ঐ খুসিতে ফেটে পড়া ছেলেমানুষটিই যেন সোনারাম, আগুনের পোড় খেয়ে তার কি হাল হয়েছে এইতো খানিক আগেই মোহন দেখে এসেছে। তার পাশে ছোট একটা বেলফুলের মতো স্নিগ্ধ মধুর

মেয়েটি কি ললিতা রায়? যে ত্রিশ বছর আগে ঠাকুমার বাতের ওষুধ আফিং খেয়ে মরেছিল বলে আজ অবধি তার নাম কেউ করে না! কেমন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চারটি ছেলেমানুষ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে হাসছে, যে ভবিষ্যত কারো কপালে সুখ লেখেনি।

আলোর কাছে তুলে ধরে ছবিটাকে দেখে দেখে মন ভরে না মোহনের, হাতটা একটু কাঁপে। রাজারামের মার কেঁদে-কেঁদে চোখের জল আর চোখে আসে না, বুকের মধ্যে জমা হয়। বলেন, তোমার সোমাদিদিকে খুঁজতে এসেছ? আমার রাজারাম তার কি করেছিল জানো তো? অনেক দূরে থেকে মোহন ভাষা খুঁজে পায়।

রাজারামের স্ত্রী আছে জেনেই সে কেন ফিরে যায় নি? তার একটা মেয়ে হয়েছিল।

বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে মোহনের। এই তাহলে উত্তর। কেন বাড়ি ফেরে নি, চিঠি লেখেনি, এই তার উত্তর। ব্যাকুল হয়ে বলে, বলুন তারা কোথায়? তার কি বেঁচে আছে? রাজারামের মা আঁচল দিয়ে শুকনো চোখ মোছেন। সোজা হয়ে উঠে বসে বলেন, পাঁচ বছর আগেও ছিল।

এখন?

কি জানি, আমি লিখতে জানি না, এদের কিছু বলতে পারি না। মাদ্রাজের বাড়ি যখন তুলে দেওয়া হল, আমাকে এখানে পাঠাল আর নিজে পাহাড়ে চলে গেল, যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা থাকতেন। আমি পথ বলে দেব, তুমি তাকে খুঁজো।

হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় মোহনের, মনে হয় এত কাছে সোমাদিদি কিন্তু এত বিষম দূরে! আর কি তাকে পাওয়া যাবে কোনোদিনো? ছোটবেলাকার যত পুরোনো দুঃখ সব মিলে একটা বিরাট দুঃখ হয়ে মোহনের বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসে। রাজারামের মা বলেন, বলব, সোমার কথা? কাউকে বলতে ইচ্ছা করে; পাঁচ বছর তার নাম করিনি। আমার রাজারাম ছিল যেমন সুন্দর তেমনি বিদ্বান। বিয়ে দিয়েছিলেন আমার শ্বশুর সতেরো বছর বয়সে। বৌকে মনে ধরেনি, সে লেখাপড়া জানে না। তবু ঘর করত। তারপর বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে গেল। বৌয়ের ছেলে হলে একবারটি দেখতে গেল না। এই শিবশঙ্কর, এর এখন চৌত্রিশ বছর বয়স। কিছু জানি না, পাশ করে, সোমাকে বিয়ে করে নিয়ে রাজা এল। ততদিনে ওর বাবাও গেছেন। সোমাকে নিয়ে এসে আমার পায়ের উপরে পড়ল। তুলে দেখি মেয়ে যেন ইস্পাতের তৈরী, সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, যেন বলছে ফেলবে তো ফেল। সেই এক মুহূর্তে তাকে ভালোবেসে ফেললাম। সিমলায় আমাদের বাড়ি-ঘর ছিল, কালকায় তেলের ব্যবসা ছিল, খুব গরীব ছিলেন না আমার স্বামী। সিমলায় আমাদের বাড়িতে তিনমাস ছিল সোমা, যা দেখে তাই ভালো লাগে, সুখ রাখবার জায়গা পায় না। আমি ভয়ে ভয়ে মরি, এ কি সর্বনাশ করে বসল রাজারাম। আমাকে বলে কি না—আমার বাবাও তো দুটো বিয়ে করেছিলেন, তাতে কি হয়েছিল? সোমাকে যদি বড়বৌয়ের কথা বল তো বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। ভয়ে বলি নি কিছু।

আমি বলি নি, কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করবে কে? শুনল সোমা ঠিকই। প্রথমে বিশ্বাস করেনি, তারপর রাজারামের মুখে শুনে যেন কথার আগুনে তাকে একেবারে পুড়িয়ে দিল। আর রইল না। সেই রাত্রেই সুটকেস গুছিয়ে গেল চলে। বললে, রাজারামের স্ত্রী আছে যখন তখন ওদের বিয়েটা বিয়েই নয়। চলে গেল।

রাজারামও আমার হাত ধরে বললে, মা, যাও তুমি সঙ্গে, ওর ছেলে হবে মা, কোথায়

যাবে একা। মরে গেলেও নিজের দেশে ফিরবে না, আমি ওকে জানি। ওর রাগ পড়লে পুরুত ডেকে আবার ওয়ে কিয়ে করব।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন রাজারামের মা। তারপর কি রকম একটা অন্য সুরে বলেন, গিয়ে উঠলাম রেলগাড়িতে সোমার কামরায়। আমাকে দেখে নেমে যায় আর কি? বললাম, তোর পেটে আমার নাতি, তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? ঐ একবার কাঁদল সে আর কাঁদতে দেখিনি। তারপর—

কথা বন্ধ হয়ে যায়। মোহন আস্তে বলে, কি তারপর?

আমরা দিল্লী পৌঁছে আমার বিধবা বোনের বাড়িতে উঠেছিলাম। পরদিন কাগজে রেল দুর্ঘটনার খবর বেরুল, মৃতদের মধ্যে আমার রাজারামের নাম ছিল। আর বাড়ি ফিরে যাই নি। সোমার মেয়ে হল ওখানেই, যেন আমার রাজারামের মুখখানি কেটে বসানো। সোমা অনেক লেখালেখি করে দিল্লীতে ডাক্তারি কলেজে ভর্তি হয়ে পরের বছর পাশ করল। মেয়ের নাম সীমা।

সে মানুষ হল দিল্লীতে আর পরে মাদ্রাজে, সোমা তখন সেখানে হাসপাতালে কাজ করেছে। তারপর সে বড় হল, এম-এ পাশ করল। কলেজে চাকরি পেল—

থেমে গেলেন রাজারামের মা।

হয়ে গেল? এই কটা কথাতেই কি পঁচিশ বছর কাবার? অসহ্য মনে হয় মোহনের। তারপর?

তারপর একটি ছেলের সঙ্গে তার ভালোবাসা হল। নিজেরা বিয়ে ঠিক করে সোমাকে এসে যখন জানল, আমার সামনেই সোমা তাদের রাজারামের কথা বলল। সীমা স্তম্ভিত, আর ঐ ছেলেটি সেই যে চলে গেল আর এল না। সীমার কি রাগ মায়ের উপরে! কেন বলতে গেলে? সবাই জানে আমার বাবা মরে গেছে, ও কথা বলবার কি দরকার ছিল?

সোমা খালি বললে, তাকে সত্যি কথাটা জানানো দরকার যে!

আর থাকল না বাড়িতে সীমা। কোন হস্টেলে গিয়ে উঠল, মায়ের মুখ পর্যন্ত আর দেখল না, ছ'মাস বাদে এক সাহেবকে বিয়ে করে বিলেত চলে গেল, মাকে একটা চিঠিও লেখে না।

আর সোমাদিদি?

সোমা? এক বছর কাজ করে গেল মুখ বুঁজে, শিবশঙ্করদের টাকা পাঠাত, তারা জানে সোমা আমার বোনের মেয়ে, কি জানি শিবশঙ্করের মা হয়তো বোঝে সব। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের এ দুঃখ সইবার অভ্যাস আছে। কোনোদিনো মুখে কিছু বলে নি। এক বছর বাদে সোমা মাদ্রাজের বাড়ি তুলে দিল। আমি এখানে এলাম, সে চলে গেল সিমলা হয়ে পাহাড়ের পথে। সেখানে সে বছর মহামারী লেগেছিল।

কত রাত কে জানে। সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে রাতটা যেন মোহনকে আর রাজা-রামের মাকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। মোহনের হৃৎপিণ্ডটা উঠছে পড়ছে যেন কত কষ্টে। ত্রিশ বছরের প্রশ্নের আধ ঘণ্টায় উত্তর দিয়ে দিলেন রাজারামের মা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। কাল তোমাকে একটা ঠিকানা দেব, পাহাড়ে আমার শ্বশুরবাড়ির সহরের ঠিকানা। সেইখানেই গেছে নিশ্চয়। চিঠি লেখে না, নিজেকে মুছে ফেলতে চায় বোধ করি।

দূরে একটা ঘণ্টা বাজে। রাজারামের মা নিঃশব্দে চলে যান। মনের মধ্যে আরো

দূরের ঘণ্টা শোনে মোহন। রাতের খাবার সময় হয়ে গেছে। শিবশঙ্করের বিধবা মা চাকরের হাতে খাবারের ট্রে নিয়ে আসেন।

এগারো

শিবশঙ্করের মার নাম বিমলাদেবী, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়স হবে, একটু পার্শি ধরনের সাজপোষাক, ফিকে নীল পাড়শূন্য জর্জেটের শাড়ি, খালি হাতে সোনার ঘড়ি, গলায় ছোট-ছোট মুক্তোর মালা, ভ্রমরকৃষ্ণ কোঁকড়া চুল। ভারি কায়দাদুরস্ত, ভারি সপ্রতিভ। একেই নাকি মুখ্যু বলে রাজারামের মনে ধরে নি।

ভালো ইংরিজি বলেন বিমলাদেবী; সব যখন হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, বাপে তখন মেম রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। বাপ মারা গেলে সেই বিদ্যা ভাঙিয়ে ছেলেকে মানুষ করেছিলেন বিমলাদেবী। চেহারার মধ্যে এত প্রসন্নতা কোথা থেকে এল কে জানে।

খাওয়া হয়ে গেলে চাকর ট্রে নিয়ে চলে গেল, বিমলাদেবী যাই যাই করেও যেতে পারেন না। হঠাৎ বলেন, নিরত্ যেতে হবে আপনাকে, সিমলা হয়ে যেতে হবে। সিমলায় আমার শাশুড়ির বাড়ি আছে। কেউ থাকে না সে বাড়িতে, পাশের বাড়িতে মৌসিমা থাকেন, তাঁর কাছে চাবি পাবেন। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মোহন। বিমলাদেবী একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বলেন, আমি চাই না শিবশঙ্কর এ বিষয় কিছু শোনে। এমনিতেই তার বাবাকে সে খুব ভক্তি করে না, সোমার কথা জানলে আর বাৎসরিকটাও করবে না। মেয়ে জাতটাকে বোঝা দায়। দুঃখ পুষে রাখবার এত অসীম ক্ষমতা, অথচ ভালোবাসার মানুষগুলো পাছে দুঃখ পায় তাই ভেবে সারা। মোহন বললে, তাকে আমি কিছু বলব না, ভয় নেই। কিন্তু আপনারো তো সোমাদিদির বিষয় জানবার কথা নয়। হাসেন বিমলাদেবী।

দেখিনি তাকে, কিন্তু জানি সবই। সোনারাম আমার মামাতো ভাই, তার কাছে ত্রিশ বছর আগে সব শুনেছি। আমার চেয়েও দুঃখী সোমা। আমার তো বাবা ছিলেন, ডানার তলায় করে আমাকে আর শিবকে রেখেছিলেন। সোমার কেউ ছিল না।

ভারি গর্ব হয় মোহনের। মাথা তুলে বলে সোমাদিদির কারো ডানার নিচে থাকবার দরকার ছিল না। তাছাড়া আপনার শাশুড়িই ছিলেন, সোমাদিদির মাথার উপরে ছাতার মতো। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিমলাদেবী বলেন, মানুষকে যতই ভালোবাসা যাক না কেন, তার কপালে সুখ লেখা না থাকলে, সুখী করা যায় না। আমি বড় সুখী। আমার শিবশঙ্করের এতদিন পরে বিয়ে করাতে মতি হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীর মেয়ে, বুড়ো বাপ ছাড়া কেউ নেই-ও। এবার হোটেল আরো বড় হবে, মাঝখানের বেড়া ভেঙে মস্ত বাগান হবে, আরো ঘর তৈরী হবে। এ জায়গাটার এখন উঠতি অবস্থা জানেন? মনে হয় কত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হয়ে আমার নৌকো তীরে এসে লেগেছে। শিবের বিয়ে হবে, নাতি-নাতনির মুখ দেখব, বয়সের তুলনায় শরীরটা কত ভালো আছে দেখুন, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ওদের জন্যে খেটে যেতে চাই। শাশুড়ির যত্ন করব, কাজ করব, আমার আর কোনো দুঃখ নেই, মিষ্টার চৌধুরী।

তারপর লজ্জিত হয়ে ওঠেন, ছিঃ, কি স্বার্থপর আমি, আপনার সমস্যার কথা ভুলে কেবল নিজের সুখের গল্প করছি?

মোহন ভাবে সবাই চায়, সবাই খোঁজে, তাই পায় না কিছু। বিমলাদেবী চান নি,

খোঁজেন নি, নৌকো আপনি এসে তীরে ভিড়েছে। বিমলাদেবী পথ বলে দিলেন। সোমা নিশ্চয় নিরতের কাছে ভবানীগাঁওয়ে গেছে। সিমলা থেকে খুব দূরে নয়, তবে যাওয়ার পথ খুব ভালো নয়। সিমলা থেকে নারকণ্ডা মোটর বাসে যাবেন, তারপর নারকণ্ডা থেকে ঠানাদার-কেণ্টগড় যেতে লরি পেতে পারেন, লরি যাওয়া আসা করে, নতুন রাস্তা হচ্ছে ওদিকে। ঠানাদার থেকে ঘোড়া নিন। সাত মাইল উৎরাই গিয়ে খড্ডার মধ্যে নওলাগ্রাম, সেখানে আমার দাদাশ্বশুরদের ফলের বাগান ছিল। সে সব খুড়শ্বশুররা বেচে খেয়েছেন। ঘোড়া ছাড়বেন না, নওলার ডাকবাংলায় বিশ্রাম করে, পরদিন সাড়ে তিনহাজার ফুট উঁচুতে নিরত্ পৌঁছবেন। সেখানে আমার আসল শ্বশুরবাড়ি। পাঁচ বছর আগে সেখানে ভারি এপিডেমিক হয়েছিল, শাশুড়িকে এখানে পাঠিয়ে সোমা সেইদিকে গেছে। আমার মনে হয় সেইখানেই আছে, সেখানে নতুন হাসপাতাল খোলা হয়েছে, ছেলেমেয়েদের স্কুল হয়েছে। সোমা ছাড়া কে এত করবে?

শেষ পর্যন্ত বিমলাদেবীও একসময় বিদায় নেন। মোহন সেইখানে বসে বসেই সোমা-দিদির জীবনের ধাঁধার ছবিটিকে প্রায় সম্পূর্ণ করে আনে। সব প্রশ্নের উত্তর পায়, বাকি থাকে শুধু সোমাদিদি নিজে। হঠাৎ মনটা কেন জানি ভালো হয়ে যায়। সোমাদিদিকে খুঁজে বের করে এনে কাজে লাগাতে হবে। মোহন উঠে পড়ে ফিকে চাঁদের আলোয় বাগানে বেরিয়ে আসে। বসবার ঘর থেকে পিয়ানোর শব্দ কানে আসে, সেখানে গিয়ে জোটে।

সুন্দরী তরুণী গোলাপি রেশমি সাড়ি পরে পিয়ানো বাজাচ্ছে। মোহনকে দেখে শিবশঙ্কর এগিয়ে আসে—আসুন মিঃ চৌধুরী, আমার ফিয়াঁসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পিয়ানো থামিয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়, মুখখানি একটু রাঙা দেখায়। ছোট একটি নমস্কার করে।

বিমলাদেবীও উঠে আসেন। মিঃ চৌধুরীকে তোমার এন্‌গেজমেন্ট রিং দেখাবে না, মীরা? চাঁপাফুলের মতো আঙুলে একফোঁটা শিশিরের মতো জ্বলজ্বল করছে হীরের আংটি। মোহনেরো মনের মধ্যে কোমল একটা উষ্ণতা। সুখী হক এরা।

ভেবেছিল হয়তো অনিদ্রায় রাত কাটাবে। অনিদ্রা মোহনের যৌবনের সঙ্গী। ভাবে সোমাদিদিকে খুঁজে পেলে খুব খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। সোমাদিদি চলে গিয়ে অবধি যত নিদ্রাহীন রাত কেটেছে মোহনের সোমাদিদিকে পেলে তার ক্ষতিপূরণ করে নেবে। অনেক রাত জেগে নীতাকে একখানি চিঠি লিখল মোহন। সমস্ত দেহমনে কিসের একটা চাঞ্চল্য, হঠাৎ যেন কিসের ঘোর কেটেছে, দেখাশোনা সহজ হয়ে গিয়েছে, নীতাকে বুঝতেও কষ্ট হচ্ছে না। দুঃখ তো নীতাও কম পায়নি। চেয়ে চেয়ে না পাওয়ার দুঃখও তো খুব ছোট কথা নয়।

সিমলার ঠিকানা দিয়ে দেয় নীতাকে। সেখানে দুদিন থাকব, নীতা, এখানে শীত পড়েছে, দেখতে বড় সুন্দর হয়েছে। সোমাদিদির খোঁজ পেয়েছি, সে হয়তো সিমলা থেকে ষাট মাইল দূরে ভবানীগাঁও বলে একটা জায়গাতে আছে। এবার তাকে খুঁজে বের করবই। তুমি বেশি ভেবো না, নীতা। আমার হাতে পড়ে ভেবে ভেবেই তোমার জীবনটা কাটছে, এবার ফিরে গিয়ে তোমার ভাবনা খানিকটা কমাতে চেষ্টা করব।

শুয়ে শুয়ে ভাবে নীতা তো চায় না সোমাদিদিকে খুঁজে পাওয়া যাক। নীতা চায় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি-গাড়ি-সম্পত্তি। মোহনকে তার জ্যাঠামশায়ের উত্তরাধিকারী মনে করেই নীতা তাকে বিয়ে করেছিল। তবু মন খারাপ হয় না, হৃদয় ডানা ঝাপটায়, এইবার এইবার

পথের শেষের নিশানা পাওয়া গেছে। সিমলা থেকে যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। ওদিকে এত শিগগির বরফ পড়া শুরু হয় না। ঠিক খুঁজে বের করবে সোমাদিদিকে মোহন। তার বেশি ভাব্য যায় না। ভাববার মতো আছেই বা কি? বুক ভরে ওঠে মোহনের। হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রে বাইরে ঝড় ওঠে, সমস্ত সহরময় দুরন্ত হাওয়ার মাতামাতি। কিন্তু ঘরের মধ্যে কি নিরাপদ, কি নির্জন, কি শান্তি।

বারো

সিমলা পাহাড়ের চূড়োয় পুরোনো গ্র্যান্ড হোটেলের বাড়ি, অতদূর মোহনকে উঠতে হল না। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে ঠিকানা মিলিয়ে রাজারামের মার বাড়িখানি খুঁজে বের করতে খুব বেশি কষ্টও হল না। স্টেশনের উপরে ছোট রাস্তায় পাহাড়ের গা আঁকড়িয়ে ঝুলে রয়েছে গোলাপ লতায় ঢাকা পুরোনো একখানি বাড়ি, বাগানে তার ফরগেট-মি-নট, প্রিমরোজ, হাইড্রাঞ্জিয়া ফুলের গাছ, মাটির টবে মেড্‌ন্‌ হেয়ারের ঝাড়, নিচু পাঁচিলের উপরে হানি-সাক্‌ল লতা।

একেবারে অযত্নে পড়ে নেই বাগান, কারো স্নেহের হাত পড়েছে এখানে। দরজা জানলায় পর্দা লাগানো, বিকেলের পশ্চিমি রোদ এসে ঘর ভরে রেখেছে। দেখে মনটা কোমল হয়ে আসে।

মোহন ফটক খুলে বাড়িতে ঢুকল। পাহাড়ি কুলি বারান্দার কোণায় সুটকেস নামিয়ে, নিশ্চিন্ত ভাবে রোদে পা মেলে বসে পড়ল।

সদর দরজা খোলা, সোনালী রঙের নরম মোটা পর্দার সঙ্গে রেশমি দড়িতে বাঁধা গোরুর গলার ঘণ্টার মালা, এতটুকু হাতের ছোঁয়া লেগে ঠিনিনি-ঠিনিনি বেজে ওঠে। কে যেন রোদে ভরা পশ্চিমি ঘরে নড়ে-চড়ে ওঠে। আর অপেক্ষা করে না মোহন, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে।

সোমাদিদি। কালের চাকা যেন এই মুহূর্তটিতে পৌঁছে থেমে যায়। এই তো সোমাদিদি। ত্রিশ বছরের পথ পার হয়ে এই তো সোমাদিদির কাছে পৌঁছে গেছে মোহন। হাত কাঁপে মোহনের, পা কাঁপে, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, ঠোঁট মুখ সাদা হয়ে যায়। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

এক পা দুই পা করে সোমাদিদি কাছে আসে, ঈগল পাখির মতো চোখের দৃষ্টি এতটুকু ক্ষীণ হয় নি, কাছে এসে মোহনের দু হাতের কব্জি দুটি বজ্র মুষ্ঠিতে ধরে। একটু হাসে সোমাদিদি, একটু কাঁদে। কাউকে কারো পরিচয় দিতে হয় না। আঁচল দিয়ে মোহনের চোখের জল মুছিয়ে দেয় সোমাদিদি। ভালোবাসার চোখে সদাই জল কেন?

এই তো সেই চির চেনা স্পর্শ, সেই চির চেনা মুখখানি। সব সেই রকমই আছে, শুধু কানের কাছের চুলগুলোতে একটু পাক ধরেছে, চোখের কোলে একটু কালি পড়েছে। সোমাদিদি গয়নাগাঁটি কোনোদিনই পরত না, এবার শুধু শাড়ি ছেড়ে থান পরেছে।

মোহনকে কৌচে বসায় সোমাদিদি, নিজে পাশে বসে। এতক্ষণে কথা বলে মোহন, জ্যাঠামশাই—

আমি জানি—বাধা দিয়ে সোমাদিদি বলে, এখানে এসেই পুরোনো কাগজে দেখেছি। বল্‌ আমাকে সব কথা।

ত্রিশ বছর কিছু না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস, একটা অন্তরায়, একটা ব্যবধান, একটা

দুঃস্বপ্ন, এই শুরু হল এই শেষ হয়ে গেল। সব কথা বলে যায় মোহন। বাইরে কুলি রোদ পোয়ানো শেষ করে দরজায় এসে হাঁকডাক করে, সোমাদিদি তাকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে।

কিছু নয় ত্রিশ বছর। অনন্তকালের হিসাব থেকে বাদ দিলে কেউ লক্ষ্যও করবে না। কারো কথা বাদ দেয় না মোহন, জ্যাঠামশাই, পিসিমারা, বাড়িঘর, চাকরবাকর, নীতা, তারা, পার্থ, অনীকেন্দ্র, ইয়েন, সব কথা বলে।

বাইরে দিন তার ডানা গুটিয়ে প্রস্থান করে, রাত এসে আকাশ পৃথিবী জুড়ে বসে। শীতের রাত, চারদিক নীরব, থমথম করছে। আলো জেবলে দেয় সোমাদিদি। হিটার জেবলে দেয়। অবাক হয়ে যায় মোহন।

কোথায় পেলে পয়সাকড়ি? কি করে করলে এত সব?

হাসে সোমাদিদি, সারাজীবন কাজই করলাম রে, পয়সাকড়ি থাকবে না কিছু?

কিন্তু তুমি এখানে কেন? আমি যে ভবানীগাঁও যাব বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম।

কে তোকে বলেছে ভবানীগাঁওয়ের কথা? সুদক্ষিণাদের কথা বলে মোহন, সোনারাম, শিবশঙ্কর, বিমলাদেবী, শিবশঙ্করের ঠাকুমা সবার কথা বলে, কিছু বাদ দেয় না। আসবার সময় অনেক ভেবেছিল কতখানি বলবে আর কতখানি বাদ দেবে, নইলে সোমাদিদি মনে কষ্ট পাবে। এখন দেখে এ সোমাদিদি মনে কষ্ট পাওয়ার বাইরে, একে সব বলা যায়। দুঃখের দেউড়ি পার হয়ে এসেছে সোমাদিদি। শিবশঙ্করের বিয়ের কথাও বললে মোহন, সোমাদিদি কত খুসি হল। এক সময় উঠে, ষ্টোভ জেবলে দুধ গরম করল সোমাদিদি, ক্ষীরের মিষ্টি বের করল, ফল কেটে আনল, দুজনায় ভাগ করে খেল।

কাল আবার বাজার করব, মোহন। কতকাল কারো জন্যে রাঁধিনি, কাল তোকে রেঁধে খাওয়াব। এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন? আরেকটু খা, ছোটবেলায় ক্ষীর পেলে ছাড়তিস্ না। এইটুকু খেয়ে নে।

ভবানীগ্রাম থেকে মাসখানেক আগে নেমে এসেছে সোমাদিদি, শীত আর সহ্য হয় না। সেখানকার কাজও শেষ হয়ে গেছে; হাসপাতালে সরকারি ডাক্তার নার্স সব এসেছে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে কত পরিবর্তন দেখলাম ওখানে, পথঘাট, স্কুল, ডাকঘর।

ওখানকার কাজ শেষ করে এসেছ তো? এবার চল আমার সঙ্গে।

চমকে ওঠে সোমাদিদি। তাই কখনো হয়? ওদিকের সব কোনকালে চুকিয়েবুকিয়ে এসেছি, কি যে বলিস্, মোহন!

অন্যসময় মোহনের মুখে সহজে কথা জোগায় না, এখন সে মুখর হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক শেষ মানে অন্য কোথাও একটা নতুন আরম্ভ। সেখানে তোমার কাজ আছে।

কাজ? কি কাজ, মোহন?

যে কাজের জন্য সারাজীবন তুমি আমি অপেক্ষা করে আছি, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি অপেক্ষা করে আছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের ঠিক মাঝখানে যেমন একটি করে কাজ, একটা তাগাদা, একটা ঈহা।

মুখ তুলে চায় সোমাদিদি। দু'চোখ দিয়ে জল পড়ে।

জানি, মোহন, মা নেই যাদের তাদের কাজ। আজ মনটা ঠিক করতে দে। কাল আবার কথা বলব।

কাল আবার কি, কখন রাত বারোটা বেজে গেছে। উঠে পড়ে সোমাদিদি, কোথা

থেকে কম্বল বালিশ বের করে, পাশের ঘরে মোহনের বিছানা পাতে।

এ বাড়িতে সব ব্যবস্থা আছেরে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের ছুটি কাটানোর বাড়ি।

তোমর শাশুড়ির বাড়ি।

রাজারামের মার বাড়ি। কি জানিস্ মোহন, এই পাঁচ বছরে আমার ঘাড় থেকে একটা ভূত নেমে গেছে। যে চিন্তাকে আগে মনে ঠাঁই দিতাম না এখন সে কথা ভাবি। রাজারামের মাকে একবার দেখতে যাব।

আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকে মোহন, চোখে ঘুম আসে না, এই তো জীবনের শেষ জাগরণের রাত, একে শেষ পল অবধি ভোগ করতে চায় মোহন। নিস্তব্ধ তিমির রাত, যে রাতে একটা জীবন শেষ হয়ে, নতুন একটা জীবন আরম্ভ হল। সুখদুঃখেব অতীত এ রাত।

একে একে আকাশের তারা নেবে, ভোরের আলো দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় লাল রঙ লাগে, হিমশীতল নির্মেঘ নিখুঁত সকাল।

আজ যা অসম্ভব কাল তাও সম্ভব হতে পারে। চোখ বুজে ভাবে মোহন, আজ যদি নীতা একখানি চিঠি লেখে, আমি সব বুঝি, সব জানি, সোমাদিদিকে নিয়ে এসো। আজ দুঃখিনী নীতা যদি সুখী হয়, সারাজীবন যে নিবিড় করে দুঃখকে বুকে বেঁধে রেখেছে, সে যদি হঠাৎ বাহুবন্ধন শিথিল করে, আজ খুঁজে পাওয়ার দিনে তাই যেন মনে হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে সোমাদিদি মনে মনে বলেছে, আজ পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেয়েছি, আজ শুভযাত্রা, সমস্ত অন্তর থেকে আজ সীমাকে যেন ছেড়ে দিতে পারি, ভগবান, সে সুখী হক, তার ভালো হক, আমি যেন তার কেশাগ্র ধরে তার মুক্তির পথে বাধা না দিই।

॥ সমাপ্ত ॥

ভারত-চীন সম্পর্ক : প্রাচীন যুগ

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষ সম্পর্কে চীনের সাম্প্রতিক আচরণ ও মনোভাব এদেশের জনসাধারণের মনে এত গভীর তিক্ততার সৃষ্টি করেছে যে অনেক ভারতবাসী বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, এসিয়ার দুটি প্রাচীনতম সভ্যতার পারস্পরিক সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন সম্পর্কে এ যাবৎ যা কিছু প্রচারিত হয়ে এসেছে, তার সবটুকুই ঐতিহাসিকগণের কল্পনাপ্রসূত কিনা। এই সংশয়ের নিরসন করা মুখ্যতঃ ঐতিহাসিকেরই কর্তব্য। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষভাবে সমস্যাটির বিচারপূর্বক বিভিন্ন যুগে ভারত-চীন সম্পর্কের ধারাবাহিক বিবরণসংগ্রহের মাধ্যমেই একমাত্র এই কাজ করা যেতে পারে। বর্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ভাবে প্রাচীনতম যুগ থেকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত উক্ত দুই সভ্যতার পারস্পরিক ভাববিনিময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা যাচ্ছে।

প্রাচীন যুগে ভারত ও চীন মহাদেশদ্বয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হত প্রধানতঃ চারটি পথের দ্বারা। এর মধ্যে তিনটি স্থলপথ, অবশিষ্টটি সমুদ্রপথ। প্রধান স্থলপথটি চীন দেশে দ্বিতীয় হান্ রাজবংশের শাসনকাল (২৫—২২০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে, যদিও এর পত্তন সম্ভবতঃ হয়েছিল প্রথম হান্ রাজবংশের আমলে (খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬—২৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এই পথটি মধ্য এসিয়ার ভিতর দিয়ে প্রসারিত ছিল। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল থেকে নির্গত হয়ে, কাবুলনদীর উপত্যকা ধরে, হিদ্দা ও জালালাবাদ (প্রাচীন নগরহার) অতিক্রম করে এই পথ উপনীত হয়েছিল সুপ্রসিদ্ধ বামিয়ান উপত্যকায়। সেখান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে এ পথ আসে অক্সাস্ উপত্যকার বাল্খ্ (সংস্কৃত বাহ্লিক, চীনা ফো-হো, ও গ্রীক্ বাক্ত্রিয়ানা) অঞ্চলে। বাল্খ্ থেকে দুটি পথ নির্গত হয়েছিল, একটির গন্তব্য মধ্য এসিয়া, অপরটির চীন। প্রধান চীনগামী মার্গটি তোখার বা তুষার দেশ উত্তীর্ণ হয়ে পামির উপত্যকার মধ্যদিয়ে কাশ্গরে আসে এবং এখান থেকে দুটি শাখাপথে বিভক্ত হয়। এর একটি তারিমবিধৌত অঞ্চলের দক্ষিণপ্রান্ত, অপরটি উত্তরপ্রান্ত ঘুরে গিয়েছিল। উত্তরবাহী মার্গটি মধ্য এসিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ কয়েকটি অঞ্চল, যেমন ইয়ারকন্দ্, খোটান, নিয়া, দন্দান-উইলিক, এন্দের, মিরান, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রসারিত ছিল। অনুরূপ ভাবে দক্ষিণ শাখাপথ ভারুক (চীনা পো-লু-কিয়া), কুচী (বর্তমান কুচার), অগ্নিদেশ (বর্তমান কারাশর), তুর্ফান্ (চীনা কাও-শাঙ্), প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে চীনের পশ্চিম সীমান্তে ইউ-মেন্-কুয়ান্ নামক স্থানে উত্তরমার্গটির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। চীনাসীমান্তের সুবিখ্যাত বৌদ্ধসংস্কৃতিকেন্দ্র তুন্-হুয়াঙ্ থেকে উক্ত স্থানটি বেশী দূরে ছিল না এবং সাধারণের নিকট তার পরিচয় ছিল চীনাসাম্রাজ্যে 'জেড্-নির্মিত প্রবেশদ্বার' (Jade Gate) নামে। অপর দুটি স্থলপথের মধ্যে একটি আসাম উত্তর ব্রহ্মদেশ ও য়ুনানের ও অন্যটি নেপাল ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে প্রসারিত ছিল। আসাম-ব্রহ্মদেশের মধ্যবাহী পথটির সুরু পাটনা (প্রাচীন পাটলিপুত্র) থেকে, এবং ক্রমশঃ ভাগলপুর (প্রাচীন চম্পা), রাজমহল (প্রাচীন কজঙ্গল) ও বাঙলাদেশের রাজশাহী বিভাগ (প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন) ধরে অগ্রসর হয়ে এটি পৌঁছেছিল আসাম উপত্যকায় বা প্রাচীন কামরূপে।

এখান থেকে এটি ত্রিধা-বিভক্ত হয় ও তিনটি শাখাই বিভিন্ন দিক দিয়ে এসে ব্রহ্মসীমান্তে ভামোতে মিলিত হয়। এই সন্ধিস্থল থেকে বিভিন্ন পাহাড়, পর্বত ও উপত্যকা পেরিয়ে এই পথ অবশেষে উপনীত হয় দক্ষিণ চীনের 'ইউ-নান্-ফু' বা কুন্-মিঙ্ সহরে। নেপাল-তিব্বতের অন্তঃপাতী মার্গটি প্রথম খোলে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে। এই সময়ে তিব্বতের অধিপতি স্রং-সান্-গাম্পো বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং চীন ও নেপালের দুটি রাজবংশের সঙ্গেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। সুতরাং ভারতের উত্তরপ্রান্তের সঙ্গে চীন-তিব্বতের সরকারী ও সংস্কৃতিগত যোগসূত্রের এখন থেকে আর কোনও বাধা রইল না। কিন্তু প্রাচীন চীনা সাহিত্যে এ পথের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, অন্যান্য পথগুলির ক্ষেত্রে যেমন যায়। সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন কাল হতেই ভারতীয় নাবিকগণ সমুদ্রপথে দক্ষিণ চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পূর্ব এসিয়ায় সমুদ্রবাণিজ্যের প্রসারের নিমিত্ত তাঁরা স্বভাবতঃ ব্যগ্র ছিলেন। এই বিষয়ক উদ্যমের ফলে বঙ্গোপসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী ভূভাগে ও দ্বীপপুঞ্জে কালক্রমে অগণিত ভারতীয় বা ভারতবর্ষ কর্তৃক প্রভাবিত উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে ফু-নান্, কম্বুজ, চম্পা, শ্রীবিজয় প্রভৃতি, ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী রাষ্ট্ররূপে প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সহস্র বৎসরেরও অধিককাল জলপথে এই দেশগুলির সঙ্গে ভারত ও চীনের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। সমুদ্রপথে দূরপ্রাচ্যে যাত্রার নিমিত্ত অনেকগুলি বন্দরের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ (বর্তমান ব্রোচ), সুর্পারক (বর্তমান সোপারা) ও কল্যাণ এবং পূর্ব উপকূলে কাবেরী নদীর মোহানায় অবস্থিত কাবেরীপত্তনম্ (পুহার), পশ্চিমবঙ্গোপকূলে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) প্রভৃতি, এসমূহের মধ্যে অন্যতম। মধ্যপথে চীনগামী নৌবহর যে সকল বাণিজ্যকেন্দ্র ও পোতাশ্রয় স্পর্শ করে যেত সে প্রসঙ্গে মালয় উপদ্বীপের তক্কোলু ও সিংহপুর (বর্তমান সিঙ্গাপুর) এবং আন্নামের পাণ্ডুরঙ্গ বিজয়পুর ও কৌঠার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত-চীন সমুদ্র-বাণিজ্যের প্রথম যুগে চীনদেশে সমাগত ভারতীয় পোত-সমূহ দক্ষিণ চীনের তং-কিন বা কিয়াও-চে বন্দরে এসে যাত্রা শেষ করত। কিন্তু সপ্তম শতাব্দী থেকে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং তং-কিনের স্থান ক্রমশঃ ক্যান্‌টন্ বন্দর অধিকার করে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ চীনে এটিই হয়েছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্ত-র্দেশীয় সমুদ্রবাণিজ্যকেন্দ্র।

পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতার সম্প্রসারণের ইতিহাসে সাধারণতঃ বাণিজ্যবিস্তার, খ্রীষ্ট-ধর্মপ্রচার ও সামরিক বিজয়, এই ত্রিবিধ উদ্যমকে যথাক্রমে ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন যুগে এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ ও জীবনচর্যার (যাকে এফ্. ডব্লু. টমাস সংক্ষেপে Indianism আখ্যা দিয়েছিলেন) প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সুনিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা চলে, এর জন্য কখনও তৃতীয় মাধ্যমটির প্রয়োজন হয় নি। এই শ্রেণীভুক্ত ভারতীয় উপনিবেশ বা ভারতপ্রভাবিত রাষ্ট্রসমূহ কোনভাবেই মাতৃভূমি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্রগত অর্থে মাতৃভূমির উপর নির্ভরশীল ছিল না। এগুলিকে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন, স্বাধীন ভারতসংস্কৃতির বিচ্ছুরণকেন্দ্র বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই 'ঔপনিবেশিক' রাষ্ট্রসমূহের ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দ ভারতভূমির পক্ষ থেকে স্থানীয় জনসাধারণকে নিপীড়ন বা শোষণ করেন নি। ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরা এদের সঙ্গে সামাজিক ভাবে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছিলেন।

সুতরাং ঐ সকল উপনিবেশের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য এসিয়ার সমস্ত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এই কথা স্মরণ করেই ফরাসী মনীষী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি প্রাচীন কালের ভারতবর্ষকে 'সভ্যতার বাণীবহ ভারত' (l' Inde civilisatrice) আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীন কালে ভারত-চীন-সম্পর্ক-গঠনের ইতিহাসে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া ও মধ্য এসিয়ার উক্ত ভারতীয় উপনিবেশ ও ভারত-প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বাণিজ্যসূত্র অবলম্বন করে ভারতবর্ষ ও চীন সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সর্বপ্রথম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। চীনে প্রথম হান্‌ বংশের রাজত্বকালে ১৩৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে চাং-খিয়েন্‌ নামক জনৈক চীনা রাষ্ট্রদূত পশ্চিম এসিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ হূন জাতির বিরুদ্ধে চীন সম্রাটের স্বপক্ষে পশ্চিম এসিয়ার ইউয়ে-চি, তোখার, সুগ্‌দ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্র একটি শক্তিজোট গড়ে তোলা যেতে পারে কিনা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার নিমিত্ত চীন সম্রাট তাঁকে পাঠান। তিনি পরে চীনা রাজসভায় তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতালব্ধ যে বিবরণ পেশ করেন, তাতে আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের মাধ্যমে ভারত-চীনের তদানীন্তন ব্যবসায়গত যোগাযোগের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে (খ্রীঃ পূঃ ২২১—২০৬) চীনদেশে 'সিন্‌' (Ts'in) রাজ-বংশ রাজত্ব করেন। দেশবাচক 'চীন' নামটি এই 'সিন্‌' নামের ভারতীয় অপভ্রংশ। মহাভারতে 'চীন' (চীনদেশের অধিবাসী অর্থে) নামটি সুপরিচিত। সম্ভবতঃ চাং-খিয়েনের বর্ণনার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে হান্‌ বংশীয় সম্রাটগণ এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে চীনা বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত নূতন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। শেষপর্যন্ত এই নব বাণিজ্যনীতিরই ফলে মধ্য এসিয়ার স্থলপথ ধরে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে রাষ্ট্রসমর্থিত প্রত্যক্ষ-সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম লিয়াঙ্‌ রাজবংশের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৩১৭—৭৬) চীনরাষ্ট্রের প্রতীচ্য বাণিজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ করে এবং চীনের রাজধানীতে তুর্কী এবং ভারতীয় বণিকগণ কর্তৃক অধ্যুষিত এক একটি স্বতন্ত্র এলাকা পর্যন্ত গড়ে উঠতে দেখা যায়। এইভাবে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে পশ্চিমে মধ্য এসিয়ার সূত্রে ও দক্ষিণে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ও চীন পরস্পরের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সেই সঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে এই দুই মহাদেশের মধ্যে সমুদ্রপথেও বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল এবং মোটামুটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

দুই দেশের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির ব্যাপারে বাণিজ্য অন্যতম সূত্ররূপে স্বয়ং কার্যকরী হয়েছিল, তদুপরি চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশের ভূমিকাটিও বহুল-পরিমাণে বাণিজ্যকে অবলম্বন করেই প্রস্তুত হয়েছিল। জাতক ও অবদান কাহিনী সমূহের পাঠক মাত্রেই জানেন, ভারতীয় বৈশ্য, বিশেষতঃ বণিক সম্প্রদায়ের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আদৌ কত গভীর। এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মবিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে এই কাজে বিদেশগামী ভারতীয় বণিকসমাজ চিরকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধভিক্ষুগণের সহযোগিতা করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চীনদেশে প্রথম লিয়াঙ্‌ বংশের রাজত্বকালে বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে দৃঢ় প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে বৌদ্ধ-বিহার ও সংঘারাম সকল নির্মিত হত এবং এই গৃহগুলি এত সুরক্ষিত হওয়াতে স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়িগণ কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে তাঁদের অর্থ উক্ত বিহারসমূহে

গচ্ছিত রাখতেন। পণ্যদ্রব্য জমা রাখবার জন্য বণিকগণ কর্তৃক বৌদ্ধবিহারের শরণাপন্ন হওয়ার নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। যখন কোনও বৌদ্ধ বিহারের চতুর্দিকে বাণিজ্যকেন্দ্র-বিশেষ গড়ে উঠেছে, সে সময়ে স্থানীয় বণিকগণ উক্ত বিহারকে সাময়িক আবাসগৃহরূপে ব্যবহার করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এইভাবে চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ধর্ম ও বাণিজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা ঘটেছে।

অবশ্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাক্যমুনি বুদ্ধের ধর্ম চীনদেশে ভারতসংস্কৃতির প্রভাববিস্তারের বৃহত্তম অবলম্বন ছিল, এ কথা ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব ও এর শাস্ত্র চীনদেশে নীত হয়েছিল তিন শ্রেণীর প্রচারকের দ্বারা। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার ভারতসংস্কৃতিকেন্দ্রগুলি থেকে চীনদেশে সমাগত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শাস্ত্রবিদ্ এবং ভারতপ্রত্যাগত চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পর্যটক। ভারতবর্ষ ও এসিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে সকল বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ ও প্রচারক এই দশ শতাব্দী কালের মধ্যে চীনদেশে গমন করেন তাঁদের কালানুক্রমিক ভাবে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) গুপ্তযুগের পূর্ববর্তী দল যারা খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের বাণী চীনদেশে বহন করে নিয়ে যান; (২) গুপ্তযুগের সুপণ্ডিত ও গভীর শাস্ত্রব্যুৎপত্তিসম্পন্ন প্রচারক-বর্গ যাঁদের কাল হল মোটামুটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতক; (৩) গুপ্তোত্তর কালের প্রচারকদল (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ হতে একাদশ শতক)। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে অবশ্য কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্যসম্রাট অশোক সতেরো জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চীনদেশে প্রেরণ করেন বা এরই অল্পকাল পরে কোনও চীনা সেনাপতি হূনদেশ থেকে বুদ্ধের এক স্বর্ণমূর্তি স্বদেশে আনয়ন করেন। কিন্তু যথোচিত ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে এ সকল কাহিনীকে আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরবার উপায় নেই।

যতদূর জানা যায় সর্বপ্রথম ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামক দুই ভারতীয় ভিক্ষু অনেকগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনদেশে যান। এঁরা অক্সাস্ নদীর উপত্যকায় অবস্থিত তৎকালীন কুষাণরাজগণের রাজধানী থেকে যাত্রা করেছিলেন এবং চীনের তদানীন্তন রাজধানী লো-ইয়াঙ্ নগরীতে চীনসম্রাট ও তাঁর অভিজাত পারিষদবর্গকর্তৃক যথেষ্ট সমাদর ও সম্ভ্রমসহকারে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। চীন রাজধানীতে 'পো-মা-সে' বা 'শ্বেতাশ্ববিহার' নামক প্রথম বৌদ্ধ বিহার এই সময়ে নির্মিত হয় এবং ভিক্ষুদ্বয় আনীত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও চীনাভাষায় অনূদিত হয়। এইভাবে দুই জন ভারতীয় ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় চীনদেশে বৌদ্ধধর্মবিস্তারের সূচনা হলেও গুপ্তপূর্ব যুগে এ বিষয়ে প্রধানতঃ উদ্যোগী হয়েছিলেন মধ্য এসিয়ার তদানীন্তন ভারতসংস্কৃতিপরি-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত পার্থিয়া, ইউয়ে-চি, সুগ্দ, কুচী, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধভিক্ষু-সম্প্রদায়। পারথিয় বা পারসীক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন আর্সাকিদীয় রাজবংশের সন্ন্যাসী রাজপুত্র লোকোত্তম যাঁর চীনা নাম ছিল আন্-শে-কাও। ইনি চীনদেশে এসে শ্বেতাশ্ববিহারে বাস করেন এবং সর্বসমেত ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রায় ১৭৯ খানি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গের পূর্বতন প্রচেষ্টার কথা মনে রেখেও আন্-শে-কাও বা লোকোত্তমকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। চীনা বৌদ্ধ জগতে তাঁর প্রভাব ও সম্মান বিপুল। এই প্রসঙ্গে পারসীক বৌদ্ধ উপাসক আন্-হিউয়ান্, তোখারদেশীয় ভিক্ষু লোকক্ষেম, সুগ্দ-

দেশীয় ভিক্ষুত্রয় থাং-কিউ, থাং-মোং-সিয়াং ও থাং-সেং-হুই (বা সংঘভদ্র) এবং ইউয়ে-চি জাতীয় ভিক্ষু ধর্মরক্ষের নামও শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হবার যোগ্য। এঁদের প্রচেষ্টায় সমগ্র চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের বার্তা প্রচারিত হয়। সুগ্‌দদেশীয় সংঘভদ্র দক্ষিণ চীনে পর্যন্ত প্রচারকার্য নির্বাহ করেন। এঁরা বহু বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রধানতঃ এঁদের নিষ্ঠা, আদর্শবাদ ও পরিশ্রমের ফলে চীনদেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি -সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মবিষয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং চীনা বৌদ্ধভিক্ষুগণের মনে ভারত পরিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ জীবনদর্শনকে গ্রহণ করবার উপ-যোগী করে চীনের চিত্তকে প্রস্তুত করবার কাজে এই পর্বের প্রচারকবৃন্দের অবদান অসামান্য।

প্রস্তুতিপর্বের উদ্যমের ফল ফলতে দেরী হয়নি। শীঘ্রই দেখা গেল চীনা বৌদ্ধ-সমাজ বিদেশী অভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু ও উপাসকগণের সংস্পর্শ ও শিক্ষায় আর আশানু-রূপ তৃপ্তি লাভ করছেন না। ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য চীনা বৌদ্ধগণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অপরপক্ষে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে চীনদেশীয় শ্রমণ ফা-হিয়েনের ভারতযাত্রা ও কয়েক বৎসরকাল তাঁর ভারতের নানা বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন, ভারতীয় বৌদ্ধমহলেও চীনদেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলেছিল। ফলস্বরূপ পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গুপ্তরাজগণের শাসনকালে পশ্চিমে মধ্য এসিয়ার পথে ও পূর্বপ্রান্তে জলপথে দলে দলে ভারতীয় ভিক্ষু চীনদেশে উপনীত হতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে সর্বাধিক উদ্যোগী ছিলেন কাশ্মীর দেশের শ্রমণগণ। এঁদের মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে সংঘভূতি, গৌতম সংঘদেব, বিমলাক্ষ, বুদ্ধভদ্র, ধর্মযশস্‌, পুণ্যত্রাত এবং গুণবর্মন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বের প্রসিদ্ধতম ভারতীয় শ্রমণ অবশ্য হচ্ছেন কুমারজীব। এঁর পিতা কাশ্মীরের অধিবাসী, মাতা মধ্য এসিয়ার কুচী দেশের কন্যা। এই বৌদ্ধাচার্য-গণের মাধ্যমে মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মের সর্বাস্তিবাদশাখার ঐতিহ্য ও শাস্ত্র চীনদেশে নীত হয়। পূর্বে যে পদ্ধতিতে ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাদির চীনাভাষায় অনুবাদ করা হত, এঁদের আমলে সে পুরাতন প্রণালী পরিত্যক্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট নূতন পদ্ধতিতে উক্ত অনুবাদ-কার্য পুনরায় আরম্ভ হয়।

গুপ্তোত্তর যুগে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে একাদশ শতাব্দীযাবৎ বৌদ্ধধর্মসূত্রে ভারত ও চীনের পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধন পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বের কাশ্মীরদেশীয় শ্রমণগণের অক্লান্ত ধর্মপ্রচার ও শাস্ত্রগ্রন্থানুবাদ ও চীনা শ্রমণগণের সাগ্রহ 'পশ্চিমের স্বর্গ' বা ভারতবর্ষ পরিদর্শন, দুটি মহাদেশকে পরস্পরের মনোরাজ্য আবিস্কারে ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় উৎসাহী করে তুলেছিল এবং তার ফলে আলোচ্য তৃতীয় পর্বে এই ক্ষেত্রে আমরা গভীরতর ও পূর্ণতর চিন্তা এবং কর্মপ্রচেষ্টার সন্ধান পাই। এই যুগে যে সকল ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্য চীনদেশে গমন করেন তাঁদের মধ্যে বারানসীর গৌতম প্রজ্ঞারুচি, উজ্জয়িনীনিবাসী উপশূন্য এবং পরমার্থ, উড্ডিয়ান (সোয়াত-উপত্যকা) অঞ্চলের বিমোক্ষসেন, পুরুষপুর (পেশোয়ার) নিবাসী জিনগুপ্ত, লাট (গুজরাট) নিবাসী ধর্মগুপ্ত, পূর্বভারতের (সম্ভবতঃ বাঙ্‌লা-আসাম অঞ্চলের) অধিবাসী জ্ঞানভদ্র, জিনযশস্‌ ও যশো-গুপ্ত, নালন্দার প্রভাকরমিত্র ও শুভাকর সিংহ, দক্ষিণভারতের বোধিরুচি, মধ্যদেশের বজ্রবোধি এবং তদীয় শিষ্য সিংহলনিবাসী অমোঘবজ্র, প্রধান। ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানে, চরিত্রে, সাধনায় সমুন্নত যে বৌদ্ধ শ্রমণের দল চীনদেশে গিয়েছিলেন সে ধারার শেষ উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্ক শেষোক্ত সিংহলী ভিক্ষু (তাঁর শিক্ষা ও সাধনার ভূমি ছিল ভারতবর্ষ,) অমোঘ-বজ্র। ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পর থেকে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারত-চীন যোগাযোগের সূত্রটি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। চীনদেশের অনিশ্চিত রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির পারস্পরিক কলহ, বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মান অবস্থা ও বৌদ্ধসংঘের উত্তরোত্তর অবনতি, প্রভৃতি, বহু কারণে এই অবস্থান্তরের উদ্ভব হয়। ভারতীয় ভিক্ষুগণের চীনগমন অবশ্য তখনই বন্ধ হয়নি। কিন্তু নবম, দশম ও একাদশ শতকে যে সকল শ্রমণ চীনদেশে উপস্থিত হন তাঁরা প্রতিভায় ও চরিত্রে পূর্বাচার্যগণ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ এবং তাঁদের কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদসমূহ অকিঞ্চিৎকর এবং বহুস্থলে নির্ভরের অযোগ্য।

খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে একাদশ শতক অবধি ভারত ও এসিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের চীনযাত্রার যে নিরবচ্ছিন্ন স্রোত চলেছিল তার প্রেরণায় এবং বহুলাংশে তার বিনিময়ে এই দশশতাব্দী কালের মধ্যে বহু চীনা ভিক্ষু, উপাসক এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিছু চীনা রাজপুরুষ ভারতবর্ষ পর্যটন করেন। বুদ্ধের মাতৃভূমি ও বৌদ্ধ-ধর্মের উৎপত্তিস্থলরূপে ভারত চীনা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছিল। সর্বপ্রথম আসেন বিংশতিসংখ্যক শ্রমণের একটি দল। এঁরা এসেছিলেন খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে পূর্বপ্রান্তের যুনান-ব্রহ্মদেশের পথ ধরে। কথিত আছে শ্রীগুপ্ত নামক জনৈক ভারতীয় নরপতি এঁদের জন্য বুদ্ধগয়াতে চীন-সংঘারাম নামক একটি বিহার নির্মাণ করে দেন। কিন্তু এ বিষয়ে নবোৎসাহ ও নবোদ্যমের সৃষ্টি করেন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের চীনা ভিক্ষু তাও-আন্। চীনের লো-ইয়াং নগরীতে ইনি বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন এবং তাঁর সমকালীন চীনা ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থসমূহের উপর সুনিপুণ টীকা রচনা করেছিলেন। শাস্ত্রশিক্ষা ও স্বরচিত শাস্ত্রব্যাখ্যার দ্বারা তিনি চীনা বৌদ্ধমহলে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করলেন এবং চীনা ভিক্ষুদের পক্ষে ভারত ভ্রমণপূর্বক বৌদ্ধতীর্থ-সমূহ দর্শন, ভারতে সংস্কৃতশিক্ষাপূর্বক মূল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলির পুঁথি সংগ্রহের একান্ত উপযোগিতার কথা তাঁদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলেন। ৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও প্রেরণা ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিছুকাল পরেই বহু চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিদ্যার্থী তীর্থদর্শন, শাস্ত্রশিক্ষা ও পুঁথিসংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথের সমস্ত বিঘ্ন তুচ্ছ করে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের আরম্ভে এরূপ দুটি দলের ভারত-আগমনের দ্বারা এই প্রচেষ্টা সুরু হয়। এর মধ্যে প্রথম গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ছিলেন বিখ্যাত ফা-হিয়েন্। তাঁর অন্য চার জন সঙ্গী যথাক্রমে হুই-সিঙ্, তাও-সিঙ্, হুই-ইঙ্ এবং হুই-ওয়েই; দ্বিতীয় দলটি ছে-ইয়েন্, হুই-ইয়েন্, সেঙ্-সাও, পাও-ইউন্ ও সেঙ্-চিঙ্‌কে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পঞ্চম শতকে পরবর্তী কালে ও ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে আসেন ভিক্ষুগণের আর একটি দল,—চে মোঙ্, ফা-ইয়ং, তাও-পু, ফা-শেঙ্, ফা-ওয়েই, তাও-ইয়ো, তাও-তাই এবং সর্বশেষে জনৈক ভিক্ষু সমেত চীনা রাজদূত সোঙ্-ইউন্। রাজপ্রতিনিধির আগমনের উদ্দেশ্য ছিল চীনসম্রাটের পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থে পূজা দেওয়া। এর পর চীনদেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য কিছুদিন চীনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিদলের আগমনের স্রোত মন্দীভূত থাকে। সুই রাজবংশ চীনের সিংহাসনাধিরূঢ় হলে চীনাদের তীর্থযাত্রা পুনরায় পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়। সপ্তম শতকের প্রথমভাগে সম্রাট ইয়েঙ্ এর প্রতিনিধিরূপে ওয়েই-চি ও তু-হিঙ্-

মান্ নামক দুইজন রাজপুরুষ ভারতবর্ষে আসেন। অবশ্য পরবর্তী থাং বংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বকালেই (রাজ্যারম্ভ বৎসর ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ) আমরা ভারতে চীনা তীর্থযাত্রার পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে থাং বংশীয়গণের রাজ্যারম্ভের পর হতে ভারতে যে সংখ্যক চীনা বৌদ্ধভিক্ষু ও চীনা রাজপুরুষের আগমন হয়, এমন আর কোনও সময়ে দেখা যায় নি। এই যুগে চীন থেকে যে সকল বৌদ্ধাচার্য ভারতে এসেছিলেন, বিদ্যাবত্তা ও মনীষায় এঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ, বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ব্যতীত হিন্দু দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনাতেও এঁদের অসামান্য উৎসাহ ও নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। এঁদের মধ্যে হিউয়ান্-সাঙ্ (ভারতভ্রমণকাল ৬২৯ থেকে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেছিলেন ই-ৎসিঙ্ এবং অপর ষাটজন ভিক্ষু। শেষোক্তদের মধ্যে হিউয়ান্-চাও ভারতবর্ষেই দেহত্যাগ করেন। কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের রাজসভায় প্রেরিত চীনসম্রাটের প্রতিনিধিদ্বয় লি-ই-পিয়াও এবং ওয়াং-হিউয়ান্-সে হিউয়ান্-সাঙ্ দেশে ফিরবার পরে ভারতে আসেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাঁরা রাজগৃহ, গৃধ্রকূট, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করেছিলেন ও মহাবোধি মন্দিরে চীন-সম্রাটের পক্ষ হতে পূজা দিয়েছিলেন। থাং রাজবংশ দশম শতকের আরম্ভকাল পর্যন্ত চীনের সিংহাসনে ছিলেন। এঁদের রাজত্বকালের শেষ উল্লেখযোগ্য চীনা বৌদ্ধ পর্যটক হলেন উ-খোঙ্। ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। পরবর্তী সুং বংশীয়গণের রাজত্বকালে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে যে সকল বৌদ্ধ তীর্থ-যাত্রী চীন থেকে এদেশে এসেছিলেন পূর্ববর্তিগণের তুলনায় তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ছিল নিকৃষ্ট স্তরের। বৌদ্ধ সাহিত্যে বা দর্শনে তাঁদের বিশেষ অনুরাগ বা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ছিল বলে মনে হয় না। এই ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য পর্যটক হুই-ওয়েন্। ইনি ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পরবর্তী কালে ভারতে চীনা বৌদ্ধ পর্যটকগণের আগমন ক্রমশঃ বিরল হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ স্থগিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ভারত-চীন সহযোগিতার শ্রেষ্ঠ ফল, তিন সহস্রেরও অধিক ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ। হীনযান, মহাযান ও তন্ত্রযান বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনেক মহামূল্যবান গ্রন্থের মূল ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এদের বিষয়বস্তুর পরিচয় পেতে হলে বর্তমানে চীনা অনুবাদের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, লুই দ্য লা ভালে পুস্যাঁ, সের্‌বাট্‌স্কি প্রমুখ আধুনিক কালের পাশ্চাত্য বুধমন্ডলী কর্তৃক উদ্‌ভাবিত প্রণালীর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে চীনা অনুবাদের সহায়তায় মূল সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধারও সম্ভবপর হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন চীনা অনুবাদ সকল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল,—কুমারজীব, বুদ্ধভদ্র, জিনগুপ্ত প্রভৃতি, চীনা ভাষা-বিদ্ ভারতীয় ভিক্ষু, বা ফা-হিয়েন্, হিউয়ান-সাঙ্ বা ই-ৎসিঙের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ চীনদেশীয় শ্রমণগণ কর্তৃক কৃত। আবার দ্রুত কার্যসিদ্ধির জন্য অনেক সময়ে অনুবাদক-মণ্ডলী নিযুক্ত হতেন। প্রধান অনুবাদক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আবৃত্তি করে যেতেন। কোনও ভারতীয়, মধ্যএসিয়াবাসী বা চীনা দোভাষী সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মৌখিক অনুবাদ করে যেতেন। কোনও সুপণ্ডিত চীনা কর্তৃক এই অনুবাদ লিখিত হত। মণ্ডলীভুক্ত চতুর্থ ব্যক্তি এই প্রাথমিক খসড়াগুলি সংশোধন করবার পর অনুবাদকার্য সমাপ্ত হত। চীনা অনুবাদে যে বিপুল পরিমাণ বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে পরিচয় ব্যতীত আমাদের বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞানকে কিছুতেই সম্পূর্ণ গণ্য করা যাবে না। কিছু কিছু

চীনা পর্যটক তাঁদের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রগণের নিকট সেগুলির গুরুত্ববিষয়ে নূতন করে বলবার কিছু নেই। এঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন্, হিউয়ান্ সাঙ্ ও ই-ৎসিঙের নাম সর্বাধিক পরিচিত। ক্ষুদ্রতর ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত আরও কতগুলি বিবরণ আছে। স্বভাবতঃ সে সকলের ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। এই ভ্রমণবিবরণগুলি যে মাত্র সমসাময়িক ভারতবর্ষের অবস্থার উপর আলোকপাত করে তা নয়, এগুলি পাঠ করলে বৌদ্ধ চীন যে বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে কতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখত তাও সুন্দররূপে বুঝতে পারা যায়।

ভারতীয় শ্রমণগণের শিক্ষা ও চীনা ভিক্ষুগণের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে জনপ্রিয় ধর্মরূপে চীনদেশে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চীনা দেশে উদ্ভূত কন্‌ফুসীয় এবং তাও ধর্মদ্বয় সম্পূর্ণভাবে চীনা জনসাধারণের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করতে সক্ষম হয় নি। কন্‌ফুসীয় ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল পিতৃপুরুষ ও সম্রাটকেন্দ্রিক সনাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংরক্ষণ। এর মধ্যে নীতি বা লোকব্যবহার উচ্চ মর্যাদা পেলেও আধ্যাত্মিকতার স্থান ছিল না। তাও ধর্মকে মস্‌পেরো প্রাচীন চীনা দর্শনপ্রস্থানসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণতম ও সর্বাধিক সুসমঞ্জস বলে বর্ণনা করেছেন (le plus complet et le plus cohérent de tous les systèmes de philosophie chinoise antique) প্রাচীন চীনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আধ্যাত্মিকতাবর্জিত নীতিমাত্রসার সমষ্টিগত কন্‌ফুসীয় ধর্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এর উদ্ভব। ব্যক্তিগত মরমীয়তার উপর এ ধর্মে খুব বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং সেই কারণেই প্রাচীন চীনে ব্যক্তিগত মোক্ষসাধনার ধর্মরূপে তাও মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ সমাজ বা সম্প্রদায়কে নিবিড় মৈত্রী ও আধ্যাত্মিকতার সূত্রে বাঁধবার ক্ষমতা এই দুই মতবাদের একটিরও ছিল না। এই ক্ষেত্রেই বৌদ্ধধর্ম চীনকে নূতন পথের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে চীনা বুদ্ধিজীবী মউ-ৎসিউ বলেছিলেন, 'শ্রমণগণ মোক্ষমার্গ (way) এবং শীলের (virtue) সাধনা করেন; তাঁরা পার্থিব সুখবিলাসের পরিবর্তে জীবনে এইগুলিরই প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইন্দ্রিয়সুখ বর্জনপূর্বক তাঁরা পবিত্রতা ও প্রজ্ঞার প্রতি আগ্রহবান। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে?' উই রাজবংশ (৩৮৬—৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বপর্যন্ত বৌদ্ধ মতবাদ চীন দেশে 'বিদেশী ধর্ম' রূপেই গণ্য হত। উই বংশীয় নরপতিগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁদেরই যত্নে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম চীনের অন্যতম জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়। এই বংশের শাসনকালে চাঙ্-আন্ ও লো-ইয়াঙ্‌এ সাতচল্লিশটি বৌদ্ধবিহার এবং উত্তর চীনে তুন্-হুয়াঙের সুপ্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। সমগ্র চীনদেশে ৮৩৯টি বৌদ্ধমন্দির ও ত্রিশসহস্র স্তূপ গড়ে ওঠে এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর সংখ্যা দাঁড়ায় কুড়ি লক্ষ। পরবর্তী কালে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যে চীনে বৌদ্ধধর্মের সাতটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যাচ্ছে: (১) শ্বেতপদ্ম বা লু-শান্ সম্প্রদায়; এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুই-ইউয়ান্। অমিতাভ বুদ্ধের উপাসনা এ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল; (২) ধ্যান সম্প্রদায়; ভারতীয় ভিক্ষু বোধিধর্ম এর প্রতিষ্ঠা করেন। চীনদেশে এই সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। এখন পর্যন্ত জাপানে 'জেন্' নামে এর অস্তিত্ব আছে; (৩) থিয়েন্-থাই সম্প্রদায়; চি-খাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত; সমকালীন বৌদ্ধধর্মের সকল শাখার মধ্যে সমন্বয়-সাধন করাই এর উদ্দেশ্য ছিল; (৪) ফা-সিয়াঙ্ বা ধর্মলক্ষণ সম্প্রদায়; ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য

অসঙ্গ ও বসুবন্ধু কর্তৃক ব্যাখ্যাত যোগাচার দর্শন ও সাধনমার্গের উপর এর ভিত্তি। সুবিখ্যাত হিউয়ান-সাঙ্ ও তদীয় শিষ্য কুই-চির উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল; (৫) 'কিউ-শি' বা 'কোষ' সম্প্রদায়; বসুবন্ধু কর্তৃক তাঁর সুবিখ্যাত দর্শন-গ্রন্থ "অভিধর্মকোষে" ব্যাখ্যাত মতবাদের উপর এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা। হিউয়ান্-সাঙ্ "অভিধর্মকোষ" গ্রন্থখানি সংস্কৃত থেকে চীনাভাষায় অনুবাদ করেন; (৬) 'লিউ' বা 'বিনয়' সম্প্রদায়; হিউয়ান-সাঙের শিষ্য তাও-সিউয়ান্ এর প্রবর্তক। ধর্মগুপ্তক শাখার বিনয়-পিটক অনুযায়ী আদর্শ আচারনিষ্ঠ জীবনগঠন করবার উপর এঁরা ঝোঁক দিতেন; (৭) তান্ত্রিক সম্প্রদায়; ভারতীয় ভিক্ষু বজ্রবোধি ও তদীয় শিষ্য অমোঘবজ্র কর্তৃক এই মত চীনদেশে প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক অবধি চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের দ্রুত বিস্তার, বিচিত্র বিকাশ ও গভীর প্রভাব আমাদের অতিমাত্রায় বিস্মিত করে। জোসেফ নীড্হাম্ চীনা সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে প্রায় কোনখানেই ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। তিনিও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম 'introduced that element of universal compassion which neither Taoism nor Confucianism rooted as they were in family-ridden Chinese society, could produce' (*Science and Civilisation in China* Vol. II p. 431)।

ধর্ম, দর্শন, সাধনপদ্ধতি ও লোকশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সূত্র অবলম্বন করে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য বৈশিষ্ট্যসমূহও ক্রমে চীনদেশে সঞ্চারিত হয়। চীনা শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাবে। ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য নানা দিক দিয়ে চীনা শিল্পে নূতন প্রেরণা ও প্রভাব এনেছিল। চীনা শিল্পের এই নবপর্বে চীনের নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসৃত হতে দেখা যায় না। মূল ভারতীয় উপাদান ও মধ্য এসিয়াতে সৃষ্ট ভারত-চীন মিশ্র উপাদান একত্র সমন্বিত হয়ে চীনের নিজস্ব অসামান্য শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই তিন ধারার সম্মিলনে চীনা শিল্পের ইতিহাসে নবাধ্যায় রচিত হয়েছিল। চীনদেশে বৌদ্ধশিল্পের তিনটি প্রধান কেন্দ্র যুন্-কাঙ্, লোঙ্-মেন্ ও তুন্-হুয়াঙ্। ৪১৪ থেকে ৫২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তুন্-হুয়াঙের গুহাগুলি নির্মিত হয় মধ্য এসিয়ার ভিক্ষু তান্-ইয়োর তত্ত্বাবধানে। দশটি বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতিটি গিরিগুহা চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত হল এবং সর্বসমেত এক হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হওয়ায় এই গুহাগুলি 'সহস্র বুদ্ধের গিরিগুহা' নামে পরিচিত হল। এখানকার ভাস্কর্যের বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় শিল্পের গান্ধার, মথুরা ও গুপ্ত রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীর চিত্রে ভারতীয় ও পারসীক প্রভাবের সমন্বয় বিশেষজ্ঞগণ আবিস্কার করেছেন। কতগুলি চিত্রের সঙ্গে অজন্তা চিত্রের বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। লোঙ-মেন্এ-ও অনুরূপ গিরিগুহা, বুদ্ধ, আনন্দ, কাশ্যপ ও দুইজন বোধিসত্ত্বের পূর্ণাবয়ব মূর্তি ও প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভাস্কর্যসমূহের লালিত্য ও পারিপাট্য অনেকস্থলে আমাদের ভারতবর্ষের সারনাথ ও এলিফ্যাণ্টার ভাস্কর্যরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইউন্-কাঙের গুহা-মন্দিরের শিল্পে ও পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত বিরাট বুদ্ধমূর্তিসমূহে ভারতীয় ইন্দো-গ্রীক্ ও গুপ্ত পদ্ধতির প্রভাব দৃষ্ট হয়। উই বংশের শাসনকাল চীনদেশে বৌদ্ধশিল্পের স্বর্ণযুগ। থাং রাজবংশের সময় থেকে (৬১৮—৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ক্রমশঃ এই শিল্পের রূপান্তর ঘটতে

থাকে। উই বংশের রাজত্বকালেই চীনারা বিভিন্ন ভারতীয় শিল্পধারা অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। পরবর্তী কালে চীনের জাতীয় শিল্পপ্রতিভা ক্রমশঃ এই প্রভাবকে নিজস্ব করে প্রাচীন জাতীয় শিল্পধারার সঙ্গে তাকে সমন্বিত করে নেয়। এর ফলে থাং যুগে যে উন্নত শিল্পসৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে ভারতীয় প্রভাব পূর্বের ন্যায় সুপরিস্ফুট নয়। চীনের নিজস্ব প্রাচীন শিল্পের ঐতিহ্য ভারতীয়, পারসীক প্রভৃতি বহু ধারার সংস্রবে পুষ্ট হয়ে এ পর্বের শিল্পে পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতপ্রভাবিত চীনা শিল্পের বিকাশের ইতিহাসে ভিক্ষুশিল্পী তান্-ইয়ো, শাক্যবুদ্ধ, বুদ্ধকীর্তি, কুমারবোধি এবং নেপালী শিল্পাচার্য অ-নি-কোর বিরাট ব্যক্তিগত কৃতিত্ব স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে হিউয়ান্-সাঙ্, ফা-হিয়েন্, হুই-লুন্, ওয়াং-হিউয়ান্-সে প্রভৃতি ভারত-প্রত্যাগত চীনা শ্রমণ ও রাজপুরুষগণের কীর্তিও নগণ্য নয়। এঁরা ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধমূর্তির মাপ, রেখা-চিত্র এবং ভাস্কর্য ও মন্দিরের নমুনা সংগ্রহ করে স্বদেশে নিয়ে যান। এই ভাবে ভারতীয় মূর্তিশাস্ত্রের ও স্থাপত্যবিদ্যার মূল সূত্রগুলি ক্রমশঃ চীনদেশে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। সুতরাং, তত্ত্ব ও প্রয়োগবিদ্যা, উভয়তঃ ভারতবর্ষের বৌদ্ধ শিল্প যে চীনের জাতীয় শিল্পকে উল্লেখযোগ্যরূপে প্রভাবিত করে চীনা শিল্পের ইতিহাসে নবপর্বরচনায় সহায়ক হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে চীন দেশে যে স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠেছিল তাও ভারতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। য়ুন্-কাঙ্, লোঙ্-মেন ও তুন্-হুয়াঙের গিরিগুহাগুলি সর্বাংশে আমাদের প্রাচীন ভারতের গুহাস্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। তা ভিন্ন বহুতলবিশিষ্ট প্যাগোডা-রীতির মন্দিরগুলির উৎপত্তি সম্পর্কেও একটি বিশিষ্ট মত এই যে, ভারতবর্ষই এই পদ্ধতির জন্মস্থল এবং এখান থেকেই এই রীতি চীন প্রভৃতি দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রসারলাভ করেছে। চীনদেশে এই পদ্ধতির প্রাচীনতম মন্দির নির্মিত হয়েছিল উই রাজবংশের শাসনকালে, ৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে। কুমারস্বামী কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নি। তাঁর নিজমতে প্যাগোডা রীতির অনুরূপ প্রাচীন স্থাপত্যশৈলী চীন দেশেই ছিল যদিও সেখানে এর ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রভাবমুক্ত নয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুরুষপুর বা পেশাওয়ারে কণিষ্ক কর্তৃক নির্মিত সুবিখ্যাত দারুময় নিদানসৌধ ভারতবর্ষে আগত চৈনিক পরিব্রাজকগণকে কী পরিমাণ মুগ্ধ করেছিল, তা তাঁদের বর্ণনাতেই প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখতে হবে, পরবর্তী যুগে সুঙ্-বংশীয়গণের রাজত্বকালে (৯৬০—১২৭৯) চীন দেশে একটি বিশেষ স্থাপত্যশৈলী 'ভারতীয় রীতি' নামে পরিচিত ছিল। শান্-সি প্রদেশে এই রীতির বহুল প্রচলন ছিল এ-কথাও জানতে পারা যায়।

প্রাচীন চীনা সাহিত্যে মধ্য এসিয়া ও দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় সংগীতের প্রসার সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। মধ্য এসিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলভুক্ত রাষ্ট্র কুচী বা কুচার দেশের মাধ্যমে ভারতীয় সংগীত প্রথম চীন দেশে নীত হয়। সুই ও থাং রাজবংশদ্বয়ের আমলে এই সংগীত চীনদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। থাং বংশের সরকারী ইতিবৃত্ত-সমূহে চীন সম্রাটের সভায় ভারতীয় সংগীতজ্ঞগণের জলসার উল্লেখ এবং তাঁদের পরিধেয় পোষাক ও ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত বাদ্যসমূহের মধ্যে ঘণ্টা (থং-কু), বিভিন্ন প্রকারের চর্মবাদ্য ('কি', 'মাও-ইউয়ান্' ও 'তু-থান্'), নলের বাঁশী (কি-লি), আড় বাঁশী (থাং-হু), পঞ্চতন্ত্রী বীণা (পি-পা), করতাল ও শঙ্খ প্রধান। ৫৬০ থেকে ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের

মধ্যে সুজীব নামক জনৈক ভারতীয় গুণী সংগীতজ্ঞ চীনা রাজসভায় এসেছিলেন। তিনি ভারতীয় সংগীতের স্বর-সপ্তকের সঙ্গে চীনাদের পরিচিত করান। এই সাতটি স্বরের নাম চীনা সাহিত্যে নিম্নলিখিত ভাবে রক্ষিত হয়েছে: (১) সো-তো-লি (২) কি-চে (৩) শা-জে (সংস্কৃত ষড়জ) (৪) শা-হু-কিয়া-লান (সংস্কৃত-সহগ্রাম) (৫) শা-লা (৬) পান্-চেন্ (সংস্কৃত-পঞ্চম) ও (৭) হু-লি-শে (সংস্কৃত-ঋষভ)। যে কটি নামের মূল সংস্কৃত উদ্ধার করা গিয়েছে তার থেকে স্বরগুলিকে চিনতে বিলম্ব হয় না। সুজীব ভারতীয় সংগীতের সপ্ত জাতির ব্যাখ্যাও চীন রাজসভায় করেছিলেন। ভারতীয় সংগীতে এই 'জাতি'গুলি পরবর্তী কালের "রাগ"-এর অগ্রদূত। বৃহদ্দেশী, সংগীত-রত্নাকর প্রভৃতি ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রের সুপরিচিত গ্রন্থানুযায়ী সাতটি শুদ্ধ স্বর হতেই তাদের উৎপত্তি। জাপানে প্রচলিত একটি প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে চীনদেশ থেকে জাপানে আগত বোধি নামক জনৈক ভারতীয় ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্ব ও বৈরো শীর্ষক দুটি বিশিষ্ট ভারতীয় সুর জাপানে প্রচলিত করেন। বোধিসত্ত্ব নামটির থেকে অনুমান হয় এটি বৌদ্ধভিক্ষু মহলে প্রচলিত কোনও প্রকার ধর্মসংগীতের সুর হওয়া সম্ভব। বৈরো সম্পর্কে জাপানী কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে এর স্রষ্টার নাম হান্‌রো-টোকু (চীনা ভাষায়—পান্-লাং-তো)। এই নামটি সংস্কৃত 'ভরত' নামেরই ভাষান্তর। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে ভরত ঋষি প্রসিদ্ধ। তাঁকেই সুতরাং "বৈরো" সুরের স্রষ্টা বলা হয়েছে। এই 'বৈরো' আমাদের সংগীতের সুপরিচিত "ভৈরব" (সংস্কৃত) বা 'ভঁয়রো' (প্রাকৃত) রাগের সঙ্গে সমার্থক হতে পারে কিনা তা জল্পনার বিষয়।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও বৌদ্ধেতর দর্শনপ্রস্থানসমূহ চীন দেশে কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কিছু পরিচয় না দিলে আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে। সুই বংশের রাজত্বকালে অন্ততঃপক্ষে ছয়খানি ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সুই ও থাং রাজবংশের শাসনকালে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চীনরাজসভার জ্যোতিষ বিভাগে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সরকারী চীনা পঞ্জিকা প্রণয়নকার্যে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছিলেন। ৬৮৪ ও ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণকর্তৃক প্রস্তুত পঞ্জিকা চীনা রাজ-সরকার অনুমোদন ও গ্রহণ করেছিলেন। সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে চীনা বৌদ্ধভিক্ষু য়ি-হিঙ্ যে পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন তাতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান যে চীনদেশের সুধীসমাজে কতটা সংবর্ধনালাভ করেছিল তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে 'চাঙ্-আন্'এ গৌতম, কশ্যপ ও কুমারের নামে যথাক্রমে এর তিনটি শাখা স্থাপিত হয়। থাং রাজবংশের শাসনকালে মধ্য এসিয়ার সুগ্দ দেশ থেকে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিছু কিছু তত্ত্ব চীন দেশে আসে। এই সময়ে অনূদিত চারখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ এর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু গ্রন্থও চীনা অনুবাদে চীন-দেশীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে একখানি শিশুচিকিৎসা ও অপর একখানি গর্ভিনী নারীর চিকিৎসাবিষয়ক। পঞ্চম শতকে চীনা শ্রমণ কিং-শেঙ্ বিভিন্ন ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ থেকে সংকলন করে 'চে-ছান্-পিং-পি-ইয়াও-পা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। থাং রাজগণের যুগে চীনদেশে ভারতীয় তান্ত্রিক-যোগিগণের সুনাম এবং চাহিদা হয়েছিল, কেন না সাধারণের বিশ্বাস ছিল তাঁদের জরাবার্ধক্যনিবারণের গুপ্ত উপায় জানা আছে। ভিক্ষু হিউয়ান্-চাও যখন ভারতে আসেন, তাঁর প্রতি চীন

সম্রাটের বিশেষ নির্দেশ ছিল ভারতবর্ষের দুর্লভ ঔষধ সকল সংগ্রহ করবার। বৌদ্ধেতর ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানগুলির মধ্যে সাংখ্যসূত্র ও বৈশেষিকসূত্রের চীনা ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল বলে জানা যায়। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই চীনভারতের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের ভূমিকা যে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর তা অবশ্যস্বীকার্য। তথাপি মনে রাখতে হবে দক্ষিণ চীনে প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু বসতি ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার হিন্দু উপনিবেশগুলি থেকে কখনও বা বাণিজ্যসূত্রে সরাসরি জলপথে ভারতবর্ষ থেকে, এরা এখানে উপস্থিত হয়ে থাকবে। বৌদ্ধ ধর্ম বা দর্শনের সহিত সম্পর্কিত নয় এমন ভারতীয় গ্রন্থাদি চীনা ভাষায় অনুবাদ করবার কাজে কিছু কিছু ভারতীয় হিন্দু (সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ) বৌদ্ধগণের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য বোঝাবার জন্য সর্বদা এঁদের ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রাচীনকালে চীনারা ভারতীয় গণিত এবং জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থসমূহকে সাধারণতঃ 'ব্রাহ্মণশাস্ত্র' বলে অভিহিত করতেন। দক্ষিণ চীনে ছুয়ান্-চো নামক স্থানের এক বৌদ্ধ মন্দিরের একটি স্তম্ভে খোদিত কিছু হিন্দু ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির বিষয় হল কৃষ্ণকর্তৃক কালীয়দমন, বিষ্ণুর নৃসিংহাবতার কর্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ এবং শিবলিঙ্গের উপর ভক্ত গাভীর স্তন হতে দুগ্ধক্ষরণ। উক্ত স্তম্ভের পাদদেশে সিংহলের পোলোন্নাবুরম্ নামক স্থানের হিন্দুমন্দির-ভাস্কর্যের অনুরূপ এক অদ্ভূত জন্তুর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। কয়েকটি শিবলিঙ্গও ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণভারতের তামিল হিন্দু শিল্পিকর্তৃক দক্ষিণ চীনের উক্ত স্থানে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের জন্য আদি মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। পরে তারই একটি স্তম্ভ বর্তমানের বৌদ্ধমন্দির নির্মাণের কাজে লাগানো হয়েছে। দক্ষিণ চীনে যে সকল পুঁথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে একটি কালিদাসের নানা কাব্য হতে সংগৃহীত শ্লোকের সমষ্টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চীনদেশে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির অস্তিত্বের নিদর্শন একেবারে বিরল নয়, যদিও তার বিস্তার ও গুরুত্ব বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির তুলনায় নগণ্য।

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীনকালে মধ্য এসিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে জয়যুক্ত হলেও চীনের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ যোগাযোগের ফল হয়েছিল একটু ভিন্নরকমের। কুমারস্বামী, প্রবোধচন্দ্র বাগচি প্রমুখ, পণ্ডিতগণ তা লক্ষ্য করেছেন। চীনের একটি নিজস্ব উচ্চ, সুপরিণত, প্রাচীন সভ্যতা থাকায় এবং চীনাদের মনে সে সম্পর্কে ন্যায্য গর্ববোধ থাকায়, ভারতীয় বণিক এবং বৌদ্ধশ্রমণগণের দীর্ঘকাল চীনদেশে বসবাস সত্ত্বেও সেখানে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক প্রতিপত্তি বিস্তারের কোন প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। কিন্তু এই বাধা সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা চীনদেশে খ্রীষ্টীয় প্রথম হতে একাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত গভীর ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং চীনা বিদগ্ধসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতবর্ষের প্রতি যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তাঁদের ভারতবর্ষকে 'পশ্চিমের স্বর্গ' নামে অভিহিত করাতেই প্রকাশ। ভারত-চীনের সুদীর্ঘ বাণিজ্যিক ও আধ্যাত্মিক যোগাযোগের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিকের উপর কিছুটা চৈনিক প্রভাব প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে চীন ও তার অধিবাসিবৃন্দের প্রতি দুটি পৃথক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগ্রন্থগুলির সাক্ষ্য পর্যালোচনা করলে মনে হয় হিন্দুসমাজ সাধারণতঃ চীনাদের

পারসীক, শক ও হূনদের সমগোত্রীয় একটি দুর্ধর্ষ রক্তপিপাসু বর্বর জাতি বলেই জানতেন। মহাভারতের সভাপর্বে (৫১।২৩-২৪) আছে:

চীনান্ শকান্ তথা চোড্রান্ বর্বরান্ বনবাসিনঃ।
বার্ষ্ণেয়ান্ হারহূণাংশ্চ কৃষ্ণান্ হৈমবতাংস্তথা॥

ভীষ্মপর্বে (৯।৬৫-৬৬) প্রায় এই কথারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়:

যবনাশ্চীনকাম্বোজা দারুণাঃ ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
সকৃদ্‌গ্রহাঃ কুলত্থাশ্চ হূণাঃ পারসীকৈঃ সহ॥

সঙ্গত কারণেই ভারতীয় বৌদ্ধমহলে চীন ও চীনাদের প্রতি এর বিপরীত মৈত্রী ও শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করা যায়। হিউয়ান্-সাং-এর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর মহাবোধি মন্দিরের ভিক্ষু তাঁকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেটিকে এই সশ্রদ্ধ মনোভাবের প্রতীক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। (পত্রটির ইংরেজি অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য, *India and China*—প্রবোধচন্দ্র বাগচি, কলিকাতা, ১৯৪৪, পৃঃ ৮১।) সাধারণতঃ প্রাচীন কালে ভারতে আগত চীনা শ্রমণগণের স্থানীয় পরিচিত মহল ছিল সংকীর্ণ এবং বৌদ্ধধর্ম ও তৎসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া এঁদের অধিকাংশেরই অন্য কোনও কৌতূহল ছিল না। সুতরাং সীমাবদ্ধ বৌদ্ধসমাজের বাইরে বৃহত্তর জনসাধারণের মনে উল্লেখযোগ্য রেখাপাত করা এঁদের প্রায় সাধ্যাতীত ছিল। এ-কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে চীনা পর্যটকগণের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণশক্তিতে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন যখন ভারতবর্ষে আসেন, বৌদ্ধধর্মের শক্তি ও জনপ্রিয়তা তখন স্বদেশে নিঃশেষিতপ্রায়। অবৌদ্ধ জনসাধারণ ও এঁদের মধ্যে ব্যবধান বৃহত্তর হবার নিঃসন্দেহে এটিও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

কিছুদিন পূর্বে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত এক প্রবন্ধে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর চীনা প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (*Journal of the Asiatic Society of Bengal* 1959, *Vol I. No.* 1 pp. 89-122)। খুঁটিনাটি বাদ দিলে দেখা যাবে, আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় সভ্যতার উপর চীনা প্রভাবের অস্তিত্বের পাঁচটি নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে করছেন: (১) চীনের সঙ্গে যোগাযোগ ও চীনা প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কতিপয় শব্দের অস্তিত্ব; (২) গুপ্তযুগের মুদ্রাপ্রস্তুতপ্রণালীর উপর এবং সাধারণভাবে গুপ্তশিল্পের উপর চীনা প্রভাব; (৩) কালিদাসের কাব্যে চীনা প্রভাব; (৪) তান্ত্রিক ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে চীনাচারের অস্তিত্ব; (৫) গণিতশাস্ত্রের সংখ্যাজ্ঞাপক অঙ্কগুলি ও শূন্যপ্রতীক উদ্ভাবনে ভারত-চীন সহযোগিতা। সুনীতিকুমারের সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। প্রথম সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে বক্তব্য যে, সুনীতিকুমারের ন্যায় ভাষাতাত্ত্বিকও সমগ্র সংস্কৃতভাষাসিন্ধু মন্থন করে তাঁর মতপ্রতিষ্ঠার জন্য ছয়টির বেশী তথাকথিত চীনগন্ধী শব্দ খুঁজে পান নি। এর মধ্যে একটি শব্দ চীন। এটি যে চীন দেশের 'সিন্' (Ts'in) রাজবংশের নাম থেকে প্রচলিত হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সিন্দুর' শব্দটির চীনা উৎপত্তি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যেতে পারে। সংস্কৃত 'কীচক' (সরু বাঁশ অর্থে) শব্দটিকেও সুনীতিকুমারের পূর্বে স্বর্গীয় সিলভ্যাঁ লেভি চীনা 'খি-চোক্' শব্দ থেকে জাত বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দুটি শব্দ, 'শয়ঃ' ('কাগজ' অর্থে) ও মুসার (মূল্যবান প্রস্তরবিশেষ) সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। এক্ষেত্রে লেখক অর্থসাদৃশ্যের উপর নির্ভর না করে অনেক পরিমাণে বাহ্য ধ্বনিসাদৃশ্যের উপর জোর দিয়েছেন, মনে হয়। এ পন্থা বিপজ্জনক। এই ধরণের ভাষা-

তাত্ত্বিক আলোচনার পথ যে কত বন্ধুর তা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কৃত 'তসর' ('ক্ষৌম বস্ত্র' অর্থে) শব্দটিকে শেষ পর্যন্ত চীনা তাই-সস্ বা তাই-সেসর্ শব্দ থেকে উৎপন্ন বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা থেকে বোঝা যাবে। 'তসর' একটি অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ,—আদি বৈদিক সাহিত্যে বস্ত্র অর্থেই এর প্রয়োগ আছে, যথা:

সরস্বতী মনসা পেশলং বসু নাসত্যাভ্যাং বয়তি দর্শতং বপুঃ। রসং পরিস্রুতো ন রোহিতং নগ্নহুর্ধীরস্তসরং ন বেম।

শুক্লযজুর্বেদ, মাধ্যন্দিন শাখা, ১৯ অধ্যায়, ৮৩ কণ্ডিকা (আরও দ্রষ্টব্য, কাঠক সংহিতা ৩৮।৩; মৈত্রায়নী সংহিতা ৩।১১।৯; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৬।৪।২)।

শুক্লযজুর্বেদসংহিতার রচনাকাল খুব সংযত অনুমানেও খ্রীষ্টজন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সে সময়ে ভারত-চীন পরস্পরের সংস্রবে আসেনি, তার প্রায় সহস্র বৎসর পরে এসেছিল। তাই মনে হয় শব্দবিশেষের উৎপত্তির সূত্র দিয়ে চীনা প্রভাব প্রমাণের চেষ্টায় সহজে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। এই সমালোচনার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও একটা কথা সহজেই বোঝা যায়। অসংখ্য ভারতীয় গ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ভারতীয় ভাষা হতে উৎপন্ন অগণিত শব্দ এখন পর্যন্ত স্পষ্টতঃ চীনা ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। এমন কি এই কারণে প্রাচীন কালে চীনা সারস্বতসমাজের সুবিধার্থ সংস্কৃত-চীনা অভিধান পর্যন্ত রচিত হয়েছিল। সে তুলনায় যদি তিন চারটি (সন্দেহজনক?) চীনমূল শব্দ সমগ্র সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করেই থাকে, সে প্রভাবকে নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর বললে দোষ হয়না। দ্বিতীয়তঃ ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন, গুপ্তযুগের রাজকীয় মুদ্রায় কয়েকটি শব্দ বাম হতে দক্ষিণে লিখিত না হয়ে উপর থেকে নীচে অক্ষর সন্নিবিষ্ট করে লেখা হয়েছে। তাঁর মতে চীনা প্রভাবের ফলে চীনা অক্ষরের কায়দায় এখানে সংস্কৃত অক্ষরগুলিকে সজ্জিত করা হয়েছে। ভারতীয় প্রাচীন লিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি এই প্রকার সিদ্ধান্ত করতে স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হতেন। গুপ্তযুগে রাজকীয় মুদ্রার পরিধি অনেক সময়েই ছাঁচের চেয়ে ছোট হওয়ায় মুদ্রার উপর উৎকীর্ণ লিপির খানিকটা বাদ পড়ে যেত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যই যে অনেক সময়ে সম্রাটের মূলে নামটি উপর-নীচ অক্ষর সাজিয়ে লেখা হত, গুপ্তমুদ্রার আনুপূর্বিক আলোচনা করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই স্থানের সংকীর্ণতার জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্রাটের নামটি পর্যন্ত যে মুদ্রাকরকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে তা ডঃ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না। 'সমুদ্রগুপ্ত' স্থলে 'সমুদ্র', চন্দ্রগুপ্ত স্থলে 'চন্দ্র', কুমারগুপ্ত স্থলে 'কুমার', বৈন্যগুপ্ত স্থলে 'বৈন্য', এই স্থান সঙ্কুলান করবার জন্যই লেখা হয়েছে। তাছাড়া গ্রীক্‌দের মতো মুদ্রালিপিকে সুবিন্যস্ত করে উৎকীর্ণ করবার প্রথা ভারতে সর্বদা অনুসৃত হয়নি। ভারতের মধ্যযুগে মুসলমান সম্রাটদের মুদ্রায় যেখানে কলিমা উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানেও লক্ষ্য করলে ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেখতে পাবেন অক্ষরগুলিকে যেন কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রথম পাঠকদের ধাঁধাঁ লাগে। প্রাচীন ভারতের ক্ষোদিত লিপিতেও কোনও শব্দ বাদ পড়লে পঙক্তির উপরে বসিয়ে দেওয়ার প্রথা মৌর্যসম্রাট অশোকের আমল থেকেই দেখা যায়। অশোকের য়েরাগুড়ি লেখের কয়েকটি পঙক্তি যথারীতি বাম থেকে দক্ষিণে গিয়ে আবার দক্ষিণ থেকে বামমুখী হয়ে বক্রগতিতে নীচে নেমে এসেছে। পরবর্তী কালে ক্ষোদিত লিপিতে উপর থেকে নীচে অক্ষর সাজিয়ে লিখবার দৃষ্টান্ত যে একেবারে বিরল, তা নয়। এই প্রসঙ্গে কলিঙ্গের প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় রাজা চতুর্থ নরসিংহের

ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত ওড়িয়া-তামিল দ্বিভাষী ক্ষোদিত লেখখানির তামিল অংশের শেষ তিন পঙ্‌ক্তি লক্ষ্যণীয়। অতি স্বপরিকল্পিতভাবে উপর থেকে নীচে অক্ষর সাজিয়ে এই পঙ্‌ক্তি-গুলি লেখা হয়েছে (দ্রঃ *Epigraphia Indica* Vol. XXXII p. 237, note 4 এবং ২৩৪ পৃষ্ঠার চিত্র, 'left' নির্দিষ্ট অংশ; এই লেখটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছেন অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকার)। সুতরাং অক্ষরের অধোগতি থেকে চীনা প্রভাব প্রমাণিত হয় না। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যাঁদের মতামত প্রামাণ্য এমন অনেকে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের উপর পারসীক বা গ্রীকপ্রভাব স্বীকার করতে সংকুচিত হন নি। তাঁরা স্বকীয় মতস্থাপনে এই প্রভাবের অনুপ্রবেশের আনুপূর্বিক ও কালানুক্রমিক স্তরগুলি এমন সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে তাঁদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু গুপ্ত-শিল্পের উপর চীনা প্রভাবের কথা তাঁরা কখনও বলেন নি। এ বিষয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি হচ্ছে গুপ্তমুদ্রার উপর উৎকীর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের প্রতিকৃতির সঙ্গে সমসাময়িক চীনা শিল্পের অশ্বমূর্তির সাদৃশ্য আছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি বিন্দুমাত্রও অপর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন নি। এ স্থলে বিনীত জিজ্ঞাসা, মুদ্রায় উৎকীর্ণ এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি অশ্বমূর্তির সঙ্গে বিদেশী শিল্পের অশ্ব-মূর্তির সাদৃশ্য কি একটি সমগ্র শিল্পের উপর বিদেশী শিল্পের প্রভাব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে? এ সাদৃশ্য তো সম্পূর্ণ আকস্মিক হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, বিশেষতঃ যেখানে সমর্থক সাক্ষ্য সম্পূর্ণ অবর্তমান। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে চীনা প্রভাব প্রমাণার্থে ডঃ চট্টোপাধ্যায় যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন তা এতই কল্পনারঞ্জিত যে আলোচনায় বিশেষ লাভ হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি চু-ইয়ান্ (৩৪০—২৭৮ খ্রীঃ পূঃ) ও হু-কান্ (আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দ) নামক দুজন প্রাচীন কবির দুটি লিরিক কবিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিতা দুটির বিষয়বস্তু হল প্রিয়জনের নিকট মেঘকে দূতরূপে প্রেরণ। এই কবিদ্বয়ের কাব্য যে ভারতের বিদ্বৎসমাজে কোনও সময়ে আলোচিত হত বা এঁদের কারোর বিষয়বস্তু তৎকালীন ভারতীয় সাহিত্যিক মহলে পরিচিত ছিল এমন সামান্যতম প্রমাণও ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেন নি। সাহিত্য সমালোচনায় বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে সমভাবের সমান্তরাল বিকাশকে একের উপর অপরের প্রভাবের নিদর্শন ভাবা এক গুরুতর ভ্রম। হয়তো এমন কল্পনারও কিছু সার্থকতা থাকত যদি ভারতীয় সাহিত্যে এই জাতীয় দৌত্যের একটি স্পষ্ট ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য না পাওয়া যেত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৈদিক যুগ থেকেই সেটি পাওয়া গিয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সংখ্যক সূক্তে সরমা নামক কুক্কুরীকে পণিগণের নিকট ইন্দ্রের দূতরূপে প্রেরণের উল্লেখ আছে। রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামকর্তৃক হনুমৎ কে সীতার নিকট দূতরূপে প্রেরণ এবং সুন্দরকাণ্ড্যে সীতার বার্তাবহরূপে হনুমতের রামসন্নিধানে প্রত্যাগমন, মহাভারতের বনপর্বে দময়ন্তীর নলসমীপে হংসদূত পেরণ, কামবিলাপজাতকে বিপন্ন স্বামিকর্তৃক স্ত্রীর নিকট বায়সমুখে বার্তাপ্রেরণ,—এই সমস্ত উপাখ্যানই উক্ত ঐতিহ্যের দ্যোতক। (দ্রষ্টব্য, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তি লিখিত প্রবন্ধ Origin and Development of Dutakavya Literature in Sanskrit—*Indian Historical Quarterly* Vol. III, No. 2, pp. 273-97)। কালিদাস যে রামায়ণের হনুমতের দৌত্যকাহিনীদ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর টীকাকারগণ এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণাবর্তনাথ বলেন 'ইহ খলু কবিঃ সীতাং প্রতি হনুমতা হারিতং সন্দেশং হৃদয়েন সমুদ্বহন্ তৎস্থানীয়নায়কাদ্যুৎ-

পাদনেন সন্দেশং করোতি।' পরবর্তী সুপ্রসিদ্ধ মল্লিনাথের উক্তি : 'সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎসন্দেশং মনসি বিধায় মেঘসন্দেশং কবিঃ কৃতবানিত্যাহুঃ।' উত্তরমেঘের নিম্নলিখিত শ্লোকে স্বয়ং কালিদাস এই ব্যাখ্যার পরোক্ষ সুযোগ দিয়েছেন : 'ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা' (মেঘদূত ২।৪০)। এই সুস্পষ্ট ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এমনকি প্রবন্ধমধ্যে তার উল্লেখমাত্রও না করে ডঃ চট্টোপাধ্যায় যে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাকে কিছুতেই বিচারসহ গণ্য করা যেতে পারে না। তান্ত্রিক ধর্মানুষ্ঠানের চীনাচার বা মহাচীনাচার নামক অঙ্গ যে চীনদেশীয় তাওধর্মদ্বারা বহুলপরিমাণে প্রভাবিত, ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এ মতটি মৌলিক না হলেও এটি মেনে নিতে কেউ বিশেষ আপত্তি করবেন না। এই আচারের মূল তত্ত্ব হল নারীসঙ্গের মাধ্যমে ধর্মসাধনা এবং যৌনক্রিয়ার মধ্যেও চিত্তকে দৃঢ় ও নিরাসক্ত রাখা, যাতে সাধকের যৌনপ্রবৃত্তি ঊর্ধ্বগামী হয়ে তাকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের তারারহস্য, মেরুতন্ত্র, রুদ্রযামল, ব্রহ্মযামল প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠানপদ্ধতি চীন বা মহাচীন থেকে আগত। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে সময়াচার, বীরাচার, পশ্বাচার প্রভৃতি তন্ত্রদর্শনের বহুবিধ আচারের মধ্যে চীনাচার একটি। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থসমূহে এগুলিকে পৃথক করা হয়েছে, পরবর্তী কালে অনেকক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য লোপহেতু এ পার্থক্য রক্ষিত হয়নি। সমগ্র তন্ত্রদর্শনের সঙ্গে চীনাচারকে সমার্থক ভাবলে ভুল হবে। ভারতের প্রাচীনতম নিজস্ব ধর্মচিন্তা সম্পূর্ণ যৌনতত্ত্বের সংস্রব বর্জিত ছিল, ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এবংবিধ সিদ্ধান্তেরও কিছুমাত্র বস্তুভিত্তি নেই। যদিও আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে সম্ভবতঃ তাও মতবাদের প্রভাবে তন্ত্রের যৌন উপাসনা নবরূপ ধারণ করেছিল, ভারতবর্ষেও এর একটি সুপ্রাচীন নিজস্ব ধারার অস্তিত্ব ছিল। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিনসহস্র বৎসর পূর্বেকার ইতিহাসপূর্ব যুগের যে সকল নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে লিঙ্গ ও যোনি প্রতীকের আবিস্কার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদে সম্ভবতঃ এই লিঙ্গ-পূজকগণকেই 'শিশ্নদেব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'বামদেব্য সামোপাসনা' নামক যে উপাসনাপদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয়েছে—যৌনক্রিয়া তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগজীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ব্রতম্'—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২।১৩।২)। তন্ত্রের যৌন উপাসনাদির উপর বিদেশী প্রভাব প্রমাণ করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ার কালে আমাদের এই প্রাচীনতর ভারতীয় যৌনোপাসনার ধারাটির বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। সংখ্যাজ্ঞাপক অঙ্কচিহ্ন ও শূন্যপ্রতীকের উদ্ভাবন সম্পর্কে ডঃ চট্টোপাধ্যায় যোসেফ্ নীড্হামের মতকেই অনেকাংশে (পূর্ণমাত্রায় নয়) অনুসরণ করেছেন। শেষোক্ত বিজ্ঞানীর মতে, হিন্দুসংস্কৃতিপরিমণ্ডলের পূর্ব সীমান্তে যেখানে চীনা ভাবরাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তের সঙ্গে ভরতের যোগাযোগ ঘটেছে, সেখানে ভারত-চীন সহযোগিতার ফলে উক্ত গাণিতিক আবিস্কারসমূহ ঘটেছিল। ডঃ চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন, এই মতের স্বপক্ষে আজপর্যন্ত কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ আবিস্কৃত হয়নি। প্রাচীন ভারতবর্ষে চীনা গণিত বা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে কোনও কৌতূহল ছিল বা এ বিষয়গুলি অধীত হত, এমন কোনও প্রমাণ নেই। এ সকল বিষয়ে কোনও চীনা গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়নি। চীনদেশে ভারতীয় গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমাদর ছিল এবং এই বিষয়ক ভারতীয় গ্রন্থও চীনা ভাষায় অনূদিত

হয়েছিল, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যাজ্ঞাপক অঙ্কচিহ্ন ও শূন্যপ্রতীকের আবিষ্কর্তারূপে ভারতবর্ষ এ যাবৎ স্বীকৃতিলাভ করে এসেছে। নীড্‌হাম্‌ যদি নির্ভুল-ভাবে প্রাচীন চীনা গণিতশাস্ত্রের মূল্য বিচার করে থাকেন (প্রাচীন চীনে গণিত বিশেষ উৎকর্ষলাভ করেনি) তাহলে এই পর্যন্ত মাত্র বলা যাবে যে এই ক্ষেত্রে প্রাচীন কালে ভারত ও চীনে সমান্তরালভাবে কিছু একজাতীয় কাজ হয়েছিল। সে প্রয়াসগুলি যে পরস্পর-সম্পর্কিত ছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। ভারতবর্ষে দশমিক চিহ্ন বা শূন্যপ্রতীক প্রয়োগের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির অবস্থিতি (বরোদা বা উড়িষ্যার গঞ্জাম অঞ্চল) নীড্‌হাম-কল্পিত ভারত-চীন সহযোগিতার ক্ষেত্র, অর্থাৎ পূর্বভারত ও দক্ষিণ চীনের সীমান্তরেখা থেকে বহুদূরে, এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

সুতরাং ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, চীনাংশুক বা চীনদেশ থেকে আগত সূক্ষ্ম বস্ত্র, চীনা সিঁদুর এবং তন্ত্রোক্ত চীনাচার ভিন্ন এখন পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর চীনা প্রভাবের অপর কোনও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। কুষাণসম্রাট কণিষ্কের রাজসভায় আনীত চীনা প্রতিভূগণ ভারতবর্ষে পীচ ও 'নাশপাতি' ফলদ্বয়ের প্রচলন করেন এমন একটি প্রাচীন কিংবদন্তী অবশ্য আছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই কাহিনীকে সত্য বলে মনে করেন, কিন্তু স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে ভারত-চীনের পারস্পরিক আদানপ্রদানটা একতরফা ছিল না সত্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপাদান যেটুকু পাওয়া গিয়েছে তা অনুশীলন করলে স্বভাবতঃ মনে হয় এ বিষয়ে ভারতের নিকট চীন যে পরিমাণে ঋণী চীনের নিকট ভারত তার শতাংশের একাংশও নয়। মধ্য এসিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে ভারত ও চীন উভয়েই প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সেসব অঞ্চলে পর্যন্ত, চীনের অবিরাম সশস্ত্র অভিযান ও করধার্যকরণ সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ যে পরিণামে জয়লাভ করেছিল ঐতিহাসিকগণ তা স্বীকার করেছেন।

প্রমাণপঞ্জী

Eberhard : A History of China
P. C. Bagchi : Le Canon Bouddhique en Chine Tomes I & II
: Deux Lexiques Sanskrit-Chinois Tomes I & II
: India and China
: ভারত ও চীন
: ভারত ও মধ্য এসিয়া
Edkins : Chinese Buddhism
Chou Hsiang Kuang : The History of Chinese Buddhism
H. Maspero : La Chine Antique
J. Needham : Science and Civilisation in China
Coomarswami : A History of Indian and Indonesian Art
S. N. Sen : India through Chinese Eyes.
J. K. Shryock : Origin and Development of the State Cult of Confucius.
Aurel Stein : Ancient Khotan
: Serindia

আধুনিক সাহিত্য

শরৎচন্দ্রের পাঠক-পরিতোষণ পদ্ধতির ভিতরে সর্বজনপ্রিয়তার আবশ্যিক উপাদান দুটি একটি নিহিত থাকলেও, সে রচনাগুলি এবং আজকের এদেশে সর্বজনপ্রিয়তার জন্য লোলুপতা এক বস্তু নয়। শরৎচন্দ্র কখনো হারিয়ে যাবেন না, পাঠক সাধারণের একটা নিয়মিত সানুরাগ দৃষ্টি তাঁর ওপর ন্যায়তঃ চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে, বাঙালী পাঠক মাত্রেই জীবনের একসময়ে শরৎচন্দ্র পড়বেন—এমন কি শরৎচন্দ্রের ভাবালু সীমাবদ্ধতাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হবার পরেও যৌবনসন্ধির এই প্রথম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দু'একবার নির্দায় পরিক্রমণেও হয়তো কারো আপত্তি হবে না। কিন্তু বর্তমানে বাংলা পাঠকের কাছে যেগুলো প্রিয় বলে খ্যাত তাদের অধিকাংশই অকস্মাৎ দীপ্তি-ধন্য হাউই মাত্র। জ্যোতিষ্কলোকের মধ্যে স্থান-লাভের জন্য তাদের ব্যাকুলতা আছে বটে কিন্তু ক্ষণকাল পরেই দেখা যায় যে, সমস্ত আলোকছটা ভস্মমুষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর কারণ, হাউই রচনার মূলেও যে মানসিকতা, এই বিক্রয়ধন্য উপন্যাসগুলির পশ্চাতেও সেই একই মনোবৃত্তি। মানুষের দৃষ্টিকে স্থির নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যেই এই সহসা ছটা বিস্তার। এদেশে এর মূলে রয়েছে সাধারণ পাঠক সম্বন্ধে এক প্রকার স্থূল অসম্মানকর ধারণা।

এই হাটুরে উত্তেজনা বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মূল্য-বিভ্রান্তির ফল। গুণবত্তার নিরিখ যখন পঙ্গু হয়ে পড়ে তখন সহজ পন্থা হল সব কিছুকেই একটি একটি 'প্রকার' বলে মেনে নেওয়া। প্রাত্যহিক সংবাদ ক্ষুধার যে অংশটা অতি স্থূল, তারই ক্ষুন্নি-বৃত্তির জন্য 'ফিচার+সাহিত্যে'র একটা ব্যাপক আয়োজন এদেশে এই অবস্থায় বাণিজ্য-স্বভাব সাংবাদিকতার প্রশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। এই প্রচার-সর্বস্ব সাংবাদিকতার একটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর লক্ষণ হল বুদ্ধিজীবিদের প্রাধান্য খর্বের জন্য ঐকান্তিক সংগ্রাম। কেন না বুদ্ধিজীবিরা মূল্যের তারতম্য বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী। অথচ এই তারতম্য-বিচার-বোধ বেঁচে থাকলে জনমত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা চালানো দুরূহ। এ প্রসঙ্গে একজন সমাজতাত্ত্বিক বলছেন* 'চিন্তায় দু ধরনের হেত্বাভাসের অতি শক্তিবৃদ্ধির ফলে আধুনিক যূথবদ্ধ সাংবা-দিকতা বুদ্ধি-জীবনের প্রবল ক্ষতি সাধন করছে। 'লোকেরা নেবে তো?'—এই বিপুল অনিশ্চয়তাকে সামলাতে গিয়ে শিল্পজ্ঞানহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বিচারের ওপর নির্ভর-শীলতা বাড়ছে। এবং, যে ব্যর্থতাকে ভয় করা হচ্ছে তাকে এড়াতে গিয়ে নানা রকমের বিভিন্নমুখী কল্পনার ভাল ভাল অংশগুলির তিলোত্তমা বানিয়ে এক কৃত্রিম বিশুদ্ধির ভাঁওতা সৃজনও এরই আর এক অঙ্গ।' তাই 'নতুন ধরনের বিষয়', 'নতুন ধরনের লেখা'—সাহিত্যের বিজ্ঞপ্তিতে এগুলিই এখন বহুল ব্যবহৃত শব্দ, বড়লোকদের প্রশংসাবাণীতে এইগুলিই দায়িত্ব পরিহারের সংক্ষিপ্ত সড়ক। এ অবস্থায় গুণবত্তার তুলনামূলক বিচারের জন্য কারো মাথাব্যথা নেই। সবই প্রকারভেদ মাত্র। এই চূড়ান্ত মূল্যান্ধতার যুগে সর্বত্র

* House of Intellect. *By* Jacques Barzun.

অস্বাস্থ্য মাথা চাড়া দিচ্ছে—শক্তিবৃদ্ধির পরিবর্তে মেদবৃদ্ধিই এখন সাধারণ ব্যাপার। এবং নিরিখের অতি সরলীকরণের পথে চলতে চলতে—'নতুন ধরন', 'অজানা বিষয়' প্রভৃতি পরিচিতিজ্ঞাপক শব্দগুলি ছেড়ে টাকা নয়াপয়সার বাটখারাকেই সাহিত্যের ভার নিরূপক বলে অনেকেই মেনে নিয়েছি।

"কড়ি দিয়ে কিনলাম" সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে। উপন্যাসটির বিষয়বস্তুতেও এরই ইঙ্গিত। গরীব বিধবা মায়ের ছেলে দীপঙ্কর। যে বাড়ীতে তারা ভাড়া থাকে তার অপরাংশে লক্ষ্মী ও সতী বলে দু'টি তারই সমবয়সী মেয়ে তাদের কাকাবাবুর সঙ্গে এল। মেয়ে দুটির সঙ্গে দীপঙ্করের আলাপ হল। লক্ষ্মী বড়বোন, প্রেম করে শম্ভু দাতার নামে এক মারাঠী যুবকের সঙ্গে। সতী তা পছন্দ করে না। লক্ষ্মী চিঠি পাঠায় দীপঙ্করের হাত দিয়ে। একদিন লক্ষ্মী পালিয়ে গেল এবং বিয়ে করল ওরা। প্রেমজ বিয়ে প্রথম দিকে বয়ে আনল দারুন দারিদ্র্য—লক্ষ্মী পরিশেষে নিজের রূপ-দেহ ভাঙাতে আরম্ভ করল। এদিকে একদিন, যেহেতু কাকাবাবু সি. আই. ডি—তাই বাড়ীতে পাড়ার লোক হামলা করে। সতীকে দীপঙ্কর গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কিরণ দীপঙ্করের বন্ধু বলে পুলিশ দীপঙ্করকে ধরে নিয়ে যায়। দীপঙ্করের তার দু-একদিন আগে রেলে সামান্য চাকরি হয়েছে। যাই হোক জেল থেকে বেরিয়ে দীপঙ্কর দেখল সতীর বিয়ে হয়ে গেছে মস্ত বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। সতী একদিন দীপঙ্করকে স্বামী শাশুড়ী না থাকা কালে নিমন্ত্রণ করে—কিন্তু স্বামী শাশুড়ী হঠাৎ এসে পড়েন। দীপঙ্কর বুঝতে পারে যে শাশুড়ী সতীর জীবন নরক করে তুলেছে। শ্বশুরবাড়ী অসহ্য হওয়ায় সতী দীপঙ্করের কাছে পালিয়ে আসে। লক্ষ্মী আর দীপঙ্কর নানাভাবে বুঝিয়ে সতীকে আবার শ্বশুরবাড়ী দিয়ে আসে। সতীর শাশুড়ী সতীকে সাজা দেন সকলের সামনে বৌয়ের মাথায় ছেলের জুতো চাপিয়ে। এখানে প্রথম খণ্ড শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ডে, সতীকে শাশুড়ীর অত্যাচারে ও স্বামীর মহাসত্ত্ব নিষ্ক্রিয়তায় শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ী ছাড়তেই হয়। সে দীপঙ্করের রেল অফিসেই চাকরি নেয়। সতী মিঃ ঘোষাল নামে এক কুখ্যাত ঘুষখোর অফিসারের কবলে পড়ে—তার সঙ্গে এক জায়গায় বাস করতেও সুরু করে। ওদিকে লক্ষ্মী নিজ রূপ ও দেহ ব্যবহার করে যুদ্ধের সুযোগে স্বামীকে ব্যবসায়ে রীতিমত দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। বাড়ী-গাড়ী হয়েছে। কিন্তু ছেলে মানস বড় হয়েছে সে ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখছে না। দিল্লীতে লক্ষ্মীর ছেলে মানস মাকে অপর একজনের শয্যাসঙ্গিনী দেখে সেই ভদ্রলোককে গুলি করে। মানসের জেল হয়। এদিকে সতী মিঃ ঘোষালকে ঘুষের দায়ে জেলে পাঠায়। সতী এবং তার স্বামীর মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সুযোগ আসে। সতীর বাবার মৃত্যুতে সতী দেড়লক্ষ টাকার মালিক হয়। সতীর শাশুড়ীর তখন আর্থিক অনিশ্চয়তা। এই টাকাটা তাঁর চোখে পড়ে। কিন্তু সতী টাকার বিনিময়ে শ্বশুরঘরে পুনর্বাসন ক্রয় করতে অনিচ্ছুক। তখন দীপঙ্কর নানা-ভাবে ঋণ করে টাকাটা সতীর জ্ঞাতসারে সতীর শাশুড়ীকে দেয়। ইত্যবসরে মিঃ ঘোষাল ছাড়া পেয়েছেন। তিনি সতীকে জানালেন হয় সতীকে তাঁর চাই, নয় দীপঙ্করকে তিনি খুন করবেন। সতী বিরোধ মেটাতে না পেরে রেলের লাইনে আত্মহত্যা করে—দীপঙ্কর তাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়। অতঃপর দুঃখব্রতী দীপঙ্কর গ্রামে গ্রামে মাস্টারী করে বেড়াতে থাকে।—এই হল মোটামুটী মূল গল্প। মাঝে মাঝে নানা কাহিনী ও চরিত্র অবশ্যই এসেছে, গেছে। দেশবিদেশের কথা, দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস বলা হয়েছে। এই

উপন্যাসের ছক পরিকল্পনায় নিভুজ বিন্যাসের ছাপ স্পষ্ট। উপন্যাসের এক বাহু সতী, অপর বাহু লক্ষ্মী। একই পরিবার-কোণ্ থেকে উৎসারিত এই দুই বাহু পরস্পরের থেকে দূরে সরে গিয়েছে, কিন্তু দীপঙ্কর দীর্ঘ বাহুর মতো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থেকেছে। সুতরাং বলাই বাহুল্য এই উপন্যাসে দীপঙ্করের পরিপ্রেক্ষিতই লেখক ব্যবহার করতে চাইবেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দেখা গেল যে দীপঙ্করের মা, অঘোরবাবু, ছিটে ফোঁটা, রেল অফিসের ঘোষাল সাহেব, রবিন্সন সাহেব, গাঙ্গুলী, মিস্ মাইকেল, কিরণ, প্রাণমথবাবু, দীপঙ্করেরই দৃষ্টিতে দেখা মানুষ। এবং শুধু তাই নয় আরো দেখা গেল যে লক্ষ্মীর প্রসঙ্গে দাতারবাবু, অনন্তবাবু এবং সতীর প্রসঙ্গে সনাতনবাবু, নয়নরঞ্জিনী দেবী প্রভৃতিও আসলে দীপঙ্করের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মানুষ। দীপঙ্করের দৃষ্টিকোণের ওপর এই অত্যধিক চাপ কাহিনীর গভীর রসহানি ঘটিয়েছে।

নায়কের দৃষ্টি এবং চেতনার ক্রমবর্ধমান পরিধিকে উপন্যাসের ছন্দে-লয়ে মিলিয়ে দেখানো নায়কের দৃষ্টি-কেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রধান বিষয়। দীপঙ্করের ক্রমবর্ধমান চেতনা-বলয় শেষ পর্যন্ত কীভাবে কোন কোন অগ্নিশুদ্ধি লাভ করেছে তাই আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা। পুরানুগৃহীত কিশোর—এই হল দীপঙ্করের প্রাথমিক পরিচয়। দীপঙ্কর অপু নয়, কলকাতা নিশ্চিন্দপুর নয়, সুতরাং তার কোনো প্রকৃতি-দৃষ্টি গড়ে উঠল না। দীপঙ্কর শিবনাথ নয়, সুতরাং তার কোনো রাজনৈতিক, মানসিক দৃষ্টিও গড়ে ওঠেনি—কিন্তু তার পরিবর্তে দীপঙ্করের নিজস্ব কোনো দেখার ভঙ্গিও কি গড়ে উঠেছে? দুঃখের বিষয়—না, তাও নয়। এই পুরানুগৃহীত কিশোরের মাপকাঠিটি বড় সরল। যে আমার উপকার করে সে ভাল, যে করে না সে খারাপ। লক্ষ্মণ রাস্তায় চড় মারে—তখন সে খারাপ। লক্ষ্মীদি বাঁচায় লক্ষ্মণের হাত থেকে—অতএব তখন সে ভাল। প্রাণমথবাবু কলেজের বেতন যোগায়—ভালো। অঘোরদাদু পোকাধরা সন্দেশ দেয়—তত ভালো নয়। ঘোষাল সাহেব ঘুষ নেন কাজেই অসৎ, রবিন্সন্ সাহেব প্রমোশন দেয়—সৎ। এবং এইভাবে চলতে চলতে এই কিশোর যখন যুবক হল, তখন, অর্থাৎ উপন্যাসের উত্তরার্ধে সে যেভাবে জীবনকে চিনলো তাও সরলীকরণের চূড়ান্ত নিদর্শন ছাড়া আর কিছু হল না। কেউ প্রাণমথবাবুর মতো ভাল—কেউ মিঃ ঘোষালের মতো খারাপ। কারো বর পাগল হয়ে যায়—কারো বউ পাগল হয়। কেউ আত্মহত্যা করে (গাঙ্গুলী), কেউ খুন হয় (মিস মাইকেল)। এবং উপকার পাবার মাপকাঠিতে যে জগৎকে চিনতে শিখেছে—উপকার করতে চাওয়ার মাপকাঠিতেই সে নিজেকে চেনাতে চাইবে এতো সহজ কথা। সকলেই তার কাছে হৃদয় উজাড় করে দেয়—সে যে উপকারী! উপকার-পিপাসা এবং উপচিকীর্ষা এই দুই মেরু ছাড়া সে নায়ক আর কোনো ভাবেই নিজেকে প্রমাণিত করতে পারল না। কাজেই যখন উপসংহারে সতীর আত্মহত্যার পর রেলের বড় চাকরী ছেড়ে গ্রামে গ্রামে মাষ্টারী করতে করতে দীপঙ্কর একথা বলে 'মানুষ সে খুঁজে বার করবেই'—তখন হাসি পায়। কেননা প্রাণমথবাবু এবং কিরণের পরেও দীপঙ্কর যখন মানুষ খুঁজতে চাইছে তখন নিশ্চয় মানুষের সংজ্ঞা সে কিছু একটা ঠিক করেছে, সেটা কী?—দীর্ঘ চৌদ্দশ একাশি পাতার এই উপন্যাসে সে কথা কোথাও নেই।

বাংলাদেশে বহুল বিক্রীত সমস্ত উপন্যাসের মতো এই অতিকায় গ্রন্থের লেখকও একটি চতুর্মুখী সফলতা চেয়েছিলেন। সেটা দোষাবহ নয়। বিক্রয়-ধন্য উপন্যাসের

লেখকেরা সকল দেশেই সর্বদাই এই কামনা করেন :

(১) যেন নায়ক সবসময় সহানুভূতিতে অথবা প্রশংসায়, পাঠকের পিঠ চাপড়ানিতে ধন্য হয়।

(২) যেন ভাবাবেগের আতিশয্যাময় অসঙ্গতি পাঠক পাঠিকাকে সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নিষ্প্রশ্ন করে রাখে।

(৩) যেন মেয়েলি কৌতূহলের টান মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে ওঠে।

(৪) যেন একটা মনমজানো ভাব উপন্যাসকে রসাক্ত করে রাখে।

বিমলবাবু যুক্তি-বুদ্ধি-নিরপেক্ষভাবে এই চারটি উপাদানকে ঘিরে উপন্যাসের কলেবর বাড়িয়েছেন, যার ফল হয়েছে তাৎপর্যহীনতা ও যথেচ্ছচারিতা—দোষাবহ হয়েছে সেটাই। এই সহানুভূতি-ও প্রশংসা-ভিখারী নায়কের সর্বৈব অসঙ্গতির কতকগুলি নিদর্শন দেখা যাক। কিশোর দীপুর চেতনালোকে অঘোরদাদুই প্রথম স্পষ্টরেখ অভিজ্ঞতা। অঘোরদাদু সম্বন্ধে দীপুর মনোভাব উপন্যাসের দিক থেকে সুবিধাবাদী মনোভাব। অঘোরদাদু কঞ্জুস. সে দেবতার ভাগ চুরি করে' পয়সা জমানোর চেষ্টা করে। কটুভাষী.—'মুখপোড়া' শব্দটি তার মুদ্রাভ্যাস। এগুলি তার সাধারণ পরিচয়। কিন্তু দীপুকে সে লুকিয়ে রাখা গোপন সঞ্চিত সন্দেশ খেতে দেয়—দিতে দিতে কেঁদে ফেলে—কিশোর দীপু সে কান্না বুঝতে পারে। 'সন্দেশ পোকা ধরা' এ সংবাদে দীপঙ্করের উপর আমাদের সহানুভূতির ভাবোচ্ছ্বাস জাগে না (গরীবের ছেলের দুর্দশায় যেমন জাগা উচিৎ)—কিন্তু অঘোরদাদু প্রসঙ্গে দীপঙ্কর যেখানে যে মন্তব্য করেছে তাতে তাকে মানববেশী মূর্তিমান পাপ বলেই মনে হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় 'যে যখন সুদিন পেয়েছে তখনই অঘোরদাদু সেজে বসেছে। দুহাতে ঠাকুরের নৈবেদ্য চুরি করেছে আর লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছে'। দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৩২ পৃষ্ঠায় 'দেখবে অঘোরদাদুরা আজো বেঁচে আছে কড়ি দিয়ে সব কেনবার জন্য, আজকের অঘোরদাদুরাও ঘরের মধ্যে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে পচিয়ে ফেলছে, তবু দেবতার ভোগ দেবতাকেও দিচ্ছে না, মানুষকেও খেতে দিচ্ছে না'—এই দুটি উদ্ধৃতি দীপঙ্করের অঘোরদাদু সম্বন্ধে মনোভাবের প্রমাণ। অথচ দীপঙ্কর চাকরি পাবার পরে অঘোরদাদুর কাছে আশীর্বাদ চাইতে গিয়ে—অঘোরদাদুর চোখের জল আর একবার দেখেছে। অঘোরদাদু মারা যাবার পর দীপঙ্কর ভেবেছে—একটা যুগ শেষ হয়ে গেল, একটা মানুষ! এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে এ সবের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?—তাহলে উত্তর হল সামঞ্জস্য তো রয়েছে। দীপঙ্কর কেমন ছেলে? না, অঘোরদাদুও যাকে লুকুনো সন্দেশ খাওয়াতে গিয়ে, আশীর্বাদ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, স্বদেশী করলে ঠেঙায়। দীপঙ্করের বাহবা প্রাপ্তির উপাদান তিনি। পাঠকের মুখ থেকে দীপঙ্করের জন্য হয় 'আহা' চাই নয় 'বাহা' চাই। লক্ষ্মীদি তার প্রেমিককে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। দীপঙ্কর আই. এ. পাশ যুবক, লক্ষ্মীদির মাথায় সিঁদুর দেখে সেটা বুঝেও ফেলেছে। তবু সারল্যের লোভে সে বলে—'তুমি ঐ সিঁদুরের কথা ভাবছ তো, ও তেল দিয়ে ঘষলেই একেবারে সাদা হয়ে যাবে!' বাঙালী যুবকের মানসিক গঠন সম্বন্ধে লেখকের ধারণা!

এবং এই সহানুভূতি ও বাহবাও এ উপন্যাসে লেখকের খামখা খেয়ালের নিয়ম ধরেই চলে। লক্ষ্মণ এই দুর্বল ছেলেটিকে নির্যাতন করে, আহা! লক্ষ্মী বাঁচায়, সাবাস! সতীর কাকাবাবু পুলিশের চর—এই কারণে তার বাড়ীতে জনতা হামলা করলে দীপঙ্কর সতীকে ঠিক নায়কের মতো বীরত্ব সহকারে বাঁচায়—আমরা বলি ধন্য ধন্য। পুলিশ কিন্তু সন্ত্রাস-

বাদী দমনের জন্য ঐ কাণ্ডের পরে কিরণের বন্ধু বলে দীপঙ্করকেই ধরে নিয়ে যায়—আমরা আবার বলি আহা! পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কোথায় সেই সতীর কাকাবাবু, যিনি পুলিশের লোক, যাঁর বাড়ীর মেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে দীপঙ্কর গুণ্ডার লাঠি খেয়েছে সে রাতে—তিনি দীপঙ্করকে বাঁচাতে আসবেন না? না। তিনি রাতারাতি বর্মা চলে গেছেন। না চলে গেলে আই-বি লক-আপে দীপঙ্করের দুঃখসাধনায় আর একবার বাহবা প্রদানের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। অতঃপর দীপঙ্কর এখানে নানাবিধ অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করে, যথা সন্ত্রাসবাদী না হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদের জন্য নির্যাতন ভোগ, দশহাজার টাকার লোভ সম্বরণ, প্রভৃতি। শেষের ব্যাপারটির ওপর লেখক বেশি জোর দিয়েছেন। কেউ টাকা ছেড়ে দিচ্ছে এটা লেখকের কাছে অভাবনীয় ত্যাগ স্বীকারের পরাকাষ্ঠা!

জেল থেকে বেরিয়ে দীপঙ্কর শুনল, সতীর বিয়ে হয়ে গেছে। সুতরাং চাকুরীর মধ্যেই সে নিজেকে লীন করে দিল। তার রেল অফিসের চাকরী ভালই চলছে এমন সময় একদিন সতী মোটর হাঁকিয়ে এসে হাজির। সতী দীপঙ্করের জন্মদিনে তাকে কাছে বসিয়ে খাওয়াবে। কেন? সতী কি দীপঙ্করকে ভালবাসত? বোধহয়। 'বোধহয়' কথার প্রয়োজন হত না। যাই হোক সতী যেদিন দীপঙ্করকে নিমন্ত্রণ করল সেদিন সেই বিশাল প্রাসাদে সতী ছাড়া আর কেউ নেই। স্বামী সনাতনবাবু ও শাশুড়ী নয়নরঞ্জিনী দেবী সে সময় পুরী গেছেন। সতীর আপ্যায়নে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের ছায়া, সে ছায়া প্রায় কায়ামূর্তি ধারণ করল খাবার ঘরে। একে সুন্দরী তরুণী আহারের পরিচর্যা করছে তায় অনেকগুলি থালাবাটিতে পরিপূর্ণ উপচার—ঠাকুর গরম লুচি একটি একটি করে ভেজে দিচ্ছে—মনোরম সিচুয়েশন—এমন সময়—শাশুড়ী নয়নরঞ্জিনী দেবী পুত্রসহ বাড়ীতে এসে উদিত হলেন। বৌয়ের এবম্বিধ স্বেচ্ছাচারিতায় তিনিও কাণ্ডজ্ঞানহীনা। দীপঙ্করের জন্মদিনের দিন ভাল করে খাওয়া হল না—সুতরাং আমরা আবার আহা বলতে বাধ্য হলাম।

এমনি নানাবিধ আহা প্রভৃতিতে বইটি পরিপূর্ণ। এবং তা উপন্যাসের কোনো গূঢ়ার্থের সংগে সম্পৃক্ত নয়। যে-কোনো সৎ উপন্যাসে দেখা যা যে জীবন-যুদ্ধের চাপেই সেখানে পাত্রপাত্রীরা বিভিন্ন ছকের সামনে দাঁড়ায়;—ছকগুলোকে ভাঙতে গড়তে তারা নিজেদেরও ভাঙে গড়ে—উপন্যাসের টেক্‌নিক্‌ও দাঁড়ায় সেই ভাঙাগড়ার টান সামলাতে সামলাতেই। এখানে? এখানে নায়ক তাৎপর্যবিহীন বলেই জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিও কোনো কাজে আসে না। তাই প্রথম চাকরী পাবার দিন বিকেলে তার মায়ের আপ্যায়নে স্বার্থপরতা আবিষ্কার করতে হয় তাকে—মা স্বার্থপর হলে নায়কের প্রতি স্বভাবতই আমাদের সহানুভূতি জাগে। অথচ সেই মুহূর্তের ব্যাখ্যা ছাড়া মাকে স্বার্থপর বলে ব্যাখ্যা দীপঙ্কর আর কখনো করেনি। কিরণের জন্য পুলিশ খোঁজ করতে এলে দীপঙ্কর পুলিশকে কিরণের খবর বলে। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। বললে অথবা না বললে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু দীপঙ্করকে সত্যসন্ধ নায়ক করে দেখাতে হবে—তাই দীপঙ্কর বিবেকের নির্দেশে পুলিশকে বলে কিরণ তার কাছে এসেছিল। নায়ক সত্যের জন্য কারো মুখ তাকায় না, দেশপ্রেমেরও না!

কাজেই গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রীর বাতিক মেটানোর জন্য দীপঙ্করের আটশ টাকা দান, লক্ষ্মণের চড় ভুলে গিয়ে তাকে চাকুরী প্রদান, কিরণের মাকে মাসোহারা প্রদান, ক্ষীরোদার বিবাহদান এবং সতীকে শ্বশুরবাড়ীতে পুনর্বাসনের জন্য দেড়লক্ষ টাকা দান এবং পরিশেষে সতীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা বরণ, সবই সাধারণ ভালমানুষির নিদর্শন

হয়েই রইল। লেখক বাল্মীকির কথা ভূমিকা দুটিতে দুচারবার পেড়েছেন। কিন্তু বাল্মীকির নায়কের তাৎপর্য তিনি একেবারেই ধরতে পারেন নি। বাল্মীকির নায়ক ভালমানুষির জন্য বিখ্যাত নন। সে নায়ক সত্যবোধের জন্য বিশিষ্ট—এই পথেই সে গৃহধর্ম এবং সামাজিক ধর্ম পালনে সম্পর্ক-সূত্রগুলির মূল্য নির্ধারণ করেছে, এবং সেই প্রসঙ্গে তার আত্মপরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে। বালিবধ, শূদ্রকবধ তার একদিক, বনগমন, সীতা-বিসর্জন, লক্ষ্মণ বর্জন, সরযূতে আত্মবিসর্জন তার অন্যদিক। দীপঙ্করের সত্যের জন্য আত্মপরীক্ষার যে সব হাস্যকর নমুনা দেখা গেছে তার যে কোনো একটিই এখানে স্মরণ করা যায়। প্রথমবার আই-বি লক-আপে সে যখন নির্যাতন সহ্য করছে তখনকার অবস্থাটা ভাববার মতো। সে কি কিছু জানত কিরণের দলবলের কথা? না। তাহলে তার বলে দেবার বা না দেবার প্রশ্নও নিরর্থক। তাকে পুলিশ বলেছিল মোটরে করে কিরণের কাছে গিয়ে কিরণকে দেখিয়ে দিক—সে কাজ তো পুলিশই পারে, সমস্যাটা তো কিরণকে সনাক্ত করার নয়। দ্বিতীয়বার যখন যুদ্ধের সময় পুলিশ এল কিরণের খোঁজে, জিজ্ঞাসা করল কিরণ এসেছিল কিনা—সত্যের ধর্ম রক্ষার্থে কিরণের কথা দীপঙ্কর বলে দিল। রামায়ণ মহাভারতের সত্যধর্মী নায়কেরা যখন সত্যরক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তখন তার মধ্যে জীবনের একটা অমোঘ চাপ অনুভব করি- সেই চাপটা থাকে বলেই পরীক্ষাটাও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এখানে সে চাপ বিন্দুমাত্র নেই। কাজেই বিবেকরূপী কিরণের গর্জন—তুই না প্রাণমথবাবুর ছাত্র, সত্যিটা বলেদে'—এ হুঙ্কার হাস্যকর।

ফলে লেখক যখন বুঝলেন নায়ক আহা-বাহবার চোরাবালিতেই প্রথমাবধি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখান থেকে তাকে টেনে নিতে তিনি পারলেন না; সে হোলো না কোনো পুরুষার্থে প্রদীপ্ত; এমনকি এদেশের সাধারণ উপন্যাসের নায়কেরও ঘটে-পটে যে সামঞ্জস্য তাও তার নেই—তখন সব অসামঞ্জস্য চাপা দেবার জন্য লেখক ভাবাতিশয্যের লোনা জলের বান ডাকালেন। সতী এ প্রসঙ্গে তার প্রধান উপাদান। দীপঙ্কর সতীকে ভালবাসত। নানা আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে ভালবাসাকে সে প্রমাণ করতে চেয়েছে। এ ব্যাপারটাকে ঠিকমত ব্যবহার করলে লেখক কথঞ্চিৎ সফলতাও হস্তগত করতে পারতেন। সেই লোভেই সতীর আখ্যানকে এ উপন্যাসের প্রধানতম আকর্ষণ হিসাবে লেখক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেটা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে দুটি কারণে। প্রথম, সতীর দিকে এ ভালবাসার স্বরূপ কী—তা নানা গোঁজামিলে জট পাকিয়েছে। দ্বিতীয়, সতীর দুঃখভোগ বা যন্ত্রণা বলে যাকে চিত্রিত করা হয়েছে তার বাস্তবমূল বড় দুর্বল—তাই সমস্ত ব্যাপারটি ফাঁপানো মনে না হয়ে পারে না। সতী দীপঙ্করকে ভালবেসেছিল কি? সতী আশা করতো দীপঙ্কর তার কাছে কিছু একটা চাইবে। সেটা লক্ষ্মীর জন্য টাকা—একথা যখন সতী জানল তখন সে কেঁদেছে এমনকি ক্ষোভে সে তখন দীপঙ্করের হৃদয়হীনতার জন্য তাকে আঘাত করেছে। নিঃসন্দেহে এটা দীপঙ্করকে ভালবাসারই প্রমাণ। এই সূত্র ধরে বিচার করলে সতী যে দীপঙ্করকে ফাঁকা বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিল তাতে দোষের কিছু নেই, সামাজিক অশোভনতা থাকতে পারে। কিন্তু তারপরেই সনাতনবাবুর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়াটা একেবারেই বিসদৃশ। সতী দীপঙ্করের কাছে বিয়ের আগে ক্ষণে অক্ষণে যেত। তখনই লক্ষ্মী যখন এটা সতীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল—তখন কুমারী সতী প্রেম ধরা পড়ে যাবার লজ্জায় আরক্তবদনা হয়ে উঠেছে। সতী যখন শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে দীপঙ্করের বাসায় এসে থেকেছিল, চাকর কাশী দীপঙ্করের গ্রাম সম্পর্কে কাকার মেয়ে ক্ষীরোদার একখানা শাড়ি

সতীকে দিয়েছিল--সেই সময়ে ভুল বুঝে সতীর ঈর্ষাত্মক কথাবার্তাও লক্ষ্যণীয়। এ দুটিও নিশ্চয় এই ইঙ্গিতই দেয় যে সতীর বিয়ে যেখানেই হোক ভাল সে দীপঙ্করকেই বাসে। তাহলে সনাতনবাবুকে একথা বলার মানে কি যে--তোমার মতো স্বামী পাবার জন্যই আমি সারা-শৈশব ব্রত অর্চনা করেছি? অথচ উপন্যাসে সে কথার কোনো অন্য সাক্ষ্য নেই। সতীর এইসব উদ্ভট কার্যকলাপকে সনাতনবাবুর সাত্ত্বিক নিরাসক্তি বিগলিত করার উপায়ক্রম বলে দেখা হলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু তাহলে সতীর দীপঙ্করকে বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যার অর্ধেকই ভুয়ো হয়ে যায়। লেখক বড় উপন্যাস-লেখক হয়েও এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝলেন না।

যাক ধরে নেওয়া গেল সতীর ব্যাপার বোঝা যায় না। বিশেষ নারী দুর্বোধ্য একথা যখন বাংলাদেশে চালু আছে তখন সতীকেও না হয় মেনে নেওয়াই গেল। কিন্তু তখনো আর একটা করণীয় লেখকের বাকী থাকে। সেটা হল--সতীর দুঃখভোগকে একটা চারিত্র প্রদানের অবশ্য কর্তব্য—যার অভাবে এই পৃথুলতা কিছুতেই মাঝারি অভিজ্ঞতার সাশ্রু-বিবরণ ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। সেটা করতে গেলে সতী-নয়নরঞ্জিনী-সনাতন-বাবুর সম্পর্কটি ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের জটিল ক্ষেত্র হিসাবেই রূপায়িত হওয়া উচিৎ ছিল। তবেই ব্যাপারটি অনিবার্য হোত, সমস্যা হয়ে উঠতো অপ্রতিরোধ্য। সে ক্ষেত্রে নয়নরঞ্জিনী দেবী হয়েছেন দুষ্টা শাশুড়ী এবং সনাতনবাবু হয়েছেন বেয়াকুফ স্বামী। কাঠামোটিতে এই কৌশল সতীর দুর্দশাকে ঘনীভূত করার জন্যেই অবলম্বিত হয়েছে। শাশুড়ী এবং স্বামীকে এভাবে খাড়া করে এমনকি লেখকেরও অস্বস্তি হয়েছে তাই পরে তাকে নানাভাবে সামলাবার চেষ্টা করেছেন। তাতে বিড়ম্বনা বেড়েছে বৈ কমেনি।

সতীর জীবনের সমস্ত শোচনীয়তা তখনই অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য ট্র্যাজেডির সম্মান পেতে পারে যখন সনাতনবাবুর অমীমাংসিত-চিত্ততা সত্যি, সত্যি বাস্তব বলে মনে হবে। সনাতনবাবুর বক্তব্য এই, 'সতীও ভাল, মামণিও ভাল'। সনাতনবাবু সতী সম্বন্ধে বলেন--'যে কোন পুরুষের পক্ষেই অমন স্ত্রী পাওয়া সৌভাগ্য' (পৃঃ ১৫৩; ২য় খণ্ড)। আবার তিনি তাঁর মা নয়নরঞ্জিনী দেবী সম্বন্ধে বলেন--'এমন মাও তো কোনো ছেলে পায় না দীপু-বাবু' (৩৭৯ পৃঃ ২য় খণ্ড)। ব্যাপারটা যদি যথার্থই এ আকার ধারণ করতে পারতো তাহলে সনাতনবাবুই হতেন এ উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডেরই ২১৪ পৃষ্ঠায় ঐ সনাতনবাবুই আবার বলেন--'আমার মামণিই কি সুখ চেয়েছিল, মামণি চেয়েছিল টাকা'। তাহলে মায়ের সম্বন্ধে সনাতনবাবুর প্রকৃত ধারণাটা কী? বস্তুতঃ এখানে একটা কথা স্পষ্ট —সনাতনবাবুর 'জগতে সকলই সত্য' এই মতবাদজনিত অমীমংসিতচিত্ততাকে সত্য বলে প্রতিভাত করাতে গেলে নয়নরঞ্জিনী দেবীর সত্য সম্বন্ধেও আমাদের ওয়াকিবহাল করা দরকার ছিল। সে জায়গায় তা না হয়ে নয়নরঞ্জিনী দেবী হয়েছেন অশালীন, ইতর, অর্থলোলুপ, নৃশংস এক মহিলা। তিনি সতীর ছেলের অপমৃত্যুর জন্যে দায়ী, তিনি বৌকে হারামজাদী বলেন, তিনি বাইরের লোকের সামনে পুত্রবধূর মাথায় জুতো চাপান। চরিত্রটির ভেতরে কোনো চরিত্রশক্তি না থাকার ফলেই সনাতনবাবুকে বোকা বলে মনে হয়েছে—দীপঙ্করের বিস্ময় পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও। এবং এ সমস্তের পরিণতিতে সতীর মাথায় জুতো চাপানো থেকে সমস্ত দুর্দশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহাৎ লৌকিক ব্যাপারের লৌকিক বিবরণী—এক কথায় একটা পারিবারিক কেচ্ছার ঊর্ধ্বে কাহিনী আর উঠতে পেল না। আসলে এ জটিলতা উপন্যাসে অভিপ্রেত ছিল না। অথচ লেখক

বইখানিকে মেদবহুল করার লোভে তাকে বাদ দিতেও পারলেন না। দীপঙ্করের দৃষ্টি-বিন্দুই উপন্যাসের মুখ্য প্রেক্ষাকোণ, সেখানে দীপঙ্করের দেখা দিয়েই সব কিছু দেখানো হচ্ছে—এ কারণেই এ জটিলতা এখানে ছিল অনভিপ্রেত। দীপঙ্কর তো সতীর পক্ষের চরিত্র কাজেই নয়নরঞ্জিনী দেবী নিজে নিজে সত্য হয়ে উঠতে পারলেন না। লেখক সেটা বুঝেই চাকর-বাকর, ঝি নানা চরিত্রের জবানি টেনে এনেছেন—তাতে তাঁর একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বইটির কলেবর যথেচ্ছ বাড়াতে পেরেছেন। কিন্তু মূল লক্ষ্য-সিদ্ধির কিছু হয়নি। এখানে একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হলেও না বলে পারছি না। উদাসীন নিরাসক্ত পুঁথিগত প্রাণ স্বামী যথার্থ শিল্প-সন্ধ উপন্যাসে হয় চন্দ্রশেখর—আর বহুল বিক্রয়-আকাঙ্ক্ষী উপন্যাসে হয় সনাতন। এ কথা বিশ্বাস করার জন্য চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় সতী ও ঘোষাল সাহেব উপাখ্যানে সতীকেও অর্থহীন, উদ্দেশহীন বলে মনে হয়—এবং সেটা শিল্পের দিক থেকে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন বলেই কু-শিল্প। সতীর জীবনেও বিরক্তি বা দুর্দশাজনিত ক্ষোভ ব্যতীত, এ অবস্থায় স্বভাবতই আর কিছু থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে সতীর শ্বশুরগৃহ ত্যাগ প্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রসঙ্গ অবতারণা অর্থহীন। সতীর ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে ব্যবহারেও কোনো যুক্তি নেই এই একই কারণে। সতী ঘোষাল সাহেবের কবলে থাকতে পারে, কিন্তু দীপঙ্কর যখন প্রস্তাব করে সতী তার কাছে গিয়ে থাকুক, সমস্ত খরচ দীপঙ্কর বহন করবে - তখন সতী বলে, দীপঙ্করকে সে অন্যপুরুষদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র বলেই জানে, এরকম প্রস্তাব সতী তার কাছে আশা করে না। ভাল কথা, আবার তার কয়েক পাতা পরেই দেখা যাবে সতীই বলছে দীপঙ্করের কাছে গিয়ে থাকবে—দীপঙ্কর বলে ছিঃ—অর্থাৎ কেউই সোজা করে কথা বলে না। এবং কী যে কখন বলে তা কে জানে! দীপঙ্করের সর্বজ্ঞতার যে একটা সীমা থাকতে পারে সে কথাও লেখক আর মনে রাখা অতঃপর সমীচীন মনে করেন না। সতীর শ্বশুরবাড়ীর চাকরবাকরদের কাছে সে হয়ে ওঠে 'নতুন দাদাবাবু'। দেখা যায় আড়ি পেতে তারা ঘণ্টা কতকের আলাপ নিখুঁত প্রত্যক্ষ উক্তিতে মুখস্ত বলতে পারে এবং দীপঙ্করকে জানাতে পারে। দেখা যায়—নয়নরঞ্জিনীর আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে তাঁর যে গোপন কথাবার্তা চলে দীপঙ্কর তাও সর্বজ্ঞ ভগবানের নিয়মেই জানে। অর্থাৎ লেখক গল্পের যুক্তিতে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করেন সেই যুক্তিতে যে যুক্তিতে গল্পের গরু গাছে ওঠে। লেখকের একটা বিশ্বাস আছে—বিশ্বাস আছে যে পাঠক এসব খুঁটিয়ে দেখবে না। সতীর মাথায় জুতো চাপানো, নয়নরঞ্জিনীর মাথা ঠোকা সনাতনবাবুর মাতৃ-ভক্তি এবং নানাবিধ করুণরসের পরিবেশনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাঠক সবকিছুর দিকেই চোখ বুঁজে থাকবেন।

কাজেই, যখন এই বিপুল গ্রন্থের মূল কাহিনীর অন্তঃসারশূন্যতার সুযোগ নিয়ে যত রাজ্যের ঠিকে ভুল এসে জড় হল তখন আর আমরা আশ্চর্য হই না। প্রথম খণ্ডের ৫৯২ পৃষ্ঠায় সতীর বিয়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বিয়ের সময় সতীর বাবা টাকা কম দিয়েছেন একথা নেই—দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৪৪ পৃষ্ঠায় সে কথাটা নতুন করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গাঙ্গুলীবাবুর শ্বশুর প্রথম খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠায় বর্ধমানের ভট্টাচার্যি বলে উল্লিখিত; ৭৯৯ পাতায় উনিই হয়ে গেলেন সরকার। দ্বিতীয় খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় ফাউল, ১৪ পৃষ্ঠায় মাটন হয়ে যাওয়াটা না হয় বাদই দিলাম। প্রথম খণ্ডের ৫০০ পৃষ্ঠায়

ঘুণাক্ষরেও জানানো হল না যে গাঙ্গুলীবাবু এম, এ পাশ, দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৯ পৃষ্ঠায় তাঁর মৃত্যুমুহূর্তে সেটা জানানো হল করুণ রসের ভিয়েন জমানোর জন্যে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দীপঙ্কর দেখা করতে গেছে—লেখকই বলছেন, দীপঙ্করকে লক্ষ্মী সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল (১ম খণ্ড ৪৮২ পৃঃ)। ঠিক তার কয়েক পৃষ্ঠা পরেই দীপঙ্কর অনুযোগ করছে 'কারো কথা কি তোমার জিজ্ঞাসা করার নেই'? (৪৮৮ পৃঃ)। এজাতীয় ব্যাপার এ উপন্যাসে অসংখ্য। সে অসংখ্যতা এমনই যে তার পৃথক তালিকা প্রণয়ন করলে সেটাই একটা পৃথক প্রবন্ধ হয়। দীনবন্ধুর নীলচাষীদের কে যেন একবার বলেছিল— বাবু বসে আছেন যেন গজেন্দ্রগামিনী—কথাটা খুব লোক হাসায়। দীপঙ্কর শিল্পে কিউবিজম জানে, (প্রথম খণ্ড ৫৭৭ পৃঃ) কিন্তু সেও সতীর গলায় বুকে 'মন্থরতা' দেখে, সে তো চাষী নয়, কাজেই আমরা আরো হাসি। লর্ড কার্জন ডালহৌসির আগে নয়, পরে। ১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনের কথাই স্মরণীয়--আকালি বিদ্রোহ নয়। রবীন্দ্রনাথ হিজলির নিহত বন্দীদের আত্মার 'সদগতির' জন্য মনুমেণ্টের তলায় সভা করেন নি--হত্যার প্রতিবাদের জন্য সভা করেছিলেন। এইসব সাময়িক বিপর্যয়ের মধ্যেই হারিয়ে গেল লক্ষ্মীদির ঋজুরেখ গতিশীল কাহিনীটি--যেখানে, একমাত্র যেখানেই মনে পড়ে এই পুস্তকের লেখকের কথা, যে কাহিনীটির মধ্যে প্রাণবস্তু ছিল, শিল্পবস্তুরও হয়তো অভাব হত না। কিন্তু কী হবে এসব কথা বলে। যে ব্যক্তি শিয়ালকাঁটার বীজের তেলে ভেজাল সর্ষের তেলের ব্যবসা করে তার মনে এ কথা কখনো হয় না যে তার তেলটা সত্যিই সর্ষের তেল হল না কেন? সে চায় ওটাই সর্ষের তেল বলে বিক্রী হোক। বিমলবাবুও যা চেয়েছেন, পেয়েছেন। চৌদ্দশ একাশি পৃষ্ঠার বই হয়েছে। বিক্রয় বাহুল্য—হয়েছে। এ 'ঘইয়ের' কারবারে পাপ হোয় তো কাসেম আলির হোবে—তাঁর কী?*

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

*কড়ি দিয়ে কিনলাম (১ম ও ২য় খণ্ড)—বিমল মিত্র। মিত্র ও ঘোষ। কলিকাতা-১২। মূল্য (একত্রে) ৩১·০০ টাকা।

সমালোচনা

Life and Letters of Raja Rammohan Roy. *By* Sophia Dobson Collet. *Edited By* Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli. Sadharan Brahmo Samaj. Calcutta-6; Rs. 18|-.

মিস সোফিয়া ডবসন কোলেট প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ *Life and Letters of Raja Rammohan Roy* গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদনা করেছেন দিলীপকুমার বিশ্বাস ও প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী।

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। এতদিনে রামমোহন সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর ডঃ যতীন্দ্রকুমার মজুমদার--ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যও সরবরাহ করেন। গ্রন্থখানির এই সংস্করণে সম্পাদক-দ্বয় সেইসব তথ্য টীকাসহ পাঠকদের গোচরে এনেছেন, আরো অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণাও তাঁরা গ্রন্থখানির বিভিন্নস্থানে করেছেন। এসবের ফলে বইখানির মূল্য অনেক বেড়ে গেছে– বইখানিকে কেউ যদি রামমোহন সম্বন্ধে একটি নতুন যুগোপযোগী রচনা বলেন তবে তিনি খুব অত্যুক্তি করবেন না। এমন শ্রম স্বীকার করে সম্পাদকদ্বয় রামমোহন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

মিস কোলেট জন্মেছিলেন এক একেশ্বরবাদী খৃষ্টান পরিবারে, কিন্তু পরে তিনি আস্থাবতী হন ত্রিত্ববাদে। রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন একথা সর্বজনবিদিত—সেজন্য একত্ববাদী খৃষ্টানদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ঘটেছিল। কিন্তু মিস কোলেট এবং তাঁর পূর্ববর্তী ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন--অবশ্য প্রমাণাদি দিয়েই—যে রামমোহন বিলাতে গিয়ে ত্রিত্ববাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন, এমন কি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে তিনি হয়ত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করতেন। উৎকৃষ্ট নৈতিক শিক্ষার জন্য খৃষ্টানধর্মের প্রতি রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধার কথা স্বীকার করেও সম্পাদকদ্বয় যোগ্যতার সঙ্গেই এই মতের দুর্বলতা প্রতিপন্ন করেছেন। মৃত্যুকালে রামমোহনের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ছিল আর অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে 'ওম্' উচ্চারণ করতে শোনা গিয়েছিল, এসব কথা স্বতঃই তাঁদের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এর চাইতে অনেক বড়ো যে ব্যাপারটি, অর্থাৎ ধর্মে ধর্মে ও মানুষে মানুষে মিলন সম্বন্ধে রামমোহনের গভীর ভাবনা আর আন্তরিক প্রয়াস, তার কথাও তাঁরা যথাযোগ্যভাবেই উপস্থাপিত করেছেন।

রামমোহনের চিন্তা ও উদ্যমের ব্যাপ্তি ও বহুমুখিতার কথা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু শুধু চিন্তা ভাবনার প্রসার ও বৈচিত্র্য নয় তাদের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে তাঁর বোধও ছিল পরমাশ্চর্য। সব মানুষের স্বাধিকার ভোগ, ধর্ম ও আচারের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও বিশ্বের সকল দেশের ও জাতির লোকদের প্রেমে ও কল্যাণে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ হবার প্রয়োজন, সেইদিনে অতি স্পষ্ট ভাবেই তিনি এই সব

জীবনবর্ধক সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। এ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদী রবার্ট ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে রামমোহন যে পত্রখানি লেখেন সেটি উল্লেখযোগ্য। এই পত্রখানি এই গ্রন্থের একটি নতুন সম্পদও। রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহনের প্রথম যে আলোচনা হয় তাতে তাঁদের দুইজনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল ধর্ম নিয়ে—ওয়েন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ধর্মমত প্রেম ও কল্যাণ-সাধনের উপরেই জোর দেয়, সেজন্য তেমন ধর্মমত মানুষের জীবনে কল্যাণকর বৈ অকল্যাণকর নয়, এই মত এই পত্রেও রামমোহন ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন রবার্ট ওয়েন ও তাঁর পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনের বিশিষ্ট মানব-কল্যাণমুখী চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়াসের প্রতি। বোঝা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর ও একালের যে ধর্মাশ্রিত ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ কল্যাণ-ভাবনা সেই দুয়েরই স্থান লাভ হয়েছিল রামমোহনের উদার মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে।

রামমোহন তাঁর সমসাময়িক স্বজাতীয়দের যথেষ্ট বিরাগ-ভাজন হন। তার মুখ্য কারণ, বহুকাল ধরে চলে আসা ধর্মাচারকে তিনি সমূহ অনিষ্টকর ও শ্রেষ্ঠহিন্দু চিন্তার বিরোধী জ্ঞান করেছিলেন। রামমোহনের এই কড়া সমালোচনার মূল্য সম্বন্ধে তাঁর স্বজাতীয়েরা যে অবহিত হননি তা নয়। জাতির পরম প্রিয় ও পরম শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একালে রামমোহনের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। কিন্তু রামমোহনের প্রতি তাঁর স্বজাতীয়দের বিরূপতা আজো যে আশানুরূপভাবে দূর হয়ে যায় নি তাও স্বীকার করতে হবে। অথচ মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে যাঁদের কিছু বোধ আছে তাঁদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে রামমোহনের নির্দেশের মূল্য না বোঝবার অর্থ তাঁর দেশ ও জাতির অনেকের ব্যর্থতার পথই আঁকড়ে থাকা। তবে যা পথ তার সন্ধান পেয়েও মানুষ তা অবলম্বন করতে দেরী করে, এ অনেক সময়ে দেখা গেছে। আমরা আশা করবো শুধু বাংলা ও বাঙালী নয় ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জাতি তাদের একালের শ্রেষ্ঠ গুরুর নির্দেশের মর্যাদা সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠবে কেন না, এই যুগ তার বিশেষ অনুকূল হয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদ

আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র—মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য ২·৫০ টাকা।

ইতিহাস-সম্পর্কে কার্লাইলের বক্তব্য আমি সমর্থন করি। একটা ঘটনার বিবৃতি দু'জনের একরকম হয় না। কাজেই ইতিহাসের সত্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। যুদ্ধের ইতিহাস ত আরো বিভ্রান্তিকর : বিবদমান দু'পক্ষ যুদ্ধের কার্যকারণ এবং পরিণতি দু'ভাবে বর্ণনা করবেই।

সত্যের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল বলেই হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না। যা ছিল তা বিদেশীর বিবৃতি। গ্রীক, চৈনিক, মুসলিম পর্যটকদের রচিত ঘটনাবলী। নিজের বলতে হিন্দুদের যা ছিল তা কিম্বদন্তী। রাজপুত চারণরা, চাঁদ কবি, কহ্লন প্রভৃতি বীর-গাথা রচনার প্রেরণাতেই ঐতিহাসিক। কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠায় সেসব রচনার

সার্থকতা খুবই কম। একই ঐতিহাসিক ব্যক্তির আলেখ্য হিন্দু আর মুসলমান লেখক হয়ত বিপরীত ভঙ্গীতে অঙ্কিত করেছেন।

উনিশ-শতকে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মনে বঙ্কিমচন্দ্র একটা ইতিহাস-সচেতনতার জন্ম দেন। তাই হয়ত ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর একশ বছর পর বাংলা কাব্যে ইতিহাসের কাহিনী সমাদর লাভ করতে সুরু করল। কিন্তু সে-ইতিহাস সবই মধ্যযুগীয়—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কাহিনী এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে তার তথ্য আহৃত। ইংরেজের করুণা-পুষ্ট বাঙালী হিন্দুদের পক্ষে তা-ই হয়ত সেদিন স্বাভাবিক ছিল। "আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র" গ্রন্থে এ সময়কার কাহিনী কাব্যই আলোচিত হয়েছে—সে আলোচনা এ শতকে রচিত যোগীন্দ্রনাথ বসুর ও সঞ্জীব চৌধুরীর কাহিনী-কাব্য পর্যন্ত প্রসারিত।

যে-স্থলে কাহিনীর সত্য-আহরণ দুঃসাধ্য সেখানে কাহিনীগত জীবন ও চিত্র প্রামাণ্য হতে পারে না। তাছাড়া রাজায় রাজায় যুদ্ধই যখন কাহিনীর উপজীব্য তখন সামাজিক জীবন ও চিত্রের প্রত্যাশা কোথায়? ইতিহাস সাহিত্য-গত হয়ে কাহিনী হয়েছে, আবেগ-ধর্মই এখানে বিচরণশীল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। সত্য তাই অবহেলিত এবং আক্রমণকারী পাঠান-মুঘল হিন্দুর লেখনীতে নিন্দিত। জীবন বর্ণনা করতে হলে জীবনে অনুপ্রবেশ করা চাই। এসব মধ্যযুগীয় কাহিনীতে (অবশ্য মৈমনসিং গীতিকার কথা বাদ) সে সুযোগ লেখকের থাকতে পারে না।

মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান কাহিনীকাব্যগুলোর আলোচনায় তদানীন্তন নানা মতামত উদ্ধৃত করেছেন এবং তাদের সত্যাসত্য-নির্ণয়-কল্পে অনেক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতিও তাঁর রচনায় সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর নিরপেক্ষ থাকবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশির যুদ্ধ" আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য এই : 'নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত স্বাধীনতার কামনার অংশীদাররূপে মুসলমানদের কল্পনা করতে, মুসলমানদের এ-দেশী বলে মেনে নিতে অসমর্থ।' তাঁর এই উক্তির উত্তরে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। স্বাধীনতার কামনাটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই আসে। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় উনিশ শতকে। তখনও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত হয়নি। সে-শ্রেণীর উদ্ভব এ-শতকে ইংরেজেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। হিন্দুমুসলমানের নিজস্ব সমবেত চেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মারফৎ যদি দুই সম্প্রদায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হত তবে হিন্দুমুসলমানের স্বাধীনতাকামনা একসূত্রে গাঁথা হবার সুযোগ পেত। আবেগের পথে ঐক্য সম্ভবপর হলে মধ্যযুগীয় সাধুসন্তরা এবং গান্ধীজি বিফল হতেন না।

ঐতিহাসিক কাহিনীকাব্যের আলোচনার উপসংহারে মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান বলেছেন : 'কাব্যমূল্যে মহৎ সৃষ্টি না হলে চরম ঐতিহাসিক সততাও অনর্থক।' মহৎ সৃষ্টি জীবনবেদের অপেক্ষা রাখে, ইতিহাসের নয়। মুসলিম জীবনের অভিজ্ঞতা আলোচিত কাব্যকাহিনীগুলোতে খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না—অভিজ্ঞতার গভীরতা ত নেই-ই যা দিয়ে মহৎ সৃষ্টি হতে পারে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

The Empty Canvas. *By* Alberto Moravia. *Translated By* Angus Davidson. Secker & Wurburg. London. 18*s*.

নিজের অধুনাতম উপন্যাসের সম্বন্ধে মোরাভিয়া বলেছেন : People say that it is my sexiest book, and they are correct. But it is also my most chaste.

মানুষের যৌনতার অনুসন্ধানের মধ্যে বিশুদ্ধতা বা সাধুতার কথা হেঁয়ালি অথবা চালাকি বলে মনে হতে পারে। বস্তুতঃ মোরাভিয়ার কয়েকটি ছোট গল্প বাদ দিলে যৌনতাই তাঁর সমস্ত লেখার উপজীব্য। তাঁর সব লেখাই অল্পবিস্তর অশ্লীল। তবু তা সাহিত্য, এবং একালের লেখকদের মধ্যে মোরাভিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক। এবং *The Empty Canvas* সম্বন্ধে লেখকের উক্তি হেঁয়ালি বা চালাকি নয়। সাহিত্যে অশ্লীলতার দোষ-খণ্ডনে আমার প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু অশ্লীলতা কীভাবে সাধুতা অর্জন করে তা অবশ্যই বিচারযোগ্য।

যেহেতু মানুষের সমস্ত সংস্কারের মধ্যে যৌনসংস্কার অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে সেহেতু মানুষের সত্তার অনুসন্ধানে তার ভূমিকা কোনোদিনই গৌণ নয়। তদুপরি বর্তমান সমাজে, অন্ততঃ ইয়োরোপীয় সমাজে তো বটেই, অন্যান্য বিশ্বাসের অবক্ষয়ের ফলে মানুষের যৌনচিন্তা ও ব্যবহারের মধ্যদিয়ে তার সত্তার একটি গভীর মূর্ত এবং অপেক্ষাকৃত নির্ভেজাল আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেই আত্মপ্রকাশের প্রকৃতি সামাজিক সুনীতির মানদণ্ডে ভালো কী মন্দ এ প্রশ্ন সেখানে অবান্তর যেখানে উদ্দেশ্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে তার অভিব্যক্তির মধ্যদিয়ে অনুধাবন করা। মানুষের সম্বন্ধে মননশীল ব্যক্তির চিন্তা বা স্পর্শানুভূ মনের বোধ সামাজিক সুনীতিবোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে না। আত্মবহির্ভূত, অন্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে সার্থকভাবে অনুধাবন করার মধ্যে শিল্পের অন্যতম সার্থকতা। অতএব বিশিষ্ট মানবপ্রকৃতির যে কোনো দিক দিয়েই তার সম্পূর্ণতম বা বিশুদ্ধতম অভিব্যক্তি হোক, সেই দিকটিই শিল্পগ্রাহ্য, এবং শিল্পসম্মত। উপন্যাসের চরিত্রের যৌন অভিব্যক্তিকেই যদি তার বিশিষ্টতম অভিব্যক্তি বলে কোনো ক্ষেত্রে মনে করা যায়, তবে তার যৌনতাকেই সেই চরিত্রের সম্পূর্ণতম, এবং বিশুদ্ধতম আত্মপ্রকাশ বলে মানতে হয়। বিষয়বস্তু যেখানে যৌনতা, সেখানে আসক্তিহীনতাই লেখকের সাধুতার পরিচায়ক, এবং যৌনতার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্তর্নিহিত রূপটিকে পরিস্ফুট করাতেই রচনার সার্থকতা।

বিষয়ের প্রতি আসক্তিহীনতাকে ও বিশ্লেষণী প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিকগুণে বিভূষিত করা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের গবেষণার প্রতি মমতা বৈজ্ঞানিক মনেও জন্ম নেয়, এবং সঙ্গীতের মতো উন্মাদনাও সৃষ্টি করে। কোনো এক অদৃশ্য সীমা লঙ্ঘিত হলে এই মমতা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের নির্ভুলতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে বিষয়ের প্রতি আসক্তিহীনতারও একটি ন্যূনতম মান আছে, যার নিম্নতর স্তরে বিষয়ের প্রতি মানবিক মমতাও অন্তর্হিত হতে বাধ্য। এখানে বিষয় ও বিষয়াশ্রয়ী চরিত্রের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন হয়ে পড়ে। চরিত্রের প্রতি মমতা বিষয়ের মধ্যেও কিছুটা চারিয়ে যায়। এবং সম্পূর্ণ মমতাহীনতার স্তরে আত্মবহির্ভূত চরিত্রসৃষ্টিই প্রায় অসম্ভব। আত্মবহির্ভূত বা আত্ম-নিরপেক্ষ অর্থে এখানে আত্মজীবনাশ্রিত রচনাকেও বাদ দেওয়া চলে না, কেননা সার্থক রচনাতে আত্মজীবনীও আত্মনিরপেক্ষ চরিত্রচিত্রণের কিছু গুণ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ আসক্তিহীনতা ও শিল্পবহির্ভূত আসক্তির মাঝখানে এক বিস্তৃত ভূমি রয়েছে যা শিল্পের

বিচরণক্ষেত্র।

মোরাভিয়ার কোনো এক পূর্বতন উপন্যাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে নিউ-রিয়্যালিস্ট চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঐ উপন্যাসের প্রকৃতির তুলনা করেছিলাম। দুয়ের মিল সেই ভূমিতে পাওয়া গিয়েছিল যেখানে লেখক বা চলচ্চিত্র পরিচালকের একটা আপাতনির্লিপ্ততা আছে এবং সেই বাহ্য নির্লিপ্ততাই চরিত্রের প্রতি মমত্ববোধকে একাধারে মর্যাদা ও তীব্রতা এনে দেয়।

বর্তমান উপন্যাসকে মোরাভিয়ার most chaste বলতে আমার কোনো বাধা নেই। বরঞ্চ মনে হয় যে বিষয়ের প্রতি লেখকের আসক্তিহীনতাই যদি শিল্পগত সাধুতার মাপকাঠি হয় তবে সাধুতার পরীক্ষায় মোরাভিয়া উত্তীর্ণ হলেও চরিত্রের প্রতি মমত্ববোধ এত নিভৃতে অপসৃত হয়েছে যে তার নিভৃতবোধও বোধ হয় কাল্পনিক। বালক আগস্তিনোর যৌনতার উজ্জীবনের মধ্যদিয়ে মোরাভিয়া বিচিত্রভাবে তার সুকুমার মনকে আমাদের কাছে উদ্বোধিত করেছিলেন; এই সুকুমারতা এখনো আমাদের মনে প্রসাদসঞ্চার করে। এখানে সাধুতা ও মমতার এক সার্থক সম্মেলন ঘটেছিল। কিশোর লকু সম্পর্কেও একথা অনেকখানি খাটে। অপরপক্ষে *Woman of Rome* এর মধ্যে আসক্তির খাদ আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই উপন্যাস প্রাণচঞ্চল। বর্তমান উপন্যাসে বিষয়ের যৌনতা আরো পরিব্যাপ্ত এবং গভীরও বটে, এবং সেই অনুপাতে লেখকের আসক্তিহীনতাকে আরো বেশি সাধুতার অভিনন্দন জানাতে হয়। কিন্তু আশঙ্কা হয় যে আজকের কোনো কোনো পরমাণুবৈজ্ঞানিকের মতো মোরাভিয়ার বিশ্লেষণী শক্তিও বিষয়ের মধ্যে সার্থকতাবোধ হারিয়ে ফেলে আসক্তি ও মমতার অপরপারে অবসর নিচ্ছে। এখানে মমত্ববোধ বড় বেশি অন্তর্হিত।

The Empty Canvas পড়তে পড়তে জোলার *Therese* বা ঐ জাতীয় কোনো কোনো উপন্যাসের কথা মনে হয়। ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সেই অমোঘতার বোধ; চরিত্র যেন সমস্ত কিছু থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে নিজের এক অসহ্য উন্মাদনার মধ্যে ছুটে চলেছে। বর্ণনার মধ্যেও সেই স্পষ্ট দৃঢ়তা, সেই গভীর মনোনিবেশ। কিন্তু জোলার ঐ রচনার যে উত্তাপ ছিল তা এখানে নেই। শবব্যবচ্ছেদের শীতলতা এখানে। শেষার্ধের দীর্ঘ এক একটি অধ্যায় পড়লে মনে হয় নায়ক নায়িকার মনোবিকলনের চেষ্টায় অসম্ভব অধ্যবসায়ী। মোরাভিয়ার বিশ্লেষণী প্রতিভার চূড়ান্ত স্বাক্ষর বোধ হয় এই উপন্যাসেই মেলে। পরিস্থিতিকল্পনায়, ঘটনাবর্ণনায় দক্ষতার কোনো অভাব নেই। যৌনতার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে, তার মধ্যে অন্ত প্রবেশ করে নায়ক একটি আসক্তিহীন নারীর সত্তাকে ধরে ফেলার অশেষ চেষ্টায় ব্যাপৃত, কিন্তু কিছুতেই সে চেষ্টার কোনো পরিণতি নেই। হয়ত এই কারণে যে যৌনতা মানুষের যত মৌলিক সংস্কারই হোক না কেন, একমাত্র তার মধ্য দিয়েই সত্তার প্রত্যন্তসীমায় পৌঁছনো অসম্ভব; কিম্বা হয়ত ঐ পথ দিয়ে মানুষের নতুন আবিষ্কার আর মোরাভিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়, যা কিছু বলার ছিল সবই সমাপ্ত। হয়ত *The Empty Canvas*-এর শূন্যতা শুধু চরিত্রের বা পরিস্থিতির মধ্যেই নয়, লেখকের মনের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

শ্রাবণী—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়। কলিকাতা, ১২। মূল্য নয় টাকা।

খুব সম্ভব "ইস্পাতের স্বাক্ষরে"র পরে "শ্রাবণী"ই লেখকের দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রন্থ। বিষয়-বস্তু আলাদা, রচনা-কৌশলও স্বতন্ত্র। প্রথম বইখানিতে অনেক চরিত্রের ভীড় এবং তাদের মধ্যে শ্রমিক চরিত্রের সংখ্যাই বেশী। অপর বই-তে স্বল্প কয়েকটি চরিত্রের আনা-গোণা, আর তারা প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। ঘটনা-কেন্দ্রও এসেছে বার্ণপুর থেকে কলকাতায়।

দুইটি বইয়ের তুলনামূলক বৈষম্যটা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে এই বৈষম্যের কারণ নিছক বৈচিত্র্যবিলাস নয়। লেখকের ব্যবহারিক এবং আত্মিক যোগাযোগ মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে; তাই অন্যত্র বিচরণ করার মত কল্পনার ঔদার্য লেখকের থাকলেও বারবার সে-চেষ্টা করা যায় না। করতে গেলেও নিছক পুনরাবৃত্তির চেয়ে বেশী কিছু ফল লাভ করার সম্ভাবনা থাকে না। বিশুদ্ধ বাস্তববাদী মনের কাছে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক সমাজের মধ্যে কেবল চাহিদা-গত বৈষম্য নয়; যেটুকু বৈষম্য থাকতে পারে সেটা অভিজ্ঞতার স্বল্পতা বা ব্যাপকতার। কাজেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি লেখকের যে পক্ষপাত আছে বলে আমি আশঙ্কা করছি তার কারণ তাঁর মন রোমাণ্টিক ঘেঁষা।

রোমাণ্টিক গৌরীশঙ্কর একবার শখ করে বাস্তববাদী হতে চেয়েছিলেন আমি সে-কথা বলছি না। একজন লেখকের মধ্যে যে রোমাণ্টিক আর বাস্তববাদী প্রবণতা পাশাপাশি সহাবস্থান করতে পারে না এমন নয়। শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেক লেখকের মধ্যেই এই সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বর্তমান কালে এই দুটি প্রায় বিপরীতধর্মী প্রবণতার সমন্বয়ের বিশেষ উপযোগিতা আছে। আজকের দিনের সমাজজীবনে এত জটিল সব সমস্যা আছে যে নিছক বাস্তববাদী তার মধ্যে হারিয়ে যাবেন, হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি-গুলির অনুশীলন করার অবকাশই হয়তো পাবেন না। পক্ষান্তরে এ যুগের বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক মানস বাস্তব সচেতনতার অভাবে জীবনের গভীরে অবতরণ করতেই পারবে না, তার ফলে অগভীর উদ্দেশ্যহীন জীবনের সঙ্গে যোগ-শূন্য আবেগ অনুভূতি নিয়ে তাকে কাল কাটাতে হবে। যিনি এ যুগের বাস্তব সমস্যাগুলো জানেন, অথচ যিনি মূলত সাহিত্যে একটি আবেগ অনুভূতি সৌন্দর্যের জগৎ গড়ে তুলতে চান তাঁর পক্ষেই এ যুগের কাব্য লেখা সম্ভব।

কাজেই আমার মনে হয় গৌরীশঙ্করের মনে যে বাস্তববাদ ও রোমাণ্টিকতার সংমিশ্রণ রয়েছে তা অদূর-ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-ফসল সৃষ্টি করতে সক্ষম হতে পারে। আমাদের আলোচ্য "শ্রাবণী" উপন্যাসখানি লেখকের সমগ্র পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র; এবং যদিও লেখক ভূমিকায় দাবী করেছেন যে উপন্যাসটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তবে সে-দাবী কত-খানি স্বীকৃতিযোগ্য তা বিতর্ক-সাপেক্ষ।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু চরিত্রকে অবলম্বন করে এপিক উপন্যাস লেখার প্রচলিত ধারাকে লেখক অনুসরণ করেন নি। তাঁর কাহিনীর মধ্যমণি পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের একটি ছাত্রী। সেই ছাত্রীটিকে কেন্দ্র করে আর কয়েকটি চরিত্র, মালিনী, শ্রীহর্ষ, বিজয়গুপ্ত, মহিম প্রভৃতি, ঘুরপাক খাচ্ছে। কোন চরিত্রই ঠিক জীবনের সরল সহজ শড়কটি থেকে সংগৃহীত নয়। প্রত্যেকের পিছনেই রয়েছে একটি করে রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাস যা হঠাৎ প্রায় নজরেই পড়ে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর

সমাজের দ্বন্দ্বের ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে চরিত্রগুলির পিছনের ইতিহাসে সেই দ্বন্দ্বই বিচিত্ররূপে উপস্থিত রয়েছে। কাজেই চরিত্র পরিকল্পনার পিছনে লেখকের মননশীলতা যে সক্রিয় ছিল তা অনুভব করা যায়। উদাহরণ হিসাবে মালিনী চরিত্রটি উল্লেখ করা যায়। মালিনী শ্রাবণীর নিজের মা নন, পালিকা মা। দুশ্চরিত্র জমিদার স্বামীকে চড় মেরে তাঁর বাড়ি ছেড়ে এসে তিনি তার বোনের মেয়েকে নিয়ে একক জীবন-যাপন করছেন। জামাইবাবু মহিমের প্রতি তাঁর গোপন আকর্ষণ জন্মেছিল; কিন্তু সেই অপরিতৃপ্ত কামনা তীব্র ঘৃণার রূপ নিয়েছে। ক্ষোভ, ঈর্ষা, তিক্ততা, রিক্ততা এবং গভীর অভিমানবোধের সঙ্গে স্বভাবসুলভ ভালবাসা পাওয়া ও দেওয়ার অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা এবং তেজ ও দর্প মিলিত হয়ে মালিনীকে একটি অতি জটিল চরিত্রে পরিণত করেছে। মালিনী যেন এ-যুগের ধ্বস-নামা জীবনের এক প্রতিমূর্তি।

বিজয়ব্রত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর পরোপকারী একজন সাংবাদিক। কিন্তু সে বহু-প্রেমিক। সে বিবাহিত জেনেও শিক্ষয়িত্রী নিরুপমা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজী নয়, কারণ তাকে বাদ দিয়ে সে বেঁচে থাকার কথা কল্পনা করতে পারে না। বিজয়ব্রতর এই শুভাশুভ মিশ্রিত চরিত্রের কারণ হল আসলে তার জীবনের গভীরে কোন শিকর নেই। জীবনের সরোবরে সে একটি খুব সুন্দর আকর্ষণীয় ভাসমান ফুল। অপ্রতিরোধ্য কামনার তাগিদে সে অন্যায় করে না, অন্যায়কে প্রতিরোধ করার মত কোন প্রবল যুক্তি তার মনে নেই বলে সে অন্যায় করে।

এই জাতীয় কয়েকটি চরিত্রের মাঝখানে শ্রাবণীর অবস্থা অনেকটা সপ্তরথী বেষ্টিত অস্ত্রহীন অভিমন্যুর মত। তার পারিবারিক পরিবেশ এমন দ্বিধাবিভক্ত যে তার উপর কোন শক্ত নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। কলেজ-জীবনে সে কতকগুলি কাঁচা রোমাণ্টিক মনের সংস্পর্শে আসে। আর তার বাইরের জীবন যত বিস্তৃত হচ্ছে ততই নানারকম প্রভাব তার উপর এসে পড়ছে যে-সব থেকে আত্মরক্ষা করার মত উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতির অভাব আছে তার মধ্যে। শ্রাবণী হল এ যুগের অসহায় ছেলেমেয়েদের প্রতিনিধি। তাদের মনে কল্যাণবুদ্ধি যে নেই তা নয়; কিন্তু তাদের পায়ের তলার মাটিতে অজস্র ফাটল, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, আর কোন আড়াল নেই বলে তাদের গায়ে অবিরত উল্টোপাল্টা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা লাগছে। স্বভাবতই শ্রাবণী যখন শ্রীহর্ষের চুম্বনাকাঙ্ক্ষার কাছে ধরা দিচ্ছে তখন তার মন এই প্রথম নৈতিক স্খলনের জন্য অনুশোচনায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু যখন আরও বড় শত্রু বিজয়ব্রতের প্রসারিত বাহুর কাছে সে ধরা দিচ্ছে তখন তার মনে বিশেষ কোন নৈতিক দুর্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই দুয়ের মাঝখানে একটি সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবের প্রতিও তার সম্মতি আছে। তার মধ্যে যে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা আছে তা কোন নির্দিষ্ট পাত্রের উপর কেন্দ্রীভূত হতে পারছে না। তার মন অপরিণত, অনির্দিষ্ট, অসংগঠিত।

বাস্তব-জিজ্ঞাসার এই চিত্রকে পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যবহার করে গৌরীশঙ্কর একটি রোমাণ্টিক কাহিনীর অনুকূলে পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। কফি হাউস, কার্শিয়াং, বনাঞ্চল, জন্মদিনের পার্টি, শখের থিয়েটার প্রভৃতি রোমান্সের পক্ষে উপযোগী ক্ষেত্রগুলি ঘটনার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মননশীলতা কাহিনীর পিছনে রয়েছে, কাহিনীকে কোথাও ভারাক্রান্ত করেনি। রোমান্সের জন্য উন্মুখ একটি তরুণীর অনির্দিষ্ট রোমাণ্টিক স্বপ্ন, এবং বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্রে তার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে—এই হচ্ছে

কাহিনীর প্রধান অবলম্বন। এই তরুণীটির দৃষ্টি দিয়ে আমরা জগৎকে দেখতে পাচ্ছি এবং বাস্তবের রূঢ় রূপটি খুব ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে।

লেখকের রচনাকৌশলের মধ্যেও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ বা চরিত্র-বিশ্লেষণকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। আধুনিক রম্য-রচনার উপজীব্য ঘন ঘন নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির কৌশলও তিনি পরিহার করেছেন। লেখক যে গভীর রসের সন্ধানী, হঠাৎ চমক লাগানোর শস্তা কৌশলে তিনি যে বিশ্বাসী নন,—এই বিশেষত্বগুলো তারই প্রমাণ। কাহিনী এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে আর কতকগুলি নাটকীয় সম্ভাবনা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে রাখে।

এ যুগের নৈতিক সমস্যা ও তার মানস ক্ষেত্রকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য লেখক যে আঙ্গিকের সাহায্য নিয়েছেন আমি তার উপযোগিতা স্বীকার করি। তবু আমার মনে হয় এ আঙ্গিক ত্রুটিহীন নয়। কাহিনীর গতি মন্থর হওয়ার দরুন কোন কোন ঘটনার অনাবশ্যক বিস্তার ঘটেছে। উপন্যাসে ঘটনার পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বর্ণনা এবং ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পারম্পর্য বজায় রাখতে না পারলে সংহতির অভাব ঘটে, কাহিনীতে লক্ষ্যভ্রষ্টতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এই দিকটাতে লেখক আর একটু নজর দিলে ভাল হত। তাছাড়া সমস্ত জগৎটাকে একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীর চোখ দিয়ে দেখার ফলে বিভিন্ন চরিত্রগুলি সরাসরি পাঠকের সামনে উপস্থিত হতে পারেনি। ছোট বইতে এই কৌশল অনেক সময় খুব কার্যকরী হলেও, বড় বইতে তা বরং অসুবিধাই সৃষ্টি করে। আঙ্গিকের এই ছোট খাটো ত্রুটি সত্ত্বেও বইখানি আগাগোড়া পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখে।

অচ্যুত গোস্বামী

সে নহি সে নহি—চাণক্য সেন। ক্লাসিক প্রেস। কলিকাতা ১২। মূল্য দশ টাকা।

বাস্তববাদী উপন্যাস বলে আজকাল যা হৈহৈ করে চলে যাচ্ছে সেখানে প্রথমেই বাস্তবিকতার নামে মিথ্যাচারই পুঞ্জিত; নিত্যনব পটভূমি-অন্বেষণে কোন কার্পণ্য নেই, কিন্তু পটভূমির চরিত্র অপেক্ষা অভিনবত্ব আকর্ষণীয় হচ্ছে, অভিজ্ঞতার তালিকা প্রণয়নে দারিদ্র্য নেই, কিন্তু নিঃস্বতা ফুটে উঠছে চরিত্রকল্পনার বলিষ্ঠতায়, যথাযথ চিত্রচরিত্র আত্মীয়তা নির্মাণের কাণ্ডজ্ঞানে; এক কথায় রিপোর্টাজ পাচ্ছি, সাহিত্যসৃষ্টি সুদূরপরাহত, বাস্তবতা আসছে, সত্যসমীক্ষা হচ্ছে না। তদুপরি মহৎ উপন্যাসের যা অন্তঃসার, মানবজীবনে নবদিগন্তের জিজ্ঞাসা ও অভীপ্সাক্ষেপণ, বৃহৎ কোন অভিলাষ ও প্রচেষ্টার, মহৎ কোন কল্পনা ও আদর্শের, ধারণা ও ধ্যানের সুবলয়িত সম্প্রসারিত পরিণতিলাভ, তা আজ, বিশেষত, এদেশের উপন্যাসে বিরল ঘটনা।

এমতাবস্থায় যে কোন বৃহৎকায় উপন্যাস হাতে এলে মন আশা ও আশঙ্কা সমভাবে জপতে থাকে। বর্তমান উপন্যাসের বেলায় অবশ্য আশঙ্কার চেয়ে আশাই কাজ করেছে বেশি। কেননা চাণক্য সেন ইতিপূর্বে তাঁর "রাজপথ জনপথে" অন্য কয়েকটি লক্ষণে কিছু দুর্লভ সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, সর্বোপরি একটি সচ্চরিত্রতার অভিজ্ঞান রেখেছিলেন। তবে সেখানে একটা ভয় শেষাবধি অনেকখানি আনন্দ হরণ করেছিল, সে হল,

তাঁর জীবিকাধর্ম তাঁর জীবন ধ্যানকে না গ্রাস করে।

আধুনিক বিশ্বমুখী ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর পটভূমিকায় কাহিনীর সুরু। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রধানতম প্রাণ ও পরীক্ষাকেন্দ্র দিল্লীর পরিপ্রেক্ষিত স্বভাবতই অচিরে সাম্প্রতিক কালের বিচিত্র জীবন ও জীবিকা সমস্যায় ঘনীভূত ও পীড়িত হয়ে উঠবে, উঠেছেও তাই : তার একদিকে আমাদের ঐতিহাসিক জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তামিলনাদের বীরাঙ্গনা সাবিত্রী আম্মা, অন্যদিকে হালের বিজ্ঞানশিক্ষা ও আদর্শ-ব্রতী বাঙ্গালী নারী দেববাণী। একজন দেশহিতে সব দিয়েছেন, এখন সনাতন সত্যাগ্রহ ও আদর্শবাদিতা ছাড়া মানবকল্যাণের সমস্ত পুঁজি নিঃশেষিত, অন্যজন দেশের চেয়েও বড়ো যে মানবহিত সেজন্যে তাঁর সুচিন্তিত অভিলাষের সঙ্গে সুপরিকল্পিত ব্যবহারিক প্রচেষ্টা যুক্তবিনিয়োগ করতে উদ্যোগী, কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল, উদ্যম নিঃসহায়, তাই, বলতে গেলে, পরিণতিহীন। সুতরাং স্বাভাবিক ভূমিকায় মাঝখানের বাধা ও বিপত্তিগুলি ইত্যবসরে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সদ্যোজাত বিবিধ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ছাড়াও অনুরূপ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মোহে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্ণধারদের যে সন্দিগ্ধ মনোভাব কূটনীতির সুতোয় সুতোয় লালফিতে ও ফাইলের আনাচেকানাচে আবদ্ধ, অনর্গল আশ্বাস ও অপরিমিত কালক্ষেপে যা সুদীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থ-তারই নামান্তর, সেই ইতিহাস উদ্ঘাটন করতে, যেন এই দুই নারী—দক্ষিণ ও পূর্বভারত থেকে, প্রাচীন ও নবীন কালের আশ্চর্য আকর্ষণে এক অভাবনীয় সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছেন, দেখা যায়। যদিচ প্রাচীনার শেষ উপলব্ধি শেষ দান আত্মত্যাগ, নবীনার প্রাথমিক জ্ঞান, প্রাথমিক উপলব্ধি আত্মপ্রতিষ্ঠা। বাস্তবের দিকে চাইলে এই তো স্বাভাবিক। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ব যুগে যাঁর সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাঁর জীবনবেদ আর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে গঠনসৃজনের যুগে যাঁর সংগ্রাম শুরু হয়েছে বা হচ্ছে তাঁর জীবনবেদ বিভিন্ন হতে বাধ্য। তবু তাঁরা মিলেছিলেন। আর তাঁদের মিলিত প্রয়াস ও অপপ্রয়াসে গণতন্ত্রের হাঁটুভাঙ্গা সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর ব্রিটিশ রাজত্ববাহিত মেধাকল্পনাহীন সচিববৃন্দের বাকচাতুর্য স্ব স্ব ভূমিকায় বেশ বিশ্বাস্য রূপ নিয়েই সমুপস্থিত। গল্পের দিকে অধিকন্তু আছে সাবিত্রী আম্মার বেশান্তগান্ধী শিষ্যত্বে প্রাচীন সমাজ সংস্কারভাঙ্গা নির্ভীক সংগ্রামী আন্দোলনের ইতিহাস-বিচিত্রা আর পাশাপাশি দেববাণীর বলিষ্ঠ চরিত্র মাতা-ভগিনী বান্ধব সর্বস্ব ব্যক্তিগত জীবনের অপচয় ও পুনরভ্যুদয় কাহিনীবাহিনীর বিসর্পিলতা। এবং সর্বোপরি আছে এই দুই নারীর দুই অপ্রেমের জাতক, স্ব স্ব গর্ভে লালিত, উভয়ের স্বামীসংসর্গ উভয়ের কাছেই অবাঞ্ছিত সত্ত্বেও, একরকম অভিশাপের ভার, অবশ্যই বিভিন্নভাবে ও অবস্থানে। তাই এঁদের ব্যবহারিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা উত্থান কাহিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সেই কণ্টকর করুণ ও আত্মগ্লানিকর স্খলনপতন-কাহিনীও যথাসম্ভব যুক্ত করার চেষ্টা দেখা দিয়েছে। আর, আমাদের মনে হয়, সেখানেই কাহিনী ও চরিত্রের বিপর্যয় শুরু হয়েছে; অথচ বুঝতে পারি লেখক সেখানেই কৌশল ও নৈপুণ্যযোগে সার্থক হতে চেয়েছিলেন, হতে চাওয়া স্বাভাবিক।

ব্যাপারটা বিশদ করা দরকার। সাবিত্রী ও দেববাণী দুজনেই আদর্শবাদী আদর্শ-সন্ধানী ও জীবনে সতত সংগ্রামশীল। তাঁদের এই আদর্শবাদিতা ও জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় জীবনবৃত্তান্তের অনেক কাহিনীই সবিস্তারে বলা যায়। লেখক তথ্যনিষ্ঠ ও সত্যসন্দ ভঙ্গিতে বলেছেনও, তাঁর কল্পনাবৃত্তি ও সৌন্দর্যদৃষ্টিরও প্রতিফলন ঘটেছে

সেখানে, বারংবার। কিন্তু এ'দের দুজনের ব্যক্তিগত জীবনের দুই জটিল গ্রন্থি তাঁদের অনীপ্সিত স্বামীসঙ্গ ও দুঃখজনক সন্তানভাগ্য। দেববাণীর ক্ষেত্রে একই ঘটনা অবশ্য সাবিত্রীর তুলনায় স্বতন্ত্র ও জটিলতর, তাঁর স্বামী প্রথমে রোমাণ্টিক ভালবাসার, পরে দুর্দমনীয় ঘৃণার পাত্র। ইত্যবসরে পুত্র এসেছে। তাকে নিয়েই তার স্বপ্নজাগরণ, তাকে মানুষ করেই তার পরিপূর্ণতা এই সে ভাবতে চায়। অথচ সাবিত্রীর স্বামী আগাগোড়াই সাবিত্রীর কাছে অনিচ্ছার আড়ম্বর, এমনকি অধিকবয়সে, অকালে, দেববাণীর বিপরীতক্রমে, যখন কন্যা এল তখন সাবিত্রী সেই কন্যার প্রতি স্নেহ দূরে থাক, আশা আকাঙ্ক্ষা বাহুল্য, করুণা করতেও অনিচ্ছুক। তাছাড়া দুজনের জীবনে স্বামীভূমিকাবতীর্ণ পুরুষদ্বয় জীবিত, সাবিত্রীর মৃত্যুর পরে একজনের দেখা মিলল, তাছাড়া তিনি নেপথ্যকাহিনীতেই ছিলেন; দেববাণীর স্বামী জীবন্মৃত এজন্যে যে, দেববাণীর জীবনে তার প্রিয় পুত্রের জন্মদাতা ও ব্যক্তিগতভাবে তার নিতান্তই কলঙ্কভাগ ছাড়া তিনি আর কিছু নন। অথচ এই দুই স্বামী—সূর্যচন্দ্র-গ্রাসী রাহুর মত, এদের নেপথ্যজীবনের নিত্যসঙ্গী, নির্জন স্বগতোক্তির প্রচ্ছন্ন প্রদাহ। সাবিত্রী এভাবেই শেষ হয়ে গেলেন। আদর্শবাদী মানবকল্যাণ আর বাস্তববাদী মানুষী কলঙ্কের দ্বিধায় সংঘর্ষে অবসাদে তিনি একরকম চলে গেলেন। যদিচ সরোজা, তাঁর কন্যা রয়ে গেল, একটা পরিণতিহীন প্রচুর প্রতিশ্রুতির আত্মদহনে, পরিহাসে। কিন্তু দেববাণীর প্রিয় পুত্র ছাড়া প্রিয় বান্ধব আছেন একজন, হিমাদ্রি। তাঁর সর্বত্যাগী বন্ধুর ভূমিকায় গল্পে প্রথম পদক্ষেপ, গল্পের শেষে দেখা যায় তিনি দেববাণীপুত্র সহ দেববাণীর স্বামীর ভূমিকায় উপনীত। সাবিত্রীরও স্বামী ছাড়া অনুরূপ এক গান্ধী-আশ্রমিক বন্ধু ছিলেন, সরোজার স্বীকারোক্তিতে জানি, তবে তিনি সাবিত্রীর জীবনে অনেক পরে এসেছিলেন, আর, উভয়ের নীরব আত্মনিবেদন ছাড়া পরস্পরের প্রতি কিছু করার ছিল না। কিন্তু দেববাণী যেহেতু আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা, বিজ্ঞানের ছাত্রী, অধ্যাপিকা, গবেষক এবং বয়সে তরুণী, সুতরাং তাকে সব দ্বিধা কাটাতেই হবে। গল্পের শেষে দেখি তার দ্বিধা কেটেছে যান্ত্রিক-ভাবে, একরূপ পরোক্ষে, হিমাদ্রি-খোকনের কষ্টকল্পিত ঐক্যযোগে, আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত জীবনদর্শনের অতি-অবিশ্বাস্য আরোপে। লেখকের সাফল্য-বৈফল্যের অন্যতম প্রধান অগ্নিপরীক্ষা ছিল এখানে, তাঁর নায়ক-নায়িকারও—অথচ সত্যসন্দ জীবনানুগ প্রত্যাশিত সামঞ্জস্য কিছুতেই ঘটে উঠল না। সাবিত্রীর জীবনে ঘটে নি, আগেই দেখেছি। দেববাণীর জীবনেও ঘটল না, গল্পের মেরুদণ্ড এখানে বিপর্যয় কেন্দ্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

লেখক গোড়াতেই একটা ভুল করেছেন বলে মনে হয়। সে হল জীবনে যেমন অনেক বিচিত্র বিরোধ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অনায়াস মীমাংসা ঘটে বলে একসময় প্রতিভাত হয়, উপন্যাসেও বুঝি অল্পায়াসেই তেমন সম্ভব। বস্তুত তা নয় এজন্যে যে, জীবনের সামঞ্জস্য জীবনব্যাপী তুচ্ছ বৃহৎ অসংখ্য ঘটনা ও দুর্ঘটনায় অদৃষ্টশক্তির দুর্নিবার সামঞ্জস্য, কিন্তু সাহিত্যের তথা ঔপন্যাসিক সামঞ্জস্য তার অল্পশক্তি নায়ক-নায়িকাঘটিত প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য মাত্র। প্রথম স্বাভাবিক, দ্বিতীয় নির্মিত। সুতরাং এর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যবিধান সে হিসেবে সত্যই সুকঠিন, সীতার সতীত্ব পরীক্ষার মত, স্বতই দুঃসাধ্য। মাত্র সৎ ও পবিত্র অভিলাষেই উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, পরিপাটি প্রয়োগ বিদ্যায় উপযুক্ত বিশ্লেষণে, ঔপন্যাসিক ন্যায় যথানুসরণেই শুধু তা সম্ভব।

এখন উপন্যাসপাঠগত বিস্তৃততর বিশ্লেষণে দেখা যায় সাবিত্রীর ক্ষেত্রে সরোজের জন্ম, বয়ঃবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা সমস্তই তাঁর শিরঃপীড়ার হেতু, অথচ বলতে গেলে এসমস্তেই

তাঁর ভূমিকা নৈতিধর্মী; অবান্তর, এমনকি এ বিষয়ে তুলনামূলকভাবে সক্রিয়তর তাঁর স্বামীও সরোজাকে কোন দিন অন্তরঙ্গভাবে জানেন নি, জানান নি। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ-দর্শিনীর মত সরোজা জেনে ফেলেছে তার জন্মসূত্র, দেববাণীর কাছে তার স্বীকারোক্তিতে আমরা অত্যাশ্চর্যভাবে জানতে পারি, সরোজার পিতা প্রথম জীবনে পুরুষত্বহীন থাকলেও পরজীবনে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় উক্ত শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। এ-যোগাযোগ সরোজার পক্ষে কীভাবে জানা সম্ভব? তার জন্মদাত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে শ্রীবিপিনভাই দেশাইয়ের অবৈধ, যদিচ নিরাপদ প্রণয়সম্পর্কই বা সে কোন্ সূত্রে জেনেছে? এ-সবই তাকে বলতে হয়েছে তার জন্যে দেববাণী তথা উপন্যাসের পাঠকদের সমবেদনা ও সহমর্মিতার আত্মীয়-বন্ধন ঘটাতে, তা হয়তো অসঙ্গত নয়; কিন্তু কাহিনীর গুরুত্ব বাড়াতে তার সিনিসিজ্‌মের একটা সমব্যথী ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এতদূর কষ্টকল্পনা অত্যন্ত অসঙ্গত, নিতান্তই অবাঞ্ছিত। ঠিক তেমনি দেববাণীর ক্ষেত্রে, আরো আপত্তিজনক ভাবে তার স্বামীপুত্র-কাহিনীর রহস্য ও রহস্যমোচনের প্রত্যক্ষবিচার হীন অপপ্রয়াস। তার প্রথম যৌবনের অব্যাখ্যাত রোমান্টিক ভাববিলাসসূত্রে প্রণয় ও পরিণয় যদি মেনেও নিই, তার স্বামীত্যাগের স্পষ্ট কার্যকারণহীন ঘটনাকে কীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব? তারপর সেই উচ্ছৃঙ্খল স্বামী (এটুকুই জানি) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে পর্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে, আর, তাকে নিরাপদ করেছে এসে হিমাদ্রি, কীভাবে তা আশ্চর্য। অতঃপর তার বিদ্যাভিলাষী জীবনে চরম ও পরম প্রাপ্তি একলা মায়ের দ্বারা সাধ্য নয়, যতই কেননা তিনি চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্যের অধিকারিনী মহিয়সী মহিলা হোন। সুতরাং হিমাদ্রিকে বারবার যথাসময়ে হাজির হতে হয়, বরদান হাতে নিয়ে। অথচ দেববাণীর ল্যাবরেটরি সংলগ্ন ডঃ ভাদুড়ীর বাড়িতে গভীররাত্রে উভয়ের সাক্ষাৎকার ও অন্যতম বরদান প্রসঙ্গ এম্নি অবিশ্বাস্য যে কল্পনা করতে বাধে। এসবই কাহিনীর সঙ্গে কাহিনী জুড়তে, কাহিনীকে সম্প্রসারিত করতে, পাত্রপাত্রীসংলগ্ন করতে, সংযুক্ত করতে কাজে লাগানো হয়েছে, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে লেখক এমন অকর্তব্য কাজ কেন করলেন? করলেন, যেহেতু তাঁকে সব দিককার সব বিরোধ বিতর্কের একটা সর্বসুখজনক মীমাংসা করতে হবে, সব দ্বন্দ্বসংঘাত অপচয় অবসাদের সর্বশ্রান্তিহর শেষে বা সমে পৌঁছতে হবে। পৌঁছনো গেল, কিন্তু শেষ অবধি তা বিষম হয়েই রইল। যাত্রাপথ ও পাথেয় সুনির্বাচিত সুনিয়ন্ত্রিত যথাযথ হয়নি বলেই এ-বিপত্তি। স্থানে স্থানে শাণিত সাংবাদিক চাতুর্য ও সুগভীর সাহিত্যিক কল্পনার সমন্বয়েও এ-বিপত্তি রোধ করা গেছে বলে উপন্যাসের উচ্চকণ্ঠ শেষ কটি পৃষ্ঠা সপ্রমাণ করে না।

তাছাড়া সরোজার শ্রান্তি ও অবসাদমলিন উজ্জ্বল মুখ যে এক ফুঁয়ে নিভে গেল তা এই উপন্যাসের উপযুক্ত ফলশ্রুতি নয়। এখানে ঋজু চরিত্র বলতে দেখানো হয়েছে অনেকগুলি, যেমন সাবিত্রী, হিমাদ্রি, দেববাণী, বাসন্তীদেবী—কিন্তু সরোজার ঋজুতা বুঝি এদের কাছেও দৃষ্টান্তস্বরূপ! বিশেষত তার জন্মলগ্নে যে ধূমকেতুর পুচ্ছতাড়না ছিল আর তৎসহ আর-পাঁচটা যুগোচিত কারণ মিলে তাকে এমন তিক্তবিরক্ত করে তুলেছে যে, সে নৈতিধর্মে আক্রান্ত বহ্নিউজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির ভস্ম পরিণতি মাত্র। এ ঘটনা আমাদের এককালীন রুদ্ধশ্বাস যৌবনের পরে অসামান্য আলোকপাত বলেও আমাদের মনে হতে পারত, কিন্তু তার ভাবপ্রবণ অবসান তার এতাবৎকালীন ঋজুতার প্রতি সত্যমূল্য দিতে পারে নি। সে একটা হালফ্যাসানি মডেল বা টাইপে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের সমস্ত অভিনিবেশ অর্থহীন করে দিয়েছে। এটা তার প্রতি, তার কাল ও স্বভাবের অবক্ষয়ের প্রতি

সুবিচার নয়। এবং এর জন্যেও লেখকের দ্বিধাবিভক্ত মনোভাবই দায়ী। সাবিত্রী ও দেববাণী-কেন্দ্রিক দুই বিরুদ্ধ স্রোতের অস্বস্তিকর অবগাহনে যখন তিনি বিব্রত ও শ্রান্ত তখন সরোজাসূত্রের গ্রন্থিমোচনে ঈপ্সিত, বৈজ্ঞানিক ন্যায় রক্ষায় তাঁর শিথিলতা আশ্চর্য নয়। বিশেষত, ইতিমধ্যে মূল কাহিনী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর এ-বিপর্যয় একাধিকবার লক্ষে পড়েছে। যেমন, দিল্লী তথা নবীন ভারতের বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে দেববাণীর কনট প্লেসে সাক্ষাৎকার। এই ড্রইংরুম সুলভ প্রায় অনর্থক ঘটনা ও সংলাপ প্রবাহকে লেখক কেন টেনে আনলেন, 'এমন অনাহূতের মতো'? এখানে সূক্ষ্মতাস্থূলতায় মেশা একটা প্রখর ঘনিষ্ট আলোচনাচক্রের চকিত চমক আছে, কিন্তু ততোধিক আর কী আছে যা লেখকের উপন্যাসগত পরিণতিসন্ধানে সামান্যও ক্রিয়াশীল? চাণক্য সেনের অনুরাগী পাঠকদের এসব প্রশ্ন নিশ্চয়ই চিন্তিত ও বিভ্রান্ত করবে।

"সে নহি সে নহি"তে তিনি যে পটভূমি বিস্তৃত করেছেন সে সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা প্রচুর, দিল্লী, দক্ষিণভারত, বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ধ্যান ও নবীন জ্ঞান-কর্মকাণ্ড তাঁর অনায়ত্ত নয়, তিনি যতটুকু ব্যবহার করেছেন তার সবটুকুই তাঁর সত্যমূল্যে আহৃত, 'শৌখিন মজদুরির' লোভে কোন মিথ্যাচার করেন নি, বরং তাঁর সাধ্যমত পূর্বাপর বিশ্লেষণে এই নবনিযুক্ত পটভূমির মর্মসন্ধানেও তিনি কর্পণ্য করেন নি। অধিকন্তু তাঁর অধিকাংশ প্রধান পাত্রপাত্রী, স্থানবিশেষে অপ্রধান পাত্রপাত্রী চরিত্রেও তিনি 'equality of things and the unity of man' প্রত্যয়যোগে প্রতিফলিত করেছেন। অথচ সেই কর্মে ব্রতী হয়ে সর্বত্র তার আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানীসুলভ নির্লিপ্ত যাথাযথ্য তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। সাবিত্রী-সরোজা দেববাণী-হিমাদ্রি বিষয়সন্নিবেশের অমীমাংসিত বিরোধ ও অসামঞ্জস্য তাই আমাদের কাছে এত পীড়াদায়ক লাগছে। এ-উপন্যাসে তাঁর সাজসরঞ্জাম ছিল, আয়োজন ছিল, ভাষাভঙ্গির ধার ছিল, কল্পনাবৃত্তি ও মননের সার ছিল, কিন্তু তিনি এত আয়োজনের যথাযোগ্য সৎকার, প্রয়োজনীয় সংহতিসাধন কেন যে ঘটাতে চাইলেন না সেটাই বিচার্য। আমার সন্দেহ হয়, তাঁর সাংবাদিকসুলভ তথ্যনিষ্ঠা, ঘটনা ও অঘটন সংঘটন প্রভৃতি তাঁকে সাহিত্যিক নিয়ন্ত্রণের দাবি, মিতাচারের মাত্রা, সর্বত্র খাটাতে দেয় নি। তিনি অনেকটাই যেন ভেসে গেছেন, প্রতিনিবৃত্ত হন নি। তাঁর লেখার জোর ও গতি তাঁকে এ বিষয়ে ঠেলেই দিয়েছে, মুক্তবন্ধ করে নি। নইলে প্রসঙ্গত, লঘুর দিকে একটিই উল্লেখ্য, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাব্যাপী তিনি সাবিত্রী আম্মার গৃহে ভোজসভায় দক্ষিণ-ভারতীয় আহার্যপাণীয়ের অত বিস্তৃত তালিকা কেন দিলেন, কেনই বা নিমন্ত্রণে উপস্থিত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কেষ্টবিষ্টুদের নিয়ে অনর্থক আবয়বিক ও ব্যবহারিক বর্ণনায় অনায়াস কালক্ষেপ করলেন? এবং গুরুবিষয়ের অন্যতম, উপন্যাসের একেবারে শেষে দেববাণী-হিমাদ্রি-খোকনের গোঁজামিলনে ক্রিয়োপাত্রীঘটিত হীরক-সুরায়ন অত রসপল্লবিত করেই বা কেন বললেন? এই অংশের সমস্ত গৌরব হরণ করল তার সাহিত্যিক নিরাসক্তির অসদ্ভাব, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরিণতিসন্ধানে অনীহা—কিছুতেই, কোন স্টান্টেই দেববাণী-হিমাদ্রির রক্ত প্রত্যয়হীন আরোপিত-সুপরিণতির অস্বাভাবিকতা ঘুচবার নয়। অথচ এই কাজ সুসম্পন্ন করতে তাঁর লেখনী উদ্যত হয়েছিল, সে নির্দ্বিধ ও অকম্পিত থাকে নি, তাই সর্বসাকুল্যে মহতী বিনষ্টি কিছুতেই রোধ করা গেল না।

বস্তুত উদ্দেশ্য ও উপায়ের অসংগতি, প্রতিপাদ্য ও প্রস্তুতির বিরোধ এই গ্রন্থের

যাবতীয় বিপর্যয়ের কারণ। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচ্য প্রতীচ্য ব্যাপ্ত বৃহৎ পটভূমিতে বিস্তৃত সাবিত্রী ও দেববাণীর যুক্তবেণী কাহিনী বর্ণনায় যে প্রত্যক্ষতা দাবি করে লেখক তা পূরণ করেন নি। আংশিক সরাসরি, বাকি সবটাই পরোক্ষ বর্ণনায় বিধৃত কাহিনীর বিচিত্র উপকাহিনী ও চরিত্র তাই প্রায়শ জীবন্ত হয়ে না এসে ভাবের ও উদ্দেশ্যাসিদ্ধির মূর্তি ধরে এসেছে মাত্র। হেনরি জেমস বলেছিলেন, 'বিবৃত কোরো না, দ্যোতিত করো, ঘটনার বর্ণনা চাই না, তাকে ঘটতে দাও', লেখক সেই অত্যাবশ্যক সর্তপূরণ করেন নি বলেই এই বিপত্তি; এমনকি তাঁর নায়িকা যে দেববাণী সেও এই টানা পোড়েনে পড়ে দ্বিধায় দ্বন্দ্বে যুদ্ধে যুদ্ধজয়ে পরাভবে প্রত্যয়ে সঞ্জীবিত রূপ না নিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি ভাবাদর্শের মৃৎ প্রতিমা—'সোনার পিতল মূর্তি'। তুলনায় সাবিত্রী আম্মা অনেকটা সজীব। আর সরোজার সপ্রাণতা যে অহেতুক ভাববাষ্পে অবসিত, সে কথা আগেই বলেছি। হিমাদ্রিও পূর্বাপর সামঞ্জস্য যাথাযথ্যে স্নায়ুরক্তময় স্বভাবী মানুষ নয়, অনেকটাই যেন অলৌকিক ক্ষমতাবান, যত্রতত্র ও যেনতেনপ্রকারেণ বরদান সক্ষম মহাপুরুষ। তাই বলব, চাণক্য সেনের বস্তুভাববাদী শিল্পীস্বভাবের যতখানি জানি, তাতে তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরণ অনুচিত হয়েছে। সাংবাদিক নৈকট্যে তথ্যবিশ্বস্ততার 'ব্লুপ্রিন্ট' পেশ করলেন তিনি—শৈল্পিক দূরত্ববিধান নির্লিপ্তভাষণ সম্ভব হল না; পটভূমিসমেত পাত্রপাত্রীও তাই সৃজনশীল মনের সত্যচিত্রে রূপায়িত হতে গিয়ে বারবার ব্যাহত হল, সচরাচর মেরুদণ্ডহীন হালের বাংলা উপন্যাসে কেবলমাত্র বলিষ্ঠ ইচ্ছা ও চিন্তার রম্য প্রকাশ হয়ে রইল এই গ্রন্থ, যথোচিত মাত্রাজ্ঞানে, বিন্যাসে, প্রচেষ্টায়, অধ্যবসায়ে, সামঞ্জস্যে, সংগতিবিধানে ততোধিক বাঞ্ছিত আশাপূরণ, ঘটনা ও চরিত্রের বৈজ্ঞানিক বিবর্তন, স্বাভাবিক বিকাশ, পরিণতি সাধিত হল না।

নিখিলকুমার নন্দী

Beyond the Blues. Selected and Introduced *By* Rosey E. Pool. The Hand and Flower Press. 8*s*. 6*d*.

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে, ১৯০৩ সালে ডক্টর ডব্লু. ই. বি. দুবয় (সম্প্রতি তিনি ঘানার প্রেসিডেণ্ট ডক্টর নক্রুমার অনুরোধে আক্রায় "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আফ্রিকানা" সম্পাদনায় ব্যাপৃত) "দি সোলস অফ ব্ল্যাক ফোক" নামীয় বিশিষ্ট গ্রন্থে নিগ্রো লোককাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন, যে আমেরিকা পৃথিবীকে চোখ-ধাঁধানো জৌলুষ ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই দিতে পারে নি, দৈবাধীন ঘটনাক্রমে সেই আমেরিকা থেকেই বাহির-বিশ্ব শুনল প্রাণ-সমৃদ্ধ গান, মানবাত্মার আশ্চর্য উদ্‌গ্রীথ। সেই উদ্‌গ্রীথের স্রষ্টা ও রূপায়ক কিন্তু সভ্যতাগর্বী শ্বেতকায় নন, কৃষ্ণবর্ণের দল, সুদূর আফ্রিকা থেকে যাদের উৎপাটিত এবং দাসবৃত্তিতে নিযুক্ত করে শ্বেতকায়রা দীর্ঘকাল সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছেন। এবং এখনো যাদের কৃষ্ণবর্ণের ছোঁয়াচ বাঁচাতে তৎপরতার অন্ত নেই। সংস্কৃতি-সন্ধানীরা তাই কিছুটা অবাকই হলেন যখন তাঁরা ঐ সব নিগ্রো দাস-দাসীদের মুখে হৃদয়োৎসারী গান শুনলেন, এবং আরো অবাক হলেন যখন তাঁরা ঐ সব ছিন্নমূল—ঐতিহাসিক, জাতিগত, সাংস্কৃতিক সমস্তরকম পটভূমি

থেকেই বিচ্ছিন্ন—শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত আদি আফ্রিকানদের কাছ থেকে এমন সব রচনা পেলেন, বিষয়বস্তু ও অপোৎকর্ষে সেগুলি যথার্থ কবিতার স্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আঠারো শতকের জুপিটার হ্যামন বা উনিশ শতকের জর্জ মোজেস হর্টনের স্কুল-কলেজের শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই ছিল না, কিন্তু তাঁদের কবিতায় প্রতিবিম্বিত কবিমনকে অস্বীকার করবেন কে? আঠারো শতকের ফিলিস হুইটলি, আফ্রিকা থেকে চুরি করে আনা হয়েছিল যে মেয়েটিকে, ক্ষমতাসম্পন্ন কবি বলে স্বীকৃত, যদিচ সমালোচকদের মতে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধির সামীপ্য লাভ করতে পারেন নি। ফ্রান্সেস এলেন হার্পার, যিনি ১৯১১ সালে মারা যান, বিশিষ্ট কবিখ্যাতির অধিকারিণী হয়েছিলেন। এ'দের অনেকের রচনাতে হয়ত নানা দুর্বলতা পরিলক্ষ্য, সময় সময় মিল্টন, বাইরন, লংফেলোদের কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না তা নয়, কিন্তু সমস্ত দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এ'দের রচনাকে যা দীপ্যমান করে রেখেছে তা হল কবিমন, অকৈতব অনুভূতি, একটু অন্যভাবে প্রেরণা, যার জন্মদাত্রী।

সেই সব কবি ও তাঁদের কবিতা অবশ্য আজ সাহিত্য-প্রত্নশাস্ত্রের অন্তর্গত। তবু আধুনিক নিগ্রো কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের নাম স্মরণীয়। এ বিষয়ে দুবোয়ের গ্রন্থই প্রামাণিকতার মর্যাদা দাবি করে। ১৯২২ সালে জেমস ওয়েলডন জনসন "দি নিগ্রোস ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস" নামীয় নিগ্রো কবিতার সংকলনগ্রন্থ প্রকাশের ফলে বিশ্বের কবিতা পাঠকরা নিগ্রো কবিতার ঐশ্বর্যের সন্ধান পেলেন। জনসন-কৃত এই কাব্য-সংগ্রহই প্রথম নিগ্রো কবিতার সংকলন-গ্রন্থ। 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড আন্‌নোন বার্‌ড্‌স' কবিতা খ্যাত জনসর ঐ সংকলনের মুখবন্ধে আত্মপ্রত্যয়ের ঋজু সুরে বললেন:

The status of the Negro in the United States is more a question of national mental attitude toward the race than of actual conditions. And nothing will do more to change that mental attitude and raise his status than a demonstration of intellectual parity by the Negro through the production of literature and art.

এই আত্মপ্রত্যয় ফলপ্রসূ হয়েছে, তার প্রমাণ জনসনের সংকলনের পরে আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য সংকলন বেরিয়েছে। একটি কাউণ্টি কুলেন-কৃত "ক্যারোলিং ডাস্ক", প্রকাশকাল ১৯২৭; অন্যটি ল্যাংস্টন হিউজ এবং আর্না বোন্‌টেম্পস সম্পাদিত "দি পোয়েট্রি অফ দি নিগ্রো, ১৭৪৬—১৯৪৯"। মোট ছেষট্টি জনের কবিতার সমাহারে প্রকাশিত শেষোক্ত সংকলনটি অত্যন্ত মূল্যবান। নিগ্রো কবিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও ধারণা, বলতে গেলে প্রধানত ঐ গ্রন্থ থেকেই লব্ধ।

হিউজ-বোন্‌টেম্পস সম্পাদিত সংকলনের উদ্দেশ্য ও পরিসর ব্যাপক, অন্যপক্ষে বর্তমান সংকলন ভিন্নতর উদ্দেশ্যে ও পরিকল্পনায় রচিত। "বিঅণ্ড দি ব্লুজ"-এর সম্পাদিকা ডক্টর রোজি. ই. পুল জনসন-কথিত 'নিগ্রো ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস'-এর কিছু নমুনা উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সংকলন প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া এই সংকলন এ-কালের নিগ্রো কবিদের রচনার সমবায়ে গড়ে উঠেছে। প'চানব্বই বছরের প্রবীণ দুবয়, থেকে শুরু করে আঠারো বছরের তরুণ স্ট্যানলি ই. মরিস পর্যন্ত মোট ছাপ্পান্ন জন কবির রচনা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এই সংকলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য, সংগৃহীত কবিতার অধিকাংশ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, এবং কবিদের অনেকেও উইলিঅম ব্রাউনের মতো অপেক্ষাকৃত নবীন। সম্পাদিকার ভাষায়, "বিঅণ্ড দি ব্লুজ" সাম্প্রতিক কালের নিগ্রো কবিদের

প্রথম ও একমাত্র সংকলনগ্রন্থ এবং এই গ্রন্থে প্রবীণ ও নবীন কবিদের মধ্যে সেই যোগসূত্র পাওয়া যাবে, আধুনিক নিগ্রো কবিতার গতিপ্রকৃতি বিচারে যার মূল্য অপরিসীম।

বিভিন্ন বয়সের কবির রচনায় এই সংকলনে স্বভাবতঃই আমরা বিভিন্ন মেজাজের, সুরের ও স্বরের সন্ধান লাভ করি। তথাকথিত পণ্ডিত সমালোচকদের প্রতি রে ডুরেম-এর ব্যঙ্গগর্ভ ঋজু উক্তি: 'আমি জানি সমালোচকদের খুশি করার মতো আমি যথেষ্ট দুর্বোধ্য নই' (পৃ. ১০৩)-র সঙ্গে পাওয়া যাবে চার্লস অ্যান্ডার্সন-এর ঠাট্টামেশানো 'প্রশ্ন' জাতীয় কবিতা (পৃ. ৩৯), শাদা চামড়ার মেয়েটির প্রতি টেড জোন্স-এর শ্লেষাত্মক কবিতার (পৃ. ১৩২) পর পাঠক এসে পৌঁছাবেন পল ভেসির 'সিঁড়ি'র মতো বিষাদমলিন দুরূহ কবিতার রাজ্যে। নিগ্রো কবিতা যে কতখানি বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যময় ও ঐশ্বর্যে বৈচিত্র্যময় হিউজ-বোন্‌টেম্পস-এর সংকলনখানি পাঠ করলেই বোঝা যায়। বর্তমান সংকলন পাঠকের সেই ধারণাকে দৃঢ়মূল হতে সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে নিগ্রো কবিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিও ইঙ্গিত করে।

গীতিপ্রবণ মার্কিনী নিগ্রোদের মধ্যে কবিতা লেখার তাড়না প্রবল, বোন্‌টেম্পস-এর মতে তাঁরা take to poetry as they do to music. কবিতা লেখার ক্ষমতাও তাঁদের কতকটা সহজাত। তাঁদের কবিতা পড়ে মনে হয় তাঁরা যা ভাবেন তাই লেখেন: ফলত তাঁদের কবিতা হয়ে-ওঠা পদার্থ, বানিয়ে-তোলা জিনিস নয়। নিজের জাতের কথা, ঈশ্বর, প্রেম, জীবন, মৃত্যু, প্রকৃতি—বিভিন্ন প্রসঙ্গ-সংক্রান্ত আবেগ ও অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে মার্কিনী নিগ্রো কবিতা। এবং সেই আবেগ ও অভিজ্ঞতার ঘরে ফাঁকি নেই বলেই মার্কিনী নিগ্রো কবিতার আবেদন সরাসরি হৃদয়কে স্পর্শ করে। এর কারণ, আমার ধারণায়, মার্কিনী নিগ্রো কবিতার, ব্যাপকভাবে নিগ্রো কবিতার, পটভূমি রচনা করেছে নিগ্রো লোক-সঙ্গীতের ঐশ্বর্যবান ঐতিহ্য এবং বলাই বাহুল্য, সঙ্গীতের, বিশেষত লোকসঙ্গীতের, আবেদন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও গভীর। পল ভেসির মতো দু'চারজন দুরূহ কবি নিগ্রোদের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু সাধারণতঃ নিগ্রো কবিতা জটিলতাবর্জিত এবং আবেগ-অনুভূতিতে হার্দ্যভারে স্পন্দমান। "বিঅন্ড দি ব্লুজ" পড়ে এ কথা আরেকবার মনে হল। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে পশ্চিমী শিল্পকলা একদিন আফ্রিকার কাঠখোদাইয়ে, বেনিন ব্রোঞ্জে, 'বার্বারিক' মুখোশে নতুন প্রেরণার উৎস খুঁজে পেয়েছিল, কোন একদিন অঙ্গ পারিপাট্য ও ভঙ্গী-ক্লান্ত পশ্চিমী কাব্যকলা নতুন পথের সন্ধানে নিগ্রো কবিতার রাজ্যে গিয়ে হাজির হবে কি না কে বলতে পারে?

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত